বাংলা একাডেমি

বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি

গ্রন্থমালা

ভোলা

বাংলা একাডেমি

বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি

গ্রন্থমালা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বাংলা একাডেমি

বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা

ভোলা জেলা

প্রধান সম্পাদক

শামসুজ্জামান খান

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক

মো. আলতাফ হোসেন

সহযোগী সম্পাদক

আমিনুর রহমান সুলতান

বাংলা একাডেমি ঢাকা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রধান সমন্বয়কারী
মো. মফিজুল ইসলাম

সংগ্রাহক
ফারজানা শরমিন
মুসবাহ্ আহমেদ মাহদি
আবু সাঈদ সিকদার
মো. শাহাদাত হোসেন

www.pathagar.com

বাংলা একাডেমি
বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা
ভোলা

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় ১৪২১/ জুন ২০১৪

বা/এ ৫৩২১

প্রকাশক
মো. আলতাফ হোসেন
কর্মসূচি পরিচালক
লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচি
বাংলা একাডেমি ঢাকা

মুদ্রণ
সমীর কুমার সরকার
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমি প্রেস

প্রচ্ছদ
কাইয়ূম চৌধুরী

মূল্য
দুইশত বিশ টাকা মাত্র

BANGLADESHER LOKOJO SOMSKRITI GRONTHAMALA: VOLA (Present state of Folklore in Vola District), Chief Editor : Shamsuzzaman Khan. Managing Editor : Md Altaf Hossain. Associate Editor : Aminur Rahman Sultan, Publication : Lokojo Somskritir Bikash Karmosuchi (Programme for the Development of Folklore), Bangla Academy, Dhaka-1000, Bangladesh. First Published : June 2014. Price : 220.00 only. US $: 7

ISBN-984-07-5351-7

www.pathagar.com

প্রসঙ্গ-কথা

বাংলা একাডেমি তার জন্মলগ্ন থেকেই বাংলাদেশের সমৃদ্ধ ফোকলোর উপাদান (folklore materials) সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং তার গবেষণার প্রয়াস চালিয়ে আসছে। এই কাজের জন্য সূচনাপর্বেই একটি ফোকলোর বিভাগও গঠন করা হয়। এই বিভাগটির নাম লোকসংস্কৃতি বা ঐতিহ্যগত সংস্কৃতি বিভাগ না রেখে ফোকলোর নামটি যে ব্যবহার করা হয় তাতে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। যতদূর জানা যায়, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এই নামকরণ করেন। তবে একই সঙ্গে ফিল্ডওয়ার্কভিত্তিক সংগ্রহ প্রকাশের জন্য যে-সংকলনটি প্রকাশ করা হয় তার নাম ছিল *লোকসাহিত্য সংকলন*। এই নামটি ফোকলোরের অনেকগুলো শাখা-প্রশাখার (genre) একটি প্রধান শাখা মাত্র (folk literature)। এর ফলে ফোকলোরের আধুনিক ও সার্বিক ধারণা সম্পর্কে কিছু অস্পষ্টতার পরিচয় পরিলক্ষিত হয়। এই অপূর্ণতা পূরণের উদ্দেশ্যে ১৯৮৫ সালে আমরা যখন বাংলা একাডেমি থেকে ফোকলোর আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ফোর্ড ফাউন্ডেশনের অর্থানুকূল্যে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফোকলোরবিদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বার্কলিস্থ ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অধ্যাপক অ্যালান ডান্ডেস, ফিনল্যান্ডস্থ নরডিক ইনস্টিটিউট অব ফোকলোরের পরিচালক প্রফেসর লাউরি হংকো, ভারতের মহীশূরস্থ কেন্দ্রীয় ভাষা ইনস্টিটিউটের ফোকলোর বিভাগের প্রধান ড. জহরলাল হান্ডু, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিখ্যাত লোকশিল্প বিশেষজ্ঞ ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোকলোর বিভাগের অধ্যাপক হেনরি গ্লাসি, ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভানিয়ার অধ্যাপিকা মার্গারেট এন মিলস্, পাকিস্তানের লোকভিরসার (ফোকলোর ইনস্টিটিউট অব পাকিস্তান) নির্বাহী পরিচালক আকসি মুফতি, ফিনল্যান্ডের ফোকলোর বিশেষজ্ঞ ড. হারবিলাতি এবং কলকাতার Folklore পত্রিকার সম্পাদক শঙ্কর সেনগুপ্ত প্রমুখ বিশেষজ্ঞবৃন্দকে কর্মশালার ফ্যাকাল্টি মেম্বার করে তিনটি আন্তর্জাতিক কর্মশালার আয়োজন করি। এতে বাংলাদেশের ফোকলোর-বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মযহারুল ইসলাম, অধ্যাপক আশরাফ সিদ্দিকী, অধ্যাপক আবদুল হাফিজ, অধ্যক্ষ তোফায়েল আহমদ, অধ্যাপক নিয়াজ জামান, ড. হামিদা হোসেন, মিসেস পারভীন আহমেদ প্রমুখ প্রশিক্ষণ দান করেন। বাংলাদেশের আধুনিক ফোকলোর চর্চার অন্যতম পথিকৃৎ অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন প্রধান অতিথি হিসেবে প্রথম কর্মশালাটির উদ্বোধন করেন। সেই কর্মশালাসমূহের অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে একাডেমির ফিল্ডওয়ার্কভিত্তিক লোকজ উপাদান সংগ্রহসমূহ প্রকাশের পত্রিকার নাম *লোকসাহিত্য সংকলন* পরিবর্তন করে *ফোকলোর সংকলন* নামকরণ করা হয়। ওই কর্মশালা আয়োজনের আগে দেশব্যাপী একটি জরিপের মাধ্যমে ফোকলোরের

www.pathagar.com

কোন কোন ক্ষেত্রে কাজ হয়েছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে একেবারেই কোনো কাজ হয়নি তা চিহ্নিত করার জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে জরিপ চালানো হয়। তবে তখন লোকবল এবং অর্থ সংস্থান সীমিত থাকায় তাকে খুব ব্যাপক করা যায়নি। ফলে বাংলাদেশে ফোকলোর সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও গবেষণার উপর যে-সমস্ত গ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়েছে তার একটি দ্বিভাষিক গ্রন্থ *Bibliography of Folklore in Bangladesh* এবং *Folklore of Bangladesh* নামে ইংরেজি ভাষায় একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়। এছাড়া *ময়মনসিংহ গীতিকা* যেহেতু আমাদের ফোকলোর গবেষণার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত সে-কথাটি মনে রেখে *লোকসংগীত সমীক্ষা : কেন্দুয়া অঞ্চল* প্রকাশ করা হয়। এর লক্ষ্য ছিল *ময়মনসিংহ গীতিকা*-র পটভূমি (context) সম্পর্কে অবহিত হওয়া। এ ধরনের বিচ্ছিন্ন দু-একটি কাজের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে ফোকলোরের সামগ্রিক চিত্র পরিস্ফুট হয়নি। সে-কাজ করার মতো অবকাঠামোগত ব্যবস্থা, আর্থিক সঙ্গতি এবং প্রশিক্ষিত লোকবলও তখন বাংলা একাডেমিতে ছিল না। তবুও যাঁরা ছিলেন তাঁরা সকলেই অত্যন্ত নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের সঙ্গে কাজ করার ফলে উপাদান যে কম সংগৃহীত হয়েছিল তা নয়। কিন্তু সর্বসাম্প্রতিক গবেষণা পদ্ধতি ও তাত্ত্বিক বিষয়ে ভালো ধারণা না থাকায় বাংলাদেশের ফোকলোরের সামগ্রিক চিত্র যথাযথভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়নি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, কয়েক বছর আগে এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে লোকসংস্কৃতি সংগ্রহ গ্রন্থমালা ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে। এতেও বাংলাদেশের ফোকলোরের ব্যাপকতা, আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের ধরন এবং উপাদানসমূহের প্রবহমানতার ফলে নিয়ত যে পরিবর্তন ঘটছে সে-সম্পর্কেও মাঠপর্যায়ভিত্তিক বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ (empirical) গবেষণার পরিচয় খুব একটা লক্ষ করা যায় না।

ফোকলোর সমাজ পরিবর্তনের (social change) সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত, বিবর্তিত ও রূপান্তরিত হয়। কোনো কোনো উপাদানের কার্যকারিতা (function) সমাজে না থাকায় তা তখন ফোকলোর হিসেবে বিবেচিত হয় না। সেজন্যই যে-সমস্ত ফোকলোর উপাদানের সামাজিক উপযোগিতা নেই এবং সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে তার কী ধরনের রূপান্তর ঘটছে তা যদি ব্যাখ্যা করা না হয় তা হলে তাকে আধুনিক ফোকলোর গবেষণা বলা যায় না। ফোকলোরের সামাজিক উপযোগিতার একটি প্রধান দিক হলো এর পরিবেশনা (performance)। ফোকলোর হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার জন্য সমাজে এর পারফরমেন্স থাকা চাই। ফোকলোরবিদ্যার এ-কালের প্রখ্যাত গবেষক ও পণ্ডিত প্রফেসর রজার ডি আব্রাহামস্ (Professor Roger D Abrahams) তাই বলেছেন, "Folklore is folklore only when performed". অর্থাৎ, যে-সমস্ত ফোকলোর উপাদানের এখন আর পরিবেশনা বা অন্য কোনো সামাজিক কার্যকারিতা (social function and utility) নেই তা আর ফোকলোর নয়।

ফোকলোর চলমান (dynamic) এবং বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষুদ্র গ্রুপসমূহের মধ্যে শিল্পিত সংযোগের (artistic communication) এক শক্তিশালী মাধ্যম। বর্তমান যুগ সংযোগের (age of communication) যুগ। দেশের বিভিন্ন স্থানে

www.pathagar.com

স্থানীয় গ্রুপসমূহের মধ্যে লোকজ উপাদানসমূহের (folkloric elements) কীভাবে সাংস্কৃতিক ও শিল্পসম্মত সংযোগ তৈরি হচ্ছে তা জানা ও বোঝার জন্য ফোকলোরের গুরুত্বও তাই সামান্য নয়। এই বিষয়গুলোকে মাথায় রেখেই বর্তমান শেখ হাসিনা সরকারের অর্থানুকূল্যে বাংলা একাডেমি ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে *লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচি*-র মাধ্যমে দেশের ৬৪টি জেলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক রূপান্তরের ধারায় লোকজ সংস্কৃতির ইতিহাসের একটি রূপরেখা তুলে ধরার লক্ষ্যে প্রতিটি জেলায় একজন প্রধান সমন্বয়কারী এবং একাধিক সংগ্রাহক নিয়োগের মাধ্যমে জেলাসমূহের তৃণমূল পর্যায় থেকে ফিল্ডওয়ার্কের মাধ্যমে উপাদান সংগ্রহের কাজ শুরু করে। কাজের শুরুতে অকুস্থল থেকে কীভাবে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে হবে সে-সম্পর্কে তাদের হাতে প্রথমে একটি সাধারণ পরিচিতিমূলক ধারণাপত্র ধরিয়ে দেয়া হয়। তা ছিল নিম্নরূপ :

লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন সংক্রান্ত নির্দেশাবলি

স্থবিরতা নয়, সামাজিক প্রবহমানতার মধ্যে লোকজ সংস্কৃতির উপাদান সংগ্রহ করাই এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য

এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য হলো দেশের প্রতিটি জেলার লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানা। সেই লক্ষ্যে প্রতিটি জেলার জন্য মনোনীত একজন প্রধান সমন্বয়কারীর তত্ত্বাবধানে সংগ্রাহকদের মাধ্যমে কাজটি সম্পন্ন করা।

কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে যা করতে হবে

১. সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলার ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও ফোকলোর বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করতে হবে।
২. সংযোগ ব্যক্তি (contact person) পূর্বেই নির্বাচন করতে হবে।
৩. সংশ্লিষ্ট এলাকায় থাকার ব্যবস্থা আগে থেকেই ঠিক করে রাখতে হবে।
৪. সকল তথ্য-উপাত্ত সরাসরি সক্রিয় ঐতিহ্যধারক (active tradition-bearer)-এর কাছ থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
৫. সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত অবশ্যই মৌলিক ও বিশ্বস্ত হতে হবে।
৬. সংগ্রহকালে প্রয়োজনীয় প্রতিটি বিষয় ও পর্যায়ের আলোকচিত্র গ্রহণ করতে হবে।
৭. সংগ্রহ পাঠাবার সময় কাগজের এক পৃষ্ঠা ব্যবহার করতে হবে।
৮. প্রতিটি পৃষ্ঠার নিচে পাদটীকায় দুরূহ আঞ্চলিক শব্দের অর্থ ও প্রয়োজনীয় টীকা (তথ্যদাতার কাছ থেকে জেনে নিয়ে) দিতে হবে।
৯. সংগ্রহ পাঠানোর সময় সেগুলোর কপি নিজেদের কাছে রাখতে হবে।
১০. সংগ্রাহক ও তথ্য প্রদানকারীর নাম, ছবি, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা, পেশা, বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা (যদি থাকে) প্রভৃতি উল্লেখ করতে হবে।
১১. সংগ্রহের তারিখ, সময় ও স্থান অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।

www.pathagar.com

১২. বই/প্রবন্ধ থেকে কোনো তথ্য/বিবরণ নেয়া যাবে না। তবে উদ্ধৃতি দেয়া যাবে।

যে-সব তথ্যাদি/উপাদান সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করে পাঠাতে হবে

ক. জেলা/উপজেলার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

১. জেলা/উপজেলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস ও পরিবেশ-প্রতিবেশ (milieu and context)-এর বিবরণ (২০ পৃষ্ঠা)।

২. জেলা/উপজেলার মানচিত্র, সীমানা, শিক্ষার হার, জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য (১০ পৃষ্ঠা)।

৩. জেলা/উপজেলার নদ-নদী, পুকুর-দিঘি, মসজিদ-মন্দির ইত্যাদি লোকজ সংস্কৃতির উপাদান সৃষ্টিতে কী ভূমিকা রাখছে তার বিবরণ (১৫ পৃষ্ঠা)।

৪. জেলা/উপজেলার প্রধান প্রধান খাদ্যশস্য ও চাষাবাদের সঙ্গে লোকজ ঐতিহ্যের সম্পর্ক (যেমন : নবান্ন, পিঠাপুলি, পৌষ-পার্বণ, বৈশাখি খাবার ইত্যাদি) (২০ পৃষ্ঠা)।

৫. জেলা/উপজেলার ঘরবাড়ি, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য-খাবারের লোকজ-ঐতিহ্যগত বৈশিষ্ট্য (১৫ পৃষ্ঠা)।

৬. লোকজ সংস্কৃতিতে জেলা/উপজেলার হাট-বাজারের ভূমিকা (৫ পৃষ্ঠা)।

৭. অন্যান্য ঐতিহ্যিক বিষয়াদি (যদি থাকে)।

খ লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সম্পর্কিত

১. জেলা/উপজেলার প্রধান প্রধান লোকসংগীতের নাম, ফর্ম ও গায়নরীতি, কারা গায়ক, কখন গাওয়া হয় ইত্যাদির বিবরণ (৪০ পৃষ্ঠা)।

   ক. লোকসংগীত আসরের বিবরণ, দর্শক-শ্রোতার প্রতিক্রিয়া, কবিয়াল/বয়াতির সংগীত পরিবেশন কৌশল ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করতে হবে।

   খ. সংগৃহীত লোকসংগীত কোন শাখার (যেমন : কবিগান, জারিগান, গম্ভীরাগান, সারিগান, বাউলগান, মেয়েলি গীত, বারোমাসি ইত্যাদি) উল্লেখ করতে হবে।

ফিল্ডওয়ার্ক-এর ছক ও আনুষঙ্গিক তথ্যপত্র

প্রস্তুতিপর্ব : ম্যাপ, স্থানীয় ইতিহাস ও সংশ্লিষ্ট বইপুস্তক দেখা, পাঠ ও অনুসন্ধান/সংযোগ ব্যক্তি ও থাকার জায়গা ঠিক করা

ক. ফিল্ডওয়ার্কের নাম, সময়সীমা ও বিষয়, উদ্দেশ্য, প্রকৃতি অর্থ-সংস্থান-সূত্র, উদ্যোক্তা ইত্যাদি ঠিক করা।

খ. ডেস্কওয়ার্কের পরিকল্পনার বিবরণ, ডিভিশন অব লেবার (যৌথ ফিল্ডওয়ার্কে) ও প্রাসঙ্গিক তথ্য।

গ. দলের গঠন-প্রকৃতি, সদস্যবৃন্দ ও ব্যবহৃতব্য যন্ত্রপাতি।

ঘ. যাত্রার বিবরণ (খুব সংক্ষিপ্ত) : যানবাহন, যাত্রাপথ।

ঙ. স্থানীয় সংযোগ ব্যক্তির নাম ও পরিচয়।

চ. থাকার স্থান : সুবিধা-অসুবিধা এবং ফিল্ডগ্রুপের অকুস্থলে পৌঁছা এবং কোনো কর্মবিভাগ বা আলোচনা হলে তার বিবরণ।

www.pathagar.com

ছ. Milieu-এর প্রাসঙ্গিক বর্ণনা।

জ. উৎসবধর্মী-অনুষ্ঠান হলে : সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ধরন, কী কী Genre-এর Performance হবে তার বর্ণনা, এর উদ্যোক্তা, অর্থনীতি, উদ্দেশ্য-এর মূল আকর্ষণ বা Main Item- যোগদানকারীদের ধরন, শ্রেণি বয়োবর্গ উদ্দেশ্য, যাতায়াত ও থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা।

ঝ. ফটোগ্রাফার/ভিডিওগ্রাফার থাকলে তিনি নিসর্গ-বিন্যাস, গৃহ ও বাস্তব জীবন-যাত্রার ধরন ও সামাজিক অর্থনৈতিক জীবনের প্রাসঙ্গিক পটভূমির (relevant context) চিত্র বা ভিজ্যুয়াল নেবেন।

১. যে অনুষ্ঠানে ছবি বা ভিজ্যুয়াল নেবেন তার ডিটেইলস, শিল্পীদের গঠন (একক, গ্রুপ, পুরুষ, মহিলা, দ্বৈত, সমবেত), সঙ্গতীয়াদের বাদ্যযন্ত্রাদির ডকুমেন্টেশন করবেন—শিল্পীদের সাদাকালো ছবি কিছু নেবেন, দলনেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে বিশেষ ফোকাস ও সময়সীমা এবং তারিখ নির্ধারণ।

২. খাতায় শিল্পী ও সঙ্গতীয়াদের নাম লিখবেন ও চিহ্নিতকরণের ব্যবস্থা করবেন।

৩. শিল্পীর কোনো গান থাকলে বা ভিডিওতে থাকলে ক্রস রেফারেন্স হিসেবে কোন ফিল্ড-সহকর্মী লিখেছেন তার নোট রাখবেন।

৪. মনিটর নেবেন এবং শিল্পী বা তথ্যদাতা রেকর্ড কেমন হলো দেখতে চাইলে দেখাবেন।

৫. কী কী যন্ত্রপাতি নিচ্ছেন তার তালিকা করবেন এবং কতটি ক্যাসেট, ফিল্ম নিলেন তার নাম, সংখ্যা ও দাম লিপিবদ্ধ করবেন এবং অফিসের রেকর্ড-বুকে তুলে রাখবেন।

ঞ. গবেষক যে তথ্যদাতা (informant) বা সংলাপীর (interlocuter) জীবন তথ্য বা অনুষ্ঠানের পরিবেশনার তথ্য (repertoire) নিচ্ছেন তা তিনি একটি প্রক্রিয়া (process) হিসেবে পর্যায়ক্রমে অনুপুঙ্খভাবে নেবেন। প্রয়োজনে তথ্যদাতার সঙ্গে বার বার সংলাপে বসবেন এবং নিয়মিত যোগাযোগ রাখবেন। গোটা পরিবেশনার বৈশিষ্ট্য এতে বিধৃত হবে। ক্রস রেফারেন্স হিসেবে তথ্যদাতা সংলাপীর ছবি নেয়া হয়েছে কিনা নিশ্চিত হবেন। গানের শিল্পী হলে গান যথাযথভাবে (exactly performed) লিখে শিল্পীকে দিয়ে চেক করিয়ে নেবেন।

ট. উৎসবে/এক বা দুই দিনের ফিল্ডওয়ার্কে ব্যক্তি শিল্পীর সঙ্গে বিস্তৃত কাজ করার সুযোগ কম। তবু যতদূর সম্ভব Dialogical Anthropology-র পদ্ধতি অনুসরণ করার চেষ্টা করতে হবে। এক্ষেত্রে একটি বিশেষ সংস্কৃতিতে দেখতে হবে æFrom the perspective of living community and to be specific, functionally", ফলে জীবন্ত সমাজ বা গ্রুপের যে-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বা ধারা নিয়ে যে ফিল্ড-ওয়ার্কার কাজ করবেন তাকে ওই সংস্কৃতি বা উপাদানের সামাজিক, সাংস্কৃতিক গতিশীলতার (dynamics) অভ্যন্তরীণ নিয়ম (inner rule) এবং পরিবেশনায় শিল্পীর ভূমিকা (role) ও উদ্ভাবনা এবং দর্শক/শ্রোতা

www.pathagar.com

(audiance) সক্রিয় ঐতিহ্যবাহকের (active tradition-bearer) প্রতিক্রিয়া/মিথস্ক্রিয়া বুঝে নিতে হবে—তথ্যদাতাদের সঙ্গে সংলাপের মাধ্যমে বা সময় থাকলে রিফ্লেক্সিভ এথনোগ্রাফির মাধ্যমে। এ ধরনের কাজে তথ্যদাতা বা সংলাপী ওই সংস্কৃতির অভ্যন্তরীণ ব্যাখ্যাতা, বিশেষ শব্দ, প্রতীক বা দুর্জ্ঞেয় তত্ত্বের ব্যাখ্যাতাও হবেন তিনি এবং ফিল্ড গবেষক বাইরের দিক থেকে পর্যবেক্ষক, দলিলীকরণকারী ও সংলাপ সমন্বয়ক। তিনিও ব্যাখ্যাতা তবে বাইরের দিক থেকে।

ঠ. যৌথ ফিল্ডওয়ার্কে দলনেতা প্রতিদিন রাতে সমন্বয় ও মূল্যায়ন সভা করবেন এবং প্রয়োজনে পরিকল্পনার পরিবর্তন বা পুনর্বিন্যাস করবেন।

ড. প্রত্যেক সদস্য যন্ত্রপাতির হেফাজত ও নিরাপত্তার প্রতি লক্ষ রাখবেন।

ঢ. ফিল্ডওয়ার্ক থেকে ফিরে সাত দিনের মধ্যে সকল সদস্য নিজ নিজ প্রতিবেদন জমা দেবেন। ভিডিওগ্রাফার-ফটোগ্রাফার তার কাজ শেষে জমা দেবেন। এরপরে একটি সমন্বয় সভা করে সংগ্রহসমূহের আর্কাইভিং, সম্পাদনা বা প্রকাশনার ব্যবস্থা করতে হবে।

মনে রাখবেন, ফোকলোরবিদ হিসেবে আপনার কাজ হলো আপনার তথ্য-উপাত্ত-উপাদানকে যে-সমাজের ফোকলোর তাদের দৈনন্দিন জীবন, বিশ্বাস-সংস্কার-বিচার-বিবেচনা এবং বিশ্ববীক্ষার নিরন্তর পরিবর্তনশীলতার প্রেক্ষাপটে খুঁটিয়ে দেখে বস্তুনিষ্ঠভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা। উপাদানের অর্থ ও ইতিহাস তাদের কাছ থেকেই জানা এবং সেভাবে রেকর্ড করা।

এই নির্দেশনাটি সমন্বয়কারী এবং সংগ্রাহকদের কাজের জন্য যথেষ্ট ছিল না। কারণ, যাদের নির্বাচন করা হয়েছিল তাদের অনেকেরই আধুনিক ফোকলোর সংগ্রহের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ধারণা তেমন একটা ছিল না। ১৯৬০-এর দশক থেকে পাশ্চাত্য বিশ্বে ফোকলোর চর্চার (folklore studies) যে নতুন প্যারাডাইম (paradigm) তৈরি হয় তার সঙ্গে আমাদের দেশের ফোকলোর অনুরাগীদের এখন পর্যন্ত সুস্পষ্ট কোনো পরিচিতি ঘটেনি। তাছাড়া আমাদের দেশের ইতিহাসের প্রাচীনতার জন্য এখানকার ফোকলোর চর্চা শুধুমাত্র পাশ্চাত্যের মতো সংকালিক (synchronic) ধারার হলেই উপাদানসমূহের মর্মার্থ যে বোঝা যাবে না সেই জায়গাটা বুঝে নেয়া আরও জটিল। আমাদের ফোকলোর উপাদানের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ইতিহাসের পটে (diachronic) স্থাপন করেই প্রেক্ষাপট (context) হিসেবে অকুস্থলের পরিবেশনকলার (local performance) অনুপুঙ্খ রেকর্ড না করা হলে সে-ব্যাখ্যাবয়ান বাস্তবানুসারী (empirical) হবে না। এই কথাগুলো মনে রেখেই সংগ্রহ কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের (field-worker) জন্য দুইটি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ এবং দুইটি কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণ প্রদান করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান, ড. ফিরোজ মাহমুদ, অধ্যাপক সৈয়দ জামিল আহমেদ এবং বাংলা একাডেমির পরিচালক জনাব শাহিদা খাতুন। কক্সবাজারের আঞ্চলিক প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করা হয় চট্টগ্রাম, সিলেট ও বরিশাল বিভাগের সমন্বয়ক ও সংগ্রাহকদের। অন্যদিকে রাজশাহীর প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন রাজশাহী ও খুলনা বিভাগের সমন্বয়ক ও সংগ্রাহকেরা। ঢাকার কেন্দ্রীয়

www.pathagar.com

প্রশিক্ষণে সকল অঞ্চলের সমন্বয়ক এবং সংগ্রাহক অংশগ্রহণ করেন। এই চারটি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আধুনিক ও বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ফোকলোর সংগ্রহ সম্পর্কে সমন্বয়কারী ও সংগ্রাহকদের ধারণা দেবার চেষ্টা করা হয়।

এই পর্যায়ে মূল কাজটি করার জন্য একটি সুস্পষ্ট রেখাচিত্র প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে ধরিয়ে দেয়া হয় :

লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচি
নির্দেশিকা

সংজ্ঞা : Folklore : Artistic communication in small groups– Dan-Ben-Amos

ফোকলোর উপাদান চেনার উপায় : Folklore is folklore only when performed– Rodger D Abrahams

জীবন্ত/বর্তমানে প্রচলিত না থাকলে তা Folklore নয়।

জেলা পরিচিতিতে যা থাকবে :

১. **নামকরণের ইতিহাস :** কাহিনি, কিংবদন্তি ॥ প্রতিষ্ঠাকাল ও বর্তমান প্রশাসনিক ইউনিট ॥ ভৌগোলিক অবস্থান ও ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ॥ বনভূমি, গাছপালা, বনজ ও ফলজ ওষধি বৃক্ষ, নদীনালা, খাল-বিল-হাওর ॥ মৃত্তিকার ধরন ॥ প্রধান পশুপাখি ও অন্যান্য বন্য জীবজন্তু ॥ জনবসতির পরিচয় (জনসংখ্যা, ধর্মগত পরিচয়), জাতি পরিচয় (হাড়ি, ডোম, ভুঁইমালি, নাগারচি, কৈবর্ত ইত্যাদি) ॥ নারী-পুরুষের হার ॥ তরুণ ও প্রবীণের হার ॥ শিক্ষার হার ॥ নৃগোষ্ঠী পরিচয় (যদি থাকে), গৌণ বা লোকধর্ম পরিচয় ॥ চাষাবাদ ও ফসল (উৎপাদন বৈশিষ্ট্য, লাঙল, জোয়াল, ট্রাক্টর ইত্যাদি) ॥ শিল্প-কারখানা ॥ ব্যবসা-বাণিজ্য ॥ যাতায়াত-যোগাযোগ (যানবাহন : নৌকা, জাহাজ, লঞ্চ, খেয়া, গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, মোষের গাড়ি, পালকি, মাওফা, নসিমন, করিমন, ভ্যানগাড়ি, বাস, ট্রেন ইত্যাদি) ॥ খাদ্যাভ্যাস ॥ পোশাক-পরিচ্ছদ ॥ পেশাগত পরিচয় ॥ বিনোদন ব্যবস্থা : গ্রামীণ ও লোকজ, নাগরিক ও আধুনিক (সিনেমা হলসহ) ॥ হাটবাজার, বড় দিঘি, পুষ্করিণী, মেলা, ওরস, বটতলা ইত্যাদি ॥ মাজার, মসজিদ, মন্দির, গির্জা, বৌদ্ধ মন্দির, চণ্ডীমণ্ডপ, আখড়া, সাধন-কেন্দ্র ইত্যাদি। (৩০-৪০ পৃষ্ঠা)

২. **বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকজ সংস্কৃতির বিষয়সমূহ :** আপনার জেলার জন্য যা প্রয়োজন তা নিয়েই ফিল্ডওয়ার্ক করবেন।

জেলার সাংস্কৃতিক ইতিহাস : ঐতিহাসিক স্থান ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। গ্রামের নামকরণ (যদি পাওয়া যায়)। সাবেক কালের বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী, কবিয়াল (master artist)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও ছবি (যদি পাওয়া যায়) কিচ্ছা, পুথিপাঠ, কবিগান (বহু জেলা), মহুয়া, মলুয়া, রূপবান, সাবেক কালের পালাগান, যেমন—গুণাই যাত্রা, রয়ানি (পটুয়াখালী, বরিশাল), ভাওয়াল যাত্রা (গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ও অন্যান্য অঞ্চল), খ্রিষ্টের পালা (গাজীপুর), মালকা বানুর পালা, আমিনা সুন্দরীর পালা (চট্টগ্রাম), আলাল-দুলাল, আসমান সিং (ঢাকা ও ঢাকার আশপাশের জেলা), বেহুলা, রামযাত্রা, রামলীলা, কৃষ্ণলীলা (বহু জেলা), বনবিবির পালা, মাইচাম্পা (সাতক্ষীরা,

www.pathagar.com

খুলনা), কুশানগান (রংপুর), বাউলগান (কুষ্টিয়া, নেত্রকোনা ও অন্যান্য জেলা), কীর্তন (বহু জেলা), আলকাপগান, গম্ভীরা (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া (কুড়িগ্রাম, রংপুর), মলয়া সংগীত (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), মুর্শিদি, মারফতি (ঢাকা, ফরিদপুর), গাজির গান (চুকনগর, খুলনা, গাজীপুর ও অন্যান্য জেলা), বিয়ের গান, অষ্টগান, পাগলা কানাইয়ের গান (ঝিনাইদহ), বিচারগান, হাবুগান (মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ), ধান কাটার গান (সন্দ্বীপ), ভাবগান, ফলইগান (যশোর), হাছন রাজার গান (সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, বালাগঞ্জ, সিলেট), শাহ আবদুল করিম ও রাধারমণের গান (সুনামগঞ্জ), মর্মসংগীত, ধুয়াগান (বিভিন্ন জেলা) ইত্যাদি; লোকনৃত্য, কালীকাচ নৃত্য (পূর্বদাশুরা, গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ ও টাঙ্গাইল), ধামাইল (সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা), মণিপুরী নৃত্য (মৌলভীবাজার), পুতুলনাচ (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), পাঁচালি (বিভিন্ন জেলা), লম্বা কিচ্ছা (নেত্রকোনা), নাগারচি সম্প্রদায় (ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বরিশাল), অনুকূল ঠাকুর (পাবনা), মতুয়া (গোপালগঞ্জ) ইত্যাদি; মাজারকেন্দ্রিক অনুষ্ঠান মাইজভাণ্ডার, বায়েজিদ বোস্তামী (চট্টগ্রাম), হজরত শাহজালাল (সিলেট), শাহ আলী (মিরপুর), মহররমের মিছিল (ঢাকা, সৈয়দপুর, গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ), মানিক পির (সাতক্ষীরা), পিরবাড়ি (গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ) ইত্যাদি; মনসা মন্দির (শরিয়তপুর), আদিনাথের মন্দির (মহেশখালী, কক্সবাজার), রথযাত্রা (ধামরাই ও মানিকগঞ্জ, জয়দেবপুর) ইত্যাদি; লাঠিখেলা (কিশোরগঞ্জ, নড়াইল, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর); শব্দকর সম্প্রদায় (কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সিলেট), বাওয়ালি সম্প্রদায় (সুন্দরবন), রবিদাস-বলাহাড়ি সম্প্রদায় (মেহেরপুর); লোকমেলা, নেকমর্দের মেলা (ঠাকুরগাঁ), সিদ্ধাবাড়ির মেলা (সাহরাইল, সিংগাইর, মানিকগঞ্জ), গুরপুকুরের মেলা (সাতক্ষীরা), মহামুনি বৌদ্ধমেলা (চট্টগ্রাম), বউমেলা (মহিষাবান, বগুড়া), মাছমেলা (পোড়াদহ, বগুড়া), সার্কাস (বিভিন্ন জেলা) ইত্যাদি; লোকশিল্প, কাঠের ঘোড়া (সোনারগাঁ), শোলার কাজ (মাগুরা, যশোর), নকশিপিঠা (ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা), নকশিকাঁথা (যশোর, ফরিদপুর, জামালপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ), জামদানি (রূপসি, নারায়ণগঞ্জ), টাঙ্গাইল শাড়ি, বাবুরহাটের শাড়ি, পূজার মূর্তি (রায়ের বাজার, শাঁখারিবাজার, ঢাকা, নেত্রকোনা), বাঁশ-বেতের কাজ (সিলেট), পট/পটচিত্র (মুন্সিগঞ্জ), মৃৎশিল্প (রায়ের বাজার, ঢাকা, কাগজিপাড়া, কাকড়ান-সাভার, শাঁখারিবাজার ঢাকা, হাটহাজারী চট্টগ্রাম), তামা-কাঁসা-পিতল (ধামরাই, ঢাকা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, ইসলামপুর, জামালপুর, তাঁতিবাজার ঢাকা), শীতলপাটি (বড়লেখা, বটনি, জায়নামাজ (লেমুয়া, ফেনী) ইত্যাদি; হাট-বাজার, ঘরবাড়ির ধরন, বিবাহের প্যান্ডেল (সজ্জিত গেট), বিয়ের আসর, রাউজানের অনন্ত সানাইওয়ালা, বিনয় বাঁশি, ফণী বড়ুয়া, রমেশ শীল, (চট্টগ্রাম), নারীদের অনুষ্ঠান যেখানে পুরুষের প্রবেশাধিকার নেই।

নৌকা নির্মাণ : (লক্ষ্মীপুর), জাহাজ নির্মাণ : (জিনজিরা, ঢাকা)।

লোকউৎসব : নবান্ন, হালখাতা, নববর্ষ, ঈদোৎসব, দুর্গাপূজার উৎসব ও মেলা, বৌদ্ধ পূর্ণিমা, জন্মাষ্টমী, শবেবরাত, মানিক পির উৎসব (সাতক্ষীরা), ইলিশ উৎসব (চাঁদপুর), আঞ্চলিক রাসের মেলা, রাস মেলা (দুবলার চর, সুন্দরবন, ঠাকুরগাঁ, রংপুর),

www.pathagar.com

গাজন (কোনো উৎসব যদি থাকে), বাঘাইর শিরনি (নেত্রকোনা), বৃক্ষপূজা, বাওয়ালিদের কথা, গোলপাতা ও মধু সংগ্রহের কথা (সুন্দরবন), শিবরাত্রি (বিভিন্ন জেলা)।

লোকখাদ্য : মিষ্টি : মণ্ডা (মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ), পোড়াবাড়ির চমচম (টাঙ্গাইল), রসমালাই (কুমিল্লা), প্যাড়া (রাজশাহী), কাঁচাগোল্লা (নাটোর), বালিশ মিষ্টি (নেত্রকোনা), ছানামুখী-লেডিকেনি (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), মহারাজপুরের দই (মোকসেদপুর, ফরিদপুর), মহিষের দই (ভোলা), দই (গৌরনদী-বরিশাল, বগুড়া), তিলের খাজা, রসকদম্ব (রাজশাহী), তিলের খাজা (কুষ্টিয়া), চমচম (রাজবাড়ী), রসগোল্লা (জামতলী, যশোর), মালাইকারি (ময়মনসিংহ), পানতোয়া, খেজুর গুড়ের সন্দেশ (শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ), ফকিরের ছানা সন্দেশ (সাতক্ষীরা), হাজারি গুড় (ঝিটকা, মানিকগঞ্জ), বরিশালের উজিরপুরের গুঠিয়ার সন্দেশ এবং অন্যান্য জেলার বিখ্যাত মিষ্টি।

করণক্রিয়া (folk ritual) : মানত, শিরনি, ভাদু, ব্রত, টুসু, চড়ক উৎসব, কুশপুত্তলিকা দাহ, বেড়াভাসান, জামাইষষ্ঠী, বরণকুলা, গায়েহলুদ, বধূবরণ, সাতশা (baby shower), ভোগ।

লোকক্রীড়া : কানামাছি, দাড়িয়াবান্দা, গোল্লাছুট, হাডুডু, বউছি, নৌকা বাইচ, গরুর দৌড়, মোরগের লড়াই, ঘুড়ি ওড়ানো ও অন্যান্য।

লোকচিত্রকলা : গাজির পট, লক্ষ্মীর সরা, কাঠখোদাই, মন্দির-মসজিদ চিত্রণ, বিয়ের কুলা, দেয়াল চিত্রণ (১ বৈশাখ, চারুকলা অনুষদ, ঢা.বি) বিয়ের গেট, টিনের ঘরের বারান্দার গেটের ওপরের দিকে ড্রপওয়াল (মানিকগঞ্জ, নেত্রকোনা)।

শোভাযাত্রা : সিদ্ধাবাড়ীর শোভাযাত্রা (সিংগাইর, মানিকগঞ্জ), মহর্‌রমের তাজিয়া মিছিল (গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ, ঢাকা)।

লোকপুরাণ ও কিংবদন্তি : বিভিন্ন জেলা।

লোকজ খেলনা : বিভিন্ন জেলা।

লোকচিকিৎসা : ওঝা, গুণিন (পটুয়াখালী, বরিশাল)।

গুহ্যসাধনা/তন্ত্রসাধনা/ (mystic cult) : দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলা।

মন্ত্র/কায়া-সাধনা/হঠযোগ : যেখানে আছে। আপনার এলাকায় নতুন কোনো উপাদান থাকলে তা যোগ করে নিন। গ্রাম দেবতা, বৃক্ষপূজা, লৌকিক দেবতা ও পির (বিভিন্ন অঞ্চলে)। (৭০-১০০ পৃষ্ঠা)

৩. উপাদানের বিন্যাস : একই উপাদান (যেমন নকশিকাঁথা, নকশিপিঠা, পিঠাপুলি, মিষ্টি ইত্যাদি) জেলার বিভিন্ন স্থানে থাকলে উপজেলাভিত্তিক দেখাতে হবে। (১০-২০ পৃষ্ঠা)

৪. তথ্যদাতাদের (contact person) জীবনকথা। (১০-২০ পৃষ্ঠা)

৫. ছবি। (১০-২০ পৃষ্ঠা)

৬. সাক্ষাৎকারের সময়, তারিখ ও স্থান।

মাঠকর্মে প্রতি বিষয় (genre) যে-সমস্ত উপাদান নিয়ে বিন্যস্ত হবে। যথা :

১. লোকসাহিত্য, কিচ্ছা, কাহিনি, কিংবদন্তি, লোকপুরাণ, পথুয়া সাহিত্য (একই পরিচ্ছেদে)। ২. ধাঁধা, প্রবাদ, প্রবচন ও শুলুক। ৩. লোকসংগীত (folk song) : লোকগীতি:

www.pathagar.com

ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, মারফতি, মুর্শিদি, গাজির গান, লালন, রাধারমণ, হাছন, পল্লিগীতি, পাগলা কানাই, রামলীলা, কৃষ্ণলীলা ও অন্যান্য। ৪. গীতিকা (ballad)। ৫. গ্রামনাম। ৬. উৎসব : মেলা/শবেবরাত। ৭. করণক্রিয়া (ritual)। ৮. লোকনাট্য ও নৃত্য (চিত্রে দেখান)। ৯. লোকচিকিৎসা। ১০. লোকচিত্রকলা (লক্ষ্মীর সরা, শখের হাঁড়ি)। ১১. লোকশিল্প : নকশিকাঁথা, তামাপিতল, বাঁশ-বেতের কাজ, শোলার কাজ, মৃৎশিল্প ও মসজিদের চিত্র, আলপনা। ১২. লোকবিশ্বাস ও সংস্কার। ১৩. লোকপ্রযুক্তি : মাছধরার যন্ত্র, হালচাষের যন্ত্রাদি, কামার-কুমারদের কাজ, তাঁতের যন্ত্রপাতি। ১৪. খাদ্যশিল্প/ ভেষজ-ইউনানি চিকিৎসা পদ্ধতি। ১৫. মাজার ওরস, পির। ১৬. আদিবাসী ফোকলোর। ১৭. নারীদের ফোকলোর। ১৮. হাটবাজার, পুকুর। ১৯. বটতলা, চণ্ডীমণ্ডপ, গ্রাম-বাংলার চায়ের দোকান। ২০. আঞ্চলিক ইতিহাস। ২১. তন্ত্র ও গুহ্য সাধনা। ২২. পোশাক-পরিচ্ছদ। ২৩. মেজবান (চট্টগ্রাম), কুলখানি/ফয়তা/জিয়াফত/চল্লিশা, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া।

মাঠকর্মে অন্য যে-সব বিষয় থাকবে না

১. জেলার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস
২. জীবিত রাজনীতিকদের পরিচয় ও জীবনকথা।
৩. এলাকার কবি সাহিত্যিকদের জীবনকথা ও তাদের বইপুস্তকের নাম। তবে লোককবি ও পথুয়া সাহিত্যের কথা থাকবে।

সংগ্রহ কাজের শেষ পর্যায়ে যখন সংগ্রাহক এবং সমন্বয়কারীবৃন্দ সংকলন কাজ শুরু করেন তখন কাজটি কীভাবে সম্পন্ন করতে হবে তার জন্য একটি চূড়ান্ত নির্দেশনাপত্র প্রদান করা হয়।

প্রথম অধ্যায় : জেলা পরিচিতি (introduction of the district)

ক. নামকরণ ও প্রতিষ্ঠা কাল, খ. ভৌগোলিক অবস্থান, গ. বনভূমি ও গাছপালা, ঘ. সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ঙ. জনবসতির পরিচয়, চ. নদ-নদী ও খাল-বিল, ছ. গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, জ. ঐতিহাসিক স্থাপনা, ঝ. রাজনৈতিক ঐতিহ্য ও ব্যক্তি, ঞ. বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী ও কবিয়ালের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

দ্বিতীয় অধ্যায় : লোকসাহিত্য (folk literature)

ক. লোকগল্প/কাহিনি/কিস্সা (folk tale), খ. কিংবদন্তি (legend), গ. লোকপুরাণ (myth), ঘ. কবিগান, ঙ. লোকছড়া, চ. লোককবিতা, ছ. ভাটকবিতা, জ. পুথিসাহিত্য ও পুথিপাঠ।

তৃতীয় অধ্যায় : বস্তুগত লোকসংস্কৃতি (material culture)

ক. লোকশিল্প (folk art) : লক্ষ্মীর সরা, নকশিকাঁথা, মৃৎশিল্প, খেলনা, বাঁশ-বেতশিল্প, নকশিপাটি, নকশিশিকা, হাতপাখা, খ. লোকজ পোশাক-পরিচ্ছদ ও গহনা (folk costume & folk ornaments), গ. লোকখাদ্য (folk food), ঘ. লোকবাদ্যযন্ত্র (folk instruments), ঙ. লোকস্থাপত্য (folk architecture)।

চতুর্থ অধ্যায় : লোকসংগীত ও গাথা (folk Song & ballad)

ক. লোকসংগীত : ১. মাজারের গান, ২. উড়িগান, ৩. কর্মসংগীত, ৪. গাইনের গীত, ৫. মেয়েলি গীত, ৬. ভাটিয়ালি। খ. গাথা।

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায় : লোকউৎসব (folk festival)

১. নববর্ষ বা বৈশাখী উৎসব, ২. ঈদ উৎসব, ৩. শারদীয় দুর্গোৎসব, ৪. অষ্টমী স্নান ও মেলা, ৫. রথযাত্রা ও রথমেলা, ৬. ওরস ও মেলা, ৭. আশুরা, ৮. চৈত্রসংক্রান্তির মেলা ও চড়কপূজা, ৯. বৈসাবি (বৈসুক-ত্রিপুরী, সাংরাইন-মারমা ও রাখাইন এবং বিজু-চাকমা), ১০. মারমা ও গারোদের ওয়ানগালা উৎসব, ১১. হাজংদের বাস্তুপূজা, ১২. থুবাপূজা, ১৩. মান্দিদের বিয়ে, ১৪. গুপ্তবৃন্দাবন : লোকমেলা, ১৫. অন্নপ্রাশন, ১৬. খৎনা বা মুসলমানি, ১৭. সাধভক্ষণ, ১৮. সিমন্তোন্নয়ন, ১৯. ষষ্ঠী, ২০. আকিকা, ২১. শিশুর জন্মের পর আজান বা শঙ্খধ্বনি, ২২. শিশুকে খির খাওয়ানো, ২৩. মানসিক (মানত), ২৪. গরুন্নাতের শির্‌নি, ২৫. ছডি (ষটি/ষষ্ঠী), ২৬. গায়েহলুদ, ২৭. সদরভাতা, ২৮. মঙ্গলাচরণ, ২৯. বউবরণ, ৩০. ভাত-কাপড়, ৩১. বউভাত, ৩২. রাখাল বন্ধুদের উৎসব।

ষষ্ঠ অধ্যায় : লোকনাট্য ও লোকনৃত্য (folk theatre & folk dance)

ক. লোকনাট্য : ১. ঘাটুগান, ২. গাজির গান, ৩. বাইদ্যা বা বাইদ্যানীর গান, ৪. পালাগান, ৫. একদিল গান, ৬. কবিগান, ৭. জারিগান, ৮. বিষহরির পাঁচালি। খ. লোকনৃত্য।

সপ্তম অধ্যায় : লোকক্রীড়া (folk games)

১. বলাই, ২. তই তই, ৩. রস-কস-মেয়েলি খেলা, ৪. লাঠিখেলা, ৫. হুমগুটি/গুটি খেলা, ৬. হাডুডু খেলা, ৭. মহিলা খেলা, ৮. পলাগুঞ্জি খেলা, ৯. নৌকা বাইচ, ১০. ষাঁড়ের লড়াই, ১১. দাড়িয়াবান্ধা খেলা, ১২. গোল্লাছুট খেলা, ১৩. অন্যান্য লোকক্রীড়া।

অষ্টম অধ্যায় : লোকপেশাজীবী গ্রুপ (folk groups)

১. মিস্ত্রি/ছুতার, ২. কলু, ৩. তাঁতি, ৪. জেলে, ৫. কামার প্রভৃতি।

নবম অধ্যায় : লোকচিকিৎসা ও তন্ত্রমন্ত্র (folk medicine & chant)

ক. লোকচিকিৎসা : ১. কলতার ঝাড়া, ২. সাপে কাটার ঝাড়া, ৩. অন্যান্য কবিরাজি চিকিৎসা। খ. তন্ত্রমন্ত্র।

দশম অধ্যায় : ধাঁধা (riddle)

একাদশ অধ্যায় : প্রবাদ-প্রবচন (folk sayings & proverb)

দ্বাদশ অধ্যায় : লোকছড়া ও ভাটকবিতা (folk rythm & vat poem)

ত্রয়োদশ অধ্যায় : লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার (folk belief & folk superstition)

চতুর্দশ অধ্যায় : লোকপ্রযুক্তি (folk technology)

১. মাছ ধরার উইন্যা/বাইর/জাখা/চাঁই/দুয়ারী, ২. সরিষা ভাঙার ঘানিগাছ, ৩. কাপড় বোনার তাঁত, ৪. জাঁতি বা ছরতা, ৫. ইঁদুর মারার কল ইত্যাদি।

এরপর সংগ্রাহক ও সমন্বয়কারীরা মিলিতভাবে তাদের সংকলন কাজ শেষ করে পাণ্ডুলিপি প্রকাশের জন্য বাংলা একাডেমির সচিব এবং প্রকল্প-পরিচালক জনাব মো. আলতাফ হোসেনের হাতে তুলে দেন। এই কাজে সামগ্রিক তত্ত্বাবধান, সমন্বয় সাধন এবং অনবরত তাগাদা ও নির্দেশনার মাধ্যমে সমন্বয়কারীদের কাছ থেকে সময়মতো

www.pathagar.com

পাণ্ডুলিপি আদায় করার জন্য তাকে যে নিষ্ঠা, অভিনিবেশ ও দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে হয় তার জন্য তাকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই। সারাদেশ থেকে যে-বিপুল তথ্যসমৃদ্ধ ৬৪-খানি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে তা আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়। ইতোপূর্বে এত বিস্তৃতভাবে সারাদেশের লোকজ সংস্কৃতির ইতিহাস এতটা অনুপুঙ্খতায় মাঠপর্যায় থেকে আর সম্পন্ন করা হয়নি। এই কাজের সঙ্গে যুক্ত সংগ্রাহক, সংকলক ও প্রধান সমন্বয়কারী, বাংলা একাডেমির সংশ্লিষ্ট পরিচালক, প্রধান গ্রন্থাগারিক ও ফোকলোর উপবিভাগের উপপরিচালক জনাব আমিনুর রহমান সুলতান, সহপরিচালক কুতুব আজাদ ও সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আরেকবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

লোকজ সংস্কৃতি বিষয়ক দেশব্যাপী বিস্তৃত এই তথ্যসমৃদ্ধ উপাদান নিয়ে আমরা প্রকাশ করছি *বাংলা একাডেমি বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা*। বাংলাদেশের ফোকলোর চর্চার ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা না হওয়ায় প্রাথমিক পর্যায়ের যে-কাজ – Genre চিহ্নিতকরণ ও তার বিশ্লেষণ করা হয়নি। 'লোকসাহিত্য' বলেই ফোকলোরের সব উপাদানকে চালিয়ে দেওয়ার একটি ধরতাই প্রবণতা দেখা যায়। সেই অবস্থা থেকে আমরা Genre চিহ্নিতকরণ ও বিশ্লেষণের (genre identification and analysis) মাধ্যমে বাংলাদেশের ফোকলোরের প্রাথমিক বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণার পদ্ধতিটি নিশ্চিত করে পরবর্তীকালে অন্যান্য স্তর যথাক্রমে পটভূমি (context), পরিবেশনা (performance) ইত্যাদি প্যারাডাইম অনুসরণ করার মাধ্যমে ফোকলোর আলোচনাকে পরিপূর্ণভাবে বিজ্ঞানভিত্তিকতার উপর দাঁড় করাতে চাই।

গ্রন্থমালার এই খণ্ডে বর্তমান ভোলা জেলার লোকজ সংস্কৃতির বিশদ পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে ভোলার সমৃদ্ধ ফোকলোর উপাদানসমূহকে Genre ভিত্তিকভাবে সাজানো হয়েছে।

শামসুজ্জামান খান
মহাপরিচালক

www.pathagar.com

সূচিপত্র

জেলা পরিচিতি (introduction of the district) ২৩-৯১

ক. জেলার নামকরণ
খ. ভৌগোলিক অবস্থান
গ. আয়তন ও সীমানা
ঘ. প্রতিষ্ঠাকাল ও প্রশাসনিক ইউনিট
ঙ. জনসংখ্যা
চ. সংক্ষিপ্ত পরিচিতি
ছ. দ্বীপের জন্ম
জ. ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য
ঝ. জেলার বিভিন্ন জনগোষ্ঠী
ঞ. বিভিন্ন পেশাজীবী
ট. মাটির ধরন
ঠ. চাষাবাদ ও ফসল
ড. নদ-নদী
ঢ. পশু-পাখি
ণ. জেলার গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
ত. ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান
থ. রাজনৈতিক ঐতিহ্য
দ. মুক্তিযুদ্ধে ভোলা
ধ. জেলার স্মরণীয়-বরণীয় ব্যক্তি
ন. বিখ্যাত গায়ক, কীর্তনীয়া ও কবিয়াল

লোকসাহিত্য (folk literature) ৯২-১২০

ক. লোকগল্প/লোককাহিনি/কিস্‌সা/কিংবদন্তি
খ. কিংবদন্তি
গ. কৌতুক
ঘ. কবিগান
ঙ. শ্লোক

স্থান নাম (place name) ১২১-১২৫

বস্তুগত লোকসংস্কৃতি (material culture) ১২৬-১৩৮

লোকপোশাক-পরিচ্ছদ (folk costume) ১৩৯-১৪২

লোকস্থাপত্য (folk architecture) ১৪৩-১৪৮

www.pathagar.com

লোকসংগীত (folk song) ১৪৯-১৫৪
ক. মাজারের গান
খ. মেয়েলি গীত
গ. জারি গান
লোকবাদ্যযন্ত্র (folk instruments) ১৫৫-১৫৮

লোকউৎসব (folk festival) ১৫৯-২২১
১. ঈদুল ফেতর ও ঈদুল আজহা
২. শবেবরাত
৩. দুর্গোৎসব
৪. লক্ষ্মীপূজা
৫. কালীপূজা
৬. সরস্বতীপূজা
৭. জন্মাষ্টমী
৮. রথযাত্রা
৯. নববর্ষ
১০. হালখাতা
১১. নবান্ন
১২. বরণকুলা বা বরণডালা
১৩. গায়ে হলুদ বা 'তেলাই'
১৪. বধূবরণ
লোকাচার (ritual) ২২২-২৩৯
১. মানত ও সিন্নি
২. সাতশা
৩. জামাই ষষ্ঠী

লোকখাদ্য (folk food) ২৪০-২৫৫
লোকনাট্য (folk theatre) ২৫৬-২৬৪
লোকক্রীড়া (folk games) ২৬৫-২৮৪
১. হাডুডু
২. গোল্লাছুট
৩. বউছি
৪. ডাণ্ডাবাবি বা ডাংগুলি
৫. কানামাছি
৬. চোউক পলানি বা চোখ পলানি বা পলাপলি
৭. কুমির কুমির
৮. গুটি খেলা

www.pathagar.com

৯. ষোল গুটি
১০. রুমাল চোর
১১. ব্যাঙ ব্যাঙ খেলা
১২. রাম-শাম-যদু-মধু
১৩. অ্যাক্কা দোক্কা
১৪. চোর-ডাকাত-পুলিশ-সাধু
১৫. লাঠি খেলা

লোকপেশাজীবী গ্রুপ (folk groups) ২৮৫-৩০০

লোকচিকিৎসা (folk medicine) ৩০১-৩১৫
ক. জন্ডিসের ঝাড়া ও মালা
খ. সাপের বিষ নামানো
গ. রোগ-ব্যাধি নিরাময়ে ডোর দেওয়া
ঘ. শিঙ্গা দেওয়া

প্রবাদ-প্রবচন (folk sayings & proverb) ৩১৬-৩৩৩

লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার (folk superstition & folk belief) ৩৩৪-৩৭৪

লোকপ্রযুক্তি (folk technology) ৩৭৫-৩৮৭
১. ধর্মজাল, ২. লোতর জাল, ৩. ঠেলা জাল, ৪. পিছা জাল, ৫. খুঁচি জাল, ৬. হোলি জাল বা বিন্নি জাল, ৭. খোট জাল, ৮. মইজাল, ৯. ছান্দি সাবার জাল বা ইলিশ জাল, ১০. বড় সাবার জাল, ১১. খইয়া জাল, ১২. আনতা, ১৩. গরা, ১৪. কোচ, ১৫. ছাবি, ১৬. খলুই, ১৭. টবগি, ১৮. তালাশি, ১৯. বারুনি, ২০. দেউরকা, ২১. কাইছা বা পিছা, ২২. পিঁড়া বা পিঁড়ি, ২৩. ছিক্কা বা শিঁকা, ২৪. চালুইন বা চালনি, ২৫. মাথাল, ২৬. জোংলা বা জোংরা, ২৭. লাঙ্গল-যোয়াল, ২৮. ঠুলি, ২৯. ডুলি, ৩০. গুলাল, ৩১. হাতপাখা, ৩২. কুলা ও ডালা, ৩৩. বিড়া

www.pathagar.com

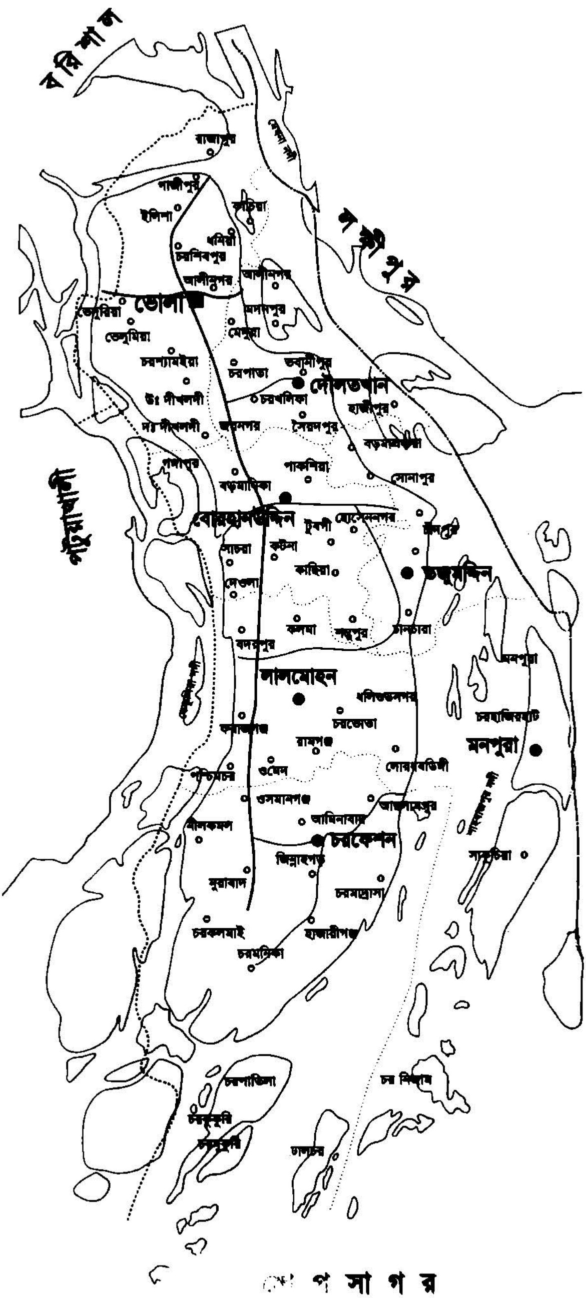

www.pathagar.com

জেলা পরিচিতি

ক. জেলার নামকরণ

ভোলার আদি নাম দক্ষিণ শাহবাজপুর। এই নামকরণের আগে বাকলা চন্দ্রদ্বীপের নতুন চর পড়া দ্বীপ 'চান্দিয়া' নামেই এটি পরিচিত ছিল। দৌলতখান উপজেলায় অবস্থিত এই চান্দিয়া বহু পূর্বেই নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে।

দক্ষিণ শাহবাজপুর নামকরণের সাথে বিশেষভাবে জড়িয়ে আছে এদেশে মোগল শাসনকর্তাদের ইতিহাস। এই দ্বী পাঞ্চলটি এক সময় সুবে বাংলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। জানা যায়, ১৫০০ সালের দিকে পর্তুগিজ ও আরাকান জলদস্যুদের দৃষ্টি পড়ে দ্বীপটির ওপর। ১৫৩৮ সালে সুলতান মাহমুদ শাহ পর্তুগিজদের বিনাশর্তে বাংলায় ব্যবসা-বাণিজ্য করার অনুমতি দেন। এদের মধ্যে একটি দল ব্যবসা-বাণিজ্য, আরেকটি দল ধর্ম প্রচার ও অপর দলটি চুরি-ডাকাতি, খুন-খারাবি ও দস্যুবৃত্তিতে লিপ্ত হয়। অল্পকালের মধ্যেই পর্তুগিজ জলদস্যুদের সাথে আরাকানি জলদস্যুদের সখ্য গড়ে ওঠায় তারা মিলিতভাবে বঙ্গোপসাগরের উপকূলীয় অঞ্চল হাতিয়া, সন্দ্বীপ, মনপুরা, ভোলা, বাকেরগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে নির্বিচারে হত্যা, লুণ্ঠন ও নারী নির্যাতন চালাতে থাকে। এদের সীমাহীন অত্যাচার, নির্যাতনের কাহিনির নিখুঁত চিত্র পাওয়া যায় মোগল কর্মচারী শিহাবুদ্দিন তালিশ, মীর্জা নাথান ও ফ্রান্সের পর্যটক বার্ণিয়ের-এর লেখা বিবরণীতে। মোগল কর্মচারী শিহাবুদ্দিন তালিশ পর্তুগিজ ও আরাকানি জলদস্যুদের নৃশংসতার বিবরণ দিতে গিয়ে লিখেন, 'পর্তুগিজ ও আরাকানি মগ জলদস্যুরা চট্টগ্রাম থেকে বাংলার সীমান্ত জাগদিয়া পর্যন্ত আকাশে কোনো পাখি ও জঙ্গলে কোনো পশু জীবিত রাখেনি। এদের নির্মম অত্যাচারে ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত মেঘনা নদীর উভয় তীরের লোকালয় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। লুণ্ঠন, হত্যা, অপহরণ, নারী নির্যাতন প্রভৃতির ফলে এসব লোকালয় এমন জনমানবশূন্য হয়ে পড়ে যে, ঘর-বাড়িতে সন্ধ্যাবাতি দেবারও কেউ ছিল না। মসজিদে আজান ও মন্দিরে আরতি দেওয়ার জন্য কাউকে খুঁজে পাওয়া যায় নি। বার্ণিয়ের লিখেছেন, মগ ও পর্তুগিজ জলদস্যুদের আক্রমণ ও অত্যাচারের ভয়ে সমুদ্র উপকূলের অনেক দ্বীপ জনশূন্য হয়ে পড়ে এবং জঙ্গলে বাঘ, শূকর, বন্য মোরগ আর পানিতে কুমির ছাড়া আর কোনো বাসিন্দা ছিল না।

জলদস্যুদের অব্যাহত আক্রমণ-নির্যাতন-নিপীড়নের ফলে ১৬০০ থেকে ১৬৬৬ সালের মধ্যে ভোলা, দৌলতখান, তজুমুদ্দিন, মনপুরা ও পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলো প্রায় জনশূন্য হয়ে পড়ে। ১৬২১ সালে ফেনী নদীর তীরে মোগল বাহিনী আরাকানিদের সাথে যুদ্ধে পরাজিত হলে মগরাজা শাহবাজপুরের গ্রামগুলোতে নির্বিচারে হামলা চালায়। দক্ষিণ শাহবাজপুর এবং গলাচিপা, বাউফল, হিজলা ও মুলাদীর শত শত বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ করে ভস্মীভূত করে দেয়, শত শত যুবক-যুবতীকে বন্দি করে নিয়ে যায়।

www.pathagar.com

তারা শাহবাজপুরের বিভিন্ন এলাকা থেকে যুবক-যুবতীদের বন্দি করে ভোলা ও বাউফলের 'দাসের হাটে' ও অন্যান্য বন্দরে ইংরেজ ও ফরাসি বণিকদের কাছে বিক্রি করতো। তারা আবার এসব বন্দিদের গোয়া, সিংহল, হুগলি, চীন ও মালাক্কায় পাঠিয়ে দিতো' (খালেকদাদ চৌধুরী অনূদিত বাহারিস্তান-ই-গায়বি ১ম খণ্ড)। স্থানীয় অধিবাসীদের ধারণা, আরাকানি ও পর্তুগিজ জলদস্যুদের এসব নির্মম ও নৃশংস অত্যাচারের প্রেক্ষাপটেই রচিত হয়েছিল সেই বিখ্যাত ছড়া, 'ছেলে ঘুমালো, পাড়া জুড়ালো, বর্গি এলো দেশে'। আর এটাও বিশ্বাস করার যথেষ্ট যুক্তি তাদের রয়েছে যে, এই এলাকাই ছিল 'মগের মুল্লুক'—হত্যা, ধর্ষণ, লুট, অগ্নিসংযোগ প্রভৃতি অন্যায়-অবিচার-নির্যাতনের লীলাভূমি।

স্থানীয় অধিবাসীদের ওপর এরূপ নির্মম ও নৃশংস অত্যাচারের ঘটনা জানতে পেরে মোগল সম্রাট আকবরের সেনাপতি শাহবাজ খান নিজেই বাংলার সুবেদারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন (১৫৮৩-৮৫) এবং পর্তুগিজ ও আরাকানি জলদস্যুদের দমন করে নিরীহ মানুষের জীবনে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য এদেশে আসেন। তিনি এই দ্বীপাঞ্চলের দৌলতখান ও মৃজাকালুর মাঝামাঝি কোনো এক স্থানে দুর্গ তৈরি করে তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে দীর্ঘ তিন মাস অবস্থান করেন। এ সময়ে তিনি সুসংগঠিত ও পরিকল্পিতভাবে আরাকানি ও পর্তুগিজ জলদস্যুদের আক্রমণ করেন এবং খুঁজে খুঁজে বের করে অত্যন্ত কঠোরভাবে তাদের এ-অঞ্চল থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেন। এখানেই শেষ নয়, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন শাহবাজ খান দ্বীপ এলাকার যুবকদের সুসংগঠিত করে জলদস্যুদের আক্রমণ প্রতিরোধ করার সামরিক কলা-কৌশলেরও প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। শাহবাজ খানের বীরত্ব ও বুদ্ধিমত্তায় দীপাঞ্চলের অধিবাসীরা জলদস্যুদের অত্যাচার-নির্যাতন থেকে মুক্তি পায়, এলাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় নিরাপত্তা, শান্তি ও স্বস্তি। দ্বীপের কৃতজ্ঞ অধিবাসীরা শাহবাজ খানের স্মৃতিকে অমর ও অম্লান করে রাখার জন্য মেঘনা, তেঁতুলিয়া আর ইলিশার মাঝখানের এই অঞ্চলটির নামকরণ করেন শাহবাজপুর। পরবর্তীকালে ইলিশা নদীর উত্তর পাড়ের বর্তমানের রামদাসপুর, হিজলা, মুলাদী এবং মেহেন্দিগঞ্জের নামকরণ হয় উত্তর শাহবাজপুর আর ইলিশার দক্ষিণ অংশে গড়ে ওঠা এই দ্বীপাঞ্চলের নামকরণ হয় দক্ষিণ শাহবাজপুর।

১৮৪৫ সালে দ্বীপাঞ্চল দক্ষিণ শাহবাজপুর মাত্র দুটি থানা—দক্ষিণ শাহবাজপুর ও দৌলতখান নিয়ে মহকুমায় উন্নীত হবার পর এর সদরদফতর স্থাপিত হয় দৌলতখানের আমানিয়ায়। ১৮৭৬ সালের ৩১ অক্টোবর তৎকালীন মহকুমা সদর দৌলতখানের ওপর দিয়ে এক ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় বয়ে যায়। এ সময়ে ২৪/২৫ ফুট জলোচ্ছ্বাসে প্লাবিত হয় এলাকাটি। এটি তিরাশি সালের (বাংলা ১২৮৩ সন) প্রলয়ংকরী ঝড় ও প্লাবন নামে খ্যাত। এ প্লাবনে গৃহপালিত পশু থেকে মহকুমা সদরের জনবসতির প্রায় পুরোটাই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

ভয়াবহ এ প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর দক্ষিণ শাহবাজপুরের তৎকালীন মহকুমা হাকিম রমেশচন্দ্র দত্ত আইসিএস মহকুমা সদর দৌলতখান থেকে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থান ভোলার বর্তমান স্থানে স্থানান্তরিত করেন। এ সময়ে ভোলায় থানার সংখ্যা ছিল চারটি :

www.pathagar.com

ভোলা, দৌলতখান, তজুমুদ্দিন ও বোরহানউদ্দিন। মহকুমা সদরদফতর স্থানান্তরের পর থেকেই মহকুমা হিসেবে 'দক্ষিণ শাহবাজপুর' নামের গুরুত্ব ধীরে ধীরে হারিয়ে যেতে থাকে, পরিচিতি লাভ করে 'ভোলা মহকুমা' নামে।

দক্ষিণ শাহবাজপুরের নাম 'ভোলা' নামকরণের পেছনে স্থানীয়ভাবে একটি কাহিনি দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত। জানা যায়, ১৮৫০ সালের দিকে বর্তমান ভোলা সদর উপজেলার মধ্য দিয়ে বঙ্গোপসাগর অবধি বয়ে যাওয়া 'বেতুয়া' খালটি 'বেতুয়া নদী' নামে পরিচিত ছিল।

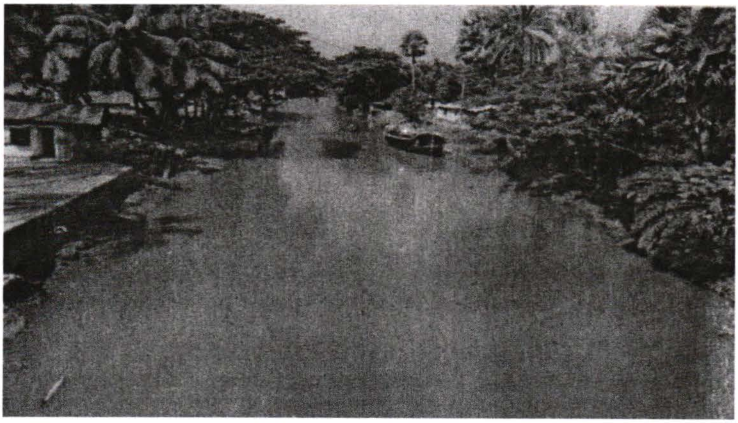

ঐতিহাসিক বেতুয়া নদীর বর্তমান অবস্থা

তখন এটি ছিল প্রবল স্রোতস্বিনী, অশান্ত ও প্রশস্ত। এখনকার মতো শান্ত ও নিস্তরঙ্গ ছিল না। এই বেতুয়া নদী পার হতে খেয়া পারাপারের প্রয়োজন হতো। ভোলা গাজী পাটনী নামে এক বৃদ্ধ মাথাপিছু সামান্য পয়সার বিনিময়ে এই পারাপারের কাজটি করতেন। ধীরে ধীরে তার নাম ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। এই ভোলা গাজীর নামানুসারেই এই অঞ্চলের নাম 'ভোলা' হিসেবে খ্যাতি লাভ করে। কারো কারো মতে 'ভোলা গাজী' নামে এক ধর্মসাধকের নামানুসারেই 'ভোলা' নামকরণ হয়। কিন্তু এরূপ মতামতের পেছনে কোনো নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না।

দৌলতখান উপজেলার নামকরণ

মোগল শাসনামলে সম্রাট আকবরের সময় সেনাপতি শাহবাজ খান তার দুর্ধর্ষ ও সাহসী সামন্তসেনা দৌলতখানের সহায়তায় আরাকানি মগ ও পর্তুগিজ জলদস্যুদের কঠোর হাতে দমন করে এ এলাকায় শান্তি স্থাপন করেন। দৌলতখান নামের এই সেনা

www.pathagar.com

জলদস্যুদের বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধে প্রভূত সাহস ও বীরত্বের স্বাক্ষর রাখেন। অতঃপর শাহবাজ খানের সামন্তসেনা দৌলতখান মেঘনার তীরবর্তী যে এলাকাটি নিজের বাসস্থানের জন্য নির্বাচন করেন, তার নাম রাখা হয় দৌলতখান—এ-রকম একটি জনশ্রুতি এ-এলাকায় আছে।

অন্য আরেকটি জনশ্রুতি থেকে জানা যায়, আকবরের সেনাপতি শাহবাজ খান পর্তুগিজ ও আরাকানি জলদস্যুদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার সময় মূল্যবান ধন-দৌলত সংরক্ষণের জন্য মির্জাকালু ও দৌলতখানের মাঝামাঝি একটি স্থান নির্বাচন করে সেখানে গোপন দৌলতাগার স্থাপন করেন। এটি পরবর্তীকালে দৌলতখান নামে পরিচিতি লাভ করে।

আরেকটি কিংবদন্তি আছে, দৌলতখান নামে একজন আধ্যাত্মিক সাধকের নাম অনুসারে এই স্থানের নাম দৌলতখান রাখা হয়েছে। প্রথমোক্ত জনশ্রুতিটিই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য বলে স্থানীয় অধিবাসী ও বিশিষ্টজনের অভিমত। ভোলা জেলায় নদী ভাঙনে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা দৌলতখান। এই সাবেক থানায় সর্বমোট ৪৭টি মৌজা ছিল। এর মধ্যে ১৬টি মৌজা সম্পূর্ণরূপে ও ১১টি মৌজা আংশিকভাবে মেঘনার তলদেশে বিলীন হয়ে গেছে।

উপজেলা পরিচিতি

উৎপত্তিকাল থেকেই বাকলা-চন্দ্রদ্বীপের একটি নতুন চর পড়া দ্বীপ হিসেবে ভোলা পরিচিতি লাভ করে। মোগল শাসনামলের প্রথমদিকে এই এলাকা ছিল আরাকানি ও পর্তুগিজ জলদস্যুদের অভয়ারণ্য। ১৮৪৫ সালে নোয়াখালীর একটি মহকুমা হিসেবে ভোলা ব্রিটিশ সরকারের স্বীকৃতি পেলে এর সদরদফতর স্থাপিত হয় দৌলতখানের আমানিয়ায়। থানার নাম ছিল চান্দিয়া। এই চান্দিয়া দৌলতখানেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিছুদিনের জন্য হাতিয়া ও সন্দ্বীপও এই চান্দিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়। বহুদিন আগে পুরনো দৌলতখানের এই চান্দিয়া মেঘনার গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে।

একসময় এই দৌলতখানই ছিল ভোলার মহকুমা সদর দফতর ও মহকুমার প্রাণকেন্দ্র। বাংলা ১২৮৩ সালে (ইংরেজি ১৮৭৬) এই দৌলতখানের ওপর দিয়ে বয়ে যায় এক প্রলয়ংকরী ঝড় ও প্রায় ৩৫-৩৬ ফুট উঁচু জলোচ্ছ্বাস। এ সময়ে এই এলাকার গবাদিপশু থেকে শুরু করে জনবসতির প্রায় সবটাই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এই প্লাবনের সময় মেঘনার তীরে আটকা পড়ে একটি বিরাট আকৃতির মাছ। এই মাছের ২৪ ফুট দীর্ঘ হাড় ভোলা ফৌজদারি আদালতে দীর্ঘদিন সংরক্ষিত ছিল। পরবর্তীকালে হাড়টি জাতীয় জাদুঘরে স্থানান্তর করা হয়। এই বিশাল আকৃতির মাছটিকে নিয়ে সে সময় এক লোককবি একটি কবিতা লিখেছিলেন, 'আজব এক মাছ পড়েছে দেউলা গ্রামের লামছির চরে, মাছের ডাকে রাজ্য কাঁপে লোকে বলে একি আজব ঘটনা।'... (কবিতাংশটুকু দীর্ঘদিন আগে কবি মোজাম্মেল হক সাংবাদিক এমএ তাহেরকে আবৃত্তি করে শুনিয়েছিলেন। এরপরই অর্থাৎ ১৮৭৭ সালের গোড়ার দিকে মহকুমা সদরদফতর দৌলতখান থেকে বর্তমান স্থানে স্থানান্তর করা হয়। এরশাদ সরকারের প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণ কর্মসূচির অংশ হিসেবে ১৯৮৩ সালের ১ আগস্ট তৎকালীন নৌবাহিনী

www.pathagar.com

প্রধান রিয়ার অ্যাডমিরাল মাহবুব আলী খান দৌলতখান থানাকে আনুষ্ঠানিকভাবে উপজেলায় উন্নীত করেন।

তজুমুদ্দিন উপজেলার নামকরণ

বর্তমান তজুমুদ্দিন একসময়ে এর অন্যতম ইউনিয়ন সোনাপুরের একটি মৌজা ছিল। এই ইউনিয়নের একজন প্রভাবশালী জমিদারের নায়েব ছিলেন তজুমুদ্দিন। একজন রুচিসম্পন্ন ও সৌখিন ব্যক্তি হিসেবে তার বেশ পরিচিতি ছিল। তিনি প্রায় সময়ই ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতেন। তার নামানুসারে এই স্থানটির নাম হয় তজুমুদ্দিন। এই মৌজাটি অনেক আগে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে।

উপজেলা পরিচিতি

তজুমুদ্দিন ভোলা জেলার দ্বিতীয় উপজেলা। দৌলতখানের মতো তজুমুদ্দিনেরও রয়েছে অনেক ভাঙা-গড়ার ইতিহাস। ভোলা জেলার নদী ভাঙনে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত দৌলতখানের পরেই রয়েছে তজুমুদ্দিন। এই থানার প্রথম কার্যক্রম শুরু হয় ১৮৬৮ সালে, একটি লবণের গুদামে। ১৮৭২ সালে তজুমুদ্দিনের মূল বাজার হাট শশীগঞ্জকে দৌলতখানের একটি আউট পোস্ট হিসেবে উল্লেখ করা হয়। ১৯২৮ সালের ২৮ আগস্ট তজুমুদ্দিন একটি পূর্ণাঙ্গ থানায় উন্নীত হয়। ১৯৮৩ সালের ১৪ মার্চ এটি ভোলা জেলার দ্বিতীয় উপজেলার মর্যাদা লাভ করে।

ব্যাপক নদী ভাঙনের ফলে এই উপজেলার আয়তন ধীরে ধীরে ছোট হয়ে আসছে। তদুপরি, তজুমুদ্দিন থানার অন্যতম ইউনিয়ন মনপুরা আলাদা থানা হিসেবে স্বীকৃতি পেলে এর আয়তন আরো হ্রাস পায়। তজুমুদ্দিনের খ্যাতনামা স্থানগুলোর বেশিরভাগই নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। উপজেলার ১ নং মলংচরা ইউনিয়ন, সোনাপুর ইউনিয়ন ও চাঁচড়া ইউনিয়নের অধিকাংশ এলাকাও আজ নদীগর্ভে।

একসময় এখানকার বড় খালগুলোতে প্রচুর কুমির ছিল। খলিল মাঝির বাজার সংলগ্ন ননীবাবুদের বাড়িতে কুমির ধরার বড় বড়শি ছিল। নৌকা বাঁধার পাটের মোটা রশিতে বড়শি বেঁধে হাঁসের পিঠে গেঁথে দিয়ে ঐ রশি ডাঙ্গায় খেজুর গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখা হতো। কুমির এসে হাঁস খেয়ে ফেললে বড়শিতে আটকা পড়তো।

বোরহানউদ্দিন উপজেলার নামকরণ

ভোলা সদর উপজেলা থেকে ২২ কিলোমিটার দক্ষিণে বোরহানউদ্দিন উপজেলার অবস্থান। পূর্বে উপজেলাটির প্রধান কেন্দ্র ছিল বোরহানগঞ্জ বা বরনগঞ্জ বাজার। বাংলা ১২৮৩ (ইংরেজি ১৮৭৬) সালের প্রলয়ংকরী বন্যা ও প্লাবনের পর এটি বর্তমান বোরহানউদ্দিনে স্থানান্তরিত হয়। বোরহানউদ্দিন হাওলাদারের পিতা খায়েরুল্লাহ সাহেব একসময়ে পটুয়াখালীর কালাইয়ার বাসিন্দা ছিলেন। পরে তিনি বর্তমান স্থানে বসতি স্থাপন করেন। বোরহানউদ্দিন হাওলাদার ফরিদপুরের উপসীর প্রভাবশালী জমিদার কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্যের কাছ থেকে তার নামে জমি বন্দোবস্ত নেন। এই বোরহানউদ্দিন হাওলাদারের নামেই বর্তমান স্থানটির নামকরণ করা হয় বোরহানউদ্দিন।

www.pathagar.com

একসময়ে বোরহানউদ্দিন নামটি বাদ পড়ে গিয়ে উপজেলাটি জমিদার কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্যের নামানুসারে কালীগঞ্জ নামে কিছুদিন পরিচিতি লাভ করে। বোরহানউদ্দিনের বিক্ষুব্ধ জনগণ এর বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারের আদালতে মামলা দায়ের করে এবং জয়লাভ করে।

লালমোহন উপজেলার নামকরণ

এ উপজেলার আদি নাম মেহেরগঞ্জ। এলাকাটি একসময় বোরহানউদ্দিন উপজেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯০৪ সালে স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি মেহের আলী পাটোয়ারির নিজস্ব জায়গার নামানুসারে এই এলাকার নাম হয় মেহেরগঞ্জ মৌজা। এখানে একটি নিয়মিত হাটও মিলতে থাকে। পরে লালমোহন কুণ্ড নামে এক তহশিলদার অত্যন্ত সুকৌশলে ও অনৈতিকভাবে দলিলপত্রে মেহেরগঞ্জ মৌজার পাশে 'লালমোহন মৌজা' লিখে রাখে। পরে এই নামই মুদ্রিত আকারে প্রকাশ করেন। পরবর্তীকালে এভাবেই 'মেহেরগঞ্জ হাটে'র নাম পরিবর্তিত হয়ে 'লালমোহন বাজার' হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

বাংলা ১২৮৩ সালে (ইং ১৮৭৬) এই অঞ্চল দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল—২২ হাওলাদারের ৯ আনি ও সরকারের ৭ আনি। জমিদারদের নিত্য-নতুন কর প্রথা ও অত্যাচারের কারণে প্রজারা জমিদারের কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব মানতে চাইতো না। এ নিয়ে বরিশালে অনেক মামলা-মোকদ্দমা চলে। চরভুতার প্রজারা সরকারবিরোধী অবস্থান নেওয়ায় এই এলাকায় জমিদারের কর্তৃত্ব বহাল ছিল। কারো কারো মতে, ঢাকার বিক্রমপুরের ভাগ্যকুলের কালীদাস ঠাকুর ছিলেন এই এলাকার জমিদার। অধ্যাপক মোহাম্মদ হোসেন চৌধুরী তাঁর 'ভোলা জেলার ইতিহাস' গ্রন্থে লিখেছেন, 'কালীদাস ঠাকুরের স্থায়ী ঠিকানা ছিল ফরিদপুরের উপসী। ইংরেজদের 'যদ্দূর ভাট্টা তদ্দুর পাট্টা' দলিলের জোরে তিনি বিরাট জমিদার হয়ে যান। তারপর তার নাম হয় কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য চৌধুরী।...অধ্যাপক চৌধুরী আরো লিখেছেন, 'প্রত্যেক বছর 'পুইন্যার' (পূর্ণিমা) সময় এতদঞ্চলের জমিদারের প্রজারা হাজার হাজার গরু, পাঁঠা, কদু (লাউ) ও বিভিন্ন প্রজাতির মাছ নিয়ে ফরিদপুর যেতো' (ভোলা জেলার ইতিহাস, পৃ. ২৮৬)।

কেউ কেউ বলেন, কালীদাস ঠাকুর ও কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য চৌধুরী ছিলেন পৃথক দুই ব্যক্তি এবং তারা দুইজন দুই জেলার বাসিন্দা।

চরফ্যাশন উপজেলার নামকরণ

১৮৯৪ সালে সাবেক জমিদাররা পুরনো দলিলমূলে চরফ্যাশন ও চরমাদ্রাজের ওপর তাঁদের অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি তোলে। সরকারপক্ষ এ সময় গুর্খা সৈন্য নিয়োজিত করে চরের ওপর তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। পরে বার্ষিক চার হাজার টাকা রাজস্ব প্রদানে স্বীকৃত হলে উভয় পক্ষের মধ্যে একটা সমঝোতা হয়। এ সমঝোতা অনুসারে বার্ষিক ৪,০০০/-টাকা সেলামিতে তাদেরকে চরভুতা বন্দোবস্ত দেওয়া হয় এবং জমিদারগণ চরফ্যাশন ও মাদ্রাজের দাবি থেকে সরে আসে। এ সময় (১৮৮৫-৮৭) বাকেরগঞ্জের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন জে.এইচ. ফ্যাশন। ১৮৮৫ সালে তার নামানুসারে এই স্থানের নামকরণ হয় চরফ্যাশন। তিনি এখানে প্রায় ১ কিল্লা জমির ওপর একটি বাজার প্রতিষ্ঠা করেন। এটিই বর্তমানে চরফ্যাশন বাজার।

www.pathagar.com

চরফ্যাশনে রয়েছে ছোট-বড় প্রায় শতাধিক চর। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, চর আইচা, চর লেতরা, চর মঙ্গল, চর নীলকমল, চর কচ্ছপিয়া, চর মানিকা, চর এওয়াজপুর, চর কিশোর, মায়ার চর, চর কলমী, চিতৈল্যা, সীবা, চর নিউটন, পাতিলা, চর ফকির, চর মেঘভাসান, কচুয়ার চর, চর নিজাম, চর মোতাহার, চর কচুয়া খালী, চর কুকুরী-মুকরী, শিবচর, লালচর, ঢাল চর, চর লক্ষ্মী-পক্ষী, চর স্টিভেন্স ইত্যাদি। এই চরগুলোর নামকরণ করেন প্রধানত স্থানীয় জেলেরা। কোনো কোনো ক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে খুশি রাখার জন্যও চরের নামকরণ করা হয়েছে। ১৯২৯ সালে (মতান্তরে ১৯৩৫) বাকেরগঞ্জের তৎকালীন জেলা প্রশাসক মি. ডোনাবান-এর নির্দেশ অনুযায়ী জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে শিক্ষিত, ভদ্র ও অভিজাত হিন্দু ও মুসলিম পরিবারের নয়জন করে ব্যক্তিত্ব ও তাদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে গড়ে ওঠে 'ভদ্র পাড়া' এবং নয়টি ভূমিহীন পরিবারকে পুনর্বাসনের মধ্য দিয়ে গড়ে তোলা হয় 'ওখরাইত পাড়া'।

উপজেলা পরিচিতি

ভোলা জেলা সদর থেকে ৬৭ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত চরফ্যাশন উপজেলা আয়তনের দিক থেকে জেলার সর্ববৃহৎ উপজেলা, জেলার মোট আয়তনের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। ১৮৩৯ সালের দিকে প্রথম এই অঞ্চলে চর জেগে উঠতে শুরু করে। নতুন চরাঞ্চলের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে উত্তর শাহবাজপুর, বাউফল, ধুলিয়া, গোবিন্দপুরসহ পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন এলাকা থেকে লোকজন এখানে এসে চাষাবাদ ও বসতি স্থাপন শুরু করে। এ সময় থেকে হিসেব করলে চরফ্যাশন জনপদের বয়স শ'দেড়েক বছরের কিছু বেশি হবে। ১৮৩৯ সালে লালমোহন থানায় চরভুতা নামে যে ইউনিয়নের সৃষ্টি হয়, বর্তমান চরফ্যাশন সেই চরভুতা ইউনিয়নেরই একটি ওয়ার্ড মাত্র ছিল। ১৯৭০ সালের ২৬ আগস্ট লালমোহন থানা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটি পৃথক থানায় উন্নীত হবার পূর্ব পর্যন্ত চরফ্যাশন একটি চরাঞ্চল হিসেবে জজিরা (চরাঞ্চল) পরগনার অংশ এই লালমোহনের একটি আউট পোস্ট হিসেবে বিবেচিত হতো। ১৯৮২ সালের ১৫ ডিসেম্বর চরফ্যাশন ভোলা জেলার প্রথম উপজেলা হিসেবে উন্নীত হয়।

মনপুরা উপজেলার নামকরণ

মনপুরার অনেক প্রবীণ অধিবাসীর দাবি, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, বিভিন্ন জাতের মাছ, পনিরযুক্ত মহিষের দধি ইত্যাদি যে কোনো আগন্তুককে এই দ্বীপ এমনভাবে ভুলিয়ে রাখতো যে, তাদের মন ষোলকলায় পূর্ণ হয়ে যেতো। এ জন্যই এই দ্বীপটির নাম হয়েছে মনপুরা। আবার কারো কারো মতে, জনৈক মনাগাজী শাহবাজপুরের জমিদারের কাছ থেকে এই এলাকাটি ইজারা নেন। তারই নামানুসারে এর নাম হয় মনপুরা। স্থানীয় অধিবাসীদের আরেকটি অংশ এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, এক সময়ে জঙ্গলে পরিপূর্ণ এই মনপুরা বাঘ, হাতীসহ অনেক বন্য জীবজন্তুতে ভরপুর ছিল। একদিন মনাগাজী নামে জনৈক ব্যক্তি বাঘের আক্রমণের শিকার হন। তার নামেই 'মনপুরা' নামকরণ হয় বলে তাদের অভিমত।

www.pathagar.com

উপজেলা পরিচিতি

ভোলা সদর থেকে প্রায় ৮০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত মনপুরা উপজেলা এই জেলার অনেক পুরনো ভূখণ্ড, যার ভিত্তিভূমি রচিত হয়েছিল ভোলা দ্বীপাঞ্চল পত্তনের প্রায় সমসাময়িককালেই। এটিও একটি দ্বীপ। প্রথমদিকে এটি ভোলার মূল ভূখণ্ডের সাথে সংযুক্ত ছিল বলে কেউ কেউ অনুমান করেন। ভোলা ও মনপুরার মাঝে যে খালটি ছিল, তা অলৌকিকভাবে এক রাতেই প্রচণ্ড স্রোতে দুকূল ভেঙে বিশাল নদীতে পরিণত হয়।

একসময় পর্তুগিজ ও আরাকানি জলদস্যুরা বঙ্গোপসাগরের বুকে জেগে ওঠা এই দ্বীপটিকে তাদের আশ্রয়স্থল হিসেবে বেছে নেয়। তাদের লুণ্ঠিত মালামাল এখানে এনে রাখতো। পরবর্তীকালে নদীর ভাঙনে বা মাটি খুঁড়ে অনেকেই অনেক অর্থ পেয়েছেন বলে শোনা যায়। পর্তুগিজদের পালিত লম্বা কেশযুক্ত কুকুরের বংশধর এখনও এখানে বিদ্যমান।

মনপুরা ১৮৭৫ সাল পর্যন্ত বাকেরগঞ্জের ১৩৩টি চরের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য চর ছিল। প্রথমদিকে এটি ছিল তজুমুদ্দিন উপজেলার একটি ইউনিয়ন।

অধ্যাপক মোহাম্মদ হোসেন চৌধুরী বলেন, '১৭৮১ সালে মনপুরা দক্ষিণ শাহবাজপুরের জমিদারদের সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।...১৮৩৪ সালে সুন্দরবন কমিশনার ডামপায়ার মনপুরা বাজেয়াপ্ত করেন।...১৮৩৭ সালে চট্টগ্রামের কমিশনার মি. রিকেট্স প্রথম মনপুরা বন্দোবস্ত দেন' (ভোলা জেলার ইতিহাস, পৃ. ৯৬)।

একটি সূত্র থেকে জানা যায়, ১৯৪৭ সালের পূর্বে চর কৃষ্ণপ্রসাদ ও চর যতীনসহ কয়েকটি মৌজার জমিদার ছিলেন রাজা রাজেশকান্ত রায় ও হরেন্দ্র রায়। রাজা রাজেশকান্ত রায় ছিলেন দক্ষিণ শাহবাজপুর পরগণার মালিক। দেশ বিভাগের পর তিনি কলকাতায় চলে গেলে মনপুরার অন্যতম প্রধান ভূস্বামী কামাল চৌধুরী সেখানে গিয়ে তার সাথে সাক্ষাৎ করেন। রাজা রাজেশকান্ত রায় তার জমিদারি রক্ষার জন্য কামাল চৌধুরীকে আহ্বান জানান এবং পরগণার 'পাওয়ার অব এটর্নি' প্রদান করেন (১৯৫৫)। ১৯৭০ সালের বন্যার পর মনপুরাকে একটি পৃথক থানা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ১৯৮৩ সালের ৭ নভেম্বর এটি উপজেলায় উন্নীত হয়।

খ. ভৌগোলিক অবস্থান

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত ভোলা জেলা বরিশাল বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। দ্বীপটির অবস্থান বঙ্গোপসাগরের উত্তর দিকে এবং ভূ-বিদ্যার ভাষায় ২২°২০ মিনিট ৪০ সেকেন্ড থেকে ২২°৪০ মিনিট ৫৫ সেকেন্ড উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০°৪০ মিনিট ২০ সেকেন্ড থেকে ৯১°৪ মিনিট ৪০ সেকেন্ড পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে। সমুদ্র সমতল থেকে এর মূল ভূখণ্ডের উচ্চতা ১১ থেকে ১৮ ফুট।

গ. আয়তন ও সীমানা

নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত এই বৃহত্তম দ্বীপটির আয়তন ৩,৪০৩.৪৮ বর্গকিলোমিটার। এর উত্তরে পূর্ব-পশ্চিমে প্রবাহিত ইলিশা নদী ও উত্তর শাহবাজপুর, পূর্বে উত্তর-দক্ষিণে প্রবাহিত মেঘনা ও বৃহত্তর নোয়াখালী জেলা, পশ্চিমে উত্তর-দক্ষিণে প্রবাহিত তেঁতুলিয়া নদী ও পটুয়াখালী জেলা এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর।

www.pathagar.com

মেঘনা-তেঁতুলিয়া বিধৌত বঙ্গোপসাগরের উপকূলে জেগে ওঠা ভোলা জেলা দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে যথাক্রমে ১০০ ও ২৫ মাইল।

ঘ. প্রতিষ্ঠাকাল ও প্রশাসনিক ইউনিট

দ্বীপাঞ্চল ভোলা মহকুমায় উন্নীত হওয়ার সুদীর্ঘ প্রায় ১৩৭ বছর পর গ্রামপ্রধান বাংলাদেশের জাতীয়, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ও অগ্রগতির প্রয়োজনে ১৯৮২ সালে যে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে গণমুখি প্রশাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়, তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৮৪ সালের ১১ জানুয়ারি বাংলাদেশের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ভোলায় অনুষ্ঠিত এক জনসভায় ভোলা মহকুমাকে জেলা হিসেবে ঘোষণা করেন। একই বছরের ১ ফেব্রুয়ারি ভোলার ৭টি থানাকে ৭টি উপজেলায় রূপান্তরিত করে একে আনুষ্ঠানিকভাবে জেলার স্বীকৃতি দেওয়া হয়। উপজেলা ৭টি হলো : ভোলা সদর, দৌলতখান, তজুমুদ্দিন, বোরহানউদ্দিন, লালমোহন, চরফ্যাশন ও মনপুরা। এই জেলার ইউনিয়নের সংখ্যা ৬৬টি ও গ্রামের সংখ্যা ৪৮০টি।

ভোলার চারদিকে প্রায় অর্ধশত চর আছে।

ঙ. জনসংখ্যা

পুরুষ	:	৯,১৮,৭০৪ জন
মহিলা	:	৯,২৭,৬৪৮ জন
মুসলিম	:	৯৩.৪২%
হিন্দু	:	৬.৫০%
খ্রিস্টান	:	.০২%
বৌদ্ধ	:	.০২%
অন্যান্য	:	.০৪%

চ. সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

দেশের সর্ববৃহৎ দ্বীপ এবং বর্তমান ভোলা জেলা গাঙ্গেয় অববাহিকার নিম্নাঞ্চলে অবস্থিত। দ্বীপটির অবস্থান বাকেরগঞ্জ ও নোয়াখালী জেলার মাঝামাঝি হওয়ায় বিভিন্ন সময়ে এটি উপর্যুক্ত জেলা দুটির অংশ হিসেবে বিবেচিত হতো। এর নাম কখনো ছিল দক্ষিণ শাহবাজপুর, কখনো ভোলা। উৎপত্তিকাল থেকেই এই দ্বীপাঞ্চল বাকলা বা চন্দ্রদ্বীপের (বর্তমান বরিশাল) নতুন চর পড়া দ্বীপ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। ১৮২১ সালে কোম্পানি সরকার নোয়াখালীকে একটি পৃথক জেলা হিসেবে ঘোষণা করে এবং ১৮২২ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে জেলায় উন্নীত হওয়ার পর ভৌগোলিক অবস্থান, যাতায়াত ও অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করে ভোলা দ্বীপাঞ্চলকে নোয়াখালীর সাথে সংযুক্ত করা হয়। অবশ্য এর আগেও, অর্থাৎ ১৮২২ সালের আগেও ভোলা দ্বীপাঞ্চল কয়েকবার 'ভুলুয়া' নামে পরিচিত নোয়াখালীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৮৪৫ সালে নোয়াখালী জেলার অংশ হিসেবে দ্বীপটি মহকুমায় উন্নীত হয়। এ সময় ভোলা মহকুমায় থানার সংখ্যা ছিল মাত্র দুটি—ভোলা ও দৌলতখান। এটি বাংলার অন্যতম প্রাচীন মহকুমা।

www.pathagar.com

এদিকে মেঘনা নদী ভয়ংকর মূর্তি ধারণ করায় নোয়াখালীর সাথে ভোলার যোগাযোগ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয় এবং জনসাধারণের সুবিধার্থে ১৮৬৯ সালে একে পুনরায় বাকেরগঞ্জ জেলার অধীনে ফিরিয়ে আনা হয়।

ছ. দ্বীপের জন্ম

হিমালয় থেকে নেমে আসা তিনটি প্রধান নদী পদ্মা, মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্রের শাখা-প্রশাখা বাহিত পলি দিয়ে বঙ্গোপসাগরের মোহনায় গড়ে ওঠা ভোলা দ্বীপাঞ্চলের জন্ম খুব বেশিদিনের নয়। বাকেরগঞ্জ গেজেটিয়ার ও অন্যান্য দালিলিক প্রমাণ থেকে জানা যায়, বরিশালের এক সময়ের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জে.সি. জ্যাক জেলা গেজেটিয়ারে উল্লেখ করেন যে, আনুমানিক ইংরেজি ১২৩৫ সালের দিকে দ্বীপটি গড়ে উঠতে থাকে, অর্থাৎ প্রথম চর পড়া শুরু হয়। ভূতত্ত্ববিদদের ধারণা, পূর্বদিকে মেঘনা ও পশ্চিমদিকে তেঁতুলিয়া নদী বঙ্গোপসাগরের মোহনায় এসে গতিবেগ হারিয়ে ফেলে। ফলে কালক্রমে এই গতিহীন স্থানটিতে পলি ও নদী দিয়ে বয়ে আসা গাছপালা, লতাপাতা, কচুরিপানা ও অন্যান্য বর্জ্য জমা হয়ে ধীরে ধীরে আজকের ভোলা দ্বীপাঞ্চলের মূল ভূখণ্ডের সৃষ্টি হয়। এর প্রায় ১০০ বছর পরে, অর্থাৎ ১৩৩০ সালের দিকে দ্বীপটিতে চাষাবাদ শুরু হয়। প্রথমে পার্শ্ববর্তী ভুলুয়া (নোয়াখালী) ও বাকলা-চন্দ্রদ্বীপ (বরিশাল) এলাকা থেকে লোকজন এখানে এসে চাষাবাদ শুরু করলেও আরো কিছুদিন পর স্থায়ী বসতি শুরু হয়। ১৪৪৮ সালের দিকে বিদেশি পর্যটক, ব্যবসায়ী, চীন এবং আরবের সওদাগররা ক্রমে ক্রমে এখানে ব্যবসা-বাণিজ্য করার প্রয়াস পেয়েছে বলে প্রমাণ রয়েছে।

জ. ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য

দ্বীপাঞ্চলের মাটির নীচের স্তরের ভাঁজ পর্যবেক্ষণ এবং খাল-বিল, নদী-নালাসমূহের পূর্বের অবস্থানের যে অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ ধারণা পাওয়া যায়, তাতে ভূতত্ত্ববিদরা অনুমান করেন যে, এই দ্বীপাঞ্চলটি হয়তো সুদূর অতীতে দেশের মূল ভূখণ্ডের সাথে সংযুক্ত থেকে থাকতে পারে। ১৯০৫-১৯০৮ সালে সম্পাদিত আসাম-বেঙ্গল জরিপ কাজে সম্পৃক্ত কয়েকজন বিশেষজ্ঞ অনুরূপ ধারণা পোষণ করে এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, 'বাকেরগঞ্জ জেলার দক্ষিণাঞ্চলে আরেকবার ভূ-গঠন হয়েছিল যা প্রাকৃতিক কারণে সাগরতলে ডুবে যায়।' এই জরিপ কাজের পরিচালক মেজর এফ.সি. হার্স্ট জরিপ বিবরণীতে লেখেন, 'এক সময়ে দ্বীপাঞ্চল সাগর দ্বীপ হতে চট্টগ্রাম উপকূল বরাবর যে বিস্তৃত ছিল তার প্রমাণ রয়েছে। বাকেরগঞ্জ জেলার মধ্যভাগ হতে উপকূল বরাবর বিস্তৃত এলাকা সময়ের গতিতে আস্তে আস্তে নীচে চলে যায়। বর্তমানে যে অসংখ্য খাল দেখা যায় তা প্রাচীন ভূ-ভাগের নিম্ন অংশ বিশেষ।' (ভোলা জেলার ইতিহাস : মোহাম্মদ হোসেন চৌধুরী, পৃ. ১৩)।

ভোলায় কোনো পাহাড়-পর্বত, টিলা, মালভূমি বা গভীর অরণ্যানী নেই। যতদূর দৃষ্টি যায়, সবদিক শুধু সমতল ভূমি। তবে ভোলার বুকে জেগে ওঠা প্রায় চার-পাঁচশত বছরের পুরনো চরাঞ্চল চর কুকুরি-মুকরিতে গড়ে উঠেছে ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল, যা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অফুরন্ত লীলাভূমি। বঙ্গোপসাগরের বুকে মেঘনা-তেঁতুলিয়া

www.pathagar.com

মোহনায় প্রাকৃতিকভাবে গড়ে উঠেছে এ বনাঞ্চল। এখানে অসংখ্য হরিণ, গরু-মহিষ, বানর ও বিভিন্ন প্রজাতির বন্য প্রাণী বিচরণ করে।

ঝ. জেলার বিভিন্ন জনগোষ্ঠী

জীবিকা নির্বাহ বা স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য প্রতিবেশী দুটি জেলা বাকেরগঞ্জ (বর্তমান বরিশাল) ও ভুলুয়া (বর্তমান নোয়াখালী) থেকে প্রথমে দলবদ্ধভাবে যারা এখানে এসেছিলেন, ভোলার আদি অধিবাসী মূলত তারাই। এরা কৈবর্ত দাস। দ্বীপের উপকূলীয় এলাকায় বিভিন্ন প্রজাতির মাছের বিচিত্র ও বিপুল সমারোহে আকৃষ্ট হয়েই এখানে এসব ধীবরের আগমন ঘটে। পরবর্তীকালে দ্বীপের বিভিন্ন স্থানে জন্ম নেওয়া বন-জঙ্গল, বিষাক্ত কাঁটাগাছ প্রভৃতি কেটে-ছেটে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার জন্য চট্টগ্রামের রামু এলাকা থেকে কিছু পরিশ্রমী শ্রমিক আনা হয় এবং তাদের সাহায্যেই এ অঞ্চলে আবাদ শুরু করা হয়।

প্রতিবেশী জেলা বাকেরগঞ্জ ও ভুলুয়ার অধিবাসীদের নিবিড় সংস্পর্শে থাকার ফলে দ্বীপাঞ্চলে বসবাসরত অধিবাসীদের শিক্ষা-দীক্ষায়, সংস্কৃতিতে এবং ধর্মীয় ও পেশাগত জীবনে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়। পরবর্তীকালে এ দেশে মুসলমানদের আগমনের পর আরব, ইরান, তুরস্ক প্রভৃতি অঞ্চলের শিক্ষিত ও অভিজাত পরিবারের সদস্যদের একটি অংশ রাজকার্য উপলক্ষে নিয়োগ লাভ করে; আরেকটি অংশ ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অধিকাংশ শুধু ধর্মীয় অনুপ্রেরণার বশবর্তী হয়ে এদেশে বসবাস শুরু করে। ধর্মীয় অনুপ্রেরণায় আগত পীর-আউলিয়া, দরবেশ, ইসলাম-ধর্ম প্রচারক ও তাদের প্রত্যক্ষ অনুসারীদের সংস্পর্শে দ্বীপাঞ্চলের অধিবাসীদের জীবন ও কর্মে, চিন্তা-চেতনায়, আচার-আচরণে, রীতি-নীতিতে এক ব্যাপক পরিবর্তন দেখা দেয়। বলা বাহুল্য, দ্বীপাঞ্চল ভোলার মুসলিম জনসমাজের একটি বিরাট অংশই উপর্যুক্ত আধ্যাত্মিক সাধক ও পীর-আউলিয়াদের অনুসারী।

আরেকটি বিষয় এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ভোলায় ধান-চাল, তরি-তরকারি, মাছ-মুরগি প্রভৃতি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের এতো প্রাচুর্য ছিল যে, দেশের বিভিন্ন এলাকার বিশেষকরে ঢাকার মুন্সিগঞ্জ, কুমিল্লা, ফরিদপুর প্রভৃতি এলকার বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ এখানে এসে বসবাস করতে থাকেন এবং স্থানীয় অধিবাসীদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে স্থায়ী বাসিন্দার মর্যাদা লাভ করেন।

ভোলা দ্বীপাঞ্চলটির অবস্থান বরিশাল ও নোয়াখালী জেলার মাঝামাঝি। এ কারণে দ্বীপটির উৎপত্তির পর থেকে সাত-আটশ' বছর এই জেলা কখনও বরিশাল, কখনও নোয়াখালী জেলার অধীনে পরিচালিত হয়ে আসছিল। ফলে ভোলার সংস্কৃতিতে অনেকটাই এই দুই জেলার প্রভাব বিদ্যমান। তবে দীর্ঘদিন বরিশাল বা বাকেরগঞ্জের প্রশাসনের অধীনে পরিচালিত হলেও এই জেলার অধিবাসীদের ভাষায় বা উচ্চারণে বরিশালের কোনো প্রভাব পড়েনি; বরং নোয়াখালীর বিস্তর প্রভাব বিদ্যমান। এই দুই জেলার সংস্কৃতির মিশ্রণে ভোলার জনগণ গড়ে তুলেছে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি।

ভোলা দ্বীপাঞ্চল উৎপত্তির পরবর্তীকালে বিভিন্ন সময়ে বাকলা চন্দ্রদ্বীপ, সন্দ্বীপ ও ভুলুয়া (নোয়াখালীর আদিনাম) থেকে বেশকিছু লোক এখানে বসতি স্থাপন করে। নদীর

www.pathagar.com

ভাঙা-গড়ার খেলার শিকার বাকলা চন্দ্রদ্বীপের একটা বিরাট অংশ নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেলে ঐ এলাকার অনেকে এই চরাঞ্চলে এসে বসতি স্থাপন করে। অধ্যাপক মোহাম্মদ হোসেন চৌধুরী তাঁর 'ভোলা জেলার ইতিহাস' গ্রন্থে লিখেছেন, 'এদের অধিকাংশই পশ্চিম পাড়ের বাকলা পরগনা থেকে এসেছে বলে এ পাড়ের লোকজন তাদের 'বাকলাই' বলতো। বোরহানউদ্দিন উপজেলার বিভিন্ন অংশে, বিশেষকরে দেউলা ও সাচড়ায় তাদের প্রথম বসতি শুরু হয়। অপরদিকে, পূর্ব ও উত্তরদিকের কোনো অংশে চর পড়লেই নোয়াখালী, হাতিয়া, সন্দ্বীপ, ভুলুয়া প্রভৃতি অঞ্চল থেকে লোকজন সদ্য জেগে ওঠা চরে এসে বসবাস শুরু করে দিতো।... ভোলা অঞ্চল তখনও নোয়াখালী জেলার অংশ ছিল বিধায় পূর্বাঞ্চল থেকে আগতদের বলা হতো 'পূবাল'। হাতিয়া ও সন্দ্বীপ থেকে আগতদের বলা হতো 'সুইংগাল' বা 'হুইংগাল'।' আবার 'ভুলুয়া' থেকে আগতদের বলা হতো 'ভুল্যাওয়ালা'। স্থানীয় অধিবাসীরা 'সুইংগাল' বা 'হুইংগাল' বা 'ভুল্যাওয়ালা'দের পৃথক পৃথক নামে চিহ্নিত করতে গিয়ে এই শব্দগুলো তাঁরা একটু তুচ্ছার্থেই ব্যবহার করতো। এরা পরস্পর পরস্পরকে একটু অবজ্ঞার দৃষ্টিতেই দেখতো। এই ভিন্নধর্মী দুই সংস্কৃতির জনগণের অবস্থান পাশাপাশি থাকলেও তাদের আচার-আচরণ, রীতি-নীতি অনেকটাই পৃথক ছিল। কদাচিৎ তাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হতো। এমনকি সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতেও এই দুই সংস্কৃতির জনগণের খুব একটা সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক লক্ষ্য করা যেতো না।

ঞ. বিভিন্ন পেশাজীবী

পেশার দিক থেকে এ অঞ্চলে কৃষিজীবীর সংখ্যাই সর্বাধিক, প্রায় ৮৫ শতাংশ। এর পরেই আছে মাছ ধরা ও মাছ চাষ, বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা, ব্যবসায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পেশা, চাকরি, ঠিকাদারি, ওকালতি, শিক্ষকতা, সাংবাদিকতা, রিকশা ও অন্যান্য পরিবহণশ্রমিক, মাঝি, গোয়ালা, কামার, গবাদি পশুপালন, নির্মাণশ্রমিক, ছৈয়াল, দর্জি, ধোপা, মুচি, নাপিত, সুতার (কাঠমিস্ত্রি), ধুনকর, দিনমজুর, লোকচিকিৎসক, খোন্‌কার, আয়ুর্বেদ, হোমিও ও অ্যালোপ্যাথ চিকিৎসক।

খাল-বিল-নদীতে পানি ও পর্যাপ্ত মাছের অভাবে জেলেদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। আগের মতো এখন আর গ্রামের প্রতিটি খালের কিনারে একটু পর পর মাচা পেতে জাল বসানো হয় না। দিনে-রাতে ঝাঁকি জাল মারতে মারতে মানুষ খালের কিনারা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে চলে যায় না। দুর্ভাগ্যজনকভাবে একই সঙ্গে কমে গেছে গ্রামে 'মাউছ্যা ভূতে'র (মেছোভূত) দৌরাত্ম্যও। একদিকে খাল-বিলে মাছের আকাল অন্যদিকে গ্রামের বন উজাড় করে বাসগৃহ নির্মাণ ও ঘরে ঘরে বৈদ্যুতিক আলোর সংযোগ—এই দুয়ে মিলে আগের মতো এখন আর 'মাউছ্যা ভূতরা' যখন-তখন মাছ শিকারিদের ওপর 'ভর' করে না কিংবা হাত থেকে মাছের থলে ছিনিয়ে নেয় না। সন্ধ্যা থেকে নিশিরাত অবধি জাল ফেলে মাছ ধরার পর বাড়ি ফিরে আসার পথে অনেক 'মাছ খেকো' ভূত নাকি মাছের 'খলুই' বা থলে ছিনিয়ে নিয়ে যেত।

ক্ষৌরকাররা (নাপিত) এখন আর একটি ক্ষুদ্রাকার কাঠের বাক্স নিয়ে গ্রামের বাড়ি বাড়ি গিয়ে শিশু-কিশোরদের মাথা দু'হাঁটু দিয়ে চেপে ধরে মাথা মুণ্ডন করে না। এখন

www.pathagar.com

অভিজাত সেলুন ছাড়াও গ্রামের হাট-বাজার কিংবা রাস্তার মোড়ে মোড়ে গাছের নীচে ছোট একটি চেয়ার, ছোট একটি টেবিল ও ক্ষুর, ক্ষুর ধার দেওয়ার পাথর, কাঁচি ও আয়না নিয়ে বসে যান ক্ষৌরকাররা। গাছের সাথে আয়না বেঁধে তার সামনে গ্রাহককে চেয়ারে বসিয়ে চুল কাটেন, দাড়ি-গোঁফ কামান, নাক-কান ও বগলের লোম ছাটেন।

ক্ষৌরকারদের পসার এবং গ্রামের বাড়ি বাড়ি তাদের বিচরণ কমে যাওয়ায় এখন আর তাদের বুদ্ধির প্রশংসাসূচক বাক্য (নাপিতের ষোল চোঙা বুদ্ধি) কমই শোনা যায়। এক ক্ষৌরকার তো নাকি এক সময় এক জজ সাহেবকেও খুবই বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে ফেলেছিলেন। এ সম্পর্কিত ঘটনাটি এরূপ :

মহামান্য জজ সাহেবের আদালতে বিচার চলছে। বিচারক 'শীল' (নাপিত) বংশীয়। গুরুত্বপূর্ণ মামলা। খুনের মামলা। পক্ষ-বিপক্ষের সাক্ষী-সাবুদ জানা হচ্ছে। এক ক্ষৌরকার এই মামলায় বাদী পক্ষের সাক্ষী। সাক্ষ্য প্রদানের একপর্যায়ে 'শীল' বংশীয় বিজ্ঞ জজ সাক্ষী ক্ষৌরকারকে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা, আপনি বললেন যে, আপনি খুনের সময়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। বলুন তো, যাকে খুন করা হয়েছে তার দেহ থেকে কতটুকু রক্ত গেছে?

ক্ষৌরকার-সাক্ষী বিচারককে বিব্রত করার জন্য বললো, 'হুজুর, এই নাপতার বাটির এক বাটি আর কি। বিচারক কিছু সময়ের জন্য মৌনতা অবলম্বন করলেন!

কিছুক্ষণ চুপ থেকে তিনি আবার সাক্ষীকে জিজ্ঞেস করলেন আচ্ছা, যে স্থানে খুনটি হয়েছে সেটা আপনার বাড়ি থেকে কত সময়ের পথ?

ক্ষৌরকার-সাক্ষী বিচারককে বিব্রত করার সুযোগ পেল পুনরায়। সে পাল্টা জিজ্ঞেস করলো, হুজুর, জল পথে, না স্থলপথে?

বিচারক বললেন, ধরুন জলপথে?

সাক্ষীর আবার পাল্টা প্রশ্ন, হুজুর জোয়ারের সময়, না ভাঁটার সময়?

বিচারক বললেন, ধরুন জোয়ারের সময়?

ক্ষৌরকার-সাক্ষীর আবারও পাল্টা প্রশ্ন, হুজুর, নৌকায় বাদাম দিয়া, না বাদাম ছাড়া?...

এটাকেই বলে বোধ হয় নাপিতের 'ষোল চুঙা' বুদ্ধি। এখন গ্রামের সেই প্রতিনিধিস্থানীয় ক্ষৌরকারদের খুব কমই চোখে পড়ে।

ট. মাটির ধরন

নদীর স্রোতের সঙ্গে বয়ে আসা ঘোলা জল থেকে থিতিয়ে পড়া নরম মাটির স্তর, লতাপাতা, কচুরিপানা ও আবর্জনা জমে এই মূল ভূখণ্ডের ভিত্তিভূমি রচিত হয় বলে এখানকার অধিকাংশ স্থানে কাদামাটির আধিক্য লক্ষণীয়। এখানে মিশ্র ও দো-আঁশ মাটি এবং বেলে মাটির অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। তজুমুদ্দিন উপজেলার শশীগঞ্জ ও বোরহানউদ্দিন উপজেলার দেউলা, বোয়ালিয়া ও ডাওরিতে এঁটেল মাটির সন্ধান পাওয়া যায়। এ জেলায় কোনো পাথর, শিলামাটি বা গ্রানাইটের উপস্থিতি দেখা যায় না।

www.pathagar.com

ঠ. চাষাবাদ ও ফসল

বরিশালের তৎকালীন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট উইন্টল ১৮০২ সালের ৭ জানুয়ারি এক তথ্য বিবরণীতে বৃহত্তর বরিশালের জনগণ সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন, 'এ জেলার মানুষ কোনো পরিবর্তন চায় না। তারা প্রাচীনকে আঁকড়ে ধরে থাকতে চায়। ধর্মভিত্তিক গ্রাম্য সমাজব্যবস্থা পাশ্চাত্য সভ্যতা সম্পর্কে উদাসীন থাকে। এরা নিজের প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত কিছুই উৎপাদন করে না। তারা মাঠে কাজ করে ভাগ্য উন্নয়নের জন্য নয়, বেঁচে থাকার জন্য। মুনাফা তারা করতে চায় না, তাই কোম্পানির আমলে বরিশালে 'বেঁচে থাকার অর্থনীতি' বিদ্যমান ছিল, সমাজকাঠামোর কোনো পরিবর্তন হয়নি' (ভোলা জেলার ইতিহাস : মোহাম্মদ হোসেন চৌধুরী, পৃ. ৯৩)।

এ মন্তব্য দুশো দশ বছর আগের। এ অঞ্চলের জনগণ এখন আর শুধু নিজেদের প্রয়োজন মেটানোর জন্যই উৎপাদন করে না, উৎপাদন করে দেশের অন্যান্য জেলার জন্যও। নিজেদের বেঁচে থাকার জন্যই তারা কেবল ক্ষেতে-খামারে কাজ করে না, তারা কাজ করে নিজেদের এবং সমষ্টির উন্নয়নের জন্যও। কিছু অন্ধ, ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কার থেকে মুক্তির প্রচেষ্টা ও আগ্রহ তাদের না থাকলেও চাষাবাদের ক্ষেত্রে উপাদান ব্যবহার ও উৎপাদন পদ্ধতিতে সনাতন লাঙল-জোয়ালের ব্যবহার পরিহার করে কিছু কিছু আধুনিক যন্ত্রপাতি যেমন ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার ইত্যাদি ব্যবহারে তারা মনোযোগী হয়েছে। এর ফলে ভোলা জেলার কৃষক ১৯৯৯-২০০০ সালে নিজেদের প্রয়োজনীয় সাড়ে তিন লক্ষ মেট্রিক টনেরও অতিরিক্ত ১.৫০ (দেড় লক্ষ) টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করেছে। উৎপাদন পদ্ধতিতে লাঙ্গল-জোয়াল-গরুর পরিবর্তে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার একদিকে যেমন কৃষককে অল্প সময়ে অধিক জমি চাষ, জমি চাষে ব্যয় হ্রাস ও লোকবলের অভাব পূরণে সহায়তা করেছে, অন্যদিকে তেমনি ফসলের উৎপাদনও বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে অনেক কিছুই হয়তো হয়েছে, কিন্তু এখান থেকে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে অনেক চিরপরিচিত, চিরচেনা দৃশ্যপট—সূর্যোদয়ের লগ্নে আলুভর্তা-পেয়াজ-কাঁচা মরিচ অথবা গুড়-নারিকেল দিয়ে চারটে পান্তা পেটে পুরে কাঁধে লাঙল-জোয়াল চাপিয়ে গোয়াল ঘর থেকে গরুগুলিকে বের করে 'হইট্ হইট্' শব্দে সেগুলো তাড়িয়ে ক্ষেতের দিকে নিয়ে যাওয়া, হারিয়ে যাচ্ছে বিস্তৃত ক্ষেতে জোড়া বলদের ক্ষতযুক্ত গলায় নতুন ফলার লাঙ্গল দিয়ে জমি কর্ষণের দৃশ্য। দৃষ্টির আড়ালে হারিয়ে যাচ্ছে ঘরের পাশের ঝুরঝুরে মাটিতে কৃষক-বউয়ের শশা-লাউ ও কুমড়োর বীজ বপনের চিত্র। দৃশ্যপট থেকে হারিয়ে যাচ্ছে ক্ষেতের পাশে আলের ওপরে কৃষকের গেঞ্জি-সার্ট দুমড়ে-মুচড়ে পুটুলি বানিয়ে রেখে দেওয়া, বিড়ি সিগারেট ও হুক্কা খাওয়ার জন্য খড় দিয়ে বিনুনি পাকিয়ে তার একপাশে একটু হালকা আগুন দিয়ে আলের পাশে রেখে দেওয়া, মাঝে মাঝে ওখানটায় গিয়ে পিতা-পুত্র, শ্বশুর ও ভাই মিলে পালাক্রমে একই হুঁকোতে 'টান' দেওয়া, সূর্য মাথার ওপরে উঠে গেলে স্বামী কিংবা ভাশুর-দেবরের জন্য লাল-নীল-চেকের গামছা দিয়ে বেঁধে কৃষক পরিবারের বউদের দুপুরের খাবার বয়ে নিয়ে যাওয়া, ক্ষেতের কিনারে বসে তাদের জন্য অপেক্ষা করা...। হারিয়ে যাচ্ছে গরু চরানো, মহিষ চরানো রাখাল বালকদের নিয়ে গাওয়া গান। আবার বাড়িতে 'দেওরের' (দেবর) জন্য ভাত নিয়ে ভাউজের (ভাবীর) অপেক্ষা করা নিয়েও কি যেন একটা গান শোনা যেত, 'ও

www.pathagar.com

আমার দেওরারে...'। কৃষিজীবনের এসব চিরপরিচিত ছবি আমাদের দেশের অনেক খ্যাতনামা চিত্রশিল্পীর তুলির ছোঁয়ায় মূর্ত হয়ে উঠেছে বার বার।

এসব দৃশ্য ধীরে ধীরে মলিন হতে হতে একসময় একেবারে অদৃশ্যই হয়ে যাবে হয়তো, যেমন আমাদের বাড়িঘর থেকে বিদায় নিয়েছে 'উগুইর' ও ঢেঁকি, সড়ক থেকে গরুর গাড়ি, পালকি এবং নদী থেকে গয়না নৌকা। গবাদি পশুর উচ্চমূল্য, প্রাকৃতিক গো-খাদ্যের সহজলভ্যতা হ্রাস, পশুপালনের সামগ্রিক ব্যয় বৃদ্ধি, জনবলের অভাব, উৎপাদনের বিভিন্ন স্তরে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহারের ফলে সময়ের সদ্ব্যবহার ও অধিক ফসল প্রাপ্তি ইত্যাদি কারণেও কৃষিক্ষেত্রে সনাতন লাঙল-জোয়ালের ব্যবহার ক্রমশই হ্রাস পাচ্ছে। অন্যদিকে, পরিবারের উত্তরাধিকারের সংখ্যার নিরন্তর বৃদ্ধি ও একান্নবর্তী পরিবারে বিভক্তির কারণে ব্যক্তি পর্যায়ে জমির পরিমাণ হ্রাস পাওয়ায় দীর্ঘায়তনের জমিগুলো 'আল' (আইল) দ্বারা বিভক্ত হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডিত জমিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। ফলে, ক্ষুদ্রায়তনের জমিতে ট্রাক্টর বা পাওয়ার টিলারের সাহায্যে চাষাবাদ সম্ভব হয় না। এখন পর্যন্ত এ ধরনের জমিতে লাঙল-জোয়ালের সাহায্যেই চাষাবাদ করা হয়ে থাকে। এর পরিমাণ মোট চাষকৃত জমির প্রায় এক-চতুর্থাংশ।

বাংলাদেশের প্রায় সব জেলাই প্রধানত কৃষিনির্ভর। জোয়ার-ভাঁটার অঞ্চল ভোলায় পলিমাটির আধিক্যের কারণে জমির উর্বরাশক্তি অনেক বেশি। তবে দেশের অন্যান্য জেলার মতোই এ অঞ্চলের কৃষকরাও এখন উর্বরাশক্তি বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনে সার, বৃষ্টির অভাব পূরণে সেচ, উন্নত জাতের বীজ বপন ইত্যাদি ব্যবস্থা অবলম্বন করে থাকে। এরপরেও তারা বংশ পরম্পরাগত কিছু বিশ্বাস ও ritual পালন করে থাকে। এসব ritual-এর প্রায় সবটাই খরা, অতি বৃষ্টি থেকে ফসলের নিরাপত্তা বিধান, উন্নত ও পর্যাপ্ত ফসল প্রাপ্তি এবং পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ ও মানুষের 'বদনজর' ইত্যাদি থেকে ফসল রক্ষার প্রচেষ্টায় পালন করা হয়ে থাকে।

আমাদের এলাকার কৃষিশ্রমিকদের শতকরা আশি ভাগেরও বেশি মুসলমান। সনাতন ধর্মাবলম্বী জমির মালিকদের এই মুসলমান কৃষিশ্রমিকদের ওপরই নির্ভর করতে হয়। মুসলমান কৃষিশ্রমিকরা নিজেদের হালের বলদ এনে হিন্দুদের জমি চাষ করার কাজটি সম্পাদন করে। কারণ, বিষ্ণুর অবতার গরুকে তারা দেবতা মনে করে। তাদের কাঁধে যোয়াল চাপিয়ে পাচন দিয়ে আঘাত করা মহাপাপ। চাষাবাদের পরবর্তী স্তরগুলোর যাবতীয় কাজ অর্থাৎ বীজ বপন থেকে শুরু করে ঘরে ফসল তোলা পর্যন্ত প্রায়শ তারা নিজেরাই করে থাকে।

এ অঞ্চলে একটি সময় ছিল, ধান কাটার মৌসুমে ধান কাটার জন্য ঢাকা, কুমিল্লা, ফরিদপুর ও নোয়াখালী থেকে শত শত লোক এসে ভিড় করতো। ধানকাটা শেষ হলে পারিশ্রমিক হিসেবে তারা উৎপাদিত ফসলের পাঁচ ভাগের এক ভাগের দাবিদার হতো। স্থানীয় প্রায় আশি ভাগ কৃষকই নিজেরা ধান কাটায় অংশগ্রহণ করতো না, এ কাজটি সম্পন্ন হতো অন্য জেলা থেকে আগত 'কিষাণ' বা 'বদলাদে'র দ্বারা। অবশিষ্ট দরিদ্র কৃষকেরা নিজেরাই উৎপাদনের সকল স্তরে অংশগ্রহণ করতো। এখন স্থানীয় কৃষকেরা নিজেরাই উৎপাদনের সকল স্তরে অর্থাৎ ক্ষেত কর্ষণ, বীজ বপন, চারা রোপণ, সার

www.pathagar.com

প্রয়োগ, সেচ দেওয়া, ধান কাটা, ধান মাড়াই, সিদ্ধ করা ইত্যাদি সম্পাদন করে। পরিবারের মহিলা সদস্যদেরও অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হয়। বাড়িতে ধান পৌঁছানোর পর সিদ্ধ করে শুকানো থেকে শুরু করে হাটে বিক্রি করার উপযোগী করা বা গোলায় উঠানো, আবার গোলা থেকে নামিয়ে ভাত রান্না করে স্বামী-শ্বশুর-দেবর-ননদের খাবারে পরিবেশন করা পর্যন্ত তাদের ব্যস্ত থাকতে হয়।

আগের মতোই এখনও এ এলাকার শিক্ষিত শ্রেণির মানুষ চাষাবাদ করাকে খুব একটা সম্মানের চোখে দেখে না। তারা তাদের চাষাবাদের জমি এক সনা (এক বছরের জন্য) বা দুই সনা (দুই বছরের জন্য) বা ততোধিক সময়ের জন্য বর্গা দিয়ে চাষাবাদ করিয়ে থাকে অথবা আগ্রহী কৃষকের কাছে নগদ অর্থের বিনিময়ে উপর্যুক্ত সময়ের জন্য জমি চাষ করে।

এক সময়ে এ এলাকার মানুষের অর্থোপার্জনের প্রধান ফসল ছিল সুপারি, লবণ, পাট ও মরিচ। এ অঞ্চলের মানুষ সমুদ্রের নোনা জল ও লবণ মেশানো মাটি রোদে শুকিয়ে লবণ তৈরি করতো। ভোলা ও বরিশালের চাহিদা পূরণ করেও এ লবণ সারাদেশের চাহিদা পূরণ করতো। ইংরেজ সরকার বিলেতে উৎপাদিত লবণ বিক্রির জন্য দেশীয় পদ্ধতিতে লবণ উৎপাদন ও বিক্রয় নিষিদ্ধ ঘোষণা করে এবং লবণ চাষীদের ওপর অকথ্য নির্যাতন শুরু করে। এ অঞ্চলের জনগণও ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ভোলার জনগণ ইংরেজদের আদেশ অমান্য করে লবণ উৎপাদন অব্যাহত রেখেছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে দেশীয় পদ্ধতিতে লবণ উৎপাদনের ব্যয় বৃদ্ধি এবং জনগণের উৎসাহ ও সমর্থনের অভাবে লবণ শিল্প একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

সুপারি আর মরিচের কথা বলাই বাহুল্য। একসময় লবণ, সুপারি ও মরিচ উৎপাদনের জন্য ভোলা একটি বিখ্যাত ব্যবসাকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। দিল্লি, মুম্বাই করাচি থেকে মারোয়ারি ব্যবসায়ীরা সুপারি, পাট, লবণ আর মরিচ ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য এখানে এসে বেশ কিছুদিন অবস্থান করতো। গাজীপুর, দৌলতখান, সুকদেব, মৃজাকালু ছিল সুপারি ক্রয়-বিক্রয়ের প্রধান কেন্দ্র। এসব হাট-বাজারে হাজার হাজার মণ সুপারি ও মরিচ বেচাকেনা হতো। গরুর গাড়িতে করে এসব মালামাল আনা নেওয়া হতো। কিন্তু পরবর্তীকালে বাংলা ১৩৪৮ সালের বন্যা, ৭০-এর প্রলয়ংকরীঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের পর সুপারি বাগানগুলিতে দেখা দেয় এক অজানা মড়ক। এর ফলে লক্ষ লক্ষ সুপারি গাছ মরে যায়।

তবে এ অঞ্চলে এখনও প্রচুর পরিমাণে নারিকেল ও সুপারি উৎপন্ন হয়। এ এলাকার মানুষ ধান আবাদের পাশাপাশি সুপারি ও নারিকেল গাছ লাগানোর দিকে মনোযোগ দেন বেশি। মোহাম্মদ হোসেন চৌধুরী তাঁর 'ভোলা জেলার ইতিহাস' গ্রন্থে লিখেছেন, 'বাকেরগঞ্জ জেলায় প্রায় ৩ লক্ষ ৫০ হাজার সুপারি গাছ ছিল। এই সুপারি গাছগুলিতে প্রায় সাতশত কোটি সুপারি উৎপন্ন হতো। ১৯০৫ সালে যার বাজার দর ছিল ৬৪ লক্ষ টাকা। ৮ লক্ষ মন সুপারি রফতানি করা হতো, যার বর্তমান বাজার মূল্য (২০০১ সনে) চারশত কোটি টাকা' (ভোলা জেলার ইতিহাস, পৃ. ১০৪)। সুপারি দু-

www.pathagar.com

ধরনের, টাডি ও মগাই। গাছপাকা সুপারিগুলো রোদে ভালো করে শুকিয়ে করা হয় 'টাডি' সুপারি আর কাঁচা অবস্থায় পেড়ে রোদে শুকালে বলা হয় 'মগাই' সুপারি। এগুলো খেতে 'কষ কষ' লাগে।

সমগ্র জেলার কোথাও আজ আর পাট উৎপন্ন হয় না। গৃহস্থরা শুধু নিজেদের দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য সামান্য কিছু পাট উৎপাদন করে। ধুলট ফসল অর্থাৎ রবিশস্যের মধ্যে মরিচ, মুগ, মশুরি, কলাই, তিল, তিসি, পেঁয়াজ, রসুন, সরিষা ইত্যাদি জেলার সর্বত্র উৎপন্ন হয়ে থাকে। ধানের মধ্যে ইরি, বোরো, আমন, কালাকোরা, রাজাসাইল, হাইলগ্রিণ, শালি, চাপলাইস, লোতা, মধুমালা, ভিকচ, কালিজিরা, সাক্কোরকোরা, চিনিগুঁড়া ছাড়াও বিভিন্ন প্রজাতির ধান উৎপন্ন হয়ে থাকে জেলার সর্বত্র।

ফলের মধ্যে কাঁঠাল, নারিকেল, কলা, জাম, জাম্বুরা, জামরুল, পেয়ারা, আনারস, বাঙ্গী, তরমুজ, পেঁপে, শশা, আতাফল, শরিফা, বরই, গাব (বিলেতি ও দেশি), লটকন, ডেউয়া, করমচা ইত্যাদি যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হয়ে থাকে। তবে লবণাক্ত মাটির কারণে আমের ফলন মোটেই ভালো নয়।

ইতোপূর্বে বলেছি, সমগ্র ভোলা জেলার মানুষ খুবই অতিথিপরায়ণ। কারো বাড়িতে কোনো মেহমান এলে, নতুন হোক আর পুরনো হোক, আর কিছু না হলেও তাকে গাছ থেকে একটি ডাব পেড়ে বা এক খিলি পান দিয়ে অতিথি সেবার কাজটুকু করা হবেই। পানের সাথে ধনিয়া, জর্দা, খয়ের তো থাকবেই। পানের খিলি কোথায় নেই? কনে দেখতে গেলে, কাছারি ঘরে কোনো বৈঠকে, গল্প-গুজবে, বিয়ে বাড়ির ভোজন শেষে এক খিলি পান না খাইয়ে তো আর মেহমান বিদেয় করা যায় না।

পান খাওয়ার একটা সংস্কার আছে। কোনো বাড়িতে গিয়ে পানের খিলি মুখে দেওয়ার আগে একটু শুঁকে নেন অনেকেই। কারণ, পান দিয়েও নাকি অনেক রকম তুক-তাক করা যায়। একটু শুঁকে নিলে তুকতাকে নাকি আর কাজ হয় না।

এক সময়ে এখানে প্রচুর পান উৎপন্ন হতো। ইদানীং এর চাষ কিছুটা কমে এসেছে। সনাতন ধর্মের 'বারুই' সম্প্রদায়ের লোকজন পান উৎপাদনে নিয়োজিত ছিল। গ্রামাঞ্চলে কিছুদূর পরপরই ছিল পানের বরজ। এখন মুসলমানরাও পান চাষ করে। উৎপাদিত পানের ভোক্তারও অধিকাংশই মুসলমান। আরেকটি সম্প্রদায় নিয়োজিত রয়েছে শামুক থেকে চুন প্রস্তুত করার কাজে। পানের বোঁটায় বা ডান হাতের তর্জনিতে একটু চুন নিয়ে পানের সাথে মিশিয়ে খুব মজা করেই পান খেয়ে থাকেন পানসেবীরা।

ড. নদ-নদী

মেঘনা : নদীটি ভোলা জেলার পূর্ব পাশ দিয়ে উত্তরে-দক্ষিণে প্রবাহিত। এটি কিশোরগঞ্জ জেলার দিলালপুর থেকে শুরু হয়ে কুলিয়ারচর, ভৈরব, নবীনগর, বৈদ্যেরবাজার (সোনারগাঁ), গজারিয়া, ষাটনল, মোহনপুর, এখলাসপুর, চাঁদপুর, নীলকমল, হিজলা, ইলিশাঘাট, গাজীপুর, শান্তিরহাট হয়ে দৌলতখান পর্যন্ত প্রবাহিত।

শাহবাজপুর : গাজীপুর (ভাঙনে বিলুপ্ত) হয়ে নিয়ামতপুর, শান্তিরহাট, দৌলতখান, চরমোহনপুর, চর বৈরাগী হয়ে হাতিয়া।

www.pathagar.com

তেঁতুলিয়া : এটি ভোলা জেলার পশ্চিম পাশ দিয়ে উত্তরে-দক্ষিণে প্রবাহিত। বরিশাল জেলার চন্দ্রপুরা থেকে শুরু হয়ে চালিতাবুনিয়া পর্যন্ত প্রবাহিত। পথে পড়েছে ধুলিয়া, কালাইয়া, দশমিনা ও চালিতাবুনিয়া। এই নদীর আরেক একটি শাখা চরকাহল, চরবিশ্বাস ও চরনাজির হয়ে বঙ্গোপসাগরের সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

গণেশপুরা : নিম্ন মেঘনার একটি শাখা ইলশাঘাট থেকে শুরু হয়ে ভোলাঘাট পর্যন্ত এসে গণেশপুরা নদী নামে পরিচিতি লাভ করেছে। পরে তেঁতুলিয়া নাম ধারণ করে বঙ্গোপসাগরের সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

চ. পশু-পাখি

অর্ধশত বছর আগেও এসব এলাকায় শূকর, বাঘডাশ, পয়মাল, শিয়াল প্রভৃতি জাতির পশুর বিচরণ ছিল প্রায় অবাধ। এর ফলে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা অনেকটাই বিঘ্নিত হতো। শূকর আর পয়মালের ভয়ে রাতে বের হতে মানুষ রীতিমতো ভয় পেতো। সেসব ভয় আর এখন নেই। ওইসব পশুর এখন চিহ্নমাত্র নেই। একমাত্র সাপ ছাড়া আর কোনো হিংস্র প্রাণীর এখন সাক্ষাৎ মেলে না। দৌলতখান ও তজুমুদ্দিনে এক সময় কিছু কুমির দেখা যেত। এখন তাও নেই।

একসময় রাতের আঁধার নেমে এলেই শিয়ালের ডাকে লোকালয় সরগরম হয়ে উঠতো। বাড়ির পাশের বন-জঙ্গল আর আখ ক্ষেত ছিল শিয়ালের বিচরণ ভূমি। বাড়িতে হাঁস-মুরগি পালন খুবই কষ্টকর হতো। এরাও আজ প্রায় বিলুপ্তির পথে। ঘোড়ার অবস্থাও অনুরূপ।

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের অতিপরিচিত পশুর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে গরু-মহিষ, ছাগল-ভেড়া, কুকুর ও বিড়াল, ইত্যাদি।

পাখির মধ্যে রয়েছে কাক, কোকিল, চিল, দোয়েল, কবুতর, শালিক, টিয়া, ঘুঘু, ডাহুক, বাবুই, চড়ুই, বাদুর, শকুন, মাছরাঙ্গা, কাঠঠোকরা, ভুতুম, পেঁচা, রাজহাঁস, বালিহাঁস, পাতিহাঁস, চীনা হাঁস, বক ইত্যাদি। এর মধ্যে অনেকগুলোই আজ বিলুপ্তির পথে। পেঁচা ও ভুতুম পাখি অনেকটা একই রকম। এদের উভয়ের ডাককে অত্যন্ত অলক্ষুণে বলে বিবেচনা করা হয়। বিশেষকরে রাতের বেলা পেঁচা বা ভুতুম পাখি ডেকে উঠলে এখনও মায়েরা তাদের ছোট ছোট শিশুদের দোয়া পড়ে ফুঁ দিয়ে থাকেন, বুকে থুথু দিয়ে থাকেন যাতে কোনো অকল্যাণ না হয়। নিশিরাতে অথবা সাত-সকালে করুণ বা কর্কশ স্বরে কাকের ডাক শুনলে এখনও অনেকেই দুর্ভাবনায় পড়েন, কোনো এক অজানা শঙ্কায় কেঁপে ওঠে বুক, কোত্থেকে না জানি কী দুঃসংবাদ আসে! আল্লাহ, যে যেখানে আছে, সবাইকে সুস্থ রেখো, ভালো রেখো—এই প্রার্থনা করে আল্লাহতাআলার কাছে পূর্ণ নিরাপত্তা চান। আর হাততালি দিয়ে বলেন, দূর কাক! যা, যা-সর্ সর্।

হলুইদ্যা (হলুদিয়া) পাখি বা 'কুটুম পাখি'র জন্মরহস্য নিয়ে বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো এখানেও রয়েছে নানা গল্প। এখানে এ বিষয়ে দু'ধরনের গল্প প্রচলিত রয়েছে। এক. এক গৃহস্থের বাড়িতে বেড়াতে এসেছে কুটুম বা আত্মীয়। গৃহকর্ত্রী পুত্রবধূকে উপাদেয় সব খাবার-দাবার তৈরির নির্দেশ দিল। কিন্তু রান্নাবান্নায় অদক্ষতা

www.pathagar.com

বা অসতর্কতার জন্য তরকারিতে হলুদ একটু বেশি পড়ে গিয়েছিল। নববধূ অনেক চেষ্টা করেও সে হলুদের রং আর দূর করতে পারে না। রাগে-দুঃখে, লজ্জায় বধূটি তরকারির হাঁড়িটি নিজের মাথায় ভেঙে পাখির রূপ ধারণ করে পালিয়ে যায়। তরকারির হলুদে তার গায়ের রং হলুদ বর্ণ ও পাতিলের কালো রং মাথায় লেগে কালো বর্ণ ধারণ করে।

আরেকটি জনশ্রুতি এই যে, বাড়িতে মেহমান বেড়াতে এলে শাশুড়ি নববধূকে রান্নাবান্না করতে বলে কিন্তু সাত-সকালে নদীর পানিতে গোসল করার ফলে নববধূর গায়ে জ্বর আসে। সে অবস্থায় অসতর্কতাবশত তরকারিতে হলুদের পরিমাণ একটু বেশি হয়ে যায়। এই না দেখে শাশুড়ি রেগে-মেগে তরকারির পাতিল বউয়ের গায়ে ছুঁড়ে মারে। শুধু তাই নয়, শাশুড়ি তাকে অভিশাপও দেয়। শাশুড়ির অভিশাপে নববধূটি পাখিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

চর কুকুরি-মুকরি ও ঢালচরে কিছু হরিণ রয়েছে। বন বিভাগ এসব হরিণ ছেড়েছে।

ণ. জেলার গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

ভোলা সরকারি হাইস্কুল

প্রথমদিকে এটি আধা-সরকারি স্কুল হিসেবে স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। ১৯১৯ সালে এটি সরকারি স্কুলের মর্যাদা লাভ করে। ১৯২৫ সাল পর্যন্ত লেখাপড়া হতো বর্তমান জেলা সদর ডাকঘর ও কো-অপারেটিভ ব্যাংকের মাঝে অবস্থিত টিনের ছাউনি দেওয়া কয়েকটি ছোট ছোট ঘরে। স্কুলের বর্তমান অবস্থানের কাছেই অবস্থিত লাটমন জনসন মুসলিম হোস্টেলেও কিছুদিন পড়াশোনা হয়। পরবর্তীকালে বর্তমানের এই অত্যন্ত মনোহর স্কুল ভবনটি নির্মাণ করা হয়। সে সময়ে এর নির্মাণে ব্যয় হয়েছিল ৭৮,০০০/-(আটাত্তর হাজার) টাকা।

দেশের অনেক খ্যাতনামা প্রশাসক, আমলা, রাজনীতিবিদ, চিকিৎসক, শিক্ষক, আইনজীবী, বিচারপতি, কবি, লেখক, গবেষক, সাংবাদিক ও সংস্কৃতিকর্মী এই স্কুলের ছাত্র ছিলেন।

জেলা বালিকা স্কুল, ভোলা

প্রতিষ্ঠাকাল : ১৯২৮। বরিশালের তৎকালীন জেলা প্রশাসক ই.এন. ব্র্যান্ডির সহযোগিতায় স্কুলটির প্রতিষ্ঠা। ১৯৫৮ সালে হাইস্কুলে উন্নীত হওয়ার পূর্বে এটি এম.ই. স্কুল হিসেবে পরিচালিত হয়। ১৯৬৮ সালে স্কুলটি সরকারি স্কুলের মর্যাদা লাভ করে।

এ. রব হাইস্কুল, ভোলা

প্রতিষ্ঠাকাল : ১৯০৫। এ সময়ে স্কুলটি জুনিয়র মাদ্রাসা হিসেবে গড়ে ওঠে। পরবর্তীকালে ১৯১৩ সালে স্থানীয় বিদ্যানুরাগী জনগণ ও জৌনপুরের পীর সাহেবের আন্তরিক ও অক্লান্ত পরিশ্রমে এটি সিনিয়র মাদ্রাসায় উন্নীত হয়। এরপর পাঠ্যক্রমের বিষয় নিয়ে সৃষ্ট অনেক মতবিরোধ ও দ্বন্দ্বের অবসানের পর ১৯৬০ সালে এ. রব হাই মাদ্রাসা (আবদুর রব হাই মাদ্রাসা) কাম হাইস্কুলে এবং ১৯৬২ সালে এ. রব হাইস্কুলে

www.pathagar.com

রূপান্তরিত হয়। এক্ষেত্রে জৌনপুরের বিখ্যাত আধ্যাত্মিক সাধক ও ইসলামী চিন্তাবিদ মওলানা কেরামত আলী সাহেবের পৌত্র মওলানা আবদুর রব (র.), খান বাহাদুর নূরুজ্জামান, দরবেশ আলী মহাজন, মোহাম্মদ আলী পণ্ডিত ও স্থানীয় জনগণের অবদান অপরিসীম। মওলানা আবদুর রব জৌনপুরী (র.) তখন এ অঞ্চলের মানুষের আধ্যাত্মিক গুরু ও পীরে মোর্শেদ। তাই তাঁর নামানুসারে এই মাদ্রাসার নামকরণ হয় এ. রব হাই মাদ্রাসা, যা পরবর্তীকালে এ.রব হাই মাদ্রাসা-কাম স্কুলে পরিবর্তিত হয়। বিশিষ্ট দানবীর হাজী দরবেশ আলী মহাজন এই মাদ্রাসা, সংসংলগ্ন মসজিদ ও পুকুর এবং ঈদের জামাত অনুষ্ঠানের জন্য (ঈদগাহ) প্রয়োজনীয় জমি দান করেন। শুধু তাই নয়, এসব প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার জন্যও তিনি তাঁর লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করে দেন।

পরানগঞ্জ হাইস্কুল, পরানগঞ্জ, ভোলা

প্রতিষ্ঠাকাল : ১৯১১। 'জাতীয় মঙ্গল'-এর কবি মোজাম্মেল হক এই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা। এটি প্রথমে নিম্ন প্রাইমারি ও পরবর্তীকালে মাধ্যমিক পর্যায়ে উন্নীত হয়।

টাউন কমিটি উচ্চ বিদ্যালয়, ভোলা

এই স্কুলটি একসময়ে বর্তমান অবসর সিনেমা হলের পাশে ছিল। তখন ছিল প্রাইমারি স্কুল। ১৯৫৮ সালে স্কুলটি জুনিয়র হাইস্কুল ও ১৯৭১ সালে হাইস্কুলে উন্নীত হয়। অশোক কুমার গুপ্ত ও নলিনী ভূষণ গুপ্ত নামে দুই ভাই বর্তমান স্থানে স্কুলটি স্থানান্তরের জন্য ৮৪ একর জমি দান করেন।

মাছুমা খানম বালিকা বিদ্যালয়, ভোলা

প্রতিষ্ঠাকাল : ১৯৬৯। ভোলার সাবেক সংসদ সদস্য, প্রতিমন্ত্রী, নাট্যকার, গল্পকার ও শক্তিমান অভিনেতা সদ্য প্রয়াত মোশারেফ হোসেন শাজাহান ও তাঁর পিতা আলতাজের রহমান তালুকদার এই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা। এই পরিবারের আর্থিক অনুদানেই স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

হাজিপুর সিনিয়র মাদ্রাসা, দৌলতখান

প্রতিষ্ঠাকাল : ১৯১২। তৎকালে সমগ্র বরিশাল জেলার প্রথম মাদ্রাসা হিসেবে পরিচিত। এই এলাকার শিক্ষার অন্যতম পথিকৃৎ 'বড় হুজুর' নামে সমধিক পরিচিত মৌলভী আবদুর রহিম কর্তৃক স্থাপিত একটি মক্তবই কালক্রমে এই সিনিয়র মাদ্রাসায় উন্নীত হয়। এই মাদ্রাসার পাঠ্যক্রম শুধু ইসলাম ও ধর্মবিষয়ক কেতাবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, আধুনিক শিক্ষা-সংস্কৃতি এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মৌলভী আবদুর রহিম বাংলা, ইংরেজি ও অংক বিষয়কেও পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করেন। এক সময়ে নোয়াখালী, ফরিদপুর, পটুয়াখালী, বরিশাল প্রভৃতি জেলা থেকেও ছাত্ররা এখানে এসে শিক্ষালাভ করতো।

শুধু ধর্মীয় শিক্ষার ক্ষেত্রেই নয়, স্বদেশী আন্দোলন, কৃষক প্রজা আন্দোলন ও ঋণ সালিসি আইন বাস্তবায়নেও এই মাদ্রাসার ভূমিকা অবিস্মরণীয়।

www.pathagar.com

ভোলা আলীয়া মাদ্রাসা, ভোলা

প্রতিষ্ঠাকাল : ১৯২৫। যুগীর ঘোলে স্থাপিত এ. রব মাদ্রাসায় শিক্ষা-পদ্ধতি নিয়ে সৃষ্ট দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও মতবিরোধের ফলে জন্মলাভ করে আরেকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান–ভোলা আলীয়া মাদ্রাসা। এই মাদ্রাসাটির জন্য প্রয়োজনীয় জমি দান করেন হাজী আবদুল করিম তালুকদার।

দৌলতখান হাইস্কুল, দৌলতখান

প্রতিষ্ঠাকাল : ১৯১৬। প্রথমদিকে এটি জুনিয়র হাইস্কুল ছিল। ১৯২২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়ার অনুমোদন লাভ করে। ব্যাপক নদী ভাঙনের কবলে পড়ে ১৯৪৫ সালের দিকে স্কুলটি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেলে পরবর্তীকালে একে সৈয়দপুরে স্থানান্তর করা হয়।

বোরহানউদ্দিন হাইস্কুল, বোরহানউদ্দিন

প্রতিষ্ঠাকাল : ১৯০৭। প্রথমদিকে এটি মাইনর স্কুল ছিল। ১৯১৭ সালে হাইস্কুলে উন্নীত হয়।

আলীয়া মাদ্রাসা, রানীগঞ্জ, বোরহানউদ্দিন

প্রতিষ্ঠাকাল : ১৯২১। এই মাদ্রাসাটির জন্য প্রয়োজনীয় ৮.১৬ শতাংশ জমি দান করেন জনাব আবদুল জলিল। প্রতিষ্ঠার পর দু'বার নদী ভাঙনের শিকার হলে মাদ্রাসাটি বর্তমান স্থানে স্থানান্তর করা হয়।

লালমোহন হাইস্কুল, লালমোহন

প্রতিষ্ঠাকাল : ১৯১৬। ১৯৩৮ সালে হাইস্কুলের মর্যাদা লাভ। তখন স্কুলটির নাম ছিল চন্দ্রমোহন ইনস্টিটিউট। পরবর্তীকালে স্থানের নামানুসারে স্কুলটির নামকরণ করা হয়।

দেউলা আর. এ. হাইস্কুল, দেউলা

প্রতিষ্ঠাকাল : ১৯২৮। প্রথমে এটি মধ্য ইংরেজি স্কুল, পরবর্তীকালে ১৯৬০ সালে জুনিয়র হাইস্কুল এবং ১৯৬৩ সালে হাইস্কুলের মর্যাদা লাভ করে। এই স্কুলটি নির্মাণের জন্য প্রথমে জমি দান করেন রজ্জব আলী মৃধা নামে একজন বিদ্যোৎসাহী। আসমত আলী মোসলমান, কালু দালাল প্রমুখ বিদ্যানুরাগী ব্যক্তির উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় স্কুলটি প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হয়।

মৃজাকালু হাইস্কুল, মৃজাকালু

প্রতিষ্ঠাকাল : ১৯৩২। প্রথমদিকে এমই স্কুল ও পরে হাইস্কুলে উন্নীত হয়। এই স্কুল প্রতিষ্ঠায় সর্বতোভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেন শাহ্ খলিলুর রহমান, হাজী বজলুর রহমান, মনমোহন দাস, আবদুল করিম মুন্সি, মৌলভী আহমদ উল্লাহ ও হাজী নজির আহমদ পাটোয়ারী। পরবর্তীকালে স্কুলটিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেন তৎকালীন প্রধান শিক্ষক আবদুল হান্নান চৌধুরী।

www.pathagar.com

গজারিয়া হাইস্কুল, লালমোহন

প্রতিষ্ঠাকাল : ১৯১২। প্রথমদিকে এটি ছিল পণ্ডিত অশ্বিনীকুমার পরিচালিত একটি পাঠশালা। পরবর্তীকালে এটি জেলা বোর্ডের অধীনে বোর্ড স্কুল নামে পরিচিতি লাভ করে। ১৯৪৬-এর দিকে মাইনর স্কুল এবং ১৯৫০ সালে হাইস্কুলে উন্নীত। এই স্কুল পাঠশালা থেকে উন্নীত হয়ে মাইনর স্কুল এবং পরবর্তী পর্যায়ে হাইস্কুলে উন্নীত হওয়ার পেছনে হাজী কালা মিয়া, সোনা মিয়া, হাজী মোহাম্মদ আসলাম, মৌলভী আবদুল আজিজ পঞ্চায়েত, হীরালাল পাল, অনুকূল ঘোষ প্রমুখের অসামান্য অবদান রয়েছে।

টাফনেট ব্যারেট (টি.বি.) হাইস্কুল, চরফ্যাশন

প্রতিষ্ঠাকাল : ১৯৩২। প্রথমদিকে এম.ই. স্কুল এবং ১৯৪৬ সালে হাইস্কুলে উন্নীত হয়। ১৯৩৬ সালে বরিশালের তৎকালীন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট টাফনেট ব্যারেট এর নামানুসারে স্কুলটির নামকরণ হয় টাফনেট ব্যারেট (টি.বি) হাইস্কুল। স্কুলটির প্রথম প্রধান শিক্ষক আবদুল হক এম.এ. বি.টির. দৃঢ় ও আন্তরিক পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে স্কুলটিতে সহ-শিক্ষা চালু হয় এবং এই অঞ্চলের অসংখ্য শিক্ষানুরাগী বালিকার শিক্ষালাভের পথ প্রশস্ত হয়।

কারামতিয়া আলীয়া মাদ্রাসা, চরফ্যাশন

প্রতিষ্ঠাকাল : ১৯৪৫। মাওলানা আবদুল খায়ের ও মাওলানা সালাহ্উদ্দিন আহমদের উদ্যোগে এই মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। জৌনপুরের পীরে কামেল হযরত মাওলানা কেরামত আলী (র.)-এর নামানুসারে এই মাদ্রাসার নামকরণ হয়। মাওলানা নাসির আহমেদ, ওয়াহেদ আলী মালতিয়া ও মাওলানা কলিমউল্লাহ্ এই মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠায় প্রভূত অবদান রাখেন। এক একর ৭২ শতাংশ জমির ওপর মাদ্রাসা, মাদ্রাসা সংলগ্ন মসজিদ ও ঈদগাহ্টি প্রতিষ্ঠিত।

ভোলা কলেজ, ভোলা

প্রতিষ্ঠাকাল : ১৯৬২। তৎকালীন মহকুমা প্রশাসক এম.এ. আজিজের অক্লান্ত প্রচেষ্টা ও স্থানীয় জনগণের অপরিসীম উৎসাহ-উদ্দীপনায় প্রতিষ্ঠিত হয় বহু কাঙ্ক্ষিত এই কলেজ। এই কলেজ প্রতিষ্ঠায় সর্বাধিক অবদান রাখেন আলহাজ খুরশিদ আলম, হাবিবুর রহমান তালুকদার, সাহেব আলী দারোগা, মোখলেসুর রহমান ও মো. সিদ্দিক ডিলার। কলেজের প্রথম অধ্যক্ষের পদ অলংকৃত করেন মোঃ আবদুল হক এম.এ. (দর্শন) বি.টি। পনেরো একর ষাট শতাংশ জমির ওপর রয়েছে কলেজ ভবন, প্রশাসনিক, ভবন, খেলার মাঠ, ছাত্রাবাস, একটি বড় পুকুর ও মসজিদ।

ফজিলাতুন্নেসা মহিলা কলেজ, ভোলা

প্রতিষ্ঠাকাল : ১৯৭২। উনসত্তুরের ছাত্র আন্দোলনের পুরোধা ও ভোলার কৃতীসন্তান তোফায়েল আহমদ ও ভোলার আওয়ামী লীগ নেতা শামসুদ্দিন আহমদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সহধর্মিনীর স্মৃতি অম্লান করে রাখার জন্য কলেজটির নামকরণ হয় ফজিলাতুন্নেসা মহিলা কলেজ।

www.pathagar.com

নাজিউর রহমান কলেজ, পরানগঞ্জ, ভোলা

প্রতিষ্ঠাকাল : ১৯৮৬। বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী ও ভোলার কৃতীসন্তান নাজিউর রহমানের একক প্রচেষ্টা ও অর্থানুকূল্যে কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি চার একরেরও অধিক জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত।

আলতাজের রহমান কলেজ, ভোলা

প্রতিষ্ঠাকাল : ১৯৯৪। বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও প্রাক্তন প্রতিমন্ত্রী, নাট্যকার, গল্পকার ও নাট্যাভিনেতা মোশারেফ হোসেন শাজাহান, ভোলা পৌরসভার সাবেক চেয়ারম্যান গোলাম নবী আলমগীর এবং বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক গোলাম কিবরিয়া জাহাঙ্গীর ভ্রাতৃত্রয়ের অর্থানুকূল্যে ৪.৯ একর জমির ওপর কলেজটি প্রতিষ্ঠিত। ১৯৯৯ সালে এটি ডিগ্রি কলেজে উন্নীত হয়।

আবি আবদুল্লাহ কলেজ, দৌলতখান

প্রতিষ্ঠাকাল : ১৯৮৩। দৌলতখানের কৃতীসন্তান সাবেক পাকিস্তান পুলিশের ডিআইজি এবং অত্যন্ত সৎ অফিসার হিসেবে খ্যাত আবি আবদুল্লাহর (মতান্তরে আবু আবদুল্লাহ) অর্থে কলেজটির প্রতিষ্ঠা। আবি আবদুল্লাহ কল্যাণ ট্রাস্ট থেকে কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করা হয়।

পরে তাঁর নামেই কলেজটির নামকরণ হয়। কলেজ প্রতিষ্ঠায় এলাকার কৃতীসন্তান অধ্যক্ষ মোঃ জাকির হোসেন এবং স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ফতেহ্ জং চৌধুরী ওরফে ছুবা মিয়া, এফকেএম ইব্রাহীম মিয়া, মো. ওবায়দুল হক, ভোলার প্রবীণ সাংবাদিক মোহাম্মদ আবু তাহের, আবদুল গফুর মিয়া, মো. মোয়াজ্জেম হোসেন (ছোট মিয়া), মোঃ হাতেম মিয়া, প্রয়াত সেলিম মিয়া প্রমুখ বিশেষ অবদান রাখেন।

নলিনী দাস হোমিও মেডিক্যাল কলেজ, ভোলা

প্রতিষ্ঠাকাল : ১৯৮১। ব্রিটিশ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সৈনিক ও বিপ্লবী, ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক 'ভয়ানক বিপ্লবী' হিসেবে চিহ্নিত ভোলার কৃতীসন্তান নলিনী দাসের দানকৃত জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় এই কলেজ ও হাসপাতাল। এটি প্রতিষ্ঠায় অসামান্য অবদান রাখেন এই কলেজের প্রতিষ্ঠাতা-অধ্যক্ষ প্রবীণ হোমিও চিকিৎসক ডা. নূরুল ইসলাম, সি.এম. হামিদ, অধ্যাপক নাসিরউদ্দিন খান, মোফাজ্জল হোসেন শাহীন ও তৎকালীন জেলা প্রশাসক মো. সাইফউদ্দিন প্রমুখ।

আবদুল জব্বার কলেজ, বোরহানউদ্দিন

প্রতিষ্ঠাকাল : ১৯৭২। আবদুল জব্বার মিয়া ছিলেন একসময়ে এই এলাকার জমিদার। তাঁরই ওয়াকফ এস্টেটের সম্পত্তি থেকে ৪০ একর জমি ও নগদ ৩০ হাজার টাকা অনুদানের ওপর নির্ভর করেই প্রতিষ্ঠিত হয় এই কলেজ। তৎকালীন সার্কেল অফিসার আজিজুল ইসলাম কলেজটি প্রতিষ্ঠায় বিশেষ অবদান রেখেছেন। এছাড়াও জমি, অর্থ ও অন্যান্য বিষয়ে সাহায্য-সহযোগিতা করে বিশেষ অবদান রাখেন আলহাজ মজিবুল হক চৌধুরী, রেজা এ করিম চৌধুরী (চুন্নু মিয়া), ফখরুল আলম চৌধুরী, শামসুদ্দিন চৌধুরী,

www.pathagar.com

নাজিমুদ্দিন চৌধুরী, মনিরুল আলম চৌধুরী ও তরিকুল ইসলাম চৌধুরী। কলেজটির উন্নয়নে সর্বতোভাবে সাহায্য করেন বলুমিয়া ভূঁইয়া, সাদেক আহমদ ভূঁইয়া (ছাদু ভূঁইয়া), ওয়াহিদ ভূঁইয়া, ডা. সৈয়দ আহমদ, প্রাণকুমার দাস, আজিজুল ইসলাম মিয়া (সাজু মিয়া), নসু মিয়া তালুকদার প্রমুখ।

ফাতেমা খানম কলেজ, বাংলাবাজার

প্রতিষ্ঠাকাল : ১৯৯৭। জেলা সদর থেকে ১১ কিলোমিটার দক্ষিণে বাংলাবাজারে ৩ একর জমির ওপর কলেজটি প্রতিষ্ঠিত। খ্যাতনামা রাজনীতিবিদ ও প্রাক্তন মন্ত্রী তোফায়েল আহমেদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায়ই কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর মাতা ফাতেমা খানমের নামানুসারে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই কলেজ।

ফাতেমা-মতিন মহিলা মহাবিদ্যালয়, চরফ্যাশন

প্রতিষ্ঠাকাল : ১৯৯৩। বিশিষ্ট সমাজসেবী ও বিদ্যোৎসাহী আবদুল মতিন ও তাঁর স্ত্রী বেগম ফাতেমা মতিন প্রদত্ত ৭.২০ একর জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় এই কলেজ। সে সময়ে এই জমির মূল্য ছিল প্রায় দুই কোটি টাকা।

শাহবাজপুর কলেজ, লালমোহন

প্রতিষ্ঠাকাল : ১৯৬৮। মোগল শাসনামলে বাংলার সুবেদার শাহবাজ খানের (যাঁর নামানুসারে ভোলার নামকরণ হয়েছিল দক্ষিণ শাহবাজপুর) স্মৃতিকে অম্লান করে রাখার জন্য কৃতজ্ঞ লালমোহনবাসী এই কলেজের নামকরণ করেন 'শাহবাজপুর কলেজ'। কলেজটি প্রতিষ্ঠায় সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন খ্যাতনামা রাজনীতিবিদ ও সমাজসেবী ডা. আজহার উদ্দিন, আবদুর রশিদ মাস্টার, মোখলেছুর রহমান, মৌলভী মকবুল আহমদ প্রমুখ।

ওবায়দুল হক মহাবিদ্যালয় ভোলা

বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা প্রয়াত ওবায়দুল হকের নামে কলেজটি প্রতিষ্ঠিত। ভূমি মন্ত্রণালয় কলেজটির জন্য ৭৫ একর ভূমি বন্দোবস্ত প্রদান করে।

ত. ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান

ভোলা সদর উপজেলা

বড় মসজিদ

ভোলার 'বড় মসজিদ' নামে খ্যাত মহাজন পট্টিতে অবস্থিত মসজিদটির গোড়াপত্তন করেন কাইমুদ্দিন ব্যাপারী। তিনিসহ আরো তিনজন ব্যাপারী তখন ভোলা জেলা শহর নিয়ন্ত্রণ করতেন। অপর তিনজন ব্যাপারী হলেন—কিয়ামউদ্দিন ব্যাপারী, আবদুল করিম ব্যাপারী ও রসুমুদ্দিন ব্যাপারী।

পাকিস্তান আমলে অনেক রাজনৈতিক নেতা তাদের বক্তব্য রাখার জন্য এই মসজিদের আঙিনা বেছে নিতেন। মওলানা ভাসানীও একবার এখানে এসে বক্তৃতা

www.pathagar.com

করেছিলেন। এই মসজিদের কাছেই সে সময় স্বদেশী আন্দোলনের স্থানীয় নেতাকর্মীদের কার্যালয় ছিল এবং সেখানে তাঁদের শিক্ষা দেওয়া হতো শাড়ি, লুঙ্গি ও গামছা বোনা।

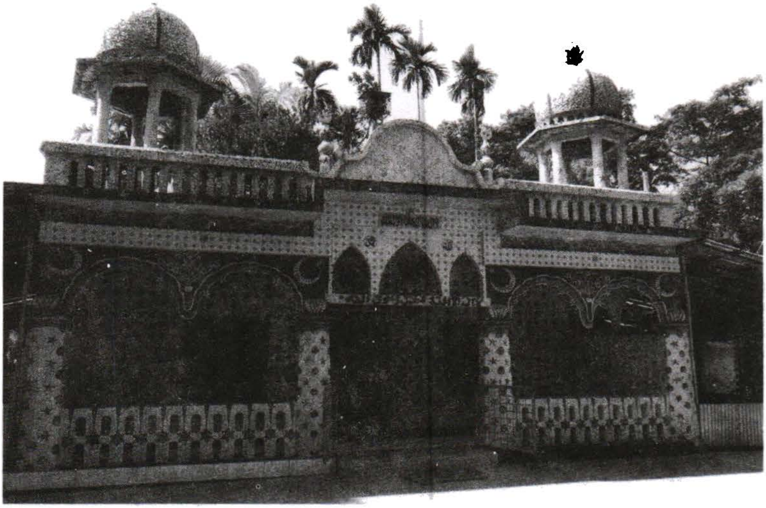

ভোলার বড় মসজিদ

জৌনপুরী পীর সাহেবদের বিশ্রামাগার

ভোলা জেলার অধিকাংশ মুসলমানই কোনো না কোনো পীরের মুরিদ বা ভক্ত। এখানে জৌনপুর, শর্ষিনা, আটরশি, চরমোনাই, ভোলা, চরপাতা প্রভৃতি স্থানের পীরদের যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। তবে যতদূর জানা যায়, এখানে উনিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকেই ভারতের জৌনপুরী পীরের সর্বব্যাপী প্রভাব। ভোলার যুগীর ঘোলে জৌনপুরী পীররা যে বিশ্রামাগার বা আস্তানাটি রয়েছে, প্রায় শতাধিক বছর পূর্বে এটি নির্মাণ করেন প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, দার্শনিক ও কামেল হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলির (র.) অন্যতম প্রধান শিষ্য বিশেষ 'কারামত' বা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী জৌনপুরের হযরত মওলানা কেরামত আলীর (র.) দৌহিত্র হযরত মওলানা আবদুর রব (র.) জৌনপুরী। ভোলা জেলার প্রায় ৯টি স্থানে হুজুরদের এ ধরনের বিশ্রামাগার রয়েছে। বিভিন্ন সময়ে এ বিশ্রামাগারে গদ্দিনশীন পীরের অবস্থানকালে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে প্রতিদিন হাজার হাজার ভক্ত একটু দোয়া ও পানি পড়া নেওয়ার আশায় ভিড় জমান, তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তাঁদের জন্য মানত করা গরু, ছাগল, মুরগি, কবুতর, বিভিন্ন ফসল, ফল ইত্যাদি প্রদান করেন। এই হুজুরদের প্রতি রয়েছে মানুষের সীমাহীন শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। জৌনপুরী হুজুরগণ আগে চার বেহারার পালকিতে চড়ে ভোলার বিভিন্ন স্থানে মুরিদ ও ভক্তদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তওবা পড়াতেন। বর্তমানে তারা

www.pathagar.com

পালকির পরিবর্তে মুরিদদের গাড়ি ব্যবহার করেন। তবে পূর্ব-পুরুষদের স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে দুটি পালকি দৌলতখানে রয়েছে।

ওয়াজির আলী শাহ্ করণী বা উজির আলী (র.)-এর দরগাহ

প্রখ্যাত সুফী সাধক ওয়াজির আলী শাহ্ (র.) (উজির আলী শাহ নামে সমধিক খ্যাত)-এর ভোলায় আগমন ১৮৭৬ সালের দিকে। কেউ কেউ বলেন, তিনি বিশিষ্ট বুজুর্গ ওয়ায়েছ করণী (র.)-এর বংশধর এবং তিনি ইয়েমেন থেকে এই দ্বীপাঞ্চলে আসেন। শোনা যায়, তিনি নগ্ন থাকতেন বলে জৌনপুরের পীররা তাঁকে এখানে বসতি গড়তে নিষেধ করেছিলেন। ওয়াজির আলী শাহ্ প্রভূত অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন বলে জনশ্রুতি রয়েছে। এমনও শোনা যায় যে, তিনি নাকি তার নাড়ি-ভুঁড়ি খুলে নদীর পানিতে পরিষ্কার করে পুনঃস্থাপন করতেন।

ওয়াজির আলী সারা শহরময় ঘুরে বেড়াতেন। একটি দোয়াত-কলম তিনি সবসময় সঙ্গে রাখতেন আর শহরের মানুষকে এক পয়সার খাজনা আদায়ের প্রাপ্তি স্বীকারপত্র লিখে দিতেন। তাঁর দোয়াতে কোনোদিন নাকি কালি দেওয়ার প্রয়োজন হয়নি, সবসময়ই কালিতে পূর্ণ থাকতো।

উজির আলী দরগাহ মহাজনপট্টি, ভোলা

ঢাকার দোহার উপজেলার সাইনপুকুরের মিয়াদের ব্যবসায়িক দফতর (গদি ঘর)-এর কাছেই থাকতেন ওয়াজির আলী শাহ্। মিয়ারা ছিলেন এই অঞ্চলের বিরাট এলাকার জমিদার। ১৯৪০ সালের দিকে করণী শাহ্ মৃত্যুবরণ করলে সাইনপুকুরের

www.pathagar.com

মিয়ারা তাঁর মাজারের জন্য জমি দান করেন। পরবর্তীকালে ১৩২০ সনে এখানে তাঁর মাজারকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে মাইজ ভান্ডারি তরিকার দরগাহ। এই দরগাহ্ এলাকার মধ্যে আরো রয়েছে ওয়াজির আলী শাহ করণীর (র.) সমসাময়িক সৌদি আরব থেকে আগত আধ্যাত্মিক সাধক রসুল বক্‌শ, করণী সাহেবের খাদেম রহিম বখ্‌শ, মাইজ ভাণ্ডারের মুরিদ ওসমান মোল্লা ও নানীবুড়ির কবর। এখানে আরো রয়েছে জমির মালিক ও সাইনপুকুরের সোনা মিয়াদের কবর, দুলা মিয়া ফকির ও পাগলা কাঞ্চনের কবর।

ওয়াজির আলী শাহ (র.)-র দরগা শরিফের সঙ্গেই রয়েছে মসজিদ। এখানে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের জামায়াত হয়। শরিয়ত ও মারেফত—উভয় রীতির প্রচলন রয়েছে এখানে। প্রতি বছর ফাল্গুনের ২৭, ২৮ ও ২৯ এই তিন দিন ওরস মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এ সময়ে ওয়াজির আলী শাহর (র.) হাজার হাজার ভক্ত ও ধর্মপ্রাণ মুসলমানের সমাগম ঘটে। এদের মধ্যে থাকেন গায়ক, সাধক, ব্যবসায়ী প্রভৃতি শ্রেণি-পেশার মানুষ। দরগায় এসে তারা তাদের বিভিন্ন মনোষ্কামনা পূরণের প্রত্যাশা করে। এ সময়ে অনেক গরু-মহিষ জবাই করে ভক্তদের খাওয়ানো হয়। সনাতন ধর্মের অনেক অনুসারীও এই মাজারে তাদের মনোবাসনা পূরণের আশায় এসে থাকেন।

এই ওরস শুরু হওয়ার দু'একদিন আগে থেকেই ভোলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এখানে প্রায় শতাধিক বাউলের সমাগম ঘটে। তারা এখানে অবস্থান করে মুর্শিদী, মারফতীসহ বিভিন্ন ধরনের মরমি গান পরিবেশন করে থাকেন।

দুদু মিয়া ফকিরের মাজার

ভোলার অতিপরিচিত ফকির দুদু মিয়া ফকির। তাঁকে চিনতেন না বা সরাসরি তাঁকে দেখেননি, এমন মানুষ ভোলাতে পাওয়া যাবে না। ভোলার যুগীর খোল এলাকা থেকে শুরু করে উকিল পাড়া, অফিসার পাড়া, নতুন বাজার, গাজীপুর রোড, মহাজন পট্টি, কালীনাথ বাজার প্রভৃতি এলাকায় তিনি চলাফেরা করতেন। তিনি এসব এলাকার রাস্তার পাশের ঘাস, লতা-পাতা, বন ইত্যাদি পরিষ্কার করতেন। সবসময় তিনি একা একা কথা বলতেন এবং কাউকে সামনে দেখলে বলতেন, 'বালা (ভালো) অইয়া যা, বালা অইয়া যা।' বিড়ি ও চায়ের প্রতি ছিল তাঁর ভীষণ আসক্তি। বিড়িতে আগুন থাকা না থাকার বিষয় ছিল না। তিনি টানতেই থাকতেন। বৃদ্ধাঙুলি ও তর্জনি দিয়ে বিড়িটিকে অদ্ভুতভাবে নাড়াচাড়া করতেন আর একটু পরপর মুখে দিয়ে টানার ভঙ্গি করতেন। কেউ কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিড়িতে আগুনও ধরিয়ে দিতো। বিভিন্ন সময়ে জাতীয় নির্বাচন কিংবা স্থানীয় নির্বাচনের সময় প্রার্থীরা তাঁর কাছে আশীর্বাদ নিতে আসতেন। ইনতেকালের পর তাঁকে উজির আলী শাহ্ দরগা কমপ্লেক্সে দাফন করা হয়।

দারুল হাবিব খানকাহ্

আধ্যাত্মিক সাধনার বিভিন্ন স্তরে বিচরণ করার যোগ্যতার অধিকারী হিসেবে খ্যাত ভোলার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ হযরত আবুবকর সিদ্দিকের (র.) অন্যতম খলিফা অধ্যাপক সুফী হাবিবুর রহমান কর্মজীবনে বহু খ্যাতনামা স্কুল ও কলেজে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষক হিসেবে সুনাম অর্জন করেন। তিনি আরবি ভাষায়ও বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। অবশেষে অসংখ্য মুরিদানের বৃহত্তর আকর্ষণে তিনি তাঁর অধ্যাপনা

www.pathagar.com

জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে হেদায়েতী কর্মসূচিতে আত্মনিয়োগ করেন। এই মহান আধ্যাত্মিক সাধক ৯৬ বছর বয়সে ঢাকার মাতুয়াইলের হাবিবনগরে মৃত্যুবরণ করেন এবং সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়। হাবিবনগরের এই বিখ্যাত স্থানটি বাংলাদেশে মোহাম্মাদীয়া তরিকার প্রধান কেন্দ্র। পীরে কামেল মোকাম্মেল কুতুবুল এরশাদ সুফী হাবিবুর রহমান এই তরিকার প্রবর্তক। দক্ষিণ মাতুয়াইলের হাবিবনগরে দারুল হবিব খানকা শরিফ ও ভোলার বাপ্তা রোডস্থ রহমান মঞ্জিলে প্রতি বছর ডিসেম্বর মাসের শেষ শুক্র, শনি ও রবিবার এবং বিশেষ তারিখে বার্ষিক ইসালে সওয়াব মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকা ছাড়াও সৌদি আরব, কাতার, লিবিয়া, গ্রিস, বাহরাইন, ইংল্যান্ড, আমেরিকা, পাকিস্তান ও ভারত থেকে তাঁর অসংখ্য মুরিদের আগমন ঘটে থাকে। এই মহান আধ্যাত্মিক সাধক একই তারিখে জন্ম ও মৃত্যু লাভ করেন (১৮ ফেব্রুয়ারি)।

পাতাবুনিয়ার পীর সাহেবের ইসালে সাওয়াব

পাতাবুনিয়ার পীর হযরত মওলানা ক্বারী ওসমান গণি (র.)-এর পূর্বপুরুষগণ দৌলতখানের চরপদ্মার বাসিন্দা ছিলেন। সমগ্র জেলায় তাঁর অসংখ্য মুরিদান ও ভক্ত ছিল। পীরের মৃত্যুর পর তাকে তাঁর প্রতিষ্ঠিত কওমী মাদ্রাসায়ে ওসমানিয়ার কাছে ওসমানিয়া জামে মসজিদের পাশে দাফন করা হয়। প্রতি বছর ফাল্গুন মাসের পাঁচ থেকে আট তারিখ পর্যন্ত এখানে বাৎসরিক ইসালে সাওয়াব-এর মাহফিল হয়ে থাকে।

সমেদ আলী ফকিরের দরগাহ্

ইলিশায় ভোলা-ইলিশা সড়কের ওপরে সর্দার বাড়ির কাছে এই আধ্যাত্মিক সাধকের দরগাহ্। প্রতি বছর ওরস অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন স্থান থেকে এসময় এখানে অনেক ফকিরের আগমন ঘটে।

দৌলতখান ঈদগাহ

জৌনপুরের হযরত মাওলানা কেরামত আলী (র.)-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র হযরত মাওলানা হাফেজ আহমদ (র.)-এর সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয় ভোলা জেলার ঐতিহাসিক দৌলতখান ঈদগাহ। ঈদুল ফিতরে দৌলতখান ঈদগাহে ও ঈদুল আজহায় ভোলার ঈদগাহ ময়দানে তিনি নামাজ পড়াতেন। ভোলা জেলার লক্ষ লক্ষ মুসলমান তাঁর ও তাঁর উত্তরসূরীদের পেছনে নামাজ আদায়ের উদ্দেশ্যে এই দিন দুটির জন্য সারা বছর ধরে অপেক্ষা করতো। এই রেওয়াজ দীর্ঘদিন প্রচলিত ছিল। দৌলতখানের ঈদগাহের জামাত ছিল ভোলার সর্ববৃহৎ ঈদের জামাত। উভয় ঈদগাহ্র অনতিদূরে নির্মিত বিশ্রামাগারে অবস্থানকালে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সব সম্প্রদায়ের মানুষ দোয়া ও পানি পড়ার জন্য পীরদের যাতায়াতের পথে ও বিশ্রামাগারের সামনে ভিড় জমাতো।

তজুমুদ্দিন উপজেলা

শ্রী শ্রী অচ্যুতানন্দ ব্রহ্মচারীর (অনিল বাবাজী) আশ্রম ও মেলা

বৈরাগ্য সাধনের মধ্যেই মুক্তির আস্বাদ খুঁজে পেয়েছিলেন তজুমুদ্দিন উপজেলার শম্ভুপুর গ্রামের সনাতন ধর্মানুসারীদের মহান অবতার আধ্যাত্মিক মহাসাধক শ্রীশ্রী অচ্যুতানন্দ

www.pathagar.com

ব্রহ্মচারী ওরফে অনিল বাবাজী। সংসার-ধর্ম পালন কিংবা বিষয় ভোগের প্রতি ছিল তাঁর প্রচণ্ড অনীহা ও অনাসক্তি। একসময় 'সাধন-ভজন-নিষ্ঠা-আচরণ-ভক্তি ও প্রেমে' যখন তিনি ষোল কলায় পূর্ণ হয়ে উঠলেন, তখন তাঁর মধ্যে প্রেমবিকার ও প্রেমভাব দর্শন করে সবাই নিশ্চিত হলেন যে, তাঁর সন্ন্যাস গ্রহণের সময় এসে গেছে। তাঁর মা পরশমণিও ব্যর্থ হলেন পার্থিব প্রেমবন্ধন দিয়ে তাঁকে সংসারের বাঁধনে বেঁধে রাখতে।

শ্রী শ্রী অচ্যুতানন্দ ব্রহ্মচারী (অনিল বাবাজি)

এই অবতারের আবির্ভাবের পূর্বে ও পরে অনেক অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল বলে বিভিন্ন সূত্র ও স্থানীয় লোকজনের কাছ থেকে জানা যায়। সম্ভুপুর গ্রামের পরম ধার্মিক ও বৈষ্ণব মা পরশমণি দে ও পিতা প্রসন্নকুমার একদিন সন্ধ্যায় ঠাকুরঘরে পুজোয় ধ্যানমগ্ন থাকাকালে সেখানে স্থাপিত রাধাগোবিন্দের প্রতিমা থেকে আকস্মিকভাবে একটি উজ্জ্বল আলোকছটা পরশমণির পেটে পড়লে প্রেমবিদ্যুতের স্পর্শে তিনি সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি দিতে থাকেন। এমন সময় স্বামী প্রসন্নকুমার তাকে স্পর্শ করলে তিনিও একইভাবে প্রেমবিদ্যুতের আকর্ষণে মাটিতে পড়ে যান এবং উভয়ে 'রাধেকৃষ্ণ রাধেকৃষ্ণ' বলে মূর্চ্ছা যান। ঠিক এ সময়েই মাতা পরশমণির গর্ভে অবতার শ্রীশ্রী অচ্যুতানন্দের আগমন ঘটে। এই ঘরে যে একজন অবতারের আবির্ভাব হবে—অনেক জ্যোতিষীই এটা গণনা করে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। শ্রীশ্রী অচ্যুতানন্দের জন্মের আগে তাঁর মাতামহ স্বরূপ মজুমদার নবদ্বীপে তীর্থভ্রমণে গেলে তিনি মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য কর্তৃক আদিষ্ট হন যে, শম্ভুপুরে যেন তাঁর

www.pathagar.com

বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করা হয়। সেখান থেকে প্রেম, দয়া, নাম ও বৈষ্ণবীয় সেবাদানের মাধ্যমে শুরু হবে ক্লেদাক্ত জীবন ও তার পরিমণ্ডল থেকে জীবকে উদ্ধারের কার্যক্রম।

শ্রীশ্রী অচ্যুতানন্দ ব্রহ্মচারীর জন্ম ১৩৩৮ সনের ৩ কার্তিক, তজুমুদ্দিন উপজেলার শম্ভপুর গ্রামে। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় রীতি অনুসারে কার্তিক মাস হচ্ছে ভজন-কীর্তনের মাস। এই মাসেই অচ্যুতানন্দের জন্ম এই ইঙ্গিতই প্রদান করে যে, ভবিষ্যতে তিনি হরিনাম প্রচারে মহানায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন।

যতদূর জানা যায়, অনিল বাবাজী বিএ পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। তিনি সংস্কৃত ও ব্যাকরণ শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। স্মৃতিশাস্ত্র, ন্যায়শাস্ত্র এবং অন্যান্য শাস্ত্রেও তিনি অভিজ্ঞতা ও পারদর্শিতা অর্জন করেন। সেনাবাহিনীতেও কিছুদিন চাকরি করেন অনিল বাবাজী। সেখানে যোগ শিক্ষাদানকালে সেনাবাহিনী ত্যাগ করে শম্ভুপুর চলে আসেন এবং যোগসাধনায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। অনিল বাবাজী সুদীর্ঘ বারো বছর কোনো অন্ন গ্রহণ করেননি, তুলসি পাতার রস আর দুধ পান করে জীবনধারণ করেছেন।

শ্রীশ্রী অচ্যুতানন্দ বৃহ্মচারীর অলৌকিক কর্মকাণ্ড বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে প্রকাশ পায়। আধ্যাত্মিক সাধনার ষষ্ঠ মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর একদিন সন্ধ্যায় বাড়ির উঠানের দক্ষিণ দিকের নির্জন কুঁড়েঘরের চালের ওপর তিনি তাঁর মা ও মাসীকে রাধা-কৃষ্ণের প্রতিমা দর্শন করান। হঠাৎ তাঁরা লক্ষ্য করলেন, বাড়ির উঠানের দক্ষিণ দিক এক পূত পবিত্র জ্যোতিতে ঝলমল করে উঠেছে। আকাশ রক্তিম বর্ণ ধারণ করেছে। একটু পরেই তারা দেখলেন, যে ঘরটিতে বাবাজী ধ্যানমগ্ন ছিলেন, সেই ঘরের শীর্ষদেশে এসে আসন পেতে বসেছেন শ্রী রাধা-কৃষ্ণের যুগল মূর্তি। তাদের অপরূপ রূপলাবণ্য দর্শন করে তারা দুজনেই বাকরুদ্ধ হয়ে মাটিতে গড়াগড়ি যেতে থাকলেন।

শশাঙ্ক নামে এক ভক্ত ছিলেন শম্ভুপুর আশ্রমে। একদিন তাঁর এক পুত্র পুকুরে ডুবে গিয়ে জ্ঞান হারায়। আত্মীয়স্বজন তাকে সমাধিস্থ করার জন্য যাত্রা করলে তারা বাবাজীর সামনে পড়ে যান। ছেলেটির মায়ের বিলাপে বাবাজী বিচলিত হয়ে উঠলেন এবং বললেন, 'ওকে মহাপ্রভুর কাছে সঁপে দিয়ে ঘাটে শুইয়ে কীর্তন করতে থাকো। বাবার নির্দেশানুযায়ী তাই করা হলো। কয়েক ঘণ্টা পর সে জেগে উঠে কীর্তনবাক্য উচ্চারণপূর্বক নাচতে থাকে।

বাবাজীর অলৌকিক ক্ষমতা দর্শন করে ছেলেটির মা পাগলিনীর মতো তাঁকে খুঁজতে খুঁজতে মন্দিরে এসে দেখেন যে, তিনি মন্দিরে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় রয়েছেন।

একদিন মমিনপুর গ্রামের কতিপয় ভক্ত বাবাজীর কাছে এসে তাঁকে ঐ গ্রাম সফরের অনুরোধ জানালে তিনি সময় স্বল্পতার জন্য অপারগতা প্রকাশ করেন। তারাও নাছোড়বান্দা। তারা বললো যে, বাবাজীর জন্য তারা তাদের গাছের একটি কাঁঠাল মানত করেছিল। কাঁঠালটি এখন পেকে বাবার সেবার উপযোগী হয়েছে।

জবাবে বাবাজী জানালেন যে, তিনি তিন মাস পর তাদের গ্রাম সফরে যাবেন। আপাতত ঐ অবস্থায়ই কাঁঠালটি রেখে দেওয়ার জন্য বললেন। ভক্তরাও দেশে ফিরে গেল। অচ্যুতানন্দ বাবাজী ঠিক তিন মাস পরে মমিনপুর গ্রামের ঐ ভক্তের বাড়িতে

www.pathagar.com

গিয়ে উপস্থিত হয়ে নিজ হাতে কাঁঠালটি ভেঙে নিজে সামান্য গ্রহণ করে বাকিটা ভক্তদের মধ্যে বিতরণ করলেন। সবার কাছে মনে হয়েছিল যে, কাঁঠালটি মাত্রই পেকেছে এবং তার রসালো স্বাদও ছিল চমৎকার।

ঢাকায় এক ভক্তের বাড়িতে নাম-প্রেম প্রচারের জন্য অবস্থান করছিলেন বাবাজী। এ সময় তাঁর মাহাত্ম্য চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে তিন বামাচারী তান্ত্রিক গুরু তাঁকে পরীক্ষা করার জন্য বাবাজীর অবস্থানস্থলে উপস্থিত হয়। ঐ সময় বাবাজী ভেতরে আহ্নিকে বিভোর ছিলেন। বাবাজী আসছেন না দেখে তারা নিজেরাই ভেতরে প্রবেশ করে দেখেন যে, তিনি শূন্যের ওপর বসে ধ্যানে নিমগ্ন, আর তাঁর দেহের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে ঐশ্বিক জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। ঐ আলোতে ঝলমল করছে সারা ঘর। প্রভুর এই রূপ দর্শনে তারা দিশেহারা হয়ে মাটিতে পড়ে অবিরাম কাঁদতে থাকলেন।

ভোলার চকিঘাট থেকে জাহাজযোগে হাতিয়া-সন্দ্বীপ যাচ্ছিলেন কুতবা এলাকার এক বিদ্বান ব্রাহ্মণ তরুণ। জাহাজে ওঠার পর প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি হয়ে শুরু গেল। ভয়ংকর মেঘনা অতিক্রম করছিল জাহাজটি। কিন্তু ঝড়ে জাহাজের অবস্থা এমন হলো যে, বারবার মনে হচ্ছিল, এই বুঝি ডুবে যায় জাহাজ। তরুণ ব্রাহ্মণ জাহাজের এক কোণায় বসে রীতিমত কাঁদতে লাগলো আর বাবাজীর নাম স্মরণ করতে লাগলো। হঠাৎ বাবাজীর এক সহচর তার কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, ঠাকুর ভাই কোথায় যাবেন! বাবাজী তো এই জাহাজেই আছেন।

এ কথা শুনে ঠাকুর মশায় যেন সম্বিৎ ফিরে পেলেন এবং ঐ ব্যক্তির সঙ্গে গিয়ে বাবাজীকে দর্শনমাত্র জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। কিছুক্ষণ পরই নদীর প্রচণ্ড ঢেউ ও ঝড় থেমে গেল।

মনপুরা থেকে নৌকযোগে ভোলায় আসছেন অনিল বাবাজী। সঙ্গে অনেক সহচর ও ভক্ত। মেঘনার দুই-তৃতীয়াংশ পথ পার হতে না হতেই সমস্ত আকাশ ছেয়ে যায় কালো মেঘে। সঙ্গে সঙ্গে ভয়ংকর রূপ ধারণ করে প্রমত্তা মেঘনা। প্রচণ্ড ও উঁচু উঁচু ঢেউয়ের আঘাতে নৌকা প্রায় ডুবুডুবু। সবারই সলিল সমাধির আশংকা! তখন বাবাজী একটি কাসা হাতে নিয়ে নৌকার মাথায় এসে একা বসে বললেন, 'হে মেঘনা দেবী, তোমার সন্তানেরা তোমার এই রূপলীলা সইতে পারছে না। অনতিবিলম্বে তুমি তোমার শান্তরূপ প্রদর্শন করে ওদের কৃতার্থ করো! এরপরই তিনি উচ্চস্বরে কীর্তন শুরু করলেন :

জয় জয় রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ
মধুসূদন রাম নারায়ণ হরে।

এরপর শান্ত হয়ে আসে মেঘনা। এপারে আসার পর দেখা গেল চারদিকে বহু ঘর-বাড়ি, নৌকা উল্টে পড়ে আছে। কিন্তু প্রমত্তা মেঘনার তরঙ্গাঘাত ও ঝড়ের মধ্যেও বাবাজী এবং তাঁর ভক্ত ও সহচরদের বহনকারী নৌকাটি অক্ষত অবস্থায় তীরে এসে ভিড়ে।

সন্ন্যাস অবলম্বনের কিছুদিন পর শম্ভুপুরের স্বরূপ আশ্রমে এক রাজভোগের প্রস্তুতি চলছে। রান্না-বান্নার সমস্ত দায়িত্ব ঠাকুর ভাইয়ের ওপর ছেড়ে দিয়ে বাবাজী একটু দূরে কোথাও গিয়েছিলেন। ঠাকুর ভাই রান্না-বান্না শেষ করে ও ভোগ-কীর্তন শেষ করতেই

www.pathagar.com

বাবাজী এসে দূর থেকেই মৃদুস্বরে বললেন, 'ঠাকুর ভাই, প্রভুর আজ কী অপরাধ যে তাকে মিষ্টান্ন থেকে বঞ্চিত করলেন?' ঠাকুর ভাই কিছুই বুঝতে না পেরে তাঁর দিকে চেয়ে রইলেন।

ঘটনাটি তখনই স্পষ্ট হলো, প্রসাদ বিতরণ করার পর যখন দেখা গেল যে, মিষ্টান্ন প্রচণ্ডভাবে লবণাক্ত হয়ে আছে। লবণ ও চিনির পাত্র দুটি পাশাপাশি থাকায় ভুলবশত চিনির বদলে মিষ্টান্নে লবণ দেওয়া হয়। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, বাবাজী তো দূর থেকে এসেছেন, তিনি তো মিষ্টান্ন স্পর্শও করেননি তখনো। কিন্তু জানলেন কী করে? তখন সবার কাছেই স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, 'আধ্যাত্মিক মনকায়ায় তিনি এ-ভোগ' গ্রহণ করেছিলেন।

এমনি অজস্র অলৌকিক ঘটনার স্রষ্টা শ্রীশ্রী অচ্যুতানন্দ ব্রহ্মচারী। বৃন্দাবনধামে আহার ত্যাগ করে বাবাজীর সামনে ময়ূরের নৃত্য প্রদর্শন ও প্রণামের ভঙ্গিতে পেখম তুলে চলে যাওয়া, ভোলায় একবার মহামারি আকারে কলেরা দেখা দিলে বাবাজী একটি কীর্তনের দল গঠন করে ঢাক, ঢোল, করতাল ও কাসা নিয়ে ভক্তদের সঙ্গে করে পথে-প্রান্তরে, গ্রাম থেকে গ্রামে নাম বন্যার ঝড় বইয়ে দেওয়া এবং ধীরে ধীরে মহামারির মৃত্যুর থাবা নিস্তেজ হয়ে যাওয়া—এমনি আরো অনেক অলৌকিক ঘটনা অনিল বাবাজীর আধ্যাত্মিক জীবনকে করেছে সমৃদ্ধশালী।

শ্রীশ্রী অচ্যুতানন্দ ব্রহ্মচারী দেশে-বিদেশে বহু নতুন নতুন মন্দির নির্মাণ, সংস্কার ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এসব মন্দিরে সেবাইতদের বাসস্থান, নিত্যসেবা, পূজার ব্যবস্থা, বার্ষিক নাম সংকীর্তন ও বৈষ্ণব ধর্মীয় অনুষ্ঠানসমূহ উদ্‌যাপন করার জন্য তিনি একটি সচ্ছন্দ ও শৃঙ্খলাপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করে যান। শ্রীশ্রী অচ্যুতানন্দ ব্রহ্মচারী প্রতিষ্ঠিত ও পুনঃনির্মিত উল্লেখযোগ্য মন্দিরসমূহ হচ্ছে : ভোলা সদর উপজেলার বাপ্তা গ্রামে শ্রীশ্রী মহাপ্রভুর মন্দির, বোরহানউদ্দিন উপজেলার কুতবা গ্রামে শ্রীশ্রী মহাপ্রভুর মন্দির, তজুমুদ্দিন উপজেলার শম্ভুপুর গ্রামে শ্রীশ্রী স্বরূপ আশ্রম ও মন্দির, একই উপজেলার আড়ালিয়া-চাঁদপুর গ্রামে শ্রীশ্রী মহাপ্রভুর আশ্রম ও মন্দির, বোরহানউদ্দিন ভাওয়াল বাড়ির মন্দির এবং বোরহানগঞ্জে শ্রী শ্রী মহাপ্রভুর মন্দির। বাংলাদেশ ছাড়া ভারতের বিভিন্ন স্থানেও তিনি বেশ কয়েকটি মন্দির নির্মাণ ও সংস্কার কাজ সম্পন্ন করেন। ভারতের উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার বাদুড়িয়া থানার অন্তর্গত চণ্ডীপুর গ্রামে শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর মন্দির, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়গপুর রবীন্দ্রপল্লীতে শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর মন্দির, নবদ্বীপ ধামের ফাঁসিতলায় শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর মন্দির, বর্ধমানের পূর্ব সাহাপুরে শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর মন্দির, হুগলীর দ্বারপাড়ায় শ্রীশ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর মন্দির, উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার হাবড়ার কইপুকুরে শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর মন্দির এবং অশোক নগরের মমিনপুর পল্লীতে ১০ কাঠা জমির ওপর নির্মিত মন্দির বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১৪০৫ সনের ১০ ফাল্গুন মঙ্গলবার শ্রীশ্রী অচ্যুতানন্দ ব্রহ্মচারী বরিশালের ধর্মরক্ষিণী মন্দিরে দেহত্যাগ করেন। সভার সিদ্ধান্তক্রমে (বৈষ্ণবীয় মতে তাঁর ইচ্ছায়) তাঁকে ভোলার চাঁদপুর আড়ালিয়ায় সমাহিত করা হয়। তাঁকে দাহ না করে যোগাসনে বসিয়ে সমাহিত করা হয়।

www.pathagar.com

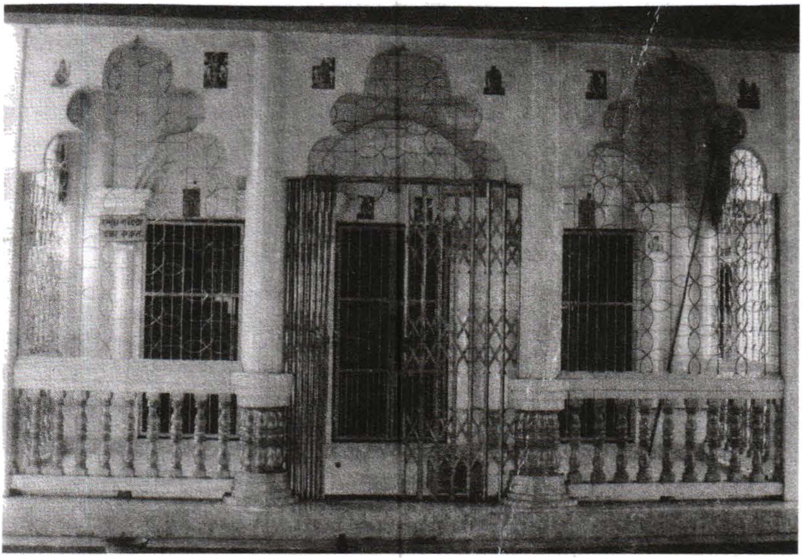

শ্রী শ্রী অচ্যুতানন্দ ব্রহ্মচারীর আশ্রম তজুমুদ্দিন

বোরহানউদ্দিন উপজেলা সদর থেকে চরফ্যাশন যাবার পথে কুঞ্জের হাট, পুরনো একটি বিশাল বাজার—দূরত্ব প্রায় ৮/১০ কিলোমিটার। বাসে যেতে সময় লেগে যাবে ২৫/৩০ মিনিট। কুঞ্জের হাট থেকে হাট শশীগঞ্জ যাওয়ার পথে মুচিবাড়ি মোড় থেকে ডানদিকে ৫/৬ কিলোমিটার গেলে অনিল বাবাজীর গোলকপুরের মন্দির। আবার মুচিবাড়ি মোড় থেকে ৮/৯ কিলোমিটার পূর্বদিকে গেলে আড়ালিয়া-চাঁদপুর সমাধি মন্দির। হাট শশীগঞ্জ থেকে দুই মন্দিরেই অটো টেম্পোতে যাওয় যায়।

অনিল বাবাজীর তিরোধান দিবস উপলক্ষে গোলকপুর ও আড়ালিয়া-চাঁদপুর উভয় মন্দিরেই প্রতিবছর ১–১০ ফাল্গুন ব্যাপক সমারোহের সাথে কীর্তন ও বন্দনা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এ উপলক্ষে এখানে এসে সমবেত হন লক্ষ লক্ষ নারী-পুরুষ, হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে। জেলার বাইরে থেকে, এমনকি ভারত থেকেও বাবাজীর ভক্ত ও অনুরাগীরা এসে সমবেত হন। ভক্তরা এক মন্দির থেকে আরেক মন্দিরে গিয়ে উপস্থিত হন— গোলকপুর থেকে আড়ালিয়া, আবার আড়ালিয়া থেকে গোলকপুর। কারো কোথাও বিশ্রাম নেই, ঘুম নেই। সর্বত্র বিরাজ করে পবিত্র প্রেমময় পরিবেশ। এ যেন সেই পবিত্র তীর্থস্থান—রাধাকৃষ্ণের প্রেমের লীলাক্ষেত্র বৃন্দাবন ধাম। স্থানে স্থানে স্থাপন করা হয় বিভিন্ন দেব-দেবীর বিগ্রহ। কীর্তন চলে দিনরাত—'জয় জয় রাধেকৃষ্ণ গোবিন্দ, মধুসুদন রাম নারায়ণ হরে।' উভয় মন্দিরেই বাবাজীর লক্ষ লক্ষ ভক্তকে আপ্যায়ন করা হয় দুধ, কলা, ফল আর প্রাতে পান্তাভাত দিয়ে। অভুক্ত থাকে না কেউ। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে নৌকাযোগে, বাসযোগে এবং বিভিন্নভাবে আসে বাবাজীর ভক্তদের জন্য অফুরন্ত খাবার। এ এক অলৌকিক ও অবিশ্বাস্য দৃশ্য!

www.pathagar.com

অনিল বাবাজীর তিরোধান দিবস উপলক্ষে আয়োজিত কীর্তন ও বন্দনা উৎসবকালে আড়ালিয়া-চাঁদপুর ও গোলকপুর উভয় স্থানেই বসে যায় স্বতঃস্ফূর্ত মেলা। হাজার হাজার লোকের সমাবেশ ঘটে থাকে এই মেলায়। এ সময়ে রসগোল্লা, দানাদার, জিলাপি-বাতাসা-কদমা থেকে শুরু করে সংসারের নিত্যব্যবহার্য আসবাবপত্র, বাচ্চাদের খেলনা, মাটির তৈরি ছোট বিভিন্ন দেব-দেবীর মূর্তি, বিভিন্ন দেব-দেবীর মুদ্রিত ছবি ইত্যাদির ছোট ছোট দোকান বসে যায়। এসব দোকানে স্বাভাবিকভাবেই প্রচুর ক্রেতা সমাগম ঘটে।

বোরহানউদ্দিন উপজেলা

গাজীপীরের দরগাহ্ ও মেলা

বোরহানউদ্দিন উপজেলার কুতবায় রয়েছে এই গাজীপীরের দরগাহ। একটি উন্মুক্ত স্থানে সমতলভূমি থেকে সামান্য একটু উঁচুতে মুরগির 'খোপ'-এর মতো ক্ষুদ্রাকার একটি টিনের ঘরের ভেতরে কবর আকৃতির মাটির ঢিবি তৈরি করা হয়েছে গাজীপীরের ভক্তদের দ্বারা। অগ্রহায়ণ মাসের শেষভাগে ভক্তরা লাল কাপড় মাথায় বেঁধে দুদিন সারারাত ধরে গান-বাজনা করে। বিভিন্ন স্থান থেকে আগত বয়াতিরা এতে অংশ নেয়। আসরের চার কোণায় চারটি লম্বা বাঁশের মাথায় পতাকা বেঁধে দিয়ে বাঁশগুলি মাটিতে পুঁতে রাখা হয়। স্থানীয় ও আশপাশের গ্রামের দরিদ্র, কৃষিজীবী ও বিভিন্ন পেশার প্রচুর সাধারণ মানুষ এতে অংশগ্রহণ করে। দরগাহের সামনে তিনটি বাঁশের মাথায় তিনটি লাল পতাকা এঁটে দিয়ে বাঁশের গোড়াগুলো মাটিতে পুঁতে রাখা হয়। এর আগে গাজীপীরের কিছু ভক্ত গ্রামের বাড়ি বাড়ি ঘুরে গাজীর শিন্নির জন্য ধান-চাউল, ডাল, নগদ টাকা-পয়সা ইত্যাদি সংগ্রহ করে।

অনেক নারী-পুরুষ এই গাজীর দরগাহের জন্য মানত করে থাকে। কেউ সন্তান লাভ, কেউ নিজের ও স্ত্রী-পুত্র-পরিজনের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু লাভের জন্য মানত আদায় করতে এই দরগাহে আসে ও শিন্নিতে অংশগ্রহণ করে। দরগাহের একপাশে শিন্নির বড় ডেকচি থাকে। গান-বাজনার অনুষ্ঠান শেষে আগত ভক্ত ও অন্যান্যদের মধ্যে শিন্নি বিতরণ করা হয়। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে একটি স্বতঃস্ফূর্ত মেলাও অনুষ্ঠিত হয়। মেলায় রসগোল্লা, দানাদার, প্রভৃতি মিষ্টান্ন, বাচ্চাদের খেলনা, বেলুন, বাঁশি, নিত্যপ্রয়োজনীয় গৃহস্থালি আসবাবপত্র ইত্যাদি বিক্রয়ের জন্য দোকানিরা ছোট ছোট দোকান খুলে বসে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ভোলার গাজীপুরেও একটি গাজীর দরগাহ ছিল, যা মেঘনার গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে।

শহীদ আউলিয়ার মাজার

নদী ভাঙনে বিলুপ্ত হাসাননগরে ছিল শহীদ আউলিয়ার মাজার। কেউ কেউ বলেন, তিনি হযরত নিজামউদ্দিন আউলিয়ার বংশধর। কিন্তু এর স্বপক্ষে কোনো যুক্তিনির্ভর প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে তিনি যথেষ্ট আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী ছিলেন বলে শোনা যায়।

www.pathagar.com

দণ্ডধর বাবাজীর আশ্রম

মলঙ্গুরার উত্তরদিকে আবুগঞ্জে এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা দণ্ডধর বাবাজী ছিলেন একজন ধর্মসাধক। আবুগঞ্জ বাজার নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেলে খলিল মাঝির বাজারসংলগ্ন পশ্চিম বিশারামপুর গ্রামে এই মন্দির আবারও স্থাপন করা হয়। ১৯৭৭ সালের দিকে এটাও ভেঙে যায়। অতঃপর মৃজাকালু বাজারের পশ্চিম পাশে মন্দিরটি পুনঃস্থাপন করা হয়। ২০০০ সালে তৎকালীন মৃজাকালু বাজারটিও নদীতে ভেঙে গেলে আবার ঐ বাজারের দক্ষিণ দিকে ঐ মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং এটি ২০০৪ সাল পর্যন্ত থাকে।

উপর্যুপরি ভাঙনের ফলে মন্দিরটিকে আবার মৃজাকালু বাজারের কাজীর হাটে স্থানান্তর করা হয়। এখানে প্রতি বছর ৩ দিন ধরে কীর্তন এবং নিয়মিত দুর্গাপূজা ও কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

নোয়াখালীর সুবর্ণচরের চরবাটায় দণ্ডধর বাবাজীর আরেকটি মন্দির রয়েছে। মৃজাকালুর মন্দিরের সেবাইতরা বাটার চর মন্দির থেকে মনোনয়ন পেয়ে থাকেন।

লালমোহন উপজেলা

মাওলানার মাজার

সমগ্র লালমোহন উপজেলার মুসলিম সম্প্রদায়ের কাছে লর্ড হার্ডিঞ্জের মাওলানা সৈয়দ আহমদ সাহেব আজও অনেক শ্রদ্ধার আসনে সমাসীন। যতদূর জানা যায়, তিনি স্থানীয় মাদ্রাসার সুপারিনটেন্ডেন্ট ও অত্যন্ত বুজুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বিশেষ অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারীও ছিলেন বলে শোনা যায়। এমনও শোনা যায় যে, কোনো কোনো ব্যক্তি তাকে হাতিয়ায় দেখে এসে একই সময়ে লর্ড হার্ডিঞ্জেও দেখেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর মাজার ঘিরেও মানুষের মনে অনেক আশা-প্রত্যাশার সঞ্চার হয়। এ-জন্যই অনেকেই বিভিন্ন বিপদ-সংকট থেকে মুক্তি, রোগ-ব্যাধি নিরাময় ইত্যাদি উদ্দেশ্যে এই মাজারের জন্য মানত করে থাকেন। প্রতিদিন অনেক মানুষ এই মাজার জেয়ারত করতে আসেন।

চরফ্যাশন উপজেলা

জালুশাহ ফকিরের মাজার, আসলামপুর

আসলামপুরের জালুশাহ ফকিরের মাজারে বিভিন্ন স্থান থেকে আগত ও স্থানীয় ভক্তরা বাউল ও মারফতি, মুর্শিদী গান পরিবেশন করে। অধিক রাত অবধি গান-বাজনা চলে। এ উপলক্ষে একটি স্বতঃস্ফূর্ত মেলাও বসে যায় এখানে। প্রতি বছরই ওরস অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ওরস উপলক্ষে অনেক লোকের সমাগম হয়।

গফুর শাহ'র মাজার, চেয়ারম্যান হাট রোড

বিশিষ্ট আধ্যাত্মিক সাধক গফুর শাহ্‌র মৃত্যুর পর তাঁকে এখানেই দাফন করা হয়। তাঁর মাজারে প্রতি বছর মাঘ মাসের শেষ বুধবারে বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এর আগে দু-তিন দিন ধরে চলে ওয়াজ-মাহফিল। সাধক গফুর শাহ'র অসংখ্য ভক্ত এ সময়ে এখানে জামায়েত হয়। এখানে গফুরিয়া মাদ্রাসা নামে যে মাদ্রাটি রয়েছে তার প্রতিষ্ঠাতাও সাধক গফুর শাহ্ বলে জানা যায়।

www.pathagar.com

আলী কাজীর মাজার, আমিনাবাদ

আমিনাবাদে উপর্যুক্ত নামে যে মাজারটি গড়ে উঠেছে অর্থাৎ শাহ আলী কাজী সম্বন্ধে স্থানীয় অধিবাসীরা বিশেষ কিছু বলতে পারেন না। তবে প্রতিবছরই এখানে শীতের শেষে ওরস অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এ উপলক্ষে এখানে প্রচুর লোক সমাগম হয়। বিভিন্ন স্থান থেকে আগত শিল্পীরা গভীর রাত অবধি মারফতি-মুর্শিদী ও বাউল গান পরিবেশন করে। এ উপলক্ষে উপস্থিত ভক্তদের মধ্যে শিন্নি বিতরণ করা হয়।

থ. রাজনৈতিক ঐতিহ্য

ব্রিটিশ শাসন প্রবর্তন হওয়ার পর থেকে এ দেশে যে কয়টি বিদ্রোহ ও আন্দোলন সূচিত হয়, তার প্রতিটিতেই সাবেক দক্ষিণ শাহবাজপুর বা বর্তমান ভোলা জেলার সবশ্রেণির জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে।

১৯০৫ সালে স্বদেশী আন্দোলন শুরু হলে তার ঢেউ দ্বীপাঞ্চল ভোলায় এসেও লাগে। এই আন্দোলনকে আইনজীবী, শিক্ষক, ব্যবসায়ীসহ সর্বস্তরের মানুষ সমর্থন দেয় ও বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে। ভোলার বয়োজ্যেষ্ঠ ও খ্যাতনামা আইনজীবী : রজনীনাথ কর, নবীনচন্দ্র দাস, অভয় কুমার চট্টোপাধ্যায়, রসিকলাল গুপ্ত, মহেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, গুরুনাথ চক্রবর্তী, ভগবতীবরণ চট্টোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র সেন, কেদারনাথ সেন, বসন্তকুমার সেন, কামাখ্যাচরণ সেন, দ্বারিকানাথ ঘোষ ও ভুবনমোহন ঠাকুর এবং ব্যবসায়ী; কৃষ্ণপ্রসাদ পোদ্দার, তারিণীচরণ সাহা, মথুরামোহন চক্রবর্তী, জমিদার পণ্ডিত রামচরণ কাব্যতীর্থ, শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় (শিক্ষক), রাজকুমার কাহালী প্রমুখ বরিশালের অশ্বিনী কুমার ও তাঁর সহযোগীদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করেন। এ সময়ে আইনজীবী রজনীনাথ কর ও তাঁর কতিপয় বন্ধু-বান্ধবের উৎসাহ ও সহযোগিতায় ভোলায় প্রতিষ্ঠিত হয় জাতীয় বিদ্যালয়। বিভিন্ন সভা-সমিতি ও প্রভাতফেরির মাধ্যমে স্বদেশী আন্দোলনকে সচল রাখা হয়। এ সময়ে বরিশালের অশ্বিনীকুমার এবং বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পাল ও লালা লাজপৎ রায় ভোলা সফর করেন এবং রজনীনাথ করের বাসার সামনের বিশাল প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় ভাষণ দেন।

গিরীন্দ্র চক্রবর্তীর নেতৃত্বে ভোলায় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠিত হয়। ভোলার বাজারে নবীনচন্দ্র দাসগুপ্তের নেতৃত্ব বিলেতি কাপড় পোড়ানো হয় উৎসবমুখর পরিবেশে। যেসব দোকানে বিলেতি লবণ ছিল সেগুলোর মধ্যে কেরোসিন তেল ঢেলে নষ্ট করা হয়। এই অভিযোগে নবীন বাবুকে পুলিশ গ্রেফতার করে।

ঢাকা অনুশীলন সমিতির খ্যাতিমান নেতা পুলিনবিহারী দাস ভোলা সফর করেন এবং যোগেন্দ্রকুমার কাহালীর প্রচেষ্টায় ভোলায় গঠিত হয় অনুশীলন সমিতি। এর সদস্যদের লাঠিখেলা ও তরবারি চালনার শিক্ষা দেওয়া হয়। যোগেন্দ্রকুমার কাহালীর অকাল মৃত্যুর পরে হরেন্দ্রকুমার কাহালী ও চুনীলাল সেনগুপ্ত অনুশীলন সমিতির হাল ধরেন এবং রাইমোহন করঞ্জাই, ধীরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, প্রবোধকুমার ভট্টাচার্য, সুরেশ গাঙ্গুলি, অতুল বন্দোপাধ্যায়, গুরুদাস দে, গিরীন্দ্রকিশোর চক্রবর্তী, পূর্ণচন্দ্র দে প্রমুখ এই সমিতিতে যোগদান করেন।

www.pathagar.com

১৯২১ সলে ভোলায় অহিংস অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। স্কুলের ছাত্ররা অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানাতে স্কুল বয়কট করে রজনীনাথ করের বাসায় উপস্থিত হলে তিনি তাদের নিয়ে মিছিল সহযোগে শহর প্রদক্ষিণ করেন। আন্দোলন ক্রমান্বয়ে তীব্রতর রূপ ধারণ করতে থাকে।

এ সময়েই ভোলায় হিন্দু ও মুসলমান একই সঙ্গে অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলনে যোগদান করে। আইনজীবী : দক্ষিণারঞ্জন বন্দোপাধ্যায়, দ্বারিকানাথ ঘোষ, কালদাকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামাচরণ চক্রবর্তী, আবদুল বারী উকিল, চুনীলাল সেন, পরেশনাথ কর, কেদারনাথ সেন, গুরুনাথ চক্রবর্তী, অক্ষয়কুমার পুসিয়ারী, অমূল্যকুমার মুখোপাধ্যায় ও ধীরেন্দ্রনাথ সেন তাদের আইনব্যবসা তিন মাসের জন্য স্থগিত রেখে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করেন।

জমিদার গিরীন্দ্রকিশোর চক্রবর্তী, দেবেন্দ্রনাথ কাহালী, ব্যবসায়ী ভুবনমোহন সরকার, রামচরণ সাহা, রমনীমোহন দাস, রাধাবল্লভ সাহা, রাধাবল্লভ কুণ্ডু, সুরেন্দ্রনাথ কুন্ডু, বিপ্লবী বিপনচন্দ্র চক্রবর্তী, মনোজকুমার কাহালী, সরোজকুমার কাহালী, উত্তর শাহবাজপুরের নলিনীকান্ত কর চৌধুরী, আলীনগরের আবদুল মিয়া (প্রয়াত মোশারেফ হোসেন শাজাহানের প্রপিতামহ), গঙ্গাপুরের বিশিষ্ট সাহিত্যিক নূর আহমেদ সিকদার, ফজলে রহমান তালুকদার, মানিকা গ্রামের মিয়াবাড়ির ইসহাক তালুকদার, গঙ্গাপুর নায়েব বাড়ির নূর মোহাম্মদ সিকদার চান মিয়া, হেকিম মমতাজউদ্দিন, মৌলভী আবদুল লতিফ ও কাজী রমজান আলী, এবং সুকদেবের যুবক সম্প্রদায় এই আন্দোলনকে সচল ও সক্রিয় রাখেন। বর্তমান স্বরাজগঞ্জ বাজারের উত্তর পাশের হাছান আলী মুন্সি বাড়ির বিপ্লবী ও স্বেচ্ছাসেবক দল 'হোমগার্ডের' কমান্ডার লাল মিয়া অসহযোগ আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণাপূর্বক বিদেশি পণ্য বর্জন করেন এবং আমরণ মাটির বাসনে ভাত খেয়ে যান। এই পর্যায়ে আন্দোলনকে স্তিমিত করার জন্য চুনীলাল সেন, গিরীন্দ্রকিশোর চক্রবর্তী ও মানিকার জমিদার ইসহাক তালুকদারকে গ্রেফতার করা হয়। এদিন জেলগেট পর্যন্ত এগিয়ে দিতে মানিকা থেকে শতশত হিন্দু-মুসলিম দেশপ্রেমিক দীর্ঘ ১৫ মাইল রাস্তা পায়ে হেঁটে ভোলা শহর অবধি এসেছিলেন।

১৯২১ সালে কলকাতায় প্রাদেশিক কংগ্রেস কার্যালয় প্রতিষ্ঠার পর সরোজকুমার কাহালী ভোলায় কংগ্রেসের অফিস প্রতিষ্ঠা করেন। আইনজীবী দক্ষিণারঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে সভাপতি এবং অমূল্য মুখোপাধ্যায়কে সম্পাদক নির্বাচিত করে একটি সাংগঠনিক কমিটি গঠন করা হয়। ১৯২১ সালের এপ্রিলে আহুত এক হরতালে পিকেটিং করার অভিযোগে গিরীন্দ্রকিশোর চক্রবর্তী, ধীরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, রমণীমোহন দাস, ফজলে রহমান তালুকদার, বিজয় বসু, লাল মিয়া, সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, হরেন্দ্রকুমার ঘোষ, আইনজীবী অক্ষয় মুখার্জী এবং হেমচন্দ্র দাস প্রমুখকে গ্রেফতার করে হাজতে পাঠানো হলে সারা শহরে প্রবল উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। বিচারে ধীরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, সরোজ কাহালী, ফজলে রহমান তালুকদার, বিজয় বসু, লাল মিয়া ও সুরেন্দ্র মোহন ঘোষকে কারাদণ্ড প্রদান করে আলীপুর সেন্ট্রাল জেলে পাঠানো হয়। অসহযোগ আন্দোলনে ভোলায় মহিলারাও পিছিয়ে থাকেননি। চুনীলাল সেনগুপ্তের স্ত্রী সরযুবালার নেতৃত্বে স্থানীয় মহিলারা সংগঠিত হন।

www.pathagar.com

খেলাফত আন্দোলন স্তিমিত হয়ে গেলে ইতোপূর্বে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় মাদ্রাসাটিও বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং ধীরে ধীরে জাতীয় বিদ্যালয়টিও অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে। রাইমোহন করঞ্জাই, সরোজ কাহালী ও কন্ট্রাক্টর পূর্ণচন্দ্র দে নতুন একটি স্কুল গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেন এবং দেবেন্দ্র কুমার কাহালী ও পূর্ণবাবুর অর্থানুকূল্যে অন্যত্র টাউন স্কুলের ঘর তৈরি করা হয়।

১৯৩০ সালে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে মনোজকুমার কাহালী, বিপিনচন্দ্র চক্রবর্তী ও সুধীন্দ্রনাথ ঘোষকে গ্রেফতার করা হয়।

১৯৪২ সালে শুরু হয় 'ভারত ছাড়' আন্দোলন। ভোলাতেও এই আন্দোলনের প্রভাব পড়ে। চুনীলাল সেনগুপ্তের স্ত্রী সরযুবাল সেনগুপ্তের নেতৃত্বে দেশপ্রেমিক যুবক ও নর-নারীরা বিশাল মিছিল নিয়ে আইন অমান্য করার উদ্দেশ্যে স্বদেশী গান গাইতে গাইতে ভোলার মুন্সেফি আদালতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে সব ফাইলপত্র নষ্ট করে দেয়। এই আন্দোলনে ভোলার ৬৪জন রাজনৈতিক কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। মনোজকুমার কাহালী ও সুধীর ঘোষকে বিহারের বক্সার ক্যাম্পে ৫ বছর আটক রাখা হয়। নলিনী দাস দীর্ঘ ২৫ বছর আন্দামানে দ্বীপান্তর শাস্তি ভোগ করে ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর মুক্তি লাভ করেন ('রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব' অংশে 'নলিনী দাস' সম্পর্কে আরো বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

লবণচাষীদের বিদ্রোহ

প্রাচীনকাল থেকেই লবণ উৎপাদনকারী এলাকা হিসেবে দক্ষিণ শাহবাজপুর বা বর্তমান ভোলার বিশেষ খ্যাতি ছিল। সমুদ্রের লবণাক্ত পানি যখন ছোট-বড় খাল-বিল দিয়ে দেশের ভেতরে প্রবেশ করতো, তখন স্থানীয় অধিবাসীরা ঐ পানি আটকে রেখে জ্বাল দিয়ে এবং লবণ মিশ্রিত মাটি রোদে শুকিয়ে লবণ আলাদা করে নিজেদের ব্যবহার ও বাজারে বিক্রয়ের উপযোগী করে তুলতো। খেজুরের রস জ্বাল দিয়ে গুড় করার যেরূপ পদ্ধতি আমাদের দেশে প্রচলিত, সাগরের লবণাক্ত পানিও একই রকম তাফালে জ্বাল দিয়ে লবণ তৈরি করা হতো। ভোলা, মনপুরা, বামনা, বরগুনা, মঠবাড়িয়া, আমতলি, খেপুপাড়া ও গলাচিপায় লবণ উৎপাদনের জন্য অনেক 'তাফাল' নির্মাণ করা হয়। ভোলায় উৎপাদিত লবণ বেচা-কেনা হতো বোরহানউদ্দিন উপজেলার মৃজাকালু ও ভোলায়। এটিই ছিল ভোলার উপকূলীয় দরিদ্র মানুষের জীবিকানির্বাহের একমাত্র অবলম্বন।

একসময় ভোলা ও বরিশালে উৎপাদিত লবণই সারাদেশের চাহিদা মেটাতো। এ বিষয়ে অনেকেই অবগত যে, স্থানীয় ব্যবসায়ীরা নিয়মিতভাবে শুল্ক পরিশোধ করতে বাধ্য থাকলেও ইংরেজ বণিক ও কর্মচারীদের ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার শুল্ক দিতে হতো না। লবণ ব্যবসা লাভজনক প্রতীয়মান হওয়ায় এবং কোম্পানির কর্মচারী ও ইংরেজ বণিকদের কোনো শুল্ক দেওয়ার বিধি না থাকায় তারা এই ব্যবসা বেশ জোরেসোরে শুরু করে দেয়। এদিকে এদেশের লবণ শিল্পকে ধ্বংস করার জন্য লর্ড হেস্টিংস ১৭৭২ সালে লবণ উৎপাদনের ওপর ৩০% শুল্ক আরোপ করে এক নির্দেশ জারি করে। শুধু তাই নয়, কোম্পানি ইংরেজ লবণ এজেন্ট ছাড়া দেশীয়

www.pathagar.com

বণিকদের কাছে লবণ বিক্রি করাও নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। কিন্তু কোম্পানির আগে লবণ ব্যবসায়ীরা মোলঙ্গীদের (লবণ ব্যবসার জন্য যারা দাদন দিতো) দাদন দিতো এবং দেশীয় বণিকদের কাছে লবণ বিক্রিতে কোনো বিধি-নিষেধ ছিল না। কোম্পানি প্রবর্তিত নতুন আইনের ফলে লবণচাষীরা লবণ উৎপাদনের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করে কোনো লাভের মুখ দেখতো না। লবণ কর বৃদ্ধি এবং ইংরেজ লবণ এজেন্ট ছাড়া দেশীয় ব্যবসায়ীদের কাছে লবণ বিক্রির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা ছাড়াও ব্রিটিশ সরকার দেশীয় লবণশিল্পকে পুরোপুরি ধ্বংস করে বিলেতে তৈরি লবণের বাজার তৈরির উদ্দেশ্যে আরো একটি নির্দেশ জারি করে এই যে, ভোলায় তৈরি লবণ মানসম্মত নয়, কাজেই কোনো লবণচাষী তার পরিবারের প্রয়োজনের চাইতে অধিক লবণ উৎপাদন করতে পারবে না। এই নির্দেশ প্রতিপালন নিশ্চিত করার জন্য ব্রিটিশ সরকার ভোলায় ৩০০ দুর্ধর্ষ গুর্খা সৈন্য প্রেরণ করে। ভোলায় লবণচাষীদের জীবিকানির্বাহের বিকল্প কোনো পথ খোলা না থাকায় গুর্খা সৈন্যদের আগমনের সংবাদ পেয়েও লবণ উৎপাদন অব্যাহত রাখে। সরকারি নির্দেশের প্রতি কোনো তোয়াক্কা না করে মৃজাকালু, ভোলা, দৌলতখান, লালমোহন, মনপুরা, প্রভৃতি এলাকায় প্রচুর লবণ উৎপাদন ও কেনা-বেচা চলতে থাকে।

অন্যদিকে 'লবণ এজেন্ট ও ইজারাদাররা পেয়াদা দিয়ে মোলঙ্গী ও লবণচাষীদের ওপর নির্মম অত্যাচার চালাতো। তাদের অত্যাচারে মোলঙ্গী ও লবণচাষীরা গ্রাম ছেড়ে গ্রামান্তরে পালিয়ে যেত। ১৮১৮ সালে মনপুরা দ্বীপের ৩৫০টি পরিবার তাদের অত্যাচার না সইতে পেরে গ্রাম ত্যাগ করে অন্য গ্রামে পালিয়ে যায়। কোম্পানির বণিকরা লবণচাষীদের ধরে জোর করে সুন্দরবনে নিয়ে যেত এবং তাদের দিয়ে লবণ তৈরি করাতো। লবণ এজেন্ট ও কোম্পানির বণিকদের অত্যাচার নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে দক্ষিণ বরিশালের নিপীড়িত ও নির্যাতিত লবণচাষীরা জনৈক আইনউদ্দিন সিকদারের নেতৃত্বে সংগঠিত হয়ে ইংরেজ ও তাদের আমলাদের বিরুদ্ধে দূর্বার প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ১৮০০ সালের দিকে দক্ষিণ শাহবাজপুরের বিদ্রোহী লবণচাষীরা গ্রিক লবণ ব্যবসায়ী ডেমোট্রিয়াসের বাংলো আক্রমণ করে। এই আক্রমণে ডেমোট্রিয়াস প্রাণে বেঁচে গেলেও তার কর্মচারী প্যালিওলগ্রাস বিদ্রোহীদের হাতে নিহত হয়। এই ঘটনায় বরিশালের তৎকালীন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিডলটন-এর নির্দেশে আলিয়ার খাঁর নেতৃত্বে একদল সিপাহি ৩১৪জন কৃষককে গ্রেফতার করেন।' (District of Bakergonj, pp. 166-287)

১৮২৫ সালে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বোর্ডের নিকট প্রেরিত এক চিঠির উত্তরে জানান, 'আমি বিনয়ের সাথে জানাচ্ছি যে, আমি এ জেলার দায়িত্ব গ্রহণের পর যে মামলার রায় হয়েছে, তাতে এটা প্রমাণিত হয় যে, লবণ কর্মচারীরা প্রজাদের ওপর অনেক অত্যাচার করতো। আমি আমার মতামত ব্যক্ত করতে দ্বিধা করবো না যে, বেপারিরা মোলঙ্গীদের দাদন গ্রহণের জন্য চরম অত্যাচার করছে এবং তারা অনেকে নির্দোষ হওয়া সত্ত্বেও দোষী সাব্যস্ত হয়ে কারা ভোগ করছে' (ভোলা জেলার ইতিহাস : মোহাম্মদ হোসেন চৌধুরী, পৃ. ২২৭)।

www.pathagar.com

'এ সময় বিলেতি লবণ পরিত্যাগ করে দেশী লবণ ব্যবহারের আন্দোলন শুরু হয়। তৎকালীন দৌলতখান থানার মৃজাকালু (বর্তমানে বোরহানউদ্দিন উপজেলার অন্তর্গত) ছিল লবণ বিক্রির প্রধান কেন্দ্র। সরকার এ বন্দরেও লবণ উৎপাদন ও বিক্রয় নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। কিন্তু কৃষকগণ সরকারের নির্দেশ উপেক্ষা করে লবণ উৎপাদন করতে থাকে। ফলে, অনেক কৃষককে পুলিশের হাতে লাঞ্ছিত হতে হয়। সরকারি দমননীতির বিরুদ্ধে বাধ্য হয়ে ভোলার উকিল দক্ষিণারঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারিকানাথ ঘোষ, আবদুল বারী উকিল, চুনিলাল সেন, অমূল্য মুখোপাধ্যায়, নূর আহমেদ সিকদার, তোফায়েল আহমদ চৌধুরী প্রমুখ লবণ আন্দোলন শুরু করেন।'

(হীরালাল দাসগুপ্ত : স্বাধীনতা সংগ্রামে বরিশাল, পৃ. ১৫৯-১৬৩)।

বাংলা ১৩৩০ সালের পহেলা বৈশাখ মৃজাকালুর অনুশীলন কর্মী যোগেশচন্দ্র ও কংগ্রেস নেতা সুরেশ চন্দ্রের নেতৃত্বে একটি মিছিল লবণ নিয়ে ভোলায় আসার পথে মৃজাকালুর কাছে জগন্নাথপুরে পুলিশের বাধার সম্মুখীন হয়। লাঠিচার্জের মাধ্যমে আন্দোলন দমন করতে ব্যর্থ হয়ে এক পর্যায়ে পুলিশ গুলি ছুঁড়লে পেয়ারপুরের কোরবান আলী এবং বিশারামপুরের কেরামত আলী ঘটনাস্থলেই শাহাদাত বরণ করেন। মতিউর রহমান ও পঞ্চানন বণিকসহ ৪০ থেকে ৫০জন প্রতিবাদী কৃষক প্রজা আহত হন এবং ঘটনাস্থল থেকে গঙ্গাপুরের বিরানব্বই বছরের বৃদ্ধ ডা. গোলামুল হক, বেলায়েত হেসেন মাস্টার, মোখলেসুর রহমান, রাজকুমার দত্ত, বিনয় চক্রবর্তী ও চন্দ্রমাধব গাঙ্গুলিকে গ্রেফতার করা হয়। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মৃজাকালুর কোরবান আলী ও কেরামত আলী বরিশালের প্রথম শহীদ। মৃজাকালুর প্রধান লবণ আন্দোলনের সময় মহাত্মা গান্ধী বরিশালে এসে তৎকালীন মন্ত্রী হাশেম আলী খানের বাসভবনে অবস্থান করছিলেন। (মিহিরলাল দত্ত : ভোলায় লবণ আন্দোলন-প্রবন্ধ)।

এরপর থেকে মৃজাকালুর যে স্থানটিতে গুলি হয়েছিল সেই জায়গার নাম হয় 'স্বরাজগঞ্জ' (ভোলা জেলার ইতিহাস, পৃ. ২২৭)।

এই ঘটনার পর থেকে স্থানীয় অধিবাসীরা প্রতি বছরের ১লা বৈশাখ 'লবণ বয়কট দিবস' হিসেবে দিনটি পালন করতো এবং এইদিনে লবণ না খেয়ে দিনটি ও শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতো। এই রীতি ১৯৪৭ সাল অবধি অব্যাহত ছিল।

কৃষক-প্রজা আন্দোলন

বাকেরগঞ্জের জমিদারদের অন্যায় দাবি পূরণ ও অতিরিক্ত কর প্রদানের বিরুদ্ধে কৃষক-প্রজারা ধীরে ধীরে সংগঠিত হতে থাকে। জমিদারদের অন্যায়, অযৌক্তিক ও নিপীড়নমূলক দাবিসমূহের মধ্যে ছিল জমিদারের অনুমতি নিয়ে কৃষক-প্রজাদের ছেলেমেয়ের বিয়ে দেওয়া, সন্তান-সন্ততির নাম রাখা, নিজস্ব ভূমিতে ঘর নির্মাণ, পুকুর কাটা ইত্যাদি। এছাড়া 'জমিদারদের পুত্র-কন্যার বিয়ে-শাদীতে, আত্মীয়-স্বজনের শ্রাদ্ধ, পূজার নানারকম কর ও উপঢৌকন সবই প্রজাদের দিতে হতো। জমিদার ও তাদের নায়েব-গোমস্তারা কৃষক-প্রজাদের বিচার-শালিস করতো। তাদের কাছারিতে রাখা লম্বা জুতা ও বেত দ্বারা কৃষকদের উপর নির্যাতন করা হতো। বিচারের নামে জমিদাররা

www.pathagar.com

প্রজাদের জরিমানা করতো আর তা তারা আত্মসাৎ করতো। সময়মত খাজনা ও অন্যান্য পাওনাদি না দিলে কৃষকদের বসতবাড়ি নিলামে বিক্রি করা হতো। ঋণের দায়ে ঘরের ঘটি-বাটি, থালা-বাসন সবই পেয়াদা পাঠিয়ে ক্রোক করে আনতো। প্রজাদের স্ত্রী-কন্যাদের সামাজিক নিরাপত্তা পদে পদে বিঘ্নিত হতো। কৃষক-প্রজারা গরিব ঘরে জন্মগ্রহণ করে ঋণে জর্জরিত হয়ে মৃত্যুবরণ করতো। তাদের সন্তানেরা ঋণের বোঝা টেনে মাথা তুলে দাঁড়াবার সুযোগ পেতো না। জমিদার, তালুকদার, মহাজন, উকিল, মোক্তার, পাইক-পেয়াদা, থানার পুলিশ কৃষকদের তুই, তুমি বলে সম্বোধন করতো। যে কোনো মুহূর্তে জমিদাররা কৃষকদের জমি হতে তাড়িয়ে দিতে পারতো। প্রতিবাদ করলে চরম শাস্তি পেতে হতো। এই জমিদার শ্রেণির বাড়ির সামনে দিয়ে কেউ ছাতা মাথায় বা জুতা পায়ে দিয়ে হেঁটে যেতে পারতো না' (মোহাম্মদ হোসেন চৌধুরী, ভোলা জেলার ইতিহাস, পৃ. ২২৮-২২৯)।

এসব অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে বৃহত্তর বাকেরগঞ্জের কৃষক-প্রজারা গগন মীর ও মোহন মীরের নেতৃত্বে সংগঠিত হয়। ভোলাসহ বাকেরগঞ্জের জমিদাররা একত্রিত হয়ে চাষীদের বিরুদ্ধে ইংরেজ সরকারের কাছে মামলা দায়ের করে। ইংরেজ সরকার কৃষক-প্রজাদের দমন করার জন্য ফ্রন্টিয়ার্স রাইফেলসের দুর্ধর্ষ গুর্খা বাহিনী নিয়োগ করে। বর্তমান চরফ্যাশন বাজারের কাছে কৃষক-প্রজাদের সাথে গুর্খা বাহিনীর প্রচণ্ড এক সংঘর্ষ হয়। আর একটি সংঘর্ষে ৮জন কৃষক শাহাদাতবরণ করেন। গগন মীর ও মোহন মীরকে গ্রেফতার করে কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

ভাষা আন্দোলন

বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে হরতাল পালনের ঘোষণা দেওয়া হয়। রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের এই আহ্বানের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে ভোলায় ২১ ফেব্রুয়ারি সরকারবিরোধী বিরাট মিছিল বের করে। লঞ্চ, স্টীমার, বাস, সিনেমা হল, দোকানপাট, স্কুল, অফিস-আদালত সব বন্ধ থাকে। মজিবুল হক চৌধুরীর সভাপতিত্বে বোরহানউদ্দিন স্কুলে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। কুঞ্জেরহাট স্কুল খোলা হলেও ছাত্রনেতৃবৃন্দের ঐ স্কুলে যাওয়ার পর তা বন্ধ ঘোষণা করা হয়। গজারিয়া হাইস্কুলে হরতাল পালন করা হয়। স্কুলের পাশের ব্রীজের ওপর আড়াআড়িভাবে বাঁশ বেঁধে দেওয়া হয়। এদিন ভোলা মহকুমা প্রশাসকের (এসডিও) চরফ্যাশনে নির্ধারিত কর্মসূচি থানায় তিনি ছাত্রদের অনুমতি নিয়ে চরফ্যাশনে যান। ভোলা শহরে পুলিশ পাহারা উপেক্ষা করে বিজলি বিড়ি, পাহাড়ি বিড়ি ও ছিদ্দিক বিড়ি ফ্যাক্টরির শ্রমিকরা মিছিল বের করে। মিছিলে নেতৃত্ব দেন ভোলা টাউনস্কুলের সহকারী শিক্ষক আবদুল মোমিন এবং নেজামুল হক, সানাউল্লাহ, জয়নাল আবেদীন, নাসের, ফজলুর রহমান, আবুল হাসনাত শামসুদ্দীন, মোশারেফ হোসেন প্রমুখ ছাত্র-নেতৃবৃন্দ।

২২ ফেব্রুয়ারি খলিফা পট্টি মসজিদে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন শাহ মতিয়ার রহমান। আবদুল মোমিন ও হেকিম আবদুল মান্নান এতে বক্তব্য রাখেন।

www.pathagar.com

দ. মুক্তিযুদ্ধে ভোলা

১৯৭১ সালের ১ মার্চ জাতীয় সংসদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করা হলে এর প্রতিবাদে ভোলা কলেজ থেকে বিপুল সংখ্যক ছাত্র একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করে। মিছিলটি সারা শহর প্রদক্ষিণ করে। ২ মার্চ সকাল আনুমানিক সাড়ে দশটা-এগারোটায় বরিশাল দালানের সামনে ছাত্র, রাজনৈতিক নেতা-কর্মী ও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের একটি জমায়েত ও সংক্ষিপ্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন আওয়ামী লীগ দলীয় এমপিএ মোশারেফ হোসেন শাজাহান, ছাত্রলীগ সভাপতি সালেহ্ আহমদ (শহীদ), ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ফজলুল কাদের (মজনু) মোল্লা, ছাত্রলীগ নেতা গোলাম মোস্তফা, কার্তিক দেবনাথ, আবদুল লতিফ, শাহ্জাহান লালু, আফসারউদ্দিন বাবুল প্রমুখ। এখানে ফজলুল কাদের মজনু একটি চিকন বাঁশের লাঠির মাথায় বেঁধে প্রথম স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন। সেখান থেকে ছাত্র-জনতার মিছিলটি কালীনাথ বাজার, কাশীশ্বর ব্রীজ হয়ে ভোলা সরকারি হাইস্কুলের সামনে দিয়ে তৎকালীন ফৌজদারি অফিসের (মহকুমা প্রশাসকের কার্যালয়) দিকে অগ্রসর হয়। এ সময়ে ভোলা থানার সামনে অবস্থিত ভোলা ক্লাবে বেলুচ রেজিমেন্টের একদল সেনা '৭০-এর বন্যা-পরবর্তী ত্রাণকাজে সম্পৃক্ত ছিল। মিছিলটি বাংলাদেশের ঐ পতাকাটি বহন করে তাদের সামনে দিয়েই এসডিও'র অফিসের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে।

ছাত্র-জনতার মিছিলটি এসডিও'র অফিসের সামনে অবস্থান নেওয়ার পর তাদের মধ্য থেকে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক সালেহ আহমদ (শহীদ), যুগ্ম-আহ্বায়ক ফজলুল কাদের মোল্লা (মজনু) আওয়ামী লীগ নেতা নাসির আহমদ (অ্যাডভোকেট), ছাত্রলীগ নেতা গোলাম মোস্তফা, কার্তিক দেবনাথ, আফসারউদ্দিন বাবুল, ছাত্র ইউনিয়নের নেতা এম. এ. তাহের, মাওলানা আবদুল খালেক, মাহে আলম (কালীবাড়ি রোড) ও অপর কয়েকজন এসডিও অফিসের একতলা ভবনের ছাদে উঠে যান এবং সালেহ আহমদ ও ফজলুল কাদের মজনু চাঁদ-তারা খচিত পাকিস্তানি পতাকা নামিয়ে তাতে অগ্নিসংযোগ করেন এবং ফজলুল কাদের মজনু বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন। এ সময়ে ছাত্রনেতা ও সংগীতশিল্পী আফসারউদ্দিন বাবুলের পরিচালনায় উপস্থিত সবাই 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' সংগীতটি পরিবেশন করেন।

'জাতীয় পতাকা' উত্তোলন এবং 'আমার সোনার বাংলা' গানটি পরিবেশন সম্পর্কে জানতে চাইলে ভোলা আওয়ামী লীগের বর্তমান সভাপতি ও উপজেলা চেয়ারম্যান এবং তৎকালীন মহকুমা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের যুগ্ম-আহ্বায়ক ফজলুল কাদের মোল্লা (মজনু মোল্লা) জানান, জাতীয় পতাকাটি তিনি তৈরি করিয়েছিলেন ভোলার তদানীন্তন খ্যাতনামা ও প্রবীণ দরজি জনাব গোলাম মাওলাকে (মাওলা খলিফা' নামেই সুপরিচিত) দিয়ে। এ প্রসঙ্গে তিনি আরো জানান, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির তৎকালীন প্রচার সম্পাদক স্বপনকুমার চৌধুরীর দেওয়া ধারণা অনুযায়ী তিনি গাঢ় সবুজ রঙের লুঙ্গি কেটে ও তার মাঝখানে লাল সালু কাপড় দিয়ে

www.pathagar.com

বৃত্ত বানিয়ে বর্তমানে আমাদের যে পতাকা রয়েছে তখনো সেভাবেই বাংলাদেশের পতাকাটি গোলাম মাওলা সাহেবকে দিয়ে তৈরি করিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তাতে মানচিত্র সংযোজন করা হয়।

ফজলুল কাদের মজনু আরো জানান, ১৯৭০ সালে জাতীয় নির্বাচনের পূর্বে ছাত্রলীগের এক বর্ধিত সভায় যোগদান উপলক্ষে তিনি স্বপনকুমার চৌধুরীর সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর ৩২ নং-এর বাসভবনে গিয়েছিলেন। তারা যখন নীচে বঙ্গবন্ধুর জন্য অপেক্ষা করছিলেন, তখন বঙ্গবন্ধু সিঁড়ি দিয়ে দোতলা থেকে নামার সময় গুনগুন করে গাইছিলেন—'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি।' গানটি সম্পর্কে তাঁরা বঙ্গবন্ধুর কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'আমি গাইতেছি, তোরাও গা। আমার সঙ্গে গা।' ফজলুল কাদের বলেন, এই প্রেরণা থেকেই সেদিন আমরা ভোলা কালেক্টরেট অফিসের ছাদে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলনকালে এই গানটি (আমাদের বর্তমান জাতীয় সংগীত) গেয়েছিলাম।

এখানে আরো উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মার্চ মাসের ৩ কিংবা ৪ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত একদল ছাত্র দাইমুদ্দিন সাহেবের লঞ্চঘাটে ঢাকা-ভোলা লঞ্চ থেকে নেমে 'জয়বাংলা', 'আমার নেতা তোমার নেতা– শেখ মুজিব শেখ মুজিব' বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো বাংলাদেশ স্বাধীন করো ইত্যাদি শ্লোগান দিতে দিতে বাপ্তা বাসস্ট্যান্ড পার হয়ে তৎকালীন এসডিও অফিসের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। একপর্যায়ে তারা ঐ অফিসের ছাদে উঠে যায় এবং তাদের মধ্য থেকে ছাত্রলীগ নেতা মফিজুল ইসলাম ও ওবায়দুল হক বাবুল ওখানে ওড়ানো পাকিস্তানি পতাকা নামিয়ে তাতে অগ্নিসংযোগ করে। মার্চের ২ তারিখে প্রথম পাকিস্তানি পতাকা নামিয়ে তাতে অগ্নিসংযোগ ও বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলনের পরবর্তী কোন এক সময়ে মহকুমা অফিসারের কার্যালয়ের কেউ পুনরায় পাকিস্তানি পতাকা উত্তোলন করে থাকতে পারে বলে ধারণা করা হয়।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ দিবাগত রাত সাড়ে বারোটা কি একটা (২৬ মার্চ)। গাজীপুর রোডস্থ টেলিগ্রাফ অফিসের তৎকালীন অন্যতম কর্মকর্তা (সম্ভবত ইনচার্জ) নোয়াখালী নিবাসী জনাব এলাহী স্বভাবগত সাদা চেকের লুঙ্গি ও সাদা ফুলশার্ট পরে সংগ্রাম পরিষদের নেতাদের সাথে দেখা করার জন্য বেরিয়ে পড়েন তাঁর কর্মস্থল থেকে। কিছুক্ষণ আগেই তিনি রিসিভ করেছেন বঙ্গবন্ধুর সেই ঐতিহাসিক স্বাধীনতার ঘোষণা ও পাকবাহিনীকে প্রতিরোধ করার বার্তা। জনাব এলাহী একে একে সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক ও মহকুমা আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব শামসুদ্দিন আহমদ (প্রয়াত), মহকুমা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি রিয়াজউদ্দিন মোক্তার, সাধারণ সম্পাদক মোশারেফ হোসেন শাজাহান, ছাত্রনেতা ফজলুল কাদের (মজনু) মোল্লা ও অন্যান্যদের সাথে সাক্ষাৎ করে বঙ্গবন্ধুর বার্তাটি পৌঁছে দেন। সেই রাত নিশীথেই বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার বার্তাটি শহরময় বিদ্যুতের বেগে ছড়িয়ে পড়ে। তাৎক্ষণিকভাবে ছাত্রলীগ কর্মী শাজাহান লালুকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তাদের মালিকানাধীন মাইক বের করে সারা শহরে প্রচার করা হয় বঙ্গবন্ধুর বার্তার সারমর্ম।

www.pathagar.com

২ মার্চ ঢাকার পল্টন ময়দানে স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠের পরপরই ভোলাতে মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং শুরু হয়ে যায়। প্রথমে বাংলা স্কুলের মাঠে, পরে ক্রমান্বয়ে টাউন স্কুলের বাগানঘেরা মাঠ, ভোলা কলেজ মাঠ ও আলীয়া মাদ্রাসা মাঠে রাইফেল ট্রেনিং চলতে থাকে। এটি আরো ব্যাপক ও দৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে যায় বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের পর থেকে। এ সময়ে ৭০-এর প্রলয়ংকরী জলোচ্ছ্বাসের কারণে স্থানীয় বহু পুলিশ ও তৎকালীন ইপিআর ও সেনা সদস্য ছুটিতে ভোলায় ছিলেন। শহর ও আশপাশের গ্রামগুলিতে মাইকিং করে তাদের সবাইকে শহরের টেনিস গ্রাউণ্ডে সমবেত হওয়ার আহ্বান জানানো হয় বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে গঠিত সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে। দলে দলে সবাই সমবেত হতে থাকেন। সর্বপ্রথম সুবেদার মান্নানকে প্রধান করে প্রাথমিকভাবে গঠন করা হয় মুক্তিবাহিনী। এরপর অপর সিনিয়র সেনা সদস্য সুবেদার মেজর আবদুল কাদের যোগদান করলে সুবেদার আবদুল মান্নানের পরিবর্তে তাকে রাইফেল ও অন্যান্য যুদ্ধ-কৌশলের ট্রেনিং প্রদানের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। ২৭ মার্চ কালীনাথ রায়ের বাজারে অবস্থিত মোল্লাবাড়ির উঠানে স্থাপন করা হয় মেয়েদের ট্রেনিং ক্যাম্প। এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রাথমিক চিকিৎসাসহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য সর্বপ্রথম যোগদান করেন ভোলা শহরের সুলতানা (অরুণা), বুলু, দুলু, মনি, আশু, কোহিনুর গোলদার, আমিরুন গোলদার এবং হাবিব তালুকদার সাহেবের স্ত্রীসহ প্রায় ৩০/৩৫ জন তরুণী ও মহিলা। শহরের ভোলা আলীয়া মাদ্রাসার সামনের মাঠ, ভোলা কলেজ মাঠ ও বাংলা স্কুলের মাঠে প্রশিক্ষণ প্রদান অব্যাহত থাকে। প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন বেঙ্গল রেজিমেন্টের জনাব আবদুর রব, আলী হোসেন, সুফী হাবিবুর রহমান সাহেবের ছেলে আবদুর রহমান (শহীদ), রিজার্ভ পুলিশের হাবিলদার মুজিবুর রহমান, শামসুল হকসহ আরো কয়েকজন। সংগ্রাম পরিষদের যুগ্ম-আহ্বায়ক মোশারেফ হোসেন শাজাহান পরবর্তীকালে আলীয়া মাদ্রাসায় স্থাপিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটিকে জয়নগর হাইস্কুলে স্থানান্তর করে ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মাকসুদকে এর প্রধান নিয়োগ করেন বলে জানা যায়।

২৮ এপ্রিল একটি অনাকাঙ্ক্ষিত ও বিয়োগান্তক ঘটনা ঘটে যায়। এদিন আনুমানিক বেলা এগারোটা-সাড়ে এগারোটার সময় ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মাকসুদুর রহমানের নেতৃত্বে ছয় সদস্যের একটি মুক্তিযোদ্ধা দল মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার তহবিল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ভোলা ট্রেজারির দখল গ্রহণ করে। এ সময়ে এখানে অন্যান্য খাতের অর্থ ছাড়াও রিলিফ ফান্ডের প্রায় ৯ কোটি টাকা গচ্ছিত ছিল। 'ট্রেজারিতে ডাকাতি হচ্ছে' এমন একটি খবর বাইরে প্রচারিত হলে অপর একটি দল ট্রেজারির অভ্যন্তরে অবস্থানরত মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর রাইফেল দিয়ে গুলিবর্ষণ শুরু করে। বেশ কিছু সময় ধরে উভয় পক্ষের মধ্যে গুলি বিনিময়ের পর ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মাকসুদসহ অপর পাঁচজন মুক্তিযোদ্ধা ট্রেজারির অভ্যন্তরেই মৃত্যুবরণ করেন। জানা যায়, বরিশালের তৎকালীন এডিসি (কুমিল্লার চিওড়া কাজী বাড়ির) ঐ রিলিফ ফাণ্ডের দায়িত্বে ছিলেন। মুজিবনগর সরকার গঠিত হলে তিনি ট্রেজারিতে গচ্ছিত ঐ অর্থ মুজিবনগর সরকারের কাছে হস্তান্তর করার জন্য স্থানীয় নেতৃবৃন্দের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছিলেন। এই দেশপ্রেমিক সরকারি কর্মকর্তাকে পাকবাহিনী নির্মমভাবে হত্যা করে।

www.pathagar.com

২ মে ক্যাপ্টেন কায়ানীর নেতৃত্বে পাকবাহিনী ভোলার দখল নেয়। সে ও তার সহকর্মী সুবেদার নওয়াব হোসেন সমগ্র ভোলা মহকুমায় কায়েম করে এক ত্রাসের রাজত্ব। মুক্তিযোদ্ধারা শহর ছেড়ে গ্রামাঞ্চলে গিয়ে আত্মগোপন করে। এ সময়ে তাদের পুনর্গঠিত করার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন মাওলানা মাকসুদুর রহমান (জালাল মোক্তার সাহেবের ছেলে)। তিনি বাড়ি বাড়ি গিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের পুনরায় একত্রিত করেন। বাটামারায় হেদায়েত মোক্তার সাহেবের বাড়ির বাগানে মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধের সংগঠকদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় ভাষা সৈনিক আবদুল মোমিন, ছাত্র ইউনিয়নের নেতা এম. এ. তাহের, সমাজকর্মী মিয়া মোহাম্মদ ইউনুস, অধ্যাপক কায়সার, মাকসুদুর রহমান সাহেবের ছোট ভাই মিজান ও বাটামারার লতিফ পাটোয়ারীসহ প্রায় ২০/২৫জন উপস্থিত ছিলেন। এখানে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সুবেদার সিদ্দিকুর রহমানকে (হাই কমান্ড সিদ্দিক) মুক্তিবাহিনীর কমান্ডারের এবং অন্যান্যদের ওপর বিভিন্ন দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। পরবর্তীকালে আনসার অ্যাডজুট্যান্ট আলী আকবরও (বড় ভাই) মুক্তিবাহিনীর গঠন প্রক্রিয়া ও পরিচালনার সাথে যুক্ত হন।

দেউলার যুদ্ধ

১৯৭১ সালের ২২ অক্টোবর পাকবাহিনী দেউলা গ্রামে ঢুকে ৮০/৮৫টি বাড়ি আগুন দিয়ে ভস্মীভূত করে দেয়। কমান্ডার সিদ্দিকুর রহমান মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে পাকবাহিনীকে আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধ সারাদিন অব্যাহত থাকে এবং এ সময়ে ৬৪ জন পাকসেনাকে খতম করা হয়। ২৯ অক্টোবর মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দল বোরহানউদ্দিন থানা আক্রমণ করে। এই যুদ্ধে উভয় পক্ষে প্রচুর হতাহত হয়। এরপর পাকসেনারা গ্রামে গ্রামে ঢুকে অসংখ্য নিরীহ মানুষকে হত্যা করে।

ঘুইঙ্গার হাট ও টনিরহাটের (বাংলাবাজার) যুদ্ধ

ভোলা শহর থেকে প্রায় ১০/১১ কিলোমিটার দক্ষিণে এই টনিরহাট বা বাংলাবাজার। মোহাম্মদ টনি নামে নোয়াখালীর এক ব্যক্তি এখানে এসে একসময় রাস্তার পাশে বসতি স্থাপন করে এবং বাজার বসায়। ধীরে ধীরে এই ক্ষুদ্র বাজারটি বিরাট হাটে পরিণত হয় এবং 'টনিরহাট' নামে পরিচিতি লাভ করে।

আনসার অ্যাটজুট্যান্ট আলী আকবরের নেতৃত্বে একদল মুক্তিযোদ্ধা পাকবাহিনীকে আক্রমণ করার জন্য এখানে এসে অবস্থান নেয়। মোহাম্মদ টনি মুক্তিযোদ্ধাদের বেশ সম্মান ও আন্তরিকতার সাথে তার বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়ে গোপনে ভোলায় অবস্থিত পাকবাহিনীকে মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থানের সংবাদ পৌঁছে দেয়। ২৭ অক্টোবর ১৯৭১ পাকবাহিনী যথেষ্ট প্রস্তুতি নিয়ে টনিরহাটে এসে অতর্কিতে মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর আক্রমণ করে। মুক্তিযোদ্ধারাও পাকবাহিনীর আক্রমণের প্রত্যুত্তর দেয় এবং বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে তুমুল যুদ্ধ চলে। কিন্তু অবস্থানগত অসুবিধা এবং পাকবাহিনীর অতর্কিত আক্রমণের ফলে মুক্তিযোদ্ধারা এই যুদ্ধে পরাজয় বরণ করে। এই যুদ্ধে ৮০জন মুক্তিযোদ্ধা শাহাদাতবরণ করে। অনেক গ্রামবাসীও শহীদ হন। স্বাধীনতা লাভের পর বিশ্বাসঘাতক মোহাম্মদ টনিকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয় এবং টনিরহাটের নাম রাখা হয় বাংলাবাজার। টনিরহাটের যুদ্ধের সংবাদ পেয়ে দেউলার সিদ্দিকুর রহমান ভোলা

www.pathagar.com

থেকে ৪ কিলোমিটার দক্ষিণে ঘুইঙ্গারহাটে এসে অবস্থান নেয়। টনিরহাট যুদ্ধে জয়লাভ করে পাকবাহিনী যখন ঐ রাস্তা ধরেই ভোলায় ফিরছিলো, তখন দেউলার সিদ্দিকুর রহমান তাদের আক্রমণ করে। এই যুদ্ধে পাঁচজন পাকসেনা নিহত হয় এবং দলের অবশিষ্টরা পালিয়ে ভোলায় চলে আসে।

২৯ অক্টোবর মুক্তিবাহিনী দৌলতখান ও বোরহানউদ্দিন থানা আক্রমণ করে থানায় রক্ষিত অস্ত্রশস্ত্র ছিনিয়ে নেয়। টনিরহাটের যুদ্ধে পরাজয়বরণের পর মুক্তিবাহিনী ধীরে ধীরে লালমোহন, বোরহানউদ্দিন, তজুমুদ্দিন ও দৌলতখান দখল করে তাদের পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। মনপুরা বরাবরই 'মুক্ত এলাকা' ছিল। নভেম্বর মাসের দিকে পাকবাহিনী কার্যত ভোলা শহরে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। ১০ ডিসেম্বর তারা অনবরত গোলা বর্ষণ করতে করতে পালিয়ে যায় এবং ভোলা হানাদারমুক্ত হয়। এইদিন ঘরে ঘরে আবার উত্তোলন করা হয় বাংলাদেশের পতাকা।

মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল, সিপাহী, বীরশ্রেষ্ঠ। জন্ম : পশ্চিম হাজীপুর, দৌলতখান, ভোলা, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৪৭ (মতান্তরে ১৯৪৬)। বীরশ্রেষ্ঠ। পিতা : হাবিবুর রহমান। শৈশব থেকেই অত্যন্ত সাহসী ও ডানপিটে ছিলেন। শৈশব অতিবাহিত হয় কুমিল্লা সেনানিবাসে, হাবিলদার পিতার চাকরির সুবাদে। এ সময়েই সেনাবাহিনীর কঠোর নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা তাঁকে আকর্ষণ করে। ১৯৬৭ সালের ১৬ ডিসেম্বর কুড়ি বছর বয়সে বাড়ির সবার অগোচরে তদানীন্তন পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে যোগদান। প্রশিক্ষণ গ্রহণ শেষে চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে যোগদান। ১৯৭১ সালের মাঝামাঝি এই রেজিমেন্টকে কুমিল্লা সেনানিবাস থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় প্রেরণ করা হয়। তখন ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অস্থায়ী সদর দফতর ছিল আখাউড়ায়।

চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট মুক্তিযুদ্ধের শুরুতেই পাকিস্তান সেনাবাহিনী ত্যাগ করে এবং ২৭ মার্চ হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে। এই রেজিমেন্টের বিদ্রোহী সৈনিকদের মধ্যে সিপাহী মোস্তফা কামাল ছিলেন অন্যতম। যুদ্ধের শুরুতেই চতুর্থ বেঙ্গল রেজিমেন্ট ব্রাহ্মণবাড়িয়াকে ঘিরে আশুগঞ্জ, উজানীস্বর আর ব্রাহ্মণবাড়িয়া এন্ডারসন খালের পাশে তিনটি প্রতিরক্ষা ঘাঁটি গড়ে তোলে। এর মধ্যে আশুগঞ্জের ঘাঁটিতে দুই কোম্পানি আর বাকি দুটির প্রত্যেকটিতে এক কোম্পানি করে সৈন্য ছিল। শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য দুই নম্বর প্লাটুনকে গঙ্গসাগরের উত্তরে দরুইন গ্রামে মুক্তিযোদ্ধা শিবিরে অবস্থানের নির্দেশ দেয় আখাউড়ায় অবস্থানরত চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট। সিপাহী মোস্তফা কামাল এই দুই নম্বর প্লাটুনের সঙ্গে ছিলেন।

১৬ এপ্রিল ১৯৭১ চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করার অভিপ্রায়ে পাকবাহিনী কুমিল্লা-আখাউড়া রেললাইন ধরে উত্তরদিকে অগ্রসর হতে থাকে। পরদিন ১৭ এপ্রিল ভোরের দিকে পাকবাহিনী দরুইন গ্রামে অবস্থানরত মুক্তিবাহিনীর ওপর মর্টার ও আর্টিলারির প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ শুরু করে। পাকবাহিনীর তুলনায় নিজেদের প্রতিরক্ষা যথেষ্ট শক্তিশালী নয় বুঝতে পেরে মেজর শাফায়াত জামিল কোম্পানির ১১ নং প্লাটুনকে দরুইন গ্রামে অবস্থানরত আগের প্লাটুন অর্থাৎ দুই নম্বর প্লাটুনের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য হাবিলদার মুনির আহমেদকে নির্দেশ দেন। ১৭ এপ্রিল হাবিলদার

www.pathagar.com

মুনির আহমদ ১১ নং প্লাটুনসহ দরুইন পৌছেন। সিপাহী মোস্তফা কামাল তার কাছ থেকে প্রয়োজনীয় গুলি সংগ্রহ করে নিজ বাঙ্কারে অবস্থান নেন। তিনদিন প্রতীক্ষার পর প্রতিরক্ষা এলাকায় খাবার আসে। কিন্তু সিপাহী মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল খাবার নিতে না এসে বাঙ্কারেই অবস্থান করতে থাকেন।

বেলা ১১টার দিকে শত্রুপক্ষের প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ শুরু হয়। সাড়ে এগারোটার দিকে মোগরা বাজার ও গঙ্গাসাগরের দিক থেকে এবং বারোটার দিকে পশ্চিম দিক থেকে সরাসরি আক্রমণ করে পাকহানাদার বাহিনী। আক্রমণের আকস্মিকতা ও তীব্রতায় হতবিহ্বল হয়ে পড়ে আমাদের বাহিনী। কিন্তু অসমসাহসী সিপাহী মোস্তফা কামাল উপর্যুপরি পাল্টা আঘাত হানতে থাকেন। তাঁর পূর্বদিকের সৈনিকেরা তখন পেছনে সরে গিয়ে নতুন অবস্থানের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। মোস্তফাকেও তাদের সঙ্গে চলে আসার জন্য সবাই অনুরোধ জানালে মোস্তফা প্রত্যুত্তরে জানায় যে, পরিস্থিতি এমনই দাঁড়িয়েছে যে, সবাই যদি বাঁচতে চায় তাহলে কেউই বাঁচবে না। তার আশা যেন তারা ত্যাগ করেন। মোহাম্মদ মোস্তফা শত্রুসেনার ওপর এলএমজি থেকে অবিরাম গোলাবর্ষণ করতে থাকেন। তিনি জানতেন, গোলাবর্ষণ বন্ধ করলে পাকবাহিনী তার সঙ্গীদের পিছু ধাওয়া করবে এবং পুরো বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলবে। এ সময়ে পাকবাহিনীর অবস্থান মাত্র ৭০ গজের মধ্যে এবং ইতোমধ্যে স্বপক্ষের ৯ জন শাহাদতবরণ করেছেন এবং অনেকে আহত হয়েছেন। এমন অবস্থায় নিজের মৃত্যু অবধারিত জেনেও বীর মোস্তফা গুলিবর্ষণ অব্যাহত রেখে পাকবাহিনীকে ঠেকিয়ে রেখে সহযোদ্ধাদের নিরাপদ স্থানে পৌছে যাওয়ার সুযোগ করে দেন। এক সময়ে গুলি শেষ হয়ে যায়। পাকবাহিনী সিপাহী মোহাম্মদ মোস্তফাকে ঘিরে ফেলে এবং তাদের গোলার আঘাতে তিনি লুটিয়ে পড়েন মাটিতে। মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও তিনি বিন্দুমাত্র ভয় পাননি, আত্মসমর্পণও করেননি। যতক্ষণ গুলি ছিল ততক্ষণ অবিরাম যুদ্ধ করেছেন, যুদ্ধ করতে করতে শাহাদতবরণ করলেন মোহাম্মদ মোস্তফা। নিজের জীবন দিয়ে বাঁচিয়ে গেলেন একটি কোম্পানিকে। দেশের জন্য, সহযোদ্ধাদের জন্য জীবন উৎসর্গ করার এমন অদম্য আকাঙ্ক্ষা বাংলাদেশের ইতিহাসে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। মৃত্যু : দরুইন গ্রাম, ১৭ এপ্রিল ১৯৭১।

নিম্নে ভোলা জেলার বিভিন্ন উপজেলায় ১৯৭১ সালে সংঘটিত মুক্তিযুদ্ধে শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের পদবিসহ নাম বর্ণিত হলো :

ভোলা জেলার শহীদ মুক্তিযোদ্ধা

ভোলা সদর উপজেলা

আজাহার উদ্দিন, চরভেদুরিয়া (ইপিআর-এ কর্মরত ছিলেন)

আমিনউদ্দিন, ডাক্তার (পৌর নবীপুর).

আবদুল আউয়াল (ইপিআর-এর নায়েক, কুমিল্লা সেনানিবাসে শাহাদাতবরণ)

আবদুল খালেক, চরসামাইয়া

আবদুল ওয়াদুদ, রতনপুর (ইপিআর-এর হাবিলদার, রংপুরে শাহাদাতবরণ)।

আবদুল গফুর, চরকুমারিয়া, উত্তর দিঘলদি

www.pathagar.com

আবদুল মজিদ, চরভেদুরিয়া
আবদুল মান্নান, চরকুমারিয়া, উত্তর দিঘলদি
আবদুল হক, দক্ষিণ দিঘলদি
আমিনুল ইসলাম, রামদাসপুর
আবদুল জব্বার বেপারী, দক্ষিণ দিঘলদি
আবদুর রহমান, চর সিফলি, ভোলা সদর
আবদুর রাজ্জাক, কাচিয়া
আবুল হোসেন, ডা., দক্ষিণ দিঘলদি
আলী হোসেন, বাপ্তা (ইপিআর-এ কর্মরত ছিলেন, যশোরে শাহাদাতবরণ)
আশুতোষ পাল, ভোলা শহর
এ. কে. এম. জুলফিকুল আলম, (জুলু) ভোলা পৌরসভা
এম. এ. সাদেক, দক্ষিণ ইলিশা (ঢা. বি. ল্যাবরেটরি স্কুলের শিক্ষক, ২৫ মার্চ রাতে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার ফুলার রোডে শাহাদাতবরণ)
ওমর ফারুক, চরকালী
কিশোরী মোহন দে মাস্টার, বাপ্তা
খলিলুর রহমান, চরকুমারিয়া, উত্তর দিঘলদি
খলিলুর রহমান, গজারিয়া
ছিদ্দিকুর রহমান, চরসিফলি, চর সামাইয়া
জালালউদ্দিন, ভবানীপুর
জামালউদ্দিন, ভবানীপুর (?)
দেওয়ান হোসেন, চরকুমারিয়া (মংলাপোর্টে সম্মুখযুদ্ধে শাহাদাতবরণ)
দুলালকান্তি দাস, ভোলা
নগেন্দ্রনাথ সেন, আলীনগর
ননীগোপাল দাস, আলীনগর
নূরুল ইসলাম, ভোলা
নূরুল ইসলাম, আলীনগর
ফরিদ উদ্দিন, রতনপুর (কুমিল্লা সেনানিবাসে শাহাদাতবরণ)
মওলানা আবদুস সোবহান হায়দরী, রতনপুর
মতিয়ূর রহমান, ভবানীপুর (চট্টগ্রাম সেনানিবাসে শাহাদাতবরণ)
মতিলাল সাহা, ভোলা সদর
মাহবুব হাসান খান, কালীবাড়ি, ভোলা সদর
মাহে আলম, ঘুইঙ্গারহাট যুদ্ধে শাহাদাতবরণ)
মুনাব আলী, দক্ষিণ দিঘলদি
মুহাম্মদ হোসেন, চর ভেদুরিয়া
মোহাম্মদ ইউনুস, দক্ষিণ দিঘলদি, (সেনা সদস্য)
মোহাম্মদ ইয়াসিন সিকদার, দক্ষিণ দিঘলদি
মোহাম্মদ ছাইফুল্লাহ মাস্টার, আবহাওয়া রোড, ভোলা পৌরসভা
মোহাম্মদ বিল্লাল, দক্ষিণ দিঘলদি

www.pathagar.com

মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল, বীরশ্রেষ্ঠ, সাহেবের কাছারি, আলীনগর, ভোলা (৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সিপাহি। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল কুমিল্লা জেলার তেলিয়াপাড়া ও গঙ্গাসাগর এলাকায় পাকবাহিনীর সাথে সম্মুখযুদ্ধে শাহাদাতবরণ)
মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, আলগী, ধনিয়া, ভোলা সদর
মোহাম্মদ শাজাহান (সেনা সদস্য), কালীবাড়ি রোড, ভোলা
মোহাম্মদ শাহে আলম, চরকুমারিয়া, ১নং ওয়ার্ড, ভোলা সদর (ঘুইঙ্গারহাট যুদ্ধে শাহাদাতবরণ)
মোহাম্মদ সালাম, উত্তর দিঘলদি
মোহাম্মদ সালেক, মুসলিম পাড়া, ভোলা পৌরসভা (আনসার সদস্য)
মোহাম্মদ সালেহ্ আহমদ, ১ নং ওয়ার্ড, ভোলা পৌরসভা
মোহাম্মদ সিরাজ, উত্তর দিঘলদি (টনিরহাট যুদ্ধে শাহাদাতবরণ)
মোহাম্মদ হানিফ, চরনোয়াবাদ, বাপ্তা
মোহাম্মদ হারুন-অর-রশিদ, চরকুমারিয়া, উত্তর দিঘলদি
যোগীন্দ্র বৈদ্য, আলীনগর
সজনীবালা সাহা, ভোলা শহর
সহদেব চন্দ্র হালদার, আলীনগর
সুবোধকুমার সাহা, ভোলা শহর
সেকান্দার আলী, দক্ষিণ দিঘলদি
সৈয়দ আহমদ, ডাক্তার, দক্ষিণ দিঘলদি
হরিমোহন কর্মকার, দক্ষিণ দিঘলদি
হরিনারায়ণ সেন, বরাইপুর
হরিপদ দাস, আলীনগর

দৌলতখান উপজেলা

আবদুল লতিফ, চরপাতা
আবদুল মালেক, বামনপুর (নবম সেক্টরে যুদ্ধে শাহাদাতবরণ)
আবদুর রশিদ খান, দিদারুল্লাহ্ (ইপিআর সেনা)
আশরাফুল আসাদ মজনু, চরমানিকা (টনিরহাট যুদ্ধে শাহাদাতবরণ)
আবুল ফারাহ, দক্ষিণ সিমাপুর (ইপিআর-এর নায়েক)
আবুল বশির খান, দিদারুল্লাহ্ (ইপিআর সেনা, রাঙ্গামাটিতে শহীদ)
ইউনুস মাস্টার, পশ্চিম জয়নগর
ওবায়দুল হক, দক্ষিণ সৈয়দপুর
কাজী রুস্তম আলী, চরলামছিপাতা
কৃষ্ণকান্ত দেবনাথ, কলাখোলা (কমলাখোলা?)
গোলাম কিবরিয়া, কালিয়া (মীরপুরে শাহাদাতবরণ)
জয়নাল আবেদীন, দিদারুল্লাহ (ল্যান্স নায়েক, ২৮ মার্চ দিনাজপুরে শাহাদাতবরণ)
তছির আহমদ, চরপাতা দায়েরাবাড়ি (ল্যান্স নায়েক, রাজশাহীতে শাহাদাতবরণ)
ফরিদউদ্দিন, মধ্য জয়নগর
বশির আহমেদ, চরগুমানি (ঘুইঙ্গারহাট যুদ্ধে শাহাদাতবরণ)

www.pathagar.com

মুহম্মদ আলমগীর, মধ্য জয়নগর
মোহাম্মদ হাফেজ, চর খলিফা
শফিকুল ইসলাম, মেদুয়া
শামসুল হক জমাদার, মেদুয়া
শাহ আলম, দিদারুল্লাহ (হাবিলদার, ৪ নং সেক্টরে যুদ্ধে শাহাদাতবরণ)
সিরাজুল ইসলাম, চরপাতা (ইপিআর সেনা)
সেলিনা আক্তার, উত্তর জয়নগর

তজুমুদ্দিন উপজেলা

আবদুল মান্নান, আড়ালিয়া চাঁদপুর (ইপিআর-এর নায়েক, কুমিল্লা সেনানিবাসে শাহাদাতবরণ)
আবদুল মান্নান, শশীগঞ্জ (ইপিআর সেনা, কুমিল্লায় শাহাদাতবরণ)
আবুল কাশেম, আড়ালিয়া চাঁদপুর (ল্যান্স নায়েক, ঢাকা সেনানিবাসে শাহাদাতবরণ)
কল্পনা বালা শীল, দক্ষিণ জয়পুর (ঢাকায় নিহত)
কালীপ্রসন্ন মজুমদার
কৃষ্ণচন্দ্র
জহিরুল হক, শশীগঞ্জ (ইপিআর-এর নায়েক, কুমিল্লায় শাহাদাতবরণ)
ননীগোপাল মজুমদার, আড়ালিয়া

বোরহানউদ্দিন উপজেলা

আজাহার বেপারী, বড় মানিকা
আসলাম আলী সিকদার, গঙ্গাপুর
আবদুর রাজ্জাক, বড় মানিকা
আবুল কাশেম, কুঞ্জেরহাট
আবুল কাশেম, বাটামারা (টনিরহাট যুদ্ধে শাহাদাতবরণ)
আবু আবদুল্লাহ, কাচিয়া
ইদ্রিস, বড় মানিকা, (টনিরহাট যুদ্ধে শাহাদাতবরণ)
ইদ্রিস, বড় মানিকা ?
গোলাম রসুল, কাচিয়া (চট্টগ্রামে শাহাদাতবরণ)
জোবল হক ফকির, জয়া
তাজুল ইসলাম, কাচিয়া (চট্টগ্রামে শাহাদাতবরণ)
তোফাজ্জেল হক, বড় মানিকা
তোফাজ্জেল হোসেন (ইপিআর-এর নায়েক, চট্টগ্রামে শাহাদাতবরণ)
নান্নু মিয়া, কাচিয়া
নিতাই চন্দ্র দে, পক্ষীয়া
নূরুল আসলাম, রামকেশর
নূরুল ইসলাম, গঙ্গাপুর
নূরুল হক, জয়া
মুজিবুল হক, পক্ষীয়া

www.pathagar.com

মল্লিকা খাতুন, চরগাজীপুর
মাহবুব আলম, বড় মানিকা (ছাত্র)
মোখলেছুর রহমান (ইপিআর সেনা, কুমিল্লায় শাহাদাতবরণ)
মোতাহার আলী, কাচিয়া
মোস্তাফিজুর রহমান, উত্তর বাটামারা (সৈয়দপুরে শাহাদাতবরণ)
মোহাম্মদ ইউসুফ, কুতবা
মোহাম্মদ ইয়াসিন, টবগী (ইপিআর সেনা)
মোহাম্মদ সাদেক, উত্তর বাটামারা (রাজশাহীতে যুদ্ধে শাহাদাতবরণ)
মোহাম্মদ হানিফ, লক্ষ্মীপুর
শামসুল হক, বাটামারা
শামসুদ্দিন ঢালী, লক্ষ্মীপুর
সুলতান আহমদ, হাসাননগর
সৈয়দ আহমদ, বাটামারা
সৈয়দ আহমদ, পোস্ট মাস্টার, দালালপুর
হাছন আলী, চরটিকিয়া (চরটিটিয়া?)
হাজী আসমত আলী, বড় মানিকা

লালমোহন উপজেলা

আওলাদ হোসেন, গজারিয়া
আবদুল কাদের, দেবীরচর
আবদুর রশিদ, রায়চাঁদ
আবু সুফিয়ান, ধলিগৌরনগর
আবুল হোসেন, পশ্চিম চর উমেদ
আবু সাঈদ (যুদ্ধে শহীদ)
তানসেন মিয়া, দেবীরচর (কুতবা গ্রামে সংঘটিত যুদ্ধে শাহাদাতবরণ)
নূরুল ইসলাম, লালমোহন (হাবিলদার, চট্টগ্রামের কালুরঘাট যুদ্ধে শাহাদাতবরণ)
পরাণ বল্লভ, গজারিয়া
মকবুল খন্দকার, চরভূতা (থানা আক্রমণের সময় শাহাদাতবরণ)
মনোরঞ্জন পাল, লালমোহন
রফিকুল ইসলাম, বাদরের চর (ইপিআর সেনা, যশোরে শাহাদাতবরণ)
সিরাজুল হক, গজারিয়া বাজার

চরফ্যাশন উপজেলা

জালাল আহমদ মাস্টার, চরযমুনা (১৫ সেপ্টেম্বর ভোলা খেয়াঘাটে শাহাদাতবরণ)
জালালউদ্দিন মানিক, চরমানিক
নাসির আহমদ, চরযমুনা
ফজলুর রহমান, চরমাদ্রাসা (হাবিলদার, সিলেটে সম্মুখ যুদ্ধে শাহাদাতবরণ)
বিনোদ বিহারী মজুমদার, জিন্নাগড়
মধুসূদন মণ্ডল, চর নাজিমউদ্দিন

www.pathagar.com

মনিকৃষ্ণ ভক্ত, চর নাজিমুদ্দিন
মহেন্দ্র মণ্ডল, চর নাজিমুদ্দিন
মোহাম্মদউল্লাহ, চর তোফাজ্জল
রাধাগোবিন্দ দেবনাথ, জিন্নাগড়
শুভচন্দ্র দেওয়ান, চর নাজিমুদ্দিন
হাচন আলী, চর আফজাল
(১৯৭১ সালের ২৬ মে পাকবাহিনী চর নাজিমুদ্দিন গ্রামের অনেক নিরীহ মানুষকে হত্যা করে। এদের অনেকের নাম জানা এখন আর সম্ভব হচ্ছে না)।

ধ. জেলার স্মরণীয়-বরণীয় ব্যক্তি

আজগর আলী উকিল॥ জন্ম : কুচিয়ামোড়া, ভোলা, ১৬ ফাল্গুন ১২৬৯ (১৮৬২)। ভোলার প্রথম গ্রাজুয়েট। ১৩০১ সনে কলকাতার রিপন কলেজ থেকে সংস্কৃতসহ বি.এ. ও ১৩০৩ সালে বিএল ডিগ্রি অর্জন। ১৩০৫ থেকে ১৩৪৫ সন পর্যন্ত বরিশাল জজকোর্টে আইন পেশায় নিয়োজিত। বরিশাল কংগ্রেসের সভাপতির দায়িত্ব পালন। শেরে বাংলার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। মৃত্যু : ১৭ অগ্রহায়ণ ১৩৫২ সন।

আজিজউদ্দিন আহমেদ এম.এ.বিএল॥ জন্ম : মদনপুর গ্রাম, দৌলতখান, ১৮৯৮ (মতান্তরে ১৮৯৭)। রাজনীতিবিদ, লিয়াকত আলী খানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার মন্ত্রী। পিতা : মৌলভী আবদুল লতিফ। বরিশাল জেলা স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক এবং এই পরীক্ষায় তৎকালীন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্যে শতকরা ৮৫ নম্বর পাওয়ায় স্বর্ণপদক লাভ। বরিশাল বি.এম. কলেজ থেকে আই.এ. পাস করার পর আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এ সময়ে তিনি প্রখ্যাত চিন্তাবিদ ও মুসলমানদের অন্যতম নেতা মাওলানা মোহাম্মদ আলীর নিবিড় সংস্পর্শে আসেন। পরবর্তীকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভতি হন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে বি.এ. অনার্স ও এমএবিএল ডিগ্রি লাভ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বিশিষ্ট ছাত্রনেতা ও বক্তা হিসেবে খ্যাতি অর্জন। ১৯২৭ সালে আইনজীবী হিসেবে বরিশাল বারে যোগদান। বরিশাল বার সমিতির প্রথম নির্বাচিত মুসলিম সেক্রেটারি। রাজনীতিতে যোগদান এবং শেরে বাংলা একে ফজলুল হক ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ। বরিশাল জেলা মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ও পরে সভাপতি। পাকিস্তান আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন। ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক 'খান বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত হলেও ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে জড়িত থাকার কারণে ঐ খেতাব প্রত্যাখ্যান। ১৯৪৯ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে এবং কমনওয়েলথ সম্মেলনে তৎকালীন পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করেন। তদানীন্তন পাকিস্তানের প্রথম গণ-পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। ১৯৫১ সালে লিয়াকত আলী খানের মন্ত্রীসভায় যোগদান ও ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত ঐ মন্ত্রিসভার সংখ্যালঘু দফতরের মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন। পরবর্তীকালে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর অনুরোধে আওয়ামী লীগে যোগদান এবং ১৯৫৮ সালে অনুষ্ঠিত তদানীন্তন পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের উপনির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে

www.pathagar.com

জয়লাভ। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের সামরিক আইন জারির পর রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ এবং ঢাকা হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টে আইন ব্যবসায়ে যোগদান। ১৯৬১ সালে গঠিত শাসনতন্ত্র কমিশন ও পুলিশ কমিশনের সদস্য। ১৯৬২ সালে দেশ সেবার স্বীকৃতি হিসেবে সিতারা-ই-পাকিস্তান উপাধিতে ভূষিত।

জনাব আজিজউদ্দিন আহমদ ভোলার প্রথম ব্যক্তিত্ব যিনি প্রথম কোনো মন্ত্রীসভায় যোগ দেওয়ার গৌরব অর্জন করেন। মৃত্যু : ১০ জুলাই ১৯৬৮।

আজিজুর রহমান, মৌলভী॥ জন্ম : বাপ্তা গ্রাম, ভোলা সদর, ৪ আশ্বিন ১২৭৯। সফল পঞ্চায়েত ও ন্যায় বিচারক। পিতা : মুন্সি আবদুল হাকিম। আরবি শিক্ষালাভ শেষে জৌনপুরী পীর সাহেবদের সান্নিধ্য লাভ এবং পরবর্তীকালে এই অঞ্চলে তাদের খলিফা মনোনীত। উপমহাদেশের প্রখ্যাত আধ্যাত্মিক সাধক ও আলেম জৌনপুরের মাওলানা কেরামত আলীর (র.) জ্যেষ্ঠপুত্র ছিলেন হযরত মাওলানা হাফেজ আহমদ (র.)। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র হযরত মাওলানা আবদুর রবের জ্যেষ্ঠ পুত্র হাফেজ মাওলানা হোসাইন আহমদ আজকারী ও তাঁর পুত্র হাফেজ মাওলানা হাসনাইন আহমদ জৌনপুর থেকে ভোলায় এলে শত ব্যস্ততার মধ্যেও মৌলভী আজিজুর রহমানের বাড়িতে একবার যেতেনই। এ দেশে পঞ্চায়েতী প্রথা চালু হওয়ার পর থেকেই পঞ্চায়েত পদের দায়িত্ব লাভ এবং পরবর্তীকালে প্রেসিডেন্ট ও চেয়ারম্যান পদ্ধতি চালু হওয়ার পর সুদীর্ঘ ৫০ বছর দায়িত্ব পালন। একজন সফল ও ন্যায় বিচারক হওয়ার সুবাদে বরিশাল জজকোর্টের জুরার-এর দায়িত্ব লাভ।

১৩৪০ সনে এই এলাকার ওপর দিয়ে যে প্রলয়ংকরী বন্যা, ঝড় ও জলোচ্ছ্বাস বয়ে যায়, সে সময় অসংখ্য লোক প্রাণ হারায়। অবশিষ্ট মানুষ মহামারি ও দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হয়। এ সময়ে চরম দুর্দশাগ্রস্ত ও দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের সাহায্যার্থে মৌলভী আজিজুর রহমানের ব্যক্তিগত উদ্যোগে তাঁর বাড়িতে লঙ্গরখানা খোলা হয়। শতাধিক বছর পূর্বে তিনি তাঁর বাড়িতে একটি পাকা মসজিদ নির্মাণ করেন এবং বাড়ির ও গ্রামের মেয়েদের শিক্ষাদানের জন্য একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই সর্বজনশ্রদ্ধেয় সফল সমাজপতি ও ন্যায়বিচারক ১৩৭২ সনের ৩০ কার্তিক ৯৬ বছর বয়সে ইনতেকাল করেন।

রচিত গ্রন্থ : বেনামাজীর পুঁথি (কলকাতা থেকে প্রকাশিত)।

আবদুল মমিন মিয়া ॥ জন্ম : উকিলপাড়া, ভোলা, ১৯৩৩। ভাষাসংগ্রামী। পিতা : খান বাহাদুর নূরুজ্জামান, এমএলএ। ১৯৪৯ সালে ভোলা সরকারি হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক। ১৯৫১ সালে কলকাতা সেন্ট গেভিয়ার্স কলেজে অধ্যয়নকালীন কলেজ হোস্টেলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রুমমেট ছিলেন। ভাষা আন্দোলনে ভোলা ও বরিশালের ছাত্রদের নেতৃত্ব দান। ২১ ফেব্রুয়ারি ভোলায় কড়া পুলিশি পাহারা উপেক্ষা করে মিছিলে নেতৃত্ব দান। ২২ ফেব্রুয়ারি খলিফা পট্টি মসজিদে শাহ্ মতিয়ার রহমান এমএলএ-র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সভায় ভোলা টাউন স্কুলের তৎকালীন শিক্ষক আবদুল মোমিন বক্তব্য প্রদান করেন। ভাষা আন্দোলনের সাথে জড়িত থাকার অপরাধে টাউন স্কুলের শিক্ষকতার চাকরি থেকে তাঁকে অপসারণ করা হয়। স্কুল পরিদর্শক এক

www.pathagar.com

তারবার্তায় তাঁকে জানান যে, 'জনাব আবদুল মমিনের শিক্ষকতার চাকুরির আর প্রয়োজনীয়তা নেই।' মৃত্যু : ১৯৯৪।

কেরামত আলী ॥ জন্মতারিখ অজ্ঞাত। বিশারামপুর, মৃজাকালু। লবণ আন্দোলনে শহিদ। ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক স্থানীয়ভাবে প্রস্তুতকৃত লবণের ওপর কর বৃদ্ধি ও লবণ উৎপাদনের ওপর বিধিনিষেধ আরোপের প্রতিবাদে মিছিলে অংশগ্রহণ। ১৩৩০ সনের ১লা বৈশাখ মৃজাকালুর অনুশীলন কর্মী যোগেশচন্দ্র ও কংগ্রেসনেতা সুরেশচন্দ্রের নেতৃত্বে মিছিল লবণ নিয়ে ভোলার বাজারে আসার পথে মৃজাকালুর জগন্নাথপুরে সরকার প্রেরিত গুর্খা সৈন্যের মুখোমুখি হয়। এ সময় মিছিলের ওপর গুর্খা বাহিনীর গুলিতে প্রতিবাদী জনতার মধ্যে পেয়ারপুরের কোরবান আলী ও বিশারামপুরের কেরামত আলী ঘটনাস্থলেই শাহাদতবরণ করেন।

খান বাহাদুর মোহাম্মদ নূরুজ্জামান ॥ জন্ম : বিজয়পুর, দৌলতখান, ১৮৯১। আইনজীবী, রাজনীতিবিদ, সমাজসেবী। ১৯১৪ সালে ভোলা কোর্টে আইন পেশায় যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবনের শুরু। ১৯৪৬ থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত নির্বাচিত এমএলএ। ১৯৩৭ সালে 'খান বাহাদুর' ও ১৯৪১ সালে MBE (Mermber of the British Empire) খেতাবে ভূষিত। সরকার তাঁকে চর নীলকমলে প্রচুর জমি দান করেছিলেন, যা দুর্ভিক্ষের সময় বিক্রি করে দিয়ে সমুদয় অর্থ অনাহারী মানুষদের জন্য লঙ্গরখানা পরিচালনায় ব্যয় করেন। তিনি সবসময় বলতেন, 'আমার যা কিছু আছে সব আমি গরিব-দুঃখীদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে শূন্য হাতে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে চাই।' আর বাস্তবেও খান বাহাদুর নূরুজ্জামান তাই করেছেন। মৃত্যু : ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৭১।

তোফায়েল আহমেদ চৌধুরী॥ জন্ম : গঙ্গাপুর, বোরহানউদ্দিন, ১৮৯২। রাজনীতিবিদ, সমাজসেবী। পিতা : আবদুল ওয়াহাব চৌধুরী, মাতা : নজিমুন নেসা। আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. ডিগ্রি লাভ। শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের একনিষ্ঠ কর্মী ও সুবক্তা। অসহযোগ আন্দোলন ও ব্রিটিশবিরোধী সকল আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ। ১৯৩৬ (৩৭?) সালে কৃষক-প্রজা পার্টির এবং ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে এমএলএ নির্বাচিত।

তোফায়েল আহমদ চৌধুরী ছিলেন প্রজাদরদী জমিদার। জমিদার হয়েও জমিদারি প্রথাকে তিনি মনে-প্রাণে ঘৃণা করতেন। প্রজাদের কল্যাণসাধন ছিল তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। জমিদারদের স্বভাবসিদ্ধ রীতি অনুযায়ী তাঁর পিতা ওয়াহাব চৌধুরী খাজনার দায়ে প্রজাদের জমি-জিরাত নিলামে ওঠাতেন, কিন্তু এটা কোনোভাবেই মেনে নিতে পারেননি তোফায়েল আহমেদ চৌধুরী। তাই পিতার মৃত্যুর পর ক্ষতিগ্রস্ত প্রজা যারা যারা তাঁর কাছে এসে এ ব্যাপারে আবেদন জানিয়েছে, তাদের প্রত্যেককে তিনি জমি ও বসতবাড়ি ফিরিয়ে দিয়ে পুনর্বাসন ও জীবনধারণের ব্যবস্থা করেছেন। তাঁর নিকটাত্মীয়রা এ ব্যাপারে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে পরবর্তী বংশধরদের কারো কারো অর্থনৈতিক দুরবস্থার কথা স্মরণ করিয়ে দিলে তিনি স্পষ্ট জবাব দিতেন, 'সুদের টাকার জমিদারি থাকা উচিত নয়, আর থাকবেও না। ছেলেমেয়েদের রেজেকের মালিক একমাত্র আল্লাহ্।' মৃত্যু : ১৯৫৪।

www.pathagar.com

দরবেশ আলী মহাজন, হাজী ॥ জন্ম : ১৮৬২। সমাজসেবী, দানশীল। ভোলা যুগীরঘোলের ঈদগাহ্, ঈদগাহ কমপ্লেক্সের মসজিদ, ঈদগাহসংলগ্ন আবদুর রব হাইস্কুল, (সাবেক এ. রব হাই মাদ্রাসা) ও পুকুরের জন্য প্রয়োজনীয় জমি দান করে এক মহান দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। শুধু তাই নয়, মসজিদটি যাতে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে চলতে পারে, সেজন্য কয়েক লক্ষ টাকারর (সে সময়ের হিসেবে) সম্পত্তি ওয়াক্ফ করে দিয়ে যান। মৃত্যু : ১৯২৪, নিজ বাড়িতে।

নলিনী দাস (নলিনী মোহন দাস) ॥ জন্ম : দাদপুর, উত্তর শাহবাজপুর, বরিশাল, ১ জানুয়ারি ১৯১০। বিপ্লবী, ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের সৈনিক। পিতা : দুর্গামোহন দাস। ভোলা সরকারি বিদ্যালয় থেকে ১৯২৮ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাস। বরিশাল বিএম কলেজে আইএসসিতে ভর্তি। পরীক্ষা দেওয়ার আগেই কলকাতা মেছুয়া বাজার বোমা হামলার মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হলে তিনি আত্মগোপন করেন।

১৯২১ সালে পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র থাকাকালীন রাজনৈতিক জীবনের শুরু। এ সময় কংগ্রেস ও খেলাফত কমিটির আহ্বানে পালিত হরতাল ও ধর্মঘটে অংশগ্রহণ ও ভোলায় গ্রেফতার বরণ ও পরে মুক্তিলাভ। ১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বরে কলকাতার পুলিশ কমিশনার টেগার্ট হত্যা প্রচেষ্টা মামলায় মুক্তি পেলেও সরকারের নির্দেশে গ্রেফতার ও প্রেসিডেন্সি জেলে প্রেরণ। ১৯৩১ সালে হিজলী ক্যাম্পে পাঠানো হয়। এ বছরের ১৬ সেপ্টেম্বর এই জেলে রাজবন্দিদের ওপর গুলিবর্ষণ করার পর কলকাতার সন্তোষ মিত্র ও বরিশালের তারকেশ্বর সেনগুপ্ত নিহত হলে ডিসেম্বর মাসে জেল থেকে পলায়ন। ১৯৩২ সালে টেগার্ট হত্যা প্রচেষ্টা মামলায় যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামি দীনেশ মজুমদার ও ওয়াটসন হত্যা প্রচেষ্টা মামলার আসামী হীরেন রায় ও নলিনীদাসের চন্দননগরের বাড়ি পুলিশ কর্তৃক ঘেরাও। চন্দননগরের রাস্তায় চার ঘণ্টা ধরে পুলিশের সাথে এই তিন বিপ্লবীর গুলি বিনিময়। এই সংঘর্ষে পুলিশ কমিশনার কিউ নিহত, বীরেন রায় গ্রেফতার ও আহত অবস্থায় দীনেশ মজুমদার ও নলিনীদাসের পলায়ন। ১৯৩৩ সালের ২২ মে কলকাতার কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের বাড়িতে বিপ্লবীকর্মী নারায়ণ ব্যানার্জী, দীনেশ মজুমদার ও জগদানন্দ মুখার্জীসহ নলিনী দাস পুলিশ কর্তৃক ঘেরাও। পুলিশের সাথে পুনরায় খণ্ডযুদ্ধ ও আহত অবস্থায় নলিনীদাসসহ অন্যান্য বিপ্লবী ধৃত। মামলায় দীনেশ মজুমদারের ফাঁসি এবং নলিনী দাস ও জগদানন্দ মুখার্জীকে যাবজ্জীবন দীপান্তর দণ্ড দান করে ১৯৩৪ সালের মে মাসে ব্রিটিশ ভারতের কুখ্যাত জেল আন্দামানের সেলুলার জেলে প্রেরণ। জেলখানায় নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন ও বারবার অনশন। জেলখানার অভ্যন্তরে 'বিপ্লবী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ও পড়াশোনায় আত্মনিয়োগ। এ সময়ে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট মতবাদের দীক্ষা গ্রহণ। দেশে ফিরিয়ে আনার দাবিতে কারাভ্যন্তরে এবার আমরণ অনশন শুরু। ভারতব্যাপী আন্দোলনের চাপে ১৯৩৮ সালের ১১ জানুয়ারি আন্দামান থেকে কলকাতায় প্রেরণ।

১৯৩৮ সাল থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত বেশকিছু রাজবন্দিকে মুক্তিদান করা হলেও 'ভয়ানক বিপ্লবী' হিসেবে চিহ্নিত করে নলিনী দাসসহ ৩০ জন রাজবন্দিকে আটক রাখা হয় এবং প্রেসিডেন্সি, আলীপুর, দমদম প্রভৃতি জেলে স্থানান্তর করা হয়। ১৯৪৬ সালে

www.pathagar.com

কলকাতায় নৃশংস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় জেলের অভ্যন্তরে থেকেই 'সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি' গঠন। রাজবন্দিদের মুক্তির দাবিতে কমিউনিস্ট পার্টিসহ অন্যান্য বামপন্থি সংগঠনসমূহের আন্দোলনের মুখে ১৯৪৬ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক নলিনী দাসকে মুক্তি দান। মুক্তিলাভের পর নিজের জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করে দাঙ্গা উপদ্রুত এলাকায় ঘুরে ঘুরে 'দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি' গঠন। দেশবিভাগের পরপরই তৎকালীন মুসলিম লীগ সরকার কর্তৃক নলিনী দাসের বিরুদ্ধে পুনরায় গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি।

১৯৫০ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়ে বরিশালের বাবুগঞ্জ থানার বাকুদিয়া গ্রামে কৃষকদের নিয়ে একটি সভা করার সময় দাঙ্গাকারীরা নলিনী দাসকে পুলিশের হাতে তুলে দেয় এবং তার বিরুদ্ধে একটি মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়। ঐ মামলায় নলিনী দাসের ১০ বছর জেল হলেও হাইকোর্ট থেকে তিনি মুক্তিলাভ করেন। কিন্তু জেল গেটেই তাঁকে আবার গ্রেফতার করা হয়। ১৯৫৫ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকার কর্তৃক মুক্তিদান। ১৯৫৮ সালে সামরিক আইন জারির পর পুনরায় আত্মগোপন এবং তাঁর বিরুদ্ধে সরকারের হুলিয়া জারি। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে রণাঙ্গনে থেকে সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ। নলিনী দাস তাঁর ৭০ বছরের জীবনকালের প্রায় ২৩ বছর আন্দামানে, ব্রিটিশ ভারতীয় জেলে ও পাকিস্তানের জেলে এবং প্রায় একুশ বছর কাটান পলাতক অবস্থায়। সাধারণ মানুষের কল্যাণে তাঁর সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি দুর্গামোহন দাস কল্যাণ ট্রাস্টের কাছে হস্তান্তর। নলিনী দাস হোমিও মেডিক্যাল কলেজ তাঁরই দানকৃত সম্পত্তির ওপর গড়ে উঠেছে। রচিত গ্রন্থ : 'স্বাধীনতা সংগ্রামে দ্বীপান্তরের বন্দি'।

নলিনী দাস বেশ কিছুদিন চিকিৎসার্থে কলকাতায় অবস্থান করেন। তাঁর চিকিৎসার সাহায্যার্থে কমরেড মমতাজউদ্দিন, আবুল ফারাহ মোল্লা, শান্তিরঞ্জন বিশ্বাস, বিশিষ্ট সাংবাদিক এম.এ. তাহের এবং মজনু মোল্লাসহ অনেকে অর্থ সংগ্রহ করে কলকাতায় পাঠান। কিন্তু সে অর্থ পৌছানোর পূর্বেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যু : ১৯ জুন ১৯৮২।

ফরমুজুল হক॥ জন্ম : পুরান দৌলতখানের হাজীপুর গ্রাম, ১৮৯৫। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মন্ত্রীসভার মন্ত্রী। পিতা : মুন্সী মহর আলী (শুকুর আলী?)। দৌলতখান স্কুল থেকে ম্যাট্রিক ও বরিশাল বিএম কলেজ থেকে বিএ ডিগ্রি লাভ। কর্মজীবনের শুরুতে শিক্ষকতা। পরবর্তীকালে ব্যবসা ও রাজনীতিতে যোগদান এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সান্নিধ্য লাভ। ১৯৪৭-এর পূর্বে একটানা বারো বছর অল বেঙ্গল মুসলিম লীগের জয়েন্ট সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন। দেশ বিভাগের পর আওয়ামী লীগে যোগদান। জনাব ফরমুজুল হকের রাজনৈতিক দীক্ষাগুরু সোহরাওয়ার্দী সাহেবের পূর্ব বাংলায় কোনো বাড়ি না থাকায় তাঁর নাগরিকত্ব পাওয়ার স্বার্থে তিনি তাঁর ঢাকার শান্তিনগরের বাড়িটি তাঁর নামে লিখে দেন।

জনাব ফরমুজুল হক ছিলেন অবিভক্ত ভারতে ভারতীয় আইন সভার সদস্য। ১৯৫৪ সালে আইন সভার সদস্য নির্বাচিত। আইয়ুব খানের সামরিক আইন জারির পূর্বে সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভায় মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন।

এই সৎ ও কট্টর আদর্শবাদী রাজনীতিবিদ ১৯৬২ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

www.pathagar.com

মওলানা নাসির আহমদ॥ জন্ম : বরিশাল, ১৮৯৬। শিক্ষাবিদ, রাজনীতিক। ১৯১৯ সালে কোলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে টাইটেল-এ প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে বিশ্ববিদ্যালয় স্বর্ণপদক লাভ। আরবি ভাষা ও সাহিত্যে উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য ভারতের দেওবন্দ গমন। সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনের পর ভোলা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ ও প্রতিষ্ঠাতা সুপারিন্টেনডেন্ট হিসেবে যোগদান। এ পদে তিনি দীর্ঘ দুই দশকেরও অধিককাল দায়িত্ব পালন করেন। এ সময়ে এ প্রতিষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর 'এমেরিটাস' ড. সিরাজুল হক তাঁর সহকর্মী ছিলেন।

তরুণ বয়সে নিখিল ভারত কংগ্রেসে যোগদান এবং স্বদেশী আন্দোলনে অংশগ্রহণ। পরবর্তীকালে খেলাফত আন্দোলনের অন্যতম স্থানীয় সংগঠক। 'মুসলিম লীগ' প্রতিষ্ঠার পর তার সদস্যপদ লাভ ও বরিশাল জেলার সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে আত্মনিয়োগ। ১৯৩৫ সালে বরিশালের তৎকালীন জেলা প্রশাসক মি. ডোনাবান-এর নির্দেশে যে নয়জন মুসলমান এবং নয়জন হিন্দু ব্যক্তিত্ব ও তাদের পরিবার নিয়ে চরফ্যাশন এলাকার রাজস্ব সার্কেলের কাছাকাছি 'ভদ্রপাড়া' গড়ে তোলা হয়, মওলানা নাসির আহমদ ছিলেন তাদের একজন। বরিশালে মহাত্মা গান্ধীর আগমন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত বিশাল জনসভায় সভাপতিত্ব করেন মওলানা নাসির আহমদ।

ভোলা ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা সুপারিন্টেনডেন্ট হিসেবে দীর্ঘ দুই দশকেরও অধিককাল দায়িত্ব পালনের পর কবি মোজাম্মেল হক তাঁকে কলকাতায় নিয়ে যান এবং কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় অধ্যাপনায় যোগদান। দেশ বিভাগের পর ১৯৪৭ সালে প্রথমে ঢাকা ইসলামিয়া ইন্টারমিডিয়েট কলেজ (কবি নজরুল কলেজ) ও পরে ঢাকা আলিয়া মাদাসায় সহযোগী অধ্যাপকের দায়িত্ব পালন।

মওলানা নাসির আহমদ ছিলেন একজন অনলবর্ষী বক্তা। তার বাংলা বক্তৃতায় ভাষা ও শব্দচয়ন শ্রোতাদের মোহিত করে রাখতো। তদানীন্তন বাংলার অপ্রতিদ্বন্দ্বী বাগ্মী সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর অসাধারণ বাগ্মিতার জন্য তাঁকে ভবিষ্যতের 'অ্যাডমন্ড বার্ক' বলে অভিহিত করেন। মৃত্যু : ১৯৫১।

মাওলানা আবদুল জব্বার, হাজী, ডাকনাম আরবান আলী॥ জন্মতারিখ অজ্ঞাত। পৈতৃক নিবাস আলীনগর, ভোলা। অসাধারণ বাগ্মী। যাদুকরী বাকচাতুর্যের জন্য তিনি তৎকালীন ভোলা মহকুমার বাইরে যশোর, খুলনা, বাগেরহাট প্রভৃতি এলাকায় প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছিলেন এবং এসব এলাকায় সে সময়ে অনেকে তাঁর মুরিদ হয়ে যান। এমন একটি সময় ছিল যে, জব্বার হাজী যেসব সভায় বক্তৃতা দিতেন, সেসব সভায় এতো জনসমাগম হতো যে, তিল ধারণের ঠাঁই থাকতো না। তৎকালীন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান দেশের অভ্যন্তরে বিমান ব্যতীত সকল যানবাহনে তাঁর ভ্রমণ ব্যয় মওকুফ করে দিয়েছিলেন। রচিত গ্রন্থ : কোরআন কণিকা ও কোরআন প্রচার (৭ খণ্ড)। মৃত্যু : ১৯৬৮ সাল (৬৩ বছর বয়সে)।

মাওলানা ফজলুল করিম, জজ ॥ জন্ম : নূর মিয়া হাওলাদার বাড়ি, শিবপুর, ভোলা, ২২ জুলাই ১৯০০। ভোলার প্রথম জজ ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামবিষয়ক

www.pathagar.com

গ্রন্থপ্রণেতা। পিতা : নূর মিয়া হাওলাদার, মাতা : হাজেরা খাতুন। ১৯১৯ সালে ভোলা সরকারি হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক, ১৯২১ সালে ঢাকা কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে আইএ, ১৯২৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ (অনার্স), ১৯২৫ সালে এমএ (আরবিতে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম) ও ১৯২৬ সালে বিএল ডিগ্রি লাভ। কর্মজীবনের শুরুতে ১৯২৯ সালে মৌলভীবাজারের মুন্সেফ হিসেবে যোগদান। এরপর বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে সাবজজ ও জজ হিসেবে দায়িত্ব পালন। ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত হাইকোর্টের বিচারক। স্বাধীনতা লাভের পর ইসলামিক একাডেমী ইসলামিক ফাউন্ডেশনে রূপান্তরিত হলে তিনি তাঁর প্রথম পরিচালক (অনারারি) নিযুক্ত হন। বাংলা ও ইংরেজিতে প্রকাশিত তাঁর অসংখ্য ধর্মভিত্তিক গ্রন্থাবলী বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তানসহ ইউরোপ ও আমেরিকায় ব্যাপকভাবে সমাদৃত ও প্রশংসিত। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলি : আল হাদিস (৪ খণ্ডে) মেশকাত শরিফ (৪ খণ্ডে), মানবধর্ম, আদর্শ মানব, শরিয়াত শিক্ষা, ইসলামের রূপ, এহ্ইয়াও উলুমুদ্দিন (৯ খণ্ডে), এবং ইংরেজিতে Al-Hadis (4 Vol.), The Religion of Man, The Ideal World Prophet প্রভৃতি। মৃত্যু : ১৪ নভেম্বর, ১৯৮২।

মাওলানা ফজলুল করিম, মোহাদ্দেস ॥ জন্ম : চরপদ্মা, দৌলতখান (তারিখ অজ্ঞাত)। ভোলা জেলার অন্যতম প্রধান আলেম। পিতা : মৌলভী মতিউর রহমান। শৈশবে পিতার কাছে প্রাথমিক ধর্মীয় শিক্ষা লাভ। ১৯২৪ সালে নোয়াখালী ইসলামিয়া আলিয়া মাদ্রাসা থেকে আলিম পাস। ইলমে দ্বীন বিষয়ে অধিকতর উচ্চশিক্ষা অর্জনের জন্য কলকাতা গমন এবং ১৯২৯ সালে কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসা থেকে ফাজিল পাস। তিন বছর হাদিস বিভাগে অধ্যয়ন ও ১৯৩২ সালে অনার্স পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়ে ফকরুল মুহাদ্দিসীন ডিগ্রি অর্জন। তিনিই একমাত্র বাঙালি যিনি এ পরীক্ষায় উপর্যুক্ত ডিগ্রি লাভ করেছিলেন।

অত্যন্ত সাদাসিদা জীবনযাপনে অভ্যস্ত, সৎ ও চরিত্রবান আলেম হযরত মাওলানা ফজলুল করিম ছিলেন ভোলা আলিয়া মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপ্যাল। তিনি ছিলেন এ জেলার অসংখ্য আলেমদের ওস্তাদ। মৃত্যুর আগের দিন তিনি ভোলা শহরে অবস্থানরত তাঁর সব বন্ধু-বান্ধব ও শুভানুধ্যায়ীদের 'ঘরে ঘরে গিয়ে দেখা করেন, মাফ চেয়ে বিদায় নেন ও সমস্ত দেনা-পাওনা মিটিয়ে যান। রচিত গ্রন্থ : মাখজানুল মাসায়েল। মৃত্যু : তারিখ অজ্ঞাত।

মোখলেসুর রহমান দরবেশ, কবি ॥ জন্ম : গঙ্গাকীর্তি (বলরামসুরা), ভোলা, ১৩৩৪। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, আধ্যাত্মিক সাধক, কবি। পিতা : মৌলভী মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসাইন। ১৯৪৭ সালে বরিশাল বিএম কলেজ থেকে বিএ। তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের বরিশাল জেলার প্রথম জেলা আহ্বায়ক। ১৯৪৯ সালে নদী সিকস্তি প্রজা আন্দোলনের জন্য কারাবরণ। যুক্তফ্রন্টের আমলে রাজনৈতিক কারণে আবার কারাভোগ। ১৯৫৮ সালে সামরিক আইন জারির পর পুনরায় কারারুদ্ধ। দীর্ঘদিন ভোলা মহকুমা আওয়ামী লীগের সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন। ১৯৬৩ সালে ঢাকার হযরত মোজহারুল হোসাইন পীর পাগলা দরবেশের শিষ্যত্ব গ্রহণ এবং দীর্ঘদিন আধ্যাত্মিক সাধনায় দিনযাপন। বিশ্ব মুসলিম ঐক্য সংহতি দরবারের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান। হোসেন

www.pathagar.com

শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শেরে বাংলা একে ফজলুল হক ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সান্নিধ্যলাভ। বিড়ি শ্রমিক ও রিকশা শ্রমিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা ও দালালদের চক্রান্তের হাত থেকে নদী-সিকস্তিদের রক্ষায় তিনি অসামান্য অবদান রাখেন। নাসিরমাঝি মাদ্রাসা ও ভোলা মুসলিম ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী আজম খানের ভোলা সফরকালে বিভিন্ন দাবি-দাওয়া আদায়ের জন্য নতুন বাজারে বিজলি বিড়ি ফ্যাক্টরির সামনে তাঁর নেতৃত্বে আজম খানের গাড়ি আটক করা হয়। অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত তাঁর অমর কাব্যগ্রন্থ 'শ্রদ্ধাঞ্জলি' (ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর অভিমত সংবলিত)' ১৯৫৮ সালে এবং 'সাম্যবাণী' ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত হয়। অপ্রকাশিত গ্রন্থ : আমার সরকার, বিশ্ব শান্তির উদ্দেশ্যে এবাদত, দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ইসলাম ও মসজিদি খেলাফত।

মোবারক আলী উকিল, আলহাজ্ব, এমএ. বিএল॥ জন্ম : বালিয়া, দৌলতখান, ১৮৯৫। ভোলার প্রথম এমএ। আইনজীবী। অনেক হিন্দু উকিলের মধ্যে হাতে গোনা মুষ্টিমেয় যে কজন মুসলমান উকিল বরিশালে প্র্যাকটিস করতেন, তিনি ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম। বরিশাল জেলা কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। মৃত্যু : ১৯৮৩।

মোহাম্মদ আবি আবদুল্লাহ্ (মতান্তরে আবু আবদুল্লাহ্)॥ জন্ম : পুরনো দৌলতখান, ১ সেপ্টেম্বর ১৯০৫। সৎ ও নির্ভীক, নীতিবান ও আদর্শবাদী পুলিশ কর্মকর্তা, আইনজীবী। পিতা : আবুল হাশেম তালুকদার, মাতা : মাহমুদা বেগম। ভোলা সরকারি হাইস্কুল থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক। 'রাজচন্দ্র গোলকমণি' বৃত্তি লাভ। ব্রজমোহন কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে আইএ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে অনার্সসহ বিএ (১৯২৭), পোস্ট গ্রাজুয়েট স্কলারশিপসহ একই বিষয়ে এমএ, একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এলএলবি (১৯৬২) ডিগ্রি লাভ। ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য লন্ডন গমন এবং বার-এট-ল' ডিগ্রি লাভ। লন্ডন স্কুল অব জার্নালিজম থেকে সাংবাদিকতায় ডিগ্রি অর্জন (১৯৬৪)।

১৯৩০ সালে ইন্ডিয়ান (ইম্পেরিয়াল) পুলিশ সার্ভিসে যোগদানের মাধ্যমে আবি আবদুল্লাহ্র কর্মজীবনের শুরু। বিভিন্ন সময়ে খুলনা রেঞ্জের ডিআইজি, খাদ্য বিভাগের ডাইরেক্টর, অ্যান্টি করাপশনের ডাইরেক্টর ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের স্পেশাল অফিসারের দায়িত্ব পালন। ১৯৫৭ সালে প্রথম তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের আই.জি-র পদ অলংকৃত করেন। নীতি ও আদর্শের সাথে কোনোদিন আপোস করেননি বলে ১৯৫৮ সালে সামরিক আইন জারি করা হলে তিনি ঐ সরকারের কোপানলে পতিত হন এবং তাঁকে বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান করা হয়। এই বিষয়টি নিয়ে তিনি ১৯৬১ সাল পর্যন্ত সরকারের সাথে লড়াই করেন।

মোহাম্মদ আবি আবদুল্লাহ অবিভক্ত ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় বেঙ্গল, দিল্লি ও সিমলাতে ইন্টেলিজেন্স অফিসারের দায়িত্ব পালন করেন। এ সুবাদে মহাত্মা গান্ধী, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ ও নেহরুর নিবিড় সাহচর্য লাভ। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় তিনি নোয়াখালীতে দায়িত্ব পালনরত ছিলেন। অত্যন্ত দক্ষতা ও কৌশলের সাথে সেই দাঙ্গা দমনে সফলতা লাভ করায় সে সময় নোয়াখালীতে অবস্থানরত গান্ধীজী

www.pathagar.com

আবি আবদুল্লার ভূয়সী প্রশংসা করেন। কৃতজ্ঞ নোয়াখালীবাসী এজন্য 'চর আবদুল্লাহ্' নামে একটি চরের নামকরণ করেন। এ এলাকায় 'আবি আবদুল্লাহ' নামের অর্থই হচ্ছে সৎ, নির্ভীক ও আদর্শের মহান দৃষ্টান্ত। তিনি এমনই সততার সাথে তাঁর চাকরি জীবন কাটিয়েছেন যে, তৎকালে তদানীন্তন পাকিস্তানের কোথাও তাঁর এক কাঠা জমিও ছিল না। জীবনের শেষদিকে তিনি সামান্য খাস জমির জন্য সরকারের কাছে আবেদন করেছিলেন। কিন্তু সারাজীবন অবিবাহিত থাকার অজুহাতে তাঁর ঐ আবেদন বাতিল করে দেওয়া হয়।

১৯৬৫ সালে ঢাকা হাইকোর্টে যোগদান করেই আবি আবদুল্লাহ তাঁর বাধ্যতামূলক অবসরদানের বিরুদ্ধে মামলা করেন। ১৯৬৯ সালে 'ঐতিহাসিক আগরতলা ষড়যন্ত্র' মামলায় কর্নেল শওকত আলীর পক্ষে মামলা পরিচালনা। আবি আবদুল্লাহ ঢাকা শহরে নিজের বাসা থেকে অধিকাংশ সময়ই দূরবর্তী স্থানে যেতেও সাইকেল ব্যবহার করতেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন বিষয়ের ওপর তাঁর লেখা প্রকাশিত হতো বলে জানা যায়। এ সম্পর্কে বিচারপতি ইব্রাহিম বলেছেন, 'জ্ঞান-পিপাসু, ন্যায়-নীতির প্রতি পরাকাষ্ঠা তথা সত্য উদঘাটনে এতখানি সংবেদনশীল দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি আর আমার নজরে পড়েনি।' জানা যায়, আবি আবদুল্লাহ তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু মন্ত্রী তোফাজ্জল আলীর বাসা, এমনকি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমিনের বাসভবনও তল্লাশি করার দুঃসাহস করেছিলেন। এটি পুলিশ বিভাগে দায়িত্ব পালনরত যে কোনো কর্মকর্তার জীবনে সর্বকালের একটি নজিরবিহীন ঘটনা হিসেবেই বিশেষভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করতে পারে।

আবি আবদুল্লাহ সম্পর্কে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী বেগম আশরাফুন্নেসা বলেন, 'তিনি ছিলেন এক কিংবদন্তির নায়ক। অসাম্প্রদায়িক নীতির প্রশ্নে আপোসহীন এই মানুষটি অনেক অর্থের মালিক হয়েও নিতান্ত দীনহীনের মতো সামান্য খাটিয়ায় (ক্যাম্প খাট) শুধু একটি চাদর বিছিয়ে শয্যা গ্রহণ করতেন। প্রায়ই একটি সাদা হাফপ্যান্ট পরে ঢাকায় বিভিন্ন বইয়ের দোকানে ঘুরে ঘুরে জ্ঞানপিপাসা নিবৃত্ত করতেন।'

বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, তার বসবাসের জন্য এক টুকরো জমিও ছিল না। কিন্তু জ্ঞানচর্চার জন্য তিনি যে লাইব্রেরি গড়ে তুলেছিলেন, সে আমলেই তার মূল্য ছিল দু-লক্ষ টাকার ওপরে।

১৯৭৩ সালে আবি আবদুল্লাহর নামে একটি ট্রাস্ট গঠিত হয়। তাঁর দু'লাখ টাকার সঞ্চয়পত্রও এই ট্রাস্টের তহবিলে যোগ করা হয় যা পরে ৫ লক্ষ টাকায় উন্নীত হয়। এই ট্রাস্টের মাধ্যমে দৌলতখান ও ভোলার গরিব ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি দেওয়া হতো। এই টাকার বেশিরভাগই দৌলতখান কলেজ প্রতিষ্ঠার কাজে ব্যয় হয়। মৃত্যু : ২৫ মার্চ ১৯৭৩।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, কবি॥ জন্ম : বাপ্তা গ্রাম, ভোলা, ৯ সেপ্টেম্বর ১৮৮৫। কবি, সমাজসংস্কারক ও উপমহাদেশে মুসলিম রেনেসাঁ আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক। পিতা : মুন্সি আবদুল করিম, মাতা : আরফিনজান বিবি, স্থানীয় বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের পর ১৯০৮ সালে কলকাতা মিত্র ইনস্টিটিউশন থেকে প্রথম বিভাগে

www.pathagar.com

প্রবেশিকা, ১৯১০ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে আইএ ও ১৯১২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. ডিগ্রি অর্জন। ১৯০৯ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়নকালীন 'জাতীয় মঙ্গল' কাব্য প্রকাশ করে বিদগ্ধ মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলো ইতোপূর্বে মুন্সী মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দিন আহমদ-এর 'ইসলাম প্রচারক', মওলানা আকরম খাঁ সম্পাদিত 'মাসিক মোহাম্মদী' ও মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী সম্পাদিত 'সাপ্তাহিক সোলতান' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা ও তাদের সামগ্রিক উন্নতি বিধানের লক্ষ্যে কবি মোজাম্মেল হক ১৯১০ সালে 'আন্দোলন' নামে একটি সাহিত্য সংগঠন গড়ে তোলেন। ১৯১২ সালে কলকাতায় গঠন করেন 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'। যে পুঞ্জিভূত ক্ষোভ ও বেদনা থেকে কবি মোজাম্মেল হক এই সংগঠন গড়ে তোলার অন্যতম প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন, তাহলো এই যে, তিনি লক্ষ্য করেন, কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের এক হাজার সদস্যের মধ্যে মুসলমান সদস্য ছিল মাত্র নয়জন। এদের মধ্যে খ্যাতিমান ছিলেন আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, আবদুল গফুর সিদ্দিকী ও তিনি (মোজাম্মেল হক)। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, মুসলমান কবি-সাহিত্যিক-সাংবাদিকদের তিনি একই ছাতার নীচে নিয়ে আসবেন, তাদের মধ্যে ঐক্য সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন এবং তাদের সার্বিক উন্নয়ন ও মঙ্গল সাধনে গড়ে তুলবেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মতোই আর একটি সংগঠন। বিশিষ্ট কূটনীতিক-সাহিত্যিক সৈয়দ আবদুস সুলতান তাঁর একটি নিবন্ধে এ প্রসঙ্গে লিখেন, 'মুসলিম মেসের নিকটবর্তী ৯ নং অ্যান্টনী বাগান লেনে তখন মোহাম্মদ আবদুর রহমান নামে এক ব্যক্তির বই বাঁধাইয়ের বিরাট একটি দোকান ছিল। তাঁর বাড়ি ছিল ঢাকায়। দোকানের নাম ছিল করিম বক্স ব্রাদার্স। কবি মোজাম্মেল হক মৌলভী আবদুর রহমানকে তাঁর উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত করে তাঁর সম্মতিক্রমে তার বাসগৃহের বিস্তৃত আঙিনায় কলকাতার প্রায় সকল সাহিত্যামোদী ও সাংবাদিকদের একত্রিত করলেন।... তিনি এক পয়সার পোস্টকার্ডে চিঠি লিখে সবাইকে ডাকযোগে দাওয়াত জানিয়েছিলেন। এই সভায় যাঁরা যোগদান করেছিলেন তাদের মধ্যে 'দি মুসলমান' সম্পাদক মৌলভী মজিবর রহমান, সাপ্তাহিক 'মোহাম্মদী' ও 'আল-ইসলাম' সম্পাদক মওলানা আকরম খা, 'ইসলাম প্রচার' সম্পাদক মুন্সী রেয়াজউদ্দিন আহমদ, 'মিহির' ও 'সুধাকর' সম্পাদক মুন্সী শেখ আবদুর রহিম, অবসরপ্রাপ্ত স্কুল ইন্সপেক্টর মৌলবী আবদুল করিম, শান্তিপুরের কবি মোজাম্মেল হক, কুষ্টিয়ার মৌলবী আবদুল কুদ্দুস রুমী, চুয়াডাঙ্গা হাইস্কুলের হেড মৌলভী আফসারউদ্দিন আহমদ, সাহিত্যিক মোঃ এয়াকুব আলী চৌধুরী, বরিশহাটের উকিল (পরে ডক্টর) মো. শহীদুল্লাহ্ ও মৌলবী আবদুর রহমানের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এরপর ১৯১৮ সালে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র সাথে যৌথ সম্পাদনায় প্রকাশ করেন তৎকালীন মুসলিম কবি-সাহিত্যিক-সাংবাদিকদের চিন্তা-চেতনার বাহন বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির মুখপত্র 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি পত্রিকা।' এ পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, আবদুল গফুর সিদ্দিকী, কাজী আবদুল ওয়াদুদ, এয়াকুব আলী চৌধুরী, ডা. লুৎফর রহমান, কবি ইসমাইল হোসেন সিরাজী, আবুল মনসুর আহমদ, ইব্রাহিম খাঁ, কবি

www.pathagar.com

শাহাদৎ হোসেন, কবি গোলাম মোস্তফা ও কবি কাজী নজরুল ইসলামসহ খ্যাতনামা অন্যান্য মুসলিম লেখক। কবি মোজাম্মেল হক 'এ সময়ে দুস্থ মানুষের কল্যাণের জন্য গঠন করেন 'খাদেমুল ইসলাম সোসাইটি'। ১৯২১ সালের দিকে কয়েকজন উৎসাহী ব্যক্তির সহযোগিতায় কবি গড়ে তোলেন প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান 'দি ওরিয়েন্টাল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স লিমিডেট'। এখানেই মুদ্রিত হয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের উপন্যাস 'রিক্তের বেদন' ও কাব্যগ্রন্থ 'পূবের হাওয়া'।

রাজনৈতিক জীবনে কবি মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক 'কৃষক প্রজা পার্টির' সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ১৯৩৭ সালে এই দলের মনোয়নে প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। আইন পরিষদের সভায় সে সময়ে ইংরেজিতে ভাষণ দেওয়ার রীতি থাকলেও কবি মোজাম্মেলন হক বাংলায়ই ভাষণ দিতেন। তৎকালীন ভোলা মহকুমায় শিক্ষা সম্প্রসারণ ও জনকল্যাণে কবি মোজাম্মেল হকের অবদান অপরিসীম। তিনি প্রায় এক ডজন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ৩টি সিনিয়র মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। কবি মোজাম্মেল হক সাহিত্য সৃষ্টির চেয়ে সাহিত্য সংগঠন প্রতিষ্ঠা, পত্রিকা প্রকাশ, শিক্ষা সম্প্রসারণ ও জনকল্যাণমূলক কাজেই আজীবন নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছেন। মৃত্যু : ১ আগস্ট ১৯৭৬।

মোহাম্মদ সাদেক ॥ জন্ম : দক্ষিণ ইলিশা, ভোলা সদর উপজেলা, ৩১ মে ১৯৩৯। শহীদ বুদ্ধিজীবী। ভোলা সরকারি উচ্চবিদ্যালয় থেকে ১৯৫৪ সালে ম্যাট্রিক, বরিশাল বিএম কলেজ থেকে ১৯৫৬ সালে আই.এ. ও ১৯৫৮ সালে বি.এ. ডিগ্রি লাভ। ময়মনসিংহ শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ থেকে ১৯৬১ সালে বিএড ও ১৯৬২ সালে এমএড ও ১৯৬৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এম.এ. ডিগ্রি অর্জন। ১৯৫৮ সালে পরানগঞ্জ হাইস্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবনের শুরু। ১৯৬৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ল্যাবরেটরি স্কুলের শিক্ষক হিসেবে যোগদান এবং শাহাদতবরণের পূর্ব পর্যন্ত তিনি এই পদে কর্মরত ছিলেন। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ ফজরের নামাজের সময় পাকহানাদার বাহিনী ও তাদের এ দেশীয় দোসররা শহীদ সাদেকের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকটবর্তী ফুলার রোডের বাসভবনে প্রবেশ করে। বাসায় ক্রমাগত লাথি মারতে থাকলে তিনি দরজা খুলে দিয়ে তাদের স্পষ্ট ও বিশুদ্ধ ইংরেজিতে বলেন যে, নিরস্ত্র সিভিলিয়ানদের ওপর এভাবে আক্রমণ করা মোটেই সঙ্গত নয়। একথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে গুলি করা হয় এবং মৃত্যু নিশ্চিত করার জন্য বেয়নেট চার্জ করা হয়।

উল্লেখ্য, শহীদ মোহাম্মদ সাদেকের বাসার বারান্দায় ৭ মার্চ থেকে বাংলাদেশের পতাকা ও ২৩ মার্চ থেকে কালো পতাকা উড়ছিল। শহীদপুত্র কামরুল হাসানের 'আমার বাবা' শীর্ষক রচনা থেকে জানা যায় যে, স্ত্রীর শাড়ির কাপড় ছিঁড়ে তিনি একটি কালো পতাকা বানিয়ে তাঁর পুত্র কামরুলকে দিয়েছিলেন। শাহাদাতবরণ : ২৬ মার্চ ১৯৭১।

মৌলভী আবদুর রহীম (বড় হুজুর)॥ জন্ম : পুরাতন দৌলতখানের হাজীপুর, ১৮৮৫। বিদ্যানুরাগী, সমাজসংস্কারক। পিতা : কাজী জিন্নাতউল্লাহ পাটওয়ারি। কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় পড়াশোনা শেষে ১৯১২ সালে হাজীপুরে নিজ বাড়ির বৈঠকখানায়

www.pathagar.com

একটি মক্তব প্রতিষ্ঠা করেন, পরে যা হাজীপুর মাদ্রাসা নামে বৃহত্তর বরিশাল জেলার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য মাদ্রাসা হিসেবে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে। সেকালে এই এলাকায় শিক্ষা গ্রহণের আর কোনো আধুনিক ব্যবস্থা ছিল না। এই প্রতিষ্ঠানের সমস্ত ব্যয়ভার তার পারিবারিক সম্পত্তির আয় থেকেই বহন করা হতো। পরবর্তীকালে হাজী মোবারক আলী ও মুন্সি শহর আলীসহ এ এলাকার লোকজন মাদ্রাসাটির উন্নয়নে এগিয়ে আসেন।

বড় হুজুর মনেপ্রাণে প্রগতিশীল চিন্তাধারার অনুসারী ছিলেন। আমাদের দেশের মাদ্রাসাগুলিতে ইংরেজি ও বিজ্ঞানসহ আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করতে যেখানে আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের পরেও দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হয়েছে, সেখানে বড় হুজুর তার মাদ্রাসায় শুধু আরবি পড়ারই ব্যবস্থা করেননি, সেই যুগে তিনি পাঠক্রমে ইংরেজি, অঙ্ক, বিজ্ঞান ও অন্যান্য আধুনিক বিষয় প্রবর্তন করে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

সমাজ পরিবর্তনে তিনি পালন করেন এক অসাধারণ ভূমিকা। জীবনযাপনে সৎ পথ অবলম্বন করা, কারো কোনো ক্ষতি না করা, চুরি-ডাকাতি না করা, দুস্থদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসা ইত্যাদি ব্যাপারে তিনি সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতেন। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সবাই একটু দোয়া নেওয়ার জন্য তাঁর কাছে এসে ভিড় জমাতেন।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে শেরে বাংলার সমর্থনে দৌলতখান এলাকায় ব্যাপক দায়িত্ব পালন করেন। মৃত্যু : ১৯৭৮।

মৌলভী আবদুল জলিল॥ জন্ম : মাতুলালয় চরপাতার বিখ্যাত দায়রা বাড়িতে, তারিখ অজ্ঞাত। পৈতৃক নিবাস খাগকাটা গ্রাম, বড় মানিকা। বিদ্যানুরাগী ও দানবীর। পিতা : প্রয়াত মৌলভী আবদুল আজিজ। সাবেক টগবী আলিয়া মাদ্রাসা নদী ভাঙনের শিকার হওয়ার পূর্বে অন্যদের সহযোগিতায় এই বিশাল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটিকে বোরহানউদ্দিনে স্থানান্তরের যাবতীয় ব্যয়ভার তিনি একাই বহন করেন। মাদ্রাসাটি যে স্থানে স্থানান্তর করা হয়, সেই জমিও তিনি দান করেন, যার মূল্য তখনকার দিনেই ছিল প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা। বোরহানউদ্দিন হাফিজিয়া মাদ্রাসা ও মহিলা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠায়ও তাঁর অবদান অপরিসীম। জেলায় ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা অনন্য ও তুলনাহীন। এই অঞ্চলে ইসলামী শিক্ষার প্রসারে তাঁর নিরলস প্রচেষ্টা ও 'মুক্ত হস্তে' দান করার জন্য তাঁকে এই দ্বীপাঞ্চলের 'হাতেমতাই' বলা গয়ে থাকে। মৃত্যুতারিখ অজ্ঞাত।

লুৎফর রহমান॥ জন্ম : কাচিয়া মিয়াবাড়ি, ভোলা, ১৮৭৬। ভারতে মুসলিম রেনেসাঁর অন্যতম অগ্রনায়ক ও ভারতীয় স্বাধীনতার নিষ্ঠাবান কর্মী। ভোলার দ্বিতীয় গ্রাজুয়েট। পিতা : মুন্সি মফিজউদ্দিন বি.এল। ১৮৯৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে অনার্সসহ বিএ ডিগ্রি লাভ। এম.এ. পরীক্ষায় শীর্ষস্থান লাভ করে স্বর্ণপদক অর্জন। পরবর্তী বছর আরবিতে এবং পরের বছর উর্দুতেও প্রথম স্থান লাভের গৌরব অর্জন। তেজস্বী ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পিতার নির্দেশের প্রতি সম্মান দেখিয়ে বহু লোভনীয় সরকারি চাকুরির প্রস্তাব প্রত্যাখান। এ সময়ে আকর্ষণীয় সম্মানীর বিনিময়ে কয়েকজন গৃহশিক্ষক নিয়োগ দানের কথা উল্লেখ করে ভারতের হায়দ্রাবাদের নিজাম

www.pathagar.com

রাজপরিবারের পক্ষ থেকে কয়েকটি পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। জনাব রহমান তাতে সাড়া দিয়ে একটি পদের জন্য আবেদন জানান। যথাসময়ে তিনি বিশেষজ্ঞবৃন্দের সমন্বয়ে গঠিত ইন্টারভিউ বোর্ডে উপস্থিত হয়ে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং ঐ পরিবারের প্রধান গৃহশিক্ষক পদে যোগদান করেন।

এর অল্প কিছুদিন পরেই ভারতের অন্যতম জাতীয় নেতা মওলানা মোহাম্মদ আলীর সম্পাদনায় কলকাতা থেকে প্রকাশিত ইংরেজি সাপ্তাহিক 'দি কমরেড' পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদকের পদ গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হলে তিনি তাতে সম্মতি প্রদান করেন এবং উক্ত পদে নিয়োগ লাভ করেন। পরবর্তীকালে মওলানা মোহাম্মদ আলী ভারতের জাতীয় রাজনীতিতে এমনভাবে ব্যস্ত হয়ে পড়েন যে, পত্রিকাটি প্রকাশনার সামগ্রিক দায়িত্ব তাঁর ওপর অর্পণ করেন।

অন্য একটি সূত্র থেকে জানা যায়, যুগ্ম সম্পাদক হিসেবে 'দি কমরেড' পত্রিকায় তাঁর ব্রিটিশবিরোধী একটি বিশেষ নিবন্ধ প্রকাশিত হলে ব্রিটিশ সরকার অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয় এবং তাঁকে ভারত ছাড়ার নির্দেশ দেয়। তাঁর বিরুদ্ধে হুলিয়া জারি করা হয় এবং তিনি এ অবস্থাতেই হায়দ্রাবাদের নিজামের রাজপরিবারের গৃহশিক্ষকের পদে যোগদান করেন। পরবর্তীকালে তিনি এই পরিবারেরই এক সুশিক্ষিতা নিকটাত্মীয়ের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। জনাব লুৎফর রহমান মুসলিম লীগের প্রার্থী হিসেবে ভারতের জাতীয় এমএলএ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। তেরোটি ভাষায় তাঁর বিশেষ পাণ্ডিত্য ছিল। মৃত্যু : কলকাতা, ১৯৪২।

শৈবাল কুমার গুপ্ত॥ জন্ম : ভোলা, তারিখ অজ্ঞাত। ভোলার প্রথম ও একমাত্র আইসিএস। পিতা : রসিক কুমার গুপ্ত উকিল। বাংলাদেশ ও ভারতের বিভিন্ন স্থানে উর্ধ্বতন পদে দায়িত্ব পালন। কর্মজীবনের প্রথমদিকে মাদারীপুরের এসডিও এবং শেষের দিকে Calcutta Improvement Trust-এর চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন। কলকাতায় রিফিউজি রিহ্যাবিলিটেশন-এর উর্ধতন কর্মকর্তা। পাকিস্তান সৃষ্টির পর কলকাতায়ই স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। কলকাতায় বাংলাদেশী হিন্দু শরণার্থীদের ভরসাস্থল। মহাত্মা গান্ধীর নোয়াখালী সফরের সময় তাঁর প্রটোকল অফিসারের দায়িত্ব পালন।

সৈয়দ আজিজুর রহমান (নওয়াব মিয়া)॥ জন্ম : বাটামারা, ভোলা, ১৯০১। রাজনীতিবিদ, সমাজসেবী। পিতা : সৈয়দ আলতাফুর রহমান। বরিশাল বিএম স্কুলে লেখাপড়া। মাত্র ১৮ বছর বয়সে বরিশাল জেলা বোর্ড এবং লোকাল বোর্ডের সদস্য হিসেবে একটানা সুদীর্ঘ প্রায় তিন দশক দায়িত্ব পালন। অবিভক্ত বাংলায় মুসলিম লীগের মনোনয়ন নিয়ে সদস্য নির্বাচিত। দেশ বিভাগের পর খাজা নাজিমুদ্দিন ও অন্যান্যদের সঙ্গে ঢাকায় আগমন। পার্লামেন্টারি সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন। দীর্ঘ সাত বছর প্রাদেশিক হাউসের চিফ হুইপ। তার সমসাময়িক রাজনীতিবিদদের মধ্যে খান বাহাদুর নূরুজ্জামান, তোফায়েল আহমদ চৌধুরী, কবি মোজাম্মেল হক প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় নিজ বাড়িতে লঙ্গরখানা খুলে দীর্ঘ এক মাস

www.pathagar.com

গ্রামের মানুষের খাওয়ার ব্যবস্থা করেন। জেলা বোর্ডের সদস্য থাকাকালীন বিভিন্ন জনকল্যাণ কাজের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন। মৃত্যু : ১৯৫৬।

ন. বিখ্যাত গায়ক, কীর্তনীয়া ও কবিয়াল

গুরুদাস নাগ॥ জন্ম : তারিখ অজ্ঞাত। পিতা : মৃত দীগেন্দ্র চন্দ্র নাগ। মাতা : মৃত শচীরানী নাগ। পৈতৃক বাসস্থান ওয়েস্টার্ন পাড়া, ভোলা। তৎকালীন ভোলা মহকুমায় খ্যাতি ও জনপ্রিয়তার শীর্ষে অবস্থানকারী অন্যতম সংগীতশিল্পী। তাঁর কণ্ঠ ছিল যেমন দরাজ তেমনি মিষ্টি। আধুনিক, হিন্দি, অতুলপ্রসাদ, শ্যামাসংগীত, পদাবলী কীর্তন ও লোকসংগীত—সংগীতের এসব অঙ্গনে সমান বিচরণ থাকলেও লোকসংগীত পরিবেশনে তিনি ছিলেন একক ও অনন্য। স্বর্ণ ব্যবসায়ী সংগীতশিল্পী গুরুদাস নাগ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে খুলনা বিভাগীয় সংগীত প্রতিযোগিতায় লোকসংগীত শাখায় প্রথম স্থান অধিকারের গৌরব অর্জন করেন। ১৯৬৬ সালে তিনি রেডিওতে তালিকাভুক্ত হন। ভোলার সাংস্কৃতিক অঙ্গনের গৌরব এই কণ্ঠশিল্পী দুই পুত্র স্বপন নাগ ও তপন নাগ এবং দুই কন্যা পাপড়ি নাগ ও রীতা নাগকে রেখে মাত্র ৪৩ বছর বয়সে বাংলা ১৩৮৬ সনের ৪ পৌষ মৃত্যুবরণ করেন।

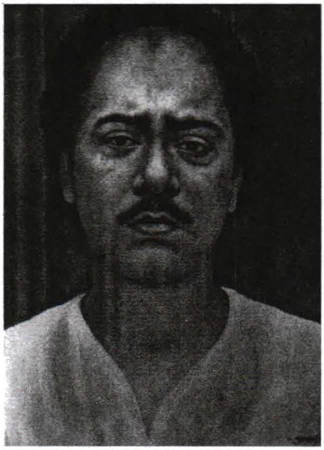

গুরুদাস নাগ (সংগীত শিল্পী)

হেলালউদ্দিন (ফেলু মিয়া) ॥ জন্ম : তারিখ অজ্ঞাত। পিতা : মুনশি আবদুল করিম। পৈতৃক নিবাস : ধনিয়া, ভোলা। সংগীতশিল্পী, সংগঠক। পঞ্চাশের দশকের শেষ ভাগে স্থানীয় সংগীতশিল্পীদের সংগীতচর্চার সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি ও সম্প্রসারণ, পরস্পরের মধ্যে বিরাজমান সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের অধিকতর প্রসার এবং সংগীতচর্চার ক্ষেত্রে সমস্ত প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবিলা করার লক্ষ্যে এখানে যে সংগীত বিষয়ক প্রথম সংগঠন 'শিল্পী নিকেতন' গড়ে ওঠে, তার অন্যতম প্রধান কর্ণধার ছিলেন ভোলার প্রথম

www.pathagar.com

মুসলমান সংগীতশিল্পী মোঃ হেলালউদ্দিন, যিনি ফেলু মিয়া নামেই সমধিক পরিচিত। শিল্পী নিকেতন গড়ে তোলায় আরো বিশেষ ভূমিকা পালন করেন অনুজ কুমার কাহালী, রমেশ পোদ্দার, নারায়ণ কর্মকার এবং খ্যাতনামা সংগীতশিল্পী সমর দাস, কালাচাঁদ দেবনাথ, মনিবাবু, গুরুদাস নাগ, মন্টু তালুকদার প্রমুখ। এই প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে সে সময়ে ভোলায় সংগীতচর্চা একটি নতুন মাত্রা লাভ করে, বলতে গেলে এ সময়ে এক্ষেত্রে একটি নবজাগরণের সৃষ্টি হয়।

তৎকালীন ভোলা মহকুমার একমাত্র হারমোনিয়ামের দোকানটির স্বত্বাধিকারীও ছিলেন হেলালউদ্দিন ওরফে ফেলু মিয়া। তিনি হারমোনিয়াম মেরামত ও সংস্কারে বেশ দক্ষ ছিলেন। মনে রাখা প্রয়োজন, এ সময়ে এখানে কোনো মুসলিম পরিবারের সদস্যকে সংগীতচর্চা করতে হলে তাকে পারিবারিক ও সামাজিক দিক দিয়ে অনেক প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হতো। এই বিরূপ পরিবেশেও ফেলু মিয়ার দোকানের পেছনের ঘরটিতে হ্যাজাক লাইট বা হ্যারিকেন জ্বালিয়ে অনেক রাত অবধি স্থানীয় শিল্পীদের সংগীতের সাপ্তাহিক আসর বসতো নিয়মিত। ভোলার সংগীত জগতের এই খ্যাতিমান শিল্পী ও সংগঠকের মৃত্যু : ৩১ চৈত্র, ২০০৪।

নারায়ণচন্দ্র দে, কীর্তনীয়া॥ ভোলার খ্যাতনামা কীর্তনের দল 'বৈষ্ণব নারায়ণ সম্প্রদায়'-এর দলনেতা অশীতিপর কীর্তনীয়া নারায়ণচন্দ্র দে (নারায়ণ ডাক্তার নামেই সব মহলে পরিচিত)। পিতা : স্বর্গীয় নিশিকান্ত দে। জন্মতারিখ সঠিকভাবে মনে করতে পারেন না। তবে এটুকু তাঁর মনে আছে যে, বাংলা ১৩৪৮ সনে (ইং ১৯৪১) যে ভয়াবহ ও প্রলয়ংকরীঝড় ও জলোচ্ছ্বাস ভোলা ও দৌলতখানসহ পার্শ্ববর্তী অনেক এলাকাকে তছনছ করে দিয়ে যায়, সে সময় তিনি যথেষ্ট বোধবুদ্ধিসম্পন্ন এবং তিনি মনে করেন, তখন তার বয়স নয় দশ হবে। সে হিসেবে নারায়ণচন্দ্র দে'র বয়স বর্তমানে আশির ওপরে।

ফরিদপুরের পালং-এ শ্যামসুন্দর আখড়ায় তাঁর জীবনের প্রথম কীর্তন পরিবেশন। ভোলায় মদনমোহন মন্দির, লক্ষ্মীগোবিন্দ মন্দির, মহাপ্রভুর আশ্রম পূর্ব বাপ্তার কালীমন্দিরসহ চট্টগ্রামের কৈবল্যধাম, চৌমুহনী রামঠাকুরের সমাধিক্ষেত্র, কুমিল্লার রাসস্থলী, নারায়ণগঞ্জের নতুন পালপাড়া, চট্টগ্রামের তুলসীধাম, অদ্বৈতানন্দপুরী, অভয়মিত্র মহাশ্মশান, ঢাকার পুরাতন এয়ার পোর্ট, শ্যামবাজার হরিসভা মন্দির, চাঁদপুর পুরানবাজারের নিত্যানন্দ প্রভুর আশ্রম ও হরিসভাসহ দেশের অন্ততপক্ষে দেড় শতাধিক মন্দিরে কীর্তন পরিবেশন করে তিনি দেশজোড়া খ্যাতি অর্জন করেন।

ফরিদপুরের খ্যাতনামা কীর্তনীয়া শৈলেন সাহা, জগবন্ধু বিশ্বাস, বরিশালের কাজলাকাঠির মনোরঞ্জন শীলসহ দেশের অনেক বরেণ্য ও প্রবীণ কীর্তনীয়াদের সাথে তিনি কীর্তন পরিবেশন করেন এবং বলতে গেলে এদের কাছেই তিনি কীর্তন শিখেছেন। সমকালীন শীর্ষস্থানীয় কীর্তনীয়া মধুসূদন কীর্তনীয়া, প্রফুল্ল মজুমদার, লাল্টু পোদ্দার প্রমুখের সাথেও তিনি কীর্তন পরিবেশন করেন। কীর্তন পরিবেশনে তাঁর সহযোগী থাকেন নরহরি নন্দী (চটি), গোপাল মজুমদার, মধুসূদন দে, প্রাণহরি দে, চুনী পোদ্দার, ঘনশ্যাম দে (খোল-মৃদঙ্গ), বকুল বিহারী দে (বেহালা), বেচারাম, ছায়ারঞ্জন (বাঁশি), অসিতরঞ্জন ঘোষ (জুরি) ও কালাচাঁদ (বাঁশি)।

www.pathagar.com

অনুপম কীর্তন পরিবেশনার স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি চট্টগ্রামে 'বৈষ্ণব' উপাধি লাভ করেন। চট্টগ্রাম কৈবল্যধামের মহারাজ তাঁকে এই উপাধিতে ভূষিত করেন। ভোলার বাইরে কুমিল্লা, চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় গিয়ে কীর্তন পরিবেশন করে এখনও তিনি অসংখ্য দর্শক-শ্রোতার মনোরঞ্জন করতে সমর্থ হচ্ছেন।

কীর্তনীয়া নারায়ণচন্দ্র দে শুধু কীর্তন পরিবেশনেই খ্যাতি অর্জন করেননি, ভোলায় কবিগান ও যাত্রাপালা অনুষ্ঠানের সুপরিচিত স্থান বাপ্তা মহাজন বাড়ির মঞ্চেও তিনি 'বাপ্তা কবিগানের দলের' হয়ে কবিগান পরিবেশন করেছেন, বিভিন্ন যাত্রাপালায় অভিনয় করে দর্শকদের প্রশংসা কুড়িয়েছেন। তাঁর অভিনীত যাত্রা পালাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে রাধারানীর বিচ্ছেদ, নিশি জাগরণ, সখী সংবাদ, নিমাই সন্ন্যাস, কৃষ্ণকলি, ধ্রুব ইত্যাদি।

নারায়াণ চন্দ্র দে এসব সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের জন্য এত খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন যে, তিনি পরপর তিনবার স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন।

স্ত্রী রঞ্জিতা রানীর সর্বাত্মক সমর্থন, সহযোগিতা ও ত্যাগের কারণেই কার্তনীয়া নারায়ণ চন্দ্র দে নিজ জেলার বাইরেও বিশেষ খ্যাতি অর্জনে সমর্থ হন বলে তিনি স্বীকার করেন এবং স্ত্রীর প্রতি তিনি তাঁর সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি চার পুত্র সন্তান মনীন্দ্রচন্দ্র দে, খগেন্দ্র চন্দ্র দে, প্রাণনাথ দে ও তপনচন্দ্র দে এবং আট কন্যা সন্তান ফুল রানী দে, আলো রানী দে, দুলু রানী দে, লিলু রানী দে, মিলু রানী দে, বীণা রানী দে, রীণা রানী দে ও কনা রানী দে'র জনক।

মোহাম্মদ চান মিয়া ॥ জন্ম : আলীনগর গ্রাম, ভোলা সদর উপজেলা, ১৯৫৫ সাল (আনুমানিক)। পিতা : প্রয়াত ওয়াজেদ আলী বয়াতী। লোকসংগীত শিল্পী। বিশ বছর বয়সে হাটে কেনাকাটা করতে এসে উজির আলী শাহ্‌র দরগাহ্‌য় গান শুনতে শুনতে গানের প্রতি একটা দুর্নিবার আকর্ষণ অনুভব করেন। এরপরই তিনি গান শেখার সুযোগ খুঁজতে থাকেন। পেয়েও যান হাতের কাছেই। একই গ্রামের ইউসুফ বয়াতির কাছে গান শিখতে থাকেন।

লালন শাহ্, হাছন রাজা, জালাল খান, খালেক দেওয়ান, মালেক দেওয়ান, রজ্জব দেওয়ান, আলাউদ্দিন বয়াতি প্রমুখের গান গেয়ে ভোলা জেলার লোকসংগীতশিল্পীদের মধ্যে জনপ্রিয়তার শীর্ষ আসনটি ধরে রেখেছেন চান মিয়া বয়াতি। অনুষ্ঠান ও গান ভেদে কখনো দোতারা, কখনো বেহালা নিয়ে গান করেন। গুরু ইউসুফ বয়াতির কাছে শিখেছেন দোতারা, আর বেহালা লোকসংগীতশিল্পী কালাম সরকারের কাছে। চার-পাঁচজন দোহার নিয়ে গান করেন। মোহাম্মদ হোসেন (ঢোল), জুয়েল (পিতলের জুড়ি), তছির (কাঠের জুড়ি), খোকন (বাঁশি) ও গিয়াসউদ্দিন (হারমোনিয়াম) তার সহযোগী ও যন্ত্রশিল্পী।

চান মিয়া বয়াতি গান করেন ঢাকা ও চট্টগ্রামের বিভিন্ন মাজারে, বিয়ে-শাদী-গায়ে হলুদের অনুষ্ঠানে। একবার চট্টগ্রামের এক মাজারে তার গানের সঙ্গে নাচতে নাচতে এক শ্রোতা এক পর্যায়ে বেহুঁশ হয়ে যায়। পরে লোকজন তাকে সেবা-যত্ন করে সুস্থ করে তোলে।

www.pathagar.com

তথ্যসূত্র

১. অধ্যাপক মোহাম্মদ হোসেন চৌধুরী, সাবেক অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ, ভোলা কলেজ এবং ভোলা জেলার ইতিহাসবিষয়ক প্রথম গ্রন্থ 'ভোলা মহকুমার ইতিহাস' (১৯৬৯) ও 'ভোলা জেলার ইতিহাস' (১৯৮৬, ১৯৯৩, ২০০১)সহ অন্যান্য কয়েকটি গ্রন্থের রচয়িতা। পিতা : আলহাজ্ব আশেক আলী চৌধুরী , জন্মতারিখ : ২৩ অক্টোবর, ১৯৪০, শিক্ষা : এমএসসি
২. এমএ তাহের, পিতা : প্রয়াত আলহাজ্ব গোলাম রহমান, মাতা : প্রয়াত সাহেরা খাতুন, স্ত্রী : সুরাইয়া বেগম, শিক্ষা : বিএ, বয়স : ৮০ বৎসর, পেশা : সাংবাদিকতা ও লেখালেখি, স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম : দক্ষিণ সৈয়দপুর, ইউনিয়ন : ৭ নং সৈয়দপুর ইউনিয়ন, ডাকঘর : সাবেক হাজিপুর মাদ্রাসা, উপজেলা : দৌলতখান, বর্তমান ঠিকানা : খালপাড় (বাংলা স্কুলের পেছনে), ডাকঘর : ভোলা, উপজেলা : ভোলা, জেলা : ভোলা
৩. কমরেড মমতাজ উদ্দিন, আবুয়াল ফারাহ মোল্লা ও শান্তিরঞ্জন বিশ্বাস রচিত 'নলিনী দাস ও দুটি কথা' (পলিমাটির দেশ ভোলা)
৪. চরিতাভিধান : বাংলা একাডেমী প্রকাশিত
৫. পলিমাটির দেশ ভোলা : মোস্তফা হারুণ সম্পাদিত
৬. বরিশালের ইতিহাস : সিরাজউদ্দিন আহমেদ
৭. বাংলাদেশের নদ-নদী : আনিসউর রহমান আনিস, সচিত্র বাংলাদেশ, ৩১ অক্টোবর ১৯৮৯, ১০ম বর্ষ, ২২ সংখ্যা
৮. ভোলা জেলার ইতিহাস : অধ্যাপক মোহাম্মদ হোসেন চৌধুরী
৯. ভোলার লবণ আন্দোলন(প্রবন্ধ) : মিহিরলাল দত্ত
১০. স্বাধীনতা সংগ্রামে বরিশাল (দ্বিতীয় খণ্ড) : হীরালাল দাসগুপ্ত।
১১. কার্তিক দেবনাথ, পিতা : ননীগোপাল দেবনাথ, মাতা : শ্রীমতী শান্তি দেবনাথ, বয়স : ৬১ বৎসর, শিক্ষা : ডি.ইউ.এম.এস, পেশা : ব্যবসা, ঠিকানা : গ্রাম : হাসাননগর, ডাকঘর : মৃজাকালু, উপজেলা : বোরহানউদ্দিন
১২. নজরুল হক অনু, পিতা : প্রয়াত আনোয়ারুল হক (মেঘু মিয়া), মাতা : সুলতানা রাজিয়া শিক্ষা : এমএ., এলএলবি, বয়স : ৪৩ বছর, পেশা : সাংবাদিকতা; সম্পাদক, দৈনিক দক্ষিণ প্রান্ত। ইনডেপেন্ডেন্ট টেলিভিশন-এর ভোলা প্রতিনিধি, ওয়েস্টার্ন পাড়া, ভোলা
১৩. মনোরঞ্জন দে ওরফে রিন্টু মহাজন (অভিনয় শিল্পী), পিতা : স্বর্গীয় আশুতোষ দে মহাজন মাতা : শ্রীমতী জ্যোৎস্না রানী দে, বয়স : ৪৬ বছর, পেশা : চাকরি, ঠিকানা : গ্রাম : মধ্যবাপ্তা, ডাকঘর : ভোলা, উপজেলা : ভোলা
১৪. মিয়া মোহাম্মদ ইউনুস, পিতা : প্রয়াত মওলানা মমতাজুল করিম, মাতা : প্রয়াত সালেহা খাতুন, ঠিকানা : গ্রাম : ইলিশা, ডাকঘর : মুরাদ সবুল্যা, উপজেলা : ভোলা সদর
১৫. মোবাশ্বির উল্লাহ্ চৌধুরী, পিতা : লুৎফুল আলম চৌধুরী, মাতা : বেগম রওশন আরা চৌধুরী, বয়স : ৬৩ বছর, পেশা : সমাজসেবা, ঠিকানা : গ্রাম : গঙ্গাপুর (নদী ভাঙনে বিলুপ্ত), উকিলপাড়া, ভোলা, ডাকঘর ও উপজেলা : ভোলা, পেশা : সমাজসেবা, ঠিকানা : গ্রাম : গঙ্গাপুর (নদী ভাঙনে বিলুপ্ত), উকিলপাড়া, ভোলা, ডাকঘর ও উপজেলা : ভোলা
১৭. নাম : ফজলুল কাদের (মজনু) মোল্লা, পিতা : প্রয়াত তোফাজ্জল হোসেন মোল্লা, মাতা : প্রয়াত বিলকিয়াস বেগম, শিক্ষা : বিএ (অনার্স), এমএ. এলএলবি, বয়স : ৬৩ বছর, পেশা : রাজনীতি, সমাজসেবা, স্থায়ী ঠিকানা : কালীনাথ রায়ের বাজার, ভোলা, উপজেলা চেয়ারম্যান, ভোলা
১৮. বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, ভোলা জেলা ইউনিট কমান্ড

www.pathagar.com

১৯. মিয়া মোহাম্মদ ইউনুস, পিতা : প্রয়াত মাওলানা মমতাজুল করিম, মাতা : প্রয়াত সালেহা বেগম, গ্রাম : ইলিশা, ঠিকানা : ডাকঘর : মুরাদ সবুল্যা, উপজেলা : ভোলা সদর
২০. হোসেন আহমদ, পিতা : প্রয়াত রফিকুল হক, মাতা : সিদ্দিকা খাতুন, বয়স : ৫২ বছর, পেশা : চাকরি, ঠিকানা : গ্রাম : বাপ্তা, ডাকঘর ও উপজেলা : ভোলা।
২১. মোঃ অজিউল্লাহ মিয়া, পিতা : প্রয়াত আবদুর রহমান মিয়া, মাতা : প্রয়াত তহুরা খাতুন, বয়স : ৭১ বছর, পেশা : ব্যবসা, ঠিকানা : গ্রাম : ধলিগৌরনগর, ডাকঘর : সিরাজিয়া মাদ্রাসা, উপজেলা : লালমোহন
২২. কার্তিক দেবনাথ, পিতা : ননীগোপাল দেবনাথ, মাতা : শান্তি দেবনাথ, শিক্ষা : ডি.ইউ.এমএস, বয়স : ৬১ বছর, পেশা : ব্যবসা, ঠিকানা : গ্রাম : হাসাননগর, ডাকঘর : মৃজাকালু, উপজেলা : বোরহানউদ্দিন
২৩. মোশারেফ হোসেন হাওলাদার, পিতা : প্রয়াত আবদুর রাজ্জাক হাওলাদার, মাতা : প্রয়াত সবুরা খাতুন, বয়স : ৬৭ বছর, পেশা : অবসরপ্রাপ্ত কর্মকতা, ঠিকানা : গ্রাম : পক্ষীয়া, ডাকঘর : বোরহানগঞ্জ, উপজেলা : বোরহানউদ্দিন
২৪. কাজী মোহাম্মদ রাশেদ, পিতা : প্রয়াত মোহাম্মদ আলী, মাতা : জাকিয়া বেগম, বয়স : ৪০ বছর, পেশা : ব্যবসা, ঠিকানা : রমজান আলী কাজীবাড়ি, দক্ষিণ ফ্যাশন, ডাকঘর ও উপজেলা : চরফ্যাশন।
২৫. কার্তিক দেবনাথ, পিতা : প্রয়াত বাবু ননীগোপাল দেবনাথ, মাতা : শান্তি দেবনাথ, শিক্ষা : ডি.ইউএম.এম, বয়স : ৬১ বছর, পেশা : ব্যবসা, গ্রাম : হাসাননগর, ডাকঘর : মৃজাকালু, উপজেলা : বোরহানউদ্দিন

www.pathagar.com

লোকসাহিত্য

ক. লোকগল্প/লোককাহিনি/কিস্‌সা/কিংবদন্তি

ভোলা সদর উপজেলা

নাই রাজা

কাহিনি সংক্ষেপ

['নাই' নামে এক দেশে এক আঁটকুড়া রাজা ছিল। তাহার তিনটি পুত্র সন্তান ছিল। তিন ভাইয়ের শারীরিক গঠনে নানা অসঙ্গতি ছিল। তিন ভাই একবার শিকারে গিয়ে তিনটি হরিণ শিকার করিয়া রান্না-বান্না করে। কিন্তু পাতিলে রাখিবার পরে দেখা গেল যে, মাংসগুলি সব নীচে পড়িয়া গিয়াছে আর ঝোলগুলি আটকে আছে। প্রকৃতপক্ষে এটি একটি আজগুবি গল্প।]

অ্যাক 'নাই' দেশে আছিল অ্যাক আটকুইড়্যা রাজা। এই আটকুইড়্যা রাজার আছিল তিন পোলা। এই তিন পোলার মইদ্যে অ্যাক পোলা আন্দা[১] আর দুই পোলা চোউকে দ্যাহে না। অ্যাক পোলা ল্যাংড়া আর দুই পোলা আটতো[২] পারে না। অ্যাক পোলা বরা[৩] আর দুই পোলা কানে হোনে না[৪]। অ্যাক পোলার আত[৫] নাই আর দুই পোলার হাত বাঙ্গা[৬]।

অ্যাহন এই তিন বাইয়ের সাদ[৭] অইছে শিকারে যাওনের। হেয়ারা[৮] ব্যাকে[৯] মিইল্যা[১০] হেয়াগো বাপ আটকুইড়্যা রাজার দারে গ্যালো। বাপ হেয়াগো কতায় রাজি অইয়া শিকারে যাওনের ব্যবস্থা করনের লাইগ্যা মন্ত্রীরে হুকুম দিল। মন্ত্রী তিন বাইয়ের লাইগ্যা তিনডা তীর কিনলো। এই তীর তিনডার মইদ্যে অ্যাকটা বাঙ্গা আর দুইডা অচল। মন্ত্রী তিন বাইয়ের লাইগ্যা তিনডা গোড়াও[১১] কিনলো। গোড়া অ্যাকটার ঠ্যাং বাঙ্গা আর দুইডা আটতো[১২] পারে না।

অ্যাহন আটকুইড়্যা রাজার তিন পোলা গোড়াত চইর‌্যা যাইতে লাগলো শিকারে। যাইতে যাইতে হেরা বহুত দূরে চইল্যা গ্যাল। যাইয়া পড়লো অ্যাক বিশাল বনের মইদ্যে। হেই বনের মইদ্যে কোনো গাছপালা নাই। তিন বাই দ্যাকলো, তিনডা হরিণ হেয়ানো[১৩] গাষ[১৪] খাইতেছে। তিন বাই মারলো তীর। হরিণ তিনডা চিক্কইর দিয়া মাডিত[১৫] পাইর‌্যা গ্যাল। তিন বাই হরিণের দারে[১৬] যাইয়া দ্যাকলো যে, অ্যাকটা হরিণ মইর‌্যা গ্যাছে আর দুইডার পরান নাই। হরিণ তিনডারে লইয়া তিন বাই গ্যাল কুমার বাড়ি। কুমার বাড়ির তিন গর[১৭] কুমারের মইদ্যে এক গর বাড়িত নাই আর দুই গর পলাইয়া গ্যাছে। অ্যাহন হেরা করলো কি, কুমার বাড়িতে তিনডা হরিণেরে তিনডা পাতিলে উডাইয়া দিল (চুলায় উঠিয়ে দিল)। পাতিল তিনডার মইদ্যে অ্যাকটার তলি নাই আর দুইডার তলি বাঙ্গা।

www.pathagar.com

তিন বাইয়ের রান্দা-বাড়া শেষ অইল। অ্যাহন হেয়ারা খাইতে বইল। খাইতে বইয়া দ্যাহে কি, গোসতগুলি সব পইড়্যা গ্যাছে আর হুররা[১৮]গুলি সব আটকাইয়া রইছে।...

তথ্য সংগ্রহের স্থান ও সময় আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. অন্ধ, ২. হাঁটতে, ৩. বধির, ৪. শোনে না, ৫. হাত, ৬. ভাঙা, ৭. ইচ্ছা, ৮. তারা, ৯. সবাই, ১০. মিলে, ১১. ঘোড়া, ১২. হাঁটতে, ১৩. সেখানে, ১৪. ঘাষ, ১৫. মাটিতে, ১৬. কাছে, ১৭. ঘর ও ১৮. ঝোল।

দৌলতখান উপজেলা

নও মুসলিম

এই গল্পটি বিভিন্ন সময়ে দেশে সরকার পরিবর্তনকে কেন্দ্র করে অত্যন্ত রসভরে পরিবেশন করা হয়। আমাদের দেশে সাধারণভাবে যে রাজনৈতিক সংস্কৃতির ধারা চলেছে, তাতে দেখা যায় যে, কোনো ক্ষমতাসীন দল যদি পরবর্তী নির্বাচনে জয়লাভ করতে না পারে, অর্থাৎ বিরোধী দল যদি দেশের শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে, তখন পূর্বতন সরকারের মন্ত্রী, এমপি, বড় নেতা, ছোট নেতা থেকে শুরু করে তৃণমূল পর্যায়ের কর্মীদেরও গ্রেফতার ও হয়রানি করা শুরু করে দেয়। রাষ্ট্রের বা সরকারের সর্বোচ্চ পদে আসীন ব্যক্তিও এই গ্রেফতার ও হয়রানি থেকে রক্ষা পান না। এই রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও পরিবেশ গল্পটির প্রেক্ষাপট।

কাহিনি সংক্ষেপ

[ভিন্ন ধর্মাবলম্বী একজন মানুষ ইসলামধর্ম গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু ধর্মান্তরের পরপরই তিনি নতুন ধর্মের নিয়ম-কানুন, নামাজ-রোজা ইত্যাদি এমনভাবে পালন করা শুরু করিলেন যে, পাড়া-প্রতিবেশীর মনে সন্দেহের উদ্রেক হইল যে, কী করে সে এতো অল্প সময়ের মধ্যে এতো কিছু রপ্ত করে ফেলছে। এই সন্দেহের বশবর্তী হয়ে মহল্লার কতিপয় দুষ্টু ছেলে তার পিছু নিয়ে মসজিদে প্রবেশ করছে। তার পর নামাজ শুরু হলে তারা ঐ অ-মুসলিমকে নেহায়েত বিব্রত করার জন্য একটি কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলল। মসজিদের ইমাম সাহেবও এই রসিকতার শিকারে পরিণত হলেন।]

অ্যাক নও মুসলিম, অর্থাৎ অন্য ধর্মের অ্যাকটা মানুষ মুসলমান অইছে। মুসলমান অইয়াই হে অ্যামন ধম্ম-কম্ম শুরু কইর‍্যা দিছে যে, ব্যাকের[১] চোউকে[২] পইড়্যা গ্যাছে। ওয়াজ-মাফিলে (মাহফিল) যায়, ওরসে যায়, মাজারে যায়। মাতাত টুপি দিয়া আতে তছবিও গোনে। রাস্তা দিয়া যাইতে যাইতে মানুষের লগে[৩] কতা কইতে কইতেও তছবিহ গোণে। পাঁচ ওক্ত নামাজ ত বাদ নাই-ই। এক্কেরে[৪] মসইদ্-এ[৫] যাইয়া জমাতে ইমামের পিছে খাড়াইয়া[৬] নমাজ পড়ে।

এই নও মুসলিমের পিছ দরছে অ্যালাকার বদমাইশ পোলাইন। হেরা[৭] হ্যারে[৮] খালি[৯] বিরক্ত কইর‍্যা মারে। পাড়ার পোলাইন বলাবলি করতে লাগলো, আইচ্ছা, এই ব্যাডায় যে পত্তিদিন[১০] মসইদে যাইয়া নমাজ পড়ে, হে নমাজের দোয়া-দরুদ, সুরা

www.pathagar.com

এগুলি মুখস্ত করলো কবে, ক্যামনে? আমাগো তো অ্যাকটা দোয়া মুখস্ত করতে হুজুরের কতো ব্যাতের[১১] মাইর খাইতো আইছে। কততো দিন লাগছে। আর এই ব্যাডা এই মুসলমান অইয়্যাই সব মুখস্ত কইর‍্যা ফালাইল, সব শিইকখা[১২] ফালাইল? অ্যাকদিন তো দেখতো অয় ব্যাডার কাণ্ড-কীর্তি।

পোলাইনে বুদ্দি করলো, ওই নও মুসলিম ব্যাডায় যহন নমাজে খাড়াইবো, তহন হের পিছে খাড়াইয়া দ্যাকতো অইবো, এই ব্যাডায় কী করে।

অ্যাকদিন বদমাইশ পোলাইন ব্যাকগুলি ব্যাডার পিছে পিছে মসইদে ডোকলো। নও মুসলিম আস্তে আস্তে ইমাম সাপের এক্কেরে পিছে যাইয়া খাড়াইছে। পোলাইনগুলিও ঠিক নও মুসলিমের পিছে যাইয়া খাড়াইছে। দুই অ্যাকজন আবার পাশেও খাড়াইছে।

মহল্লার পোলাইনগুলি খেয়াল করলো, ইমাম সাহেব যা যা য্যামন য্যামন করতাছেন, নও মুসলিমও হেইডাই করতাছে। বদমাইশ পোলাইনগুলির অ্যাকটায় করছে কি, যে-ই ব্যাকে ছেজদায় গেছে হেমনি নও মুসলিমের অণ্ডকোষ দরছে চাইপ্যা। নও মুসলিম মনে করছে, এইডা বোদ হয় নিয়ম আছে যে, যার যার সামনের মাইনষের অণ্ডকোষ চাইপ্যা দরতে হয়। এই না বাইবা নও মুসলিম করছে কি, হের সামনে খাড়ানো ইমাম সাবের অণ্ডকোষ দরছে চাইপ্যা।

অ্যাহন ইমাম সাব উটতোও পারে না, কতাও কইতো পারতাছে না। একসুম উনি পিছের লোকের আত[১৩] ছাড়ানের লাইগ্যা উঁহু উঁহু করতে লাগলেন। তহন নও মুসলিম কইয়া উঠলো, উঁহু উঁহু কইরলে কাম অইবো না। পিছের তন[১৪] দরাদরি[১৫] শুরু অইয়া গ্যাছে।

আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. সবার, ২. চোখে, ৩. সাথে, ৪. একেবারে, ৫. মসজিদে, ৬. দাঁড়িয়ে, ৭. তারা, ৮. তাকে, ৯. শুধু, ১০. প্রতিদিন, ১১. বেতের, ১২. শিখে, ১৩. হাত, ১৪. পেছন থেকে, ও ১৫. ধরাধরি (গ্রেফতার করা অর্থে)।

তজুমুদ্দিন উপজেলা

হিম্মত আলী

কাহিনি সংক্ষেপ

[এক গ্রামে পচা নামে এক যুবক ছিল। সে ছিল খুব ভীরু। এই কারণে অনেক বয়স হওয়ার পরেও সে বিবাহ করতে পারেনি। গ্রামের লোকজন ভাবল, তার নামটা যদি পাল্টে রাখা যায়, তাহলে হয়তো ইহার একটি প্রভাব তার উপর পড়তে পারে। পচার বিবাহ হতে পারে। তারা পচার নাম বদলে রাখল হিম্মত আলী।

একদিন গভীর রাতে সিঁদ কাটিয়া চোর ঘরে প্রবেশ করিলে তাহার স্ত্রী তাহার হাতে বিছানার নীচে রাখা বটিটি তুলিয়া দিল। কিন্তু হিম্মত আলীর হাত হইতে কাঁপিতে কাঁপিতে বটিটি পড়িয়া গেল। অন্ধকারের মধ্যে চোরে চুরি করিতে কোনো কষ্ট হয় কি-না ইহা ভাবিয়া হিম্মত আলী চোরকে 'মিয়া' বলিয়া সম্বোধন করিয়া ('মিয়া' না বলিলে

www.pathagar.com

পাছে চোর আবার ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হয়) বলিল, চোর মিয়া জ্বে, বাততিডা দরাইয়া দিমু জ্বে?]

অ্যাক গেরামে আছিল অ্যাক কম বুদ্দি-শুদ্দি আলা যুয়ান ব্যাডা। য্যামন কম আছিল হের বুদ্দি, ত্যামন কম আছিল সাহস। যেয়ারে[১] কয় এক্কেরে ডউরা। কোনো কামেই সাহস কইর‍্যা আউগ্যাইতো[২] পারে না। মাইয়া মানুষ তো বালা কতা, বালা পুরুষ মাইনষের লগে কতা কইতেও হে ডরায়, শরম পায়।

অ্যাহন অ্যামন অ্যাকটা মাইনষের লগে কার মাইয়্যা বিয়া দেয়। অ্যাহন অনেকে হেয়ারে[৩] বুদ্দি দিতাছে, এই রে, তোর নামডা বদলাইয়া হালা[৪] দেহি। 'পচা' অ্যাকটা নাম অইলো? অ্যাকজনে জিগ্যাইল, তোর এই পচা নামডা রাকছে কেরে?

পচা থোতমত খাইয়া জোয়াব দিল, হায়রে বাই, নাম রাকছে তো আমার বাপ-মায়। হে গো দেওইন্যা[৫] নাম কি আমি বদলাইতাম পারি? বাপ-মার দেওইন্যা নাম বদলাইয়া হালামু? আর একজনে জিগ্যাইল, আর কোনো নাম আছিল না রে পচা?

পচা জোয়াব দিল, বাই, দুক্কের কতা কী কমু? আমার বাপ-মায় কি আর সাদে[৬] পচা নাম রাখছে। আমার আগে আমার দুই-দুইডা বাই মইর‍্যা গ্যাছে। অ্যাকটা বাই মরা অইছে। আর অ্যাকটা বাই অওনের কদিন বাদেই মইর‍্যা গেল। 'বাতাস' নাগছিল। হাত-পায় খিচুনি দইর‍্যা[৭] মইর‍্যা গেল।

পচা কইল, এইরম যহন অইতে থাকলো, তহন গেরামের মাতারিরা ব্যাকে মিইল্যা[৮] আমার মারে বুদ্দি দিল, বুজান, এয়ার পরে[৯] পোলাইন অইলে হেয়ার[১০] নাম রাইককেন[১১] পচা। দ্যাকপেন দারে-কাছেও 'বাতাস' আইবোনা। এয়ার লাইগ্যাই তো আমার বাপ-মায়ে আমার নাম রাকছে পচা।

গেরামের অ্যাকজন কইল, দ্যাক, ছোডকালে মইর‍্যা যাইতো দেইক্কা বা মরা অইতো দেইক্কা তুই অওনের পর তোর নাম রাকছে পচা। তয় তুইত অ্যাহন বহুত বড় অইছত[১২]। তিরিশ-চল্লিশ বছর পার করছস। অ্যাহন আর তোর 'বাতাস' লাইগ্যা মরণের ডর নাই। তুই বাই নামডা বদলাইয়া হালা।

পচা কইল, বাই, কি নাম রাহুম? তোমরা অ্যাকটা দেইক্কা হুইন্যা[১৩] রাইক্কা[১৪] দেও।

ব্যাকে[১৫] মিইল্যা ঠিক করলো, কাইলকারতনেই[১৬] পচার নাম অইবো হিম্মত আলী। দেহি আমাগো হিম্মতের দারে কে মাইয়্যা বিয়া দিয়া না পারে?

হিম্মত আলীর নাম ছড়াইয়া গ্যাল এই গেরাম ছড়াইয়া আরেক গেরামে। অ্যাহন আস্তে আস্তে দুই-অ্যাকটা সম্বন্ধও আইতে লাগলো। অ্যাকদিন খুব দুমদামের মইদ্যে দিয়া হিম্মত আলীর বিয়া অইয়া গ্যাল।

এই সময় গেরামে চোরের খুবই আনা-গোনা শুরু অইতেছিলো। আইজ এই বাড়িত চুরি অয় তো কাইল আরেক বাড়িত। মানুষ ব্যাকে অস্তির অইয়া গ্যাল। হিম্মত হ্যার বউরে সাবদান[১৭] কইর‍্যা দিল। নতুন বউ, গয়না-গাটি, নতুন শাড়ি, কাপড়-চোপড়ের লোবে কোনোদিন আবার চোর আইয়া হানা দ্যায়, কওন যায় না।

www.pathagar.com

হিম্মত আলীর বউ হ্যার[১৮] জামাইরে কইল, তোমার আর ডর কি। তোমার তো হিম্মত আছে। নাইলে কি আর মাইনষে তোমার নাম হিম্মত আলী রাকছে।

হিম্মত আলী জোয়াব দিল, হেইডা তো[১৯] ঠিক আছে। তয় ব্যাকেরই সাবদান থাওন লাগে।

হিম্মত নতুন ধার দেওয়ইন্যা[২০] বডিটারে মাতার পাশে বিচনার নীচে রাইক্কা[২১] দিল। আর বউরে কইল, দরকার মত এইডারে কামে লাগাইতো অইবো। অ্যাকবার যদি ডোহে[২২] তয় আর বাচন নাই। এক কোবে কল্লাডা[২৩] মাডিত হালাইয়া দিমু।

আমইস্যার[২৪] রাইত। গরের চেরাগ বাততি তো সব নিবাইন্যা। চোর তো দেইক্কা হুইন্যা হিং কাইট্যা[২৫] কল্লাডা বিতরে ডুকাইছে। হিম্মতের বউ ট্যার পাইছে। আস্তে আস্তে ফিস ফিস কইর‍্যা মশারির তলে হুইয়া হুইয়া কইতাছে, অ্যাই-হোনছেন, গরে চোর ডেকেচে মনে অইতাছে।

হিম্মত আলী জোয়াব দিল, দূর, কিয়ের না কিয়ের শব্দ অইছে, তুমি কও চোর আইছে। হুইয়া গুম[২৬] যাও তো। বিলাইয়ের শব্দ অইতে পারে। হিম্মত কতাগুলি হের বউরে কইতে আছিল আর বিতরে বিতরে[২৭] কাপতে আছিল। হিম্মতের বউ আন্দারের মইদ্যে খেয়াল করল, চোর হিং কাইড্যা ডুইক্যা[২৮] মাতা উডাইয়া আড়ু বাইঙ্গা বইয়া রইছে।

হিম্মতের বউ আবার ফিসফিস কইর‍্যা জামাইরে কইল, অ্যাই হোনেন, চোর কিন্তু বইয়া রইছে। এইডাই সুযুগ, উইড্যা[২৯] খাড়াইলে কিন্তু অসুবিধা অইতো পারে। এয়ার পর বউ বিচনার নীচের তন বডিডা বাইর কইর‍্যা হিম্মতের আতে দিল। হিম্মতের বুক, গলা ব্যাক হুগাইয়া[৩০] গ্যাছে। বুক দরফর দরফর করতে আছে। আত কাপতেছে, পাও কাপতেছে। বউর কতা হের কানেই ডোকে নাই। হেয়ার আত কাপতে কাপতে বডিডা মাডিত পইড়্যা গেল। অ্যামনসুম ছোড অ্যাকটা আওয়াজ হিম্মতের কানে আইয়্যা ডোকলো। মাথাডারে এট্টু উডাইয়া দ্যাকলো যে, চোর আন্দারের[৩১] মইদ্যে আটতে আটতে[৩২] অ্যাকটা খুডির[৩৩] লগে এট্টু দাক্কা খাইয়া খাড়াইয়া রইছে।

হিম্মত আলী বাবতে লাগলো, হায় হায় সব্বনাশ অইয়া গ্যাছে। আন্দারের মইদ্যে আটতে পারতাছেনা দেইক্কা চোর মনে অয় আমার উরপে বিষণ চ্যাততাছে[৩৪]। অ্যাহন কি করণ যায়। চোরের চুরি করতে অসুবিধা অইলে তো অ্যাকটারেও আস্তা রাকপোনা[৩৫]। চোরেরে ত অ্যাকটা কিছু কওন লাগে। অ্যাহন চোরেরে খালি 'চোর' ও তো আর কওন যায় না। তাইলে তো চেইত্যা যাইতো পারে।

হিম্মত আলী আস্তে আস্তে কইল, চোর মিয়াজ্বে, বাততিডা দরাইয়া[৩৬] দিমু জ্বে। গিরস্তের গলার আওয়াজ হুইন্যা[৩৭] চোর হুড়মুড় কইর‍্যা দৌড় দিয়া পলাইয়া গ্যাল।

আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. যাকে, ২. এগুতে, ৩. তাকে, ৪. ফেলো, ৫. দেওয়া, ৬. সাধ করে, ৭. ধরে, ৮. মিলে, ৯. এরপরে, ১০. তার, ১১. রাখবেন, ১২. হয়েছিল, ১৩. দেখে-শুনে, ১৪. রেখে, ১৫. সবাই, ১৬. কাল থেকে, ১৭. সাবধান, ১৮. তার, ১৯. সেটা তো, ২০. ধার দেওয়া, ২১. রেখে, ২২. ঢোকে, ২৩. মাথাটা, ২৪. অমাবস্যার, ২৫. সিঁধ কেটে, ২৬. ঘুম, ২৭. ভিতরে ভিতরে, ২৮. ঢুকে, ২৯.

www.pathagar.com

উঠে, ৩০. শুকিয়ে, ৩১. অন্ধকারের, ৩২. হাঁটতে হাঁটতে, ৩৩. খুঁটি, ৩৪. উত্তেজিত হচ্ছে, ৩৫. রাখবে না, ৩৬. ধরিয়ে, ও ৩৭. শুনে।

বোরহানউদ্দিন উপজেলা

খেলোয়াড়

কাহিনি সংক্ষেপ

[স্বামী-স্ত্রী ট্রেনে চিটাগাং যাইতেছিলেন। পথের মধ্যে এক রেলস্টেশন হইতে এক ভদ্রলোক তাহাদের কক্ষে উঠিয়া পড়ে এবং খুব অনুনয়-বিনয় করিয়া বলিতে থাকে যে, তাহার চিটাগাং যাওয়া খুবই প্রয়োজন। সেখানে একটি ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় তিনি অংশগ্রহণ করিবেন। পূর্ব হইতে অবস্থানরত স্বামী-স্ত্রী দুইজন তাহাকে কক্ষে থাকিবার জন্য অনুমতি প্রদান করিলেন।

পূর্বের যাত্রী ভদ্রলোকের স্ত্রী ক্রীড়াবিদের সুঠাম স্বাস্থ্য দেখিয়া তাহার প্রতি খুবই আকৃষ্ট হইল। সারারাত তাহার আর ঘুম আসিতেছিল না। কিন্তু ক্রীড়াবিদ ভদ্রলোক ভদ্রমহিলার প্রতি বিন্দুমাত্র আকর্ষণবোধ করিলেন না এবং তিনি নিশ্চিন্তে সারারাত নিদ্রামগ্ন অবস্থায় কাটাইলেন। ইহাতে ভদ্রমহিলা তাহার প্রতি ভীষণ ক্ষুব্ধ হইলেন এবং প্রতিযোগিতায় ক্রীড়াবিদের জয়লাভের ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করিলেন।]

এক ব্যাডায়[১] হেয়ার বউ লইয়া রেলগাড়িত কইর‍্যা চিটাগাং যাইতে আছিল। হেয়াগো[২] রুমে হেয়ারা[৩] ব্যাডা-মাতারি[৪] দুইজনই আছিল, আর কেও[৫] আছিল না।

যাইতে যাইতে রেলগাড়ি বহুত দূর গ্যালো। পতের মইদ্যে একটা এস্টেশনে গাড়িডা থামলে আরেক ব্যাডায় আচুক্কা[৬] হেয়াগো রুমের মইদ্যো ডুকইক্যা[৭] পড়লো। ডুইক্যাই আতজোড় কইর‍্যা কইলো, বাই,[৮] আমারে মাফ কইর‍্যা দিয়েন, কোনোহানে জাগা পাই নাই। আমারে এট্টু জাগা দিবেন? খুব জরুরি এ্যাকটা কামে আমার চিটাগাং যাওন লাগবো। আমনেরা যদি এট্টু মেহেরবানি করেন, আমার খুব উপকার হয়।

ব্যাডা-মাতারি দুইজনে লোকটার মিল বালা[৯] কইর‍্যা চাইলো। দ্যাকতে তো বালা মাইনষের মতই মনে অয়। চোর-ডাকাইত তো মনে অয় না। লগে[১০] ত অ্যাকটা ব্যাগও দ্যাহা যায়। অ্যাকটা রাইতেরই ত বিষয়।

ব্যাডা-মাতারি দুইজনে শল্যা কইর‍্যা ঐ ব্যাডারে কইল, ঠিক আছে ভাই, আমাগো এট্টু অসুবিদা অইলেও কী আর করন যাইবো। আমনের যদি উপকার অয়। ত'য় বাই আমনে কী কাম করেন? ব্যাডায় জোয়াব[১১] দিল—অ্যামন কিছছু করি না ভাই, খ্যালাদুলা করি, এইডাই আমার নেশা আর পেশা।

— তয় বাই, কী খ্যালাদুলা করেন, ফুটবল?

— না বাই, ফুটবল না, হাইজাম্প, লং জাম্প দিই।

ব্যাডা-মাতারি দুইজনে খ্যালোয়াড় ব্যাডার মিল বালা কইর‍্যা চাইয়া লইল।

হেয়ার পর হেয়াগো কতা-বার্তা বন্দ অইল। আস্তে আস্তে হেয়ারা গুমাইয়া পড়লো।

www.pathagar.com

এক পাশে হুইছে দুই ব্যাডা-মাতারি। মাতারির মাতার পরে অ্যাকটা বাক্স। হেয়ার পরে হুইছে[১২] ঐ খ্যালোয়াড় ব্যাডায়। দুইজনের মাতা এক্কেরে দারে দারে।[১৩] খ্যালোয়াড় ব্যাডায় ত' গুমাইয়া গেছে। কিন্তু মাতারির গুম আর আইয়ে না। হে ক্যাবল বারে বারে চোউক মেইল্যা খ্যালোয়াড় ব্যাডার দিকে চাইয়া থাহে। কী শরীল ব্যাডার, উঁচা উঁচা বুক, আতগুলি কী শক্ত শক্ত মনে অয়। এক্কারে পিডাইন্যা[১৪] শরীল। মাতারির মনে মনে খুব লোব অয়। হের সারা শরীলের মইদ্যে ক্যামন জানি করতে থাহে। হের ব্যাডায় ত' গুমাইয়া পড়ছে। কিন্তু হের আর কিছুতেই গুম আইয়ে না। খ্যালোয়াড় ব্যাডার মিল চাইয়া থাকতে থাকতে রাইত বেয়ান অইয়া গ্যাল। গুম আর অইল না। রেলগাড়ি আইয়া থামলো চিটাগাং এস্টেশনে।

খ্যালোয়াড় ব্যাডার উরপে মাতারির বিষণ[১৫] রাগ অইল। রেলের তনে নামনের সুম হে ঐ ব্যাডারে জিগাইল, বাই, আমনে জানি কী খেলা করেন কইতেছিলেন?

খ্যালোয়াড় ব্যাডায় জোয়াব দিল, আমি হাইজাম্প, লং জাম্প দেই।

মাতারি এট্টু বাইবা[১৬] কইল, বালা কতা, তয় আমার খুব দুক্কু অইতেছে যে, আমনে এইবার খ্যালায় পাস করতে পারবেন না।

— কি কইলেন? আমার উরপে[১৭] এই দ্যাশে আর কেও হাইজাম্প দিতো পারে না।

মাতারি কইল, আমি আবার কইতাছি, আমার কতাডা মন দিয়া হোনেন। আমনে এইবার ফেল করবেন। আমনে কি নিজেও বোজেন না[১৮] যে, যেই মানুষডা হারা রাইত[১৯] দইরা সামান্য একটা এক ফুইট্যা বাক্স ডিঙ্গাইতে পারে না, হে কি কইর‍্যা হাইজামে পাশ করবো?

আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. বেটায়, ২. তাদের, ৩. তারা, ৪. স্বামী-স্ত্রী, ৫. কেউ, ৬. ঢুকে, ৭. হাতজোড়, ৮. ভাই, ৯. ভালো, ১০. সাথে, ১১. জবাব, ১২. শুয়েছে, ১৩. কাছে কাছে, ১৪. পেটানো, ১৫. ভীষণ, ১৬. ভেবে, ১৭. ওপরে, ১৮. বুঝেন না, ও ১৯. সারা রাত।

শিয়ালের নেতাগিরি

[যে কোনো ক্ষেত্রে নেতৃত্বে থাকার সুবিধা-অসুবিধা দুটোই আছে। এ গল্পে তারই কিছুটা স্বাদ পাওয়া যায়। এছাড়া আমাদের সমাজে এমন অনেকেই আছেন, যারা অন্যের ক্ষতিসাধনে সদা তৎপর, আবার নিজেকে রক্ষায়ও যথেষ্ট সতর্ক।]

কাহিনি সংক্ষেপ

[এক বনের মধ্যে দুই শিয়াল-নেতার বসবাস। দুইজনের মধ্যে প্রচণ্ড রেষারেষি। একজন আরেকজনকে মোটেই সহ্য করিতে পরে না। এক শিয়াল তাহাদের সম্প্রদায়ের নেতা নির্বাচিত হইবার কিছুদিন পর হইতেই অপর শিয়াল নেতা তাহার বিরুদ্ধে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে তাহাকে নেতৃত্ব হইতে সরাইবার জন্য। এক পর্যায়ে বর্তমান শিয়াল-নেতা তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীর হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য দৌড়াইয়া

www.pathagar.com

অন্যত্র যাইতেছিল। কিন্তু সেও সতর্ক ছিল। তাহাকে আক্রমণ করিলে সেও পাল্টা আক্রমণ করিবে—এমন প্রস্তুতি লইয়াই সে আগাইতেছিল।]

অ্যাকই গেরামের অ্যাক জঙ্গলে থাহে দুই হিয়াল। আইজকাইল তো আর হিয়াল দ্যাহাই যায় না। আগে বন-জঙ্গল আছিল ম্যালা। হাজ[১] অইলেই হিয়ালের 'হুক্কা হুয়া' 'হুক্কা হুয়া' চিক্কইর[২] হুনা যাইতো। লগে লগে[৩] কুত্তার খেউয়ানি[৪]। তয় আইজ-কাইল ক্ষ্যাতে ওষুদ দ্যাওনে, বাতের ওষুদ বানাইতে হিয়ালের গোস্ত লাগনে হিয়াল মইর‍্যা পরায় ছাফ অইয়া গ্যাছে। এয়ার মইদ্যেই[৫] যেই কয়ডা হিয়াল জঙ্গলে আছে, হেগো[৬] মইদ্যেই হেরা[৭] নিজে গো ন্যাতা[৮] বানাইয়া লয়। কী আর করবো। হ্যাগোও তো সমাজ চালাইতো অইবো। নিয়ম-কানুন না থাকলে তো অ্যাকটার লগে আরেকটা কামড়া-কামড়ি, খামচা-খামচি করবো।

কিন্তু ব্যাক সুমই[৯] সমস্যা অইয়া যায় এক হানে। হেইডা অইলো এই যে, যেই হিয়ালগুলি বুড়া, হেগুলি এক্কেরেই ন্যাতা অইতো চায় না। ফারাকে ফারাকে থাকতোই পছন্দ করে। হেগুলিও মরতে মরতে অ্যাহন ন্যাতা বানাইতো গ্যালে দুই-তিনডা হিয়ালের মইদ্যেই বাইচ্ছা লইতো অয়।

যাই অউক। হিয়ালগো ন্যাতা বানানোর দিন আইয়া পড়ছে। অ্যাকদিন দ্যাহা গ্যালো, জঙ্গলের মইদ্যে দিয়া অ্যাহন যেই হিয়াল ন্যাতা আছে, হে কেবল দৌড়াইতাছে। দৌড়াইতাছে তো দৌড়াইতাছে। তয় হের আত দুইডা দুই কামে আটকাইন্যা। অ্যাক আতে অ্যাকটা বাঁশের লাডি, আরেক আত দিয়া চাইপ্যা রাখছে হের পাছা। জঙ্গলের মইদ্যে এহানে ওহানে আর যেইসব হিয়াল আছিল, হেরা রাস্তা ছাইড়্যা দিয়া চাইয়া চাইয়া দ্যাকতে লাগলো। কী গটনা। ন্যাতা এইরম দৌড়াইতাছে ক্যান? আর হের অ্যাক আতে বাঁশের লাডি আরেক আত দিয়া পাছা চাইপ্যা দইর‍্যা রাখছে ক্যান? কিন্তু গটনা জিগ্গাইবো কে? এই সাহস কার? কিন্তু ব্যাকেই[১০] বাবতাছে ব্যাপারডা কী? সাহস কইর‍্যা অ্যাক বুইড়্যা হিয়াল ন্যাতারে জিগ্গাইল, ন্যাতা, দৌড়াইতাছেন ক্যান? আর আমনের আত দুইডা দুই জাগাত ক্যান? অ্যাকটা দেহি পাছার মইদ্যে, আর অ্যাকটায় বাঁশ। ব্যাপারডা কী?

ন্যাতা হিয়াল জোয়াব দিল, আরে ব্যাডা পত ছাড়, আগে জান বাচাই।

ঐ হিয়ালডায় আবার জিগ্‌গাইল, ন্যাতা কিন্তু গটনা খান কী?

ন্যাতা হিয়াল জোয়াব দিল, আমাগো রাইজ্যের কতা জানচ না? অ্যাক ন্যাতা কি হেয়ার যে কয়দিন ন্যাতা থাওনের কতা, হেই কয়দিন থাকতো পারে? আমারে টাইন্যা ছিইড়্যা নামানের লাইগ্যা ব্যাকে দৌড়াইয়া আইতেছে। এইডা অন্যায় না? আর কি জানি জিগ্গাইলি, আত দুইডার কতা? অ্যাক আত দিয়া পাছা দইর‍্যা রাকছি এর লাইগ্যা যে, ব্যাকে তো আমার পাছা দিয়া বাঁশ ডুকাইতে চাইতেছে, এর লাইগ্যা। আর আরেক আতে বাঁশ কিয়ের লাইগ্যা বোজসনা? আমিও কি হ্যাগোরে ছাইড়্যা দিমু বাবছস? এর লাইগ্যা এই আতে রাকছি আইক্কাআলা[১১] বাঁশ।

আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. সন্ধ্যা, ২. চিৎকার, ৩. সাথে সাথে, ৪. কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দ, ৫. এর মধ্যে, ৬. তাদের, ৭. তারা, ৮. নেতা, ৯. সবসময়, ১০.সবাই, ও ১১. গিঁটযুক্ত।

www.pathagar.com

লালমোহন উপজেলা
ইঁদুর-ইঁদুরনী
কাহিনি সংক্ষেপ

[এক গৃহস্থের ঘরে এক ইঁদুর আর এক ইঁদুরনী খুবই উৎপাত করতো। এদের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে গৃহস্থ তার পুত্রবধূর পরামর্শমতো বাড়িতে একটি বিড়াল লালন-পালন করতে শুরু করে। এবার ইঁদুর-ইঁদুরনী বিড়ালের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে ভালো ভালো খাবার-দাবারের লোভে এক মাজারে গিয়ে আশ্রয় নেয়। কিন্তু সেখানে কিছুদিন পর মাজারবিদ্বেষী একদল কাঠমোল্লা মাজার আক্রমণ করলে তারা সে স্থান ত্যাগ করে। অবশেষে পুনরায় এক বাড়িতে আশ্রয় নেওয়ার জন্য পথচলা শুরু করে। কিন্তু ঐ বাড়ির সামনে গিয়ে দেখে, বাড়ির দারোয়ান দুজনই হলো বিড়াল আর বিড়ালনী।]

অ্যাক গ্যারামের[১] অ্যাক গিরস্ত[২] বাড়িত আছিল্ অ্যাকটা ইন্দুর আর অ্যাকটা ইন্দুরনী। দুই জামাই বউ মিলি বালা[৩] আরামেই সুকে-শান্তিতেই হিয়াগো[৪] দিন কাইটতে[৫] আছিল। কিন্তু হিয়াগো শান্তি অইলে[৬] অইবো কি, গিরস্তের তো অশান্তির শ্যাষ। গিরস্তের কারের[৭] উরপে[৮] রাহোইন্যা[৯] খ্যাতা-বালিশ, ল্যাপ-তোশক, সব কুডি কুডি[১০] করি কাডি[১১] ত্যানা ত্যানা[১২] করি থুই দ্যায়। ডোলার দানগুলি[১৩] বেবাক কাডি তুষ করি গরের[১৪] শোনাত গাতা[১৫] করি ভুকাই[১৬] থোয়। গিরস্তের বউ শীতকালে খ্যাতা-বালিশ, ল্যাপ-তোশক নামাইতো গিয়া মাতাত[১৭] আত[১৮] দ্যায়, ডোলার তনে[১৯] দান আনতো গিয়া দ্যাহে বেবাক দান গাতার মইদ্যে। তুষ আছে, বিত্রের চাইল নাই। মাতাত আত দি[২০] চিক্কইর[২১] দ্যায় গিরস্তের বউ। কাহাতক আর সইয্য[২২] অয়!

জামাই-বউ মিলি বাইবতে[২৩] লাইগলো—কী করন যায়। আর তো বাচন যায় না। ব্যাবাক ত' হ্যাষ[২৪] করি হালাইলো[২৫]। গিরস্তের বউর বুদ্দি মত গিরস্তে আডের তন[২৬] ইন্দুর মারইন্যা[২৭] কল আনি[২৮] বয়াইছে[২৯]। হিয়ারাও কম বুদ্দিয়ালা না। হিয়ারা কলের দারে-কাছে দিয়াও আডে না[৩০]। অ্যাকবার হুরি[৩১] মাছের লোবে পড়ি[৩২] বিতরে ডোকনের[৩৩] লগে লগে[৩৪] দরজা আটকি গেছিল। বহুত কষ্টে পিছন দি[৩৫] তক্তা কাডি হেয়ার পর[৩৬] বাইর অইতো অইছে। আর এট্টু অইলেই গিরস্তের আতে দরা পড়ি[৩৭] গেছিল আর কি!

গিরস্ত আর গিরস্তের বউ এইবার নতুন ফন্দি কইরতে লাইগলো। কেমন করি ইন্দুররে দরন যায়। কিন্তু কোনোমতেই আর ইন্দুররে দরনের উপায় বাইর কইরতে পাইরলোনা। গিরস্তের পুতের বউ এককান বুদ্দি দিলো। এই গো মা, এককান বিলাইর ছাও আনি ছাড়ি দ্যান। দ্যাইকপেন[৩৮] ইন্দুর পলাই[৩৯] কুল পাইবো না। গিরস্ত আর গিরস্তের বউর দারে বুদ্দিডা পছন্দ অইলো। পাশের বাড়িত যাই মাছের কাডা[৪০] ছিডাইতে[৪১] ছিডাইতে অ্যাকটা বিলাইরে পত[৪২] দেহাইতে দেহাইতে[৪৩] নিজে গো বাড়িত লই আইলো।

অ্যাহন বিলাইর যন্ত্রণায় ইন্দুর আর হিন্দুরনী আগের মতস যহন তহন দৌড়াদৌড়ি করি গুইরতো[৪৪] পারে না। মনে কইলেই উগুইরের[৪৫] উরপের[৪৬] ডোলারতন দান লই কাডাকুডি কইরতো পারে না। মহা মসিবত! দুই জামাই বউ মিলি বুদ্দি করনের লাই

বইলো নিশি রাইতে। হ্যাষ-ম্যাষ সাইব্যস্ত কইরলো—গ্যারামের হ্যাষ মাতায় যেই মাজারডা আছে, হেই মাজারে যাই হেয়ারা বাসা বাইনবো[৪৭]। মাজারে ম্যালা মানুষ খই, মুড়ি, চিড়া, নাইরকল, মাছ, গোস্ত দি যায়। হেয়ানো যাই বইসতে পারলে আর দুইজনের প্যাডের চিন্তা করন লাইগবোনা। আর অ্যাকবার যদি হেয়ানো[৪৮] এট্টু বুদ্দি করি চলন যায়, হেয়া অইলে তো আর কতাই নাই। ইন্দুরনী কইল, হোনেন, মাজারে বহুত গুরু আর হেগো চ্যালা থাহে। হেরা ম্যালা ঠগবাজি করি খাইতে খাইতে শরীল, চামড়া ব্যাক মোডা করি হালাইছে[৪৯]। আমরা দুইজনেও গুরু আর চ্যালা হাজুম। আমনে অইবেন গুরু আর আমি অমু আমনের চ্যালা। বুজলেন? কী বুজলেন? মাজারে যাই আমরা দেহি হুনি মাজারের আশেপাশে অ্যাককান বড় বটগাছ দেহি হেইডার[৫০] নিচচে[৫১] বই পড়ুম। তয় এয়ানো[৫২] অ্যাককান কতা আছে। আমি এট্টু ফাকে ফাকে থাউম[৫৩]। হেয়ার পরে আমি কি করুম হেইডা আমনে দেকি লইয়েন[৫৪]।

ম্যালা বন-জঙ্গল বাঙ্গি[৫৫] ইন্দুর আর ইন্দুরনী গ্যারামের হ্যাষ মাতার মাজারে যাই উইটলো[৫৬]। আগে মাজারের তন এট্টু দূরে বই ব্যাবাক মাইনষেরে দ্যাহন লাইগলো। বক্তরা[৫৭] ক্যামন ক্যামন করে, কোনোমিল কোনোমিল যায়, ব্যাবাক। ইন্দুর আর ইন্দুরনী কইরলো কি, চুপ্‌পে চুপ্‌পে ব্যাবাকের পিছন দি যাই অ্যাক বাবরি চুল আলা ব্যাডার মমবাত্‌তি[৫৮] আগরবাত্‌তি টাইনতে টাইনতে হেয়াগো জাগাত লই গ্যাল। হেয়ার পরে ইন্দুরনী আগরবাত্‌তি আর মমবাত্‌তি দরাই হের স্বামীর ছামনে দি রাইকলো।

অ্যাহন অ্যাকজন অ্যাকজন করি বক্তো আইতে লাগলো। অ্যাকজন আইয়ে, সেলাম দি দুই-চাইর পইসা দি আবার অন্যমিল[৫৯] যায়। ইন্দুরনী হের পাছে পাছে ছোডে[৬০]। হেরে দরি[৬১] জিগ্যায়—উনি আমনের লগে কতা কইছে? কী কতা কইছে? হায়রে আমার হোড়া কপাল! আইজ অ্যাদ্দিন দরি উনার পিছ পিছ গুরতাছি। এট্টু কতা কওনের বাইগ্য আঁর কপালে জুইটলোনা। আর আমনে আইতে না আইতে আমনের লগে কতা কইলো?

বক্ত ইন্দরনীকে জিগ্যাইল, এইতে কে গো? ব্যাকের লগে কতা কয় না?

ইন্দুরনী জোয়াব দিল, এইতে বহুত হিম্মত রাহে। বহুত ক্ষেমতা। এইতের[৬২] দোয়ায় বহুত মাইনষের বহুত মশকিল আছান অই যায়। এই কতা হুনি বক্ত আরো বেশি করি টেয়া-পইসা দি গ্যাল। এইরম করি মাজারে যেইসব বকতো আইয়ে, হেয়াগোরে পডাই-পুডাই[৬৩] মিছা কতা কই ইন্দুর আর ইন্দুরনী ম্যালা জিনিষ কামাইতে লাইগলো। দিনে দিনে হেগো নাম-ছড়াই যায় মোহে মোহে। দলে দলে বক্ত আইয়ে। দিনের পরে দিন, রাইতের পরে রাইত হের দ্যাহা পাওনের লাইগ্যা, এট্টু কতা কওনের লাইগ্যা, সমস্যা কওনের লাইগ্যা না খাই না দাই বই থাহে।

ব্যাবাক বক্ত ক্যাও চিড়া-মিডাই, চাইল-ডাইল, ক্যাও ট্যায়া-পইসা, ক্যাও মুরকা, ক্যাও গোস্ত— যে যেইডা পারে ইন্দুর গুরুর দরবারে দি যায়। ইন্দুর আর ইন্দুরনী আগে তো খালি দান খাই দিন কাডাইতো। অ্যাহন জিলাপি খায়, মিডাই খাই, চাইল-ডাইল খায়, গোস্ত খায়। এয়াতে শরীল মোডা-তাজা অই ছোড-খাডো খরগোশের মত

www.pathagar.com

অই গ্যালো। আগে যেয়ারা হ্যাগো দারের[৬৪] আছিল, হেয়ারাও অ্যাহন দ্যাকলে চিনতো পাইরবোনা। একসুম মাইনষেরে দেইকলে ইন্দুর আর ইন্দুরনী দোড়াই পলাইতো। অ্যাহন অ্যাতো যে মানুষ হ্যাগো এট্টুও ডর লাগে না। যেই মাইনষে ইন্দুর আর ইন্দুরনীরে দেইকলে লাডি লই দৌড়াইতো, হ্যাগোরে মারি হালানের লাই[৬৫] আডের তন[৬৬] কল আনি হেয়ার বিত্রে হুরি মাছ, নাইরকলের বাঙ্গা থুই দি হেই কলের বিত্রে ডোকনের লাই লোব দ্যাহাইতো, হেই মাইনষেরাও অ্যাহন মমবাত্তি, আগরবাত্তি, গোস্ত দি হ্যাগোরে খুশি রাহনের লাই দিনের পর দিন রাইতের পর রাইত বই[৬৭] থাহে।

এইবাবে ইন্দুর আর ইন্দুরনীর দিন বালাই কাটতে আছিল। এয়ার বিত্রে বাইজলো এক মহা গণ্ডগোল। ঐ গ্যারাম আর আশপাশের গ্যারামের ব্যাক হুজুরেরা এই মাজারের গুরুগো উরপে বালা করি ক্ষেপি গ্যালো। হেই হুজুরেরা গ্যারামে ছড়াই দিল যে, এই বে-শরা গুরুগো দারে যেয়ারা[৬৮] যাইবো হেয়ারা ছারাছার[৬৯] দোযখে যাইবো। অ্যাহন বচ্ছরের পর বচ্ছর খালি আগুনের কইলার বিত্রে জ্বইলতে থাকপো। খালি হেয়াই ন[৭০], হেয়ারা ব্যাবাকে মিলি অ্যাকদিন মাজারে হামলা চালাইল। হেয়াগো গুরুগো যত ছাপড়া আছিল, সব বাঙ্গি-চুড়ি[৭১] আগুন দি দিল। যততো গুরু আর হেয়াগো বক্ত আছিল, ব্যাকে ডরে দিল দৌড়। ব্যাক্কের আগে দৌড় দিল ইন্দুর আর ইন্দুরনী। হেয়াগো লগে দৌড় দি মাইনষেও কুলাইলো না, ইন্দুর আর ইন্দুরনী পিছে পড়ি রইলো। এইরম দৌড়াইতে দৌড়াইতে কততো রাস্তা, মাট-গাট[৭২], বন-জঙ্গল যে পার অই আইল হের সীমা নাই। শ্যাষকালে বহুত দূরের তন অ্যাকটা বাড়ির মতন দ্যাহা যাওনে ইন্দুর আর ইন্দুরনীর পরানে এট্টু পানি আইলো। হেরা বাইবতে লাইগলো, এই বার আর মাজার-টাজার না, আগের মতনই গরের দান-চাইল, লেপ-তোশক কাডন-কোডনের[৭৩] কামে লাগি যাইবো। এই না বাবতে বাবতে ইন্দুর আর ইন্দুরনী হেই বাড়ির দরজাত আসি পইড়লো। কিন্তু এক্কেরে বাড়ির বিত্রে ডুকতে যাই দেইকলো, কপাল খুবই মন্দ। যেয়ানো সইন্দা অয় হেয়ানেই[৭৪] বাগের বয়। হেই বাড়ির দরজাত দুই পাহারা খাড়াই রইছে। অ্যাকজন বিড়াল আর অ্যাকজন বিড়ালনী।

আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক অর্থ : ১. গ্রামের, ২. গৃহস্থ, ৩. ভালো, ৪. তাদের, ৫. কাটতে, ৬. হলে, ৭. পাটাতনের, ৮. ওপরে, ৯. রেখে দেওয়া, ১০. কুটিকুটি, ১১. কেটে, ১২. টুকরা টুকরা, ১৩. ধানগুলো, ১৪. ঘরের, ১৫. গর্ত, ১৬. ঢুকিয়ে, ১৭. মাথার, ১৮. হাত, ১৯. ধান-চাউল রাখার জন্য বাঁশ-বেতের তৈরি বড় পাত্র থেকে, ২০. হাত দিয়ে, ২১. চিৎকার, ২২. সহ্য, ২৩. ভাবতে, ২৪. শেষ, ২৫. ফেললো, ২৬. হাট থেকে, ২৭. মেরে ফেলার, ২৮. কল এনে, ২৯. বসিয়েছে, ৩০. হাঁটে না, ৩১. শুঁটকি, ৩২. লোভে পড়ে, ৩৩. ঢোকার, ৩৪. সাথে সাথে, ৩৫. দিয়ে, ৩৬. তারপর, ৩৭. ধরা পড়া, ৩৮. দেখবেন, ৩৯. পালিয়ে, ৪০. কাঁটা, ৪১. ছিটাতে ছিটাতে, ৪২. পথ, ৪৩. দেখাতে দেখাতে. ৪৪. ঘুরতে, ৪৫. ধান-চাউল ইত্যাদি পাত্র রাখার জন্য বাঁশের খুঁটির ওপর তৈরি পাটাতন, ৪৬. ওপরের, ৪৭. বাঁধবো, ৪৮. সেখানে, ৪৯. ফেলেছে, ৫০. সেটার, ৫১. নীচে, ৫২. এখানে, ৫৩. থাকবো, ৫৪. দেখে নেবেন, ৫৫. পাড়ি দিয়ে, ৫৬. উঠলো, ৫৭. ভক্তরা, ৫৮. মোমবাতি, ৫৯. অন্যদিকে, ৬০. ছোটে, ৬১. তাকে ধরে, ৬২. ওনার, ৬৩. পটিয়ে পুটিয়ে, ৬৪. কাছের, ৬৫. জন্য, ৬৬.

www.pathagar.com

হাট থেকে, ৬৭. বসে, ৬৮. যারা. ৬৯. একেবারে, ৭০. শুধু তাই নয়, ৭১. ভেঙেচুরে, ৭২. মাঠ-ঘাট, ৭৩. কাটাকুটির, ও ৭৪. সেখানেই।

চরফ্যাশন উপজেলা

নাপিত ও কৃষক

কাহিনি সংক্ষেপ

[এক গ্রামে এক বুদ্ধি-শুদ্ধিহীন কৃষক গাছের ডালের আগায় বসিয়া ডালের গোড়া দিয়া কাটিতেছিল। নীচেই ক্ষৌরকর্মে নিয়োজিত এক নাপিত ইহা দেখিয়া ঐ লোকটার নির্ঘাত মরণ হইতে পারে বলিয়া তাহাকে সতর্ক করিয়া দেয়। পরে ঐ কৃষক গাছ হইতে নামিয়া আসিয়া নাপিতের নিকট তাহার মৃত্যুর সময় জানিতে চায়। নাপিত অনেক বিরক্ত হইয়া মৃত্যুর সময় জানিবার জন্য তাহাকে উপায় বলিয়া দেয়।

এক পর্যায়ে নাপিতের প্রদত্ত নির্দিষ্ট সময়সীমা উত্তীর্ণ ও বিশেষ একটি পদ্ধতিতে মৃত্যুর লক্ষণ প্রকাশিত হইতে থাকিলে কৃষক তাহাকে মৃত বলিয়া দাবি করে এবং তাহাকে কবরস্থ করার জন্য গ্রামবাসীদের নিকট অনুরোধ জানায়। গ্রামবাসীরা তাহার উপর বিরক্ত হইয়া কোনোরকমে দাফন করে ও তাহার শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য একটা বাঁশের নল কবরের মধ্যে ঢুকাইয়া রাখে।

ঘটনাক্রমে এক পুলিশ চোর ধরিবার জন্য ঐ গ্রামে গেলে রাত্রিবেলা ঐ কবরের মধ্যে পড়িয়া যায় এবং চোর ভাবিয়া কবরের মধ্যে অবস্থানরত কৃষককে ধরিয়া নিয়া যাইতে থাকে। পরে পুলিশ ভুল বুঝিতে পারিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেয়। বাড়িতে প্রত্যাবর্তনের সময় ঐ কৃষক পথের পাশে এক মসজিদে কবরের আজাব সম্পর্কে এক মাওলানা সাহেবের ওয়াজ শোনে এবং মৃত্যুর পরে কবরে সওয়াল-জওয়াবকারী ফেরেস্তাদের সংখ্যা লইয়া মাওলানা সাহেবের সাথে তর্কে লিপ্ত হয়।]

অ্যাক গ্যারামে আছিল অ্যাক চাষা। এই চাষায় আছিল এক্কারে[১] অ্যাকটা আহাম্মক। বুদ্দি-শুদ্দি হের এক্কারেই কম আছিল। চাষবাসের কাম-কাজ কিচ্ছু বোজতো না। এয়া লইয়া[২] হেয়ার[৩] বাপে হেয়ার উরপে[৪] ম্যালা ত্যক্ত আছিল। অ্যাকদিন হেই পোলাডায় অ্যাকটা গাছের ঠাইলা[৫] কাডনের লাইগ্যা[৬] গাছের উরপে উটছে। উইড্যা[৭] করছে কি, বালা দেইক্যা[৮] অ্যাকটা গাছের ঠাইলার উরপে বইয়া হেইডার গোড়ায় দাও দিয়া[৯] কাটতে লাগলো। অ্যাক নাপিত এইসুম হেই গাছের তলে বইয়া[১০] ক্ষেরি[১১] করতে আছিল। হে উরপের মিল[১২] চাইয়া দ্যাহে যে, ওই চাষা ব্যাডায় ঠাইলার উরপে বইয়া ঠাইলার গোড়া দিয়া[১৩] কাটতে আছে। নাপতায় চিক্কইর[১৪] দিয়া কইতে লাগলো, ও মিয়া, তুমি এইডা কি করতে আছ ? তুমি আগাত বইয়া গোড়া দিয়া কাটতে আছো? তুমি তো পইড়্যা[১৫] মইর্যা যাইবা। আর না মইরলেও ঠ্যাং বাইঙ্গা[১৬] আতুড়-লুজা অইয়া[১৭] যাইবা। তুমি বেকুব নাহি?

চাষা ব্যাডায় হেয়ানো[১৮] বইয়া নাপতারে কইল, কি কও, আমি মইর্যা যামু ?

নাপতায় কইল, অ্যাতো উরপের তন পইড়্যা আবার বাচনেরও আশা কর ? নামো মিয়া, নামো। তোমার ত মনে অয়, মরনের ডর-বয় নাই।

www.pathagar.com

নাপতার কতায় চাষা ব্যাডায় গাছের তন নিচচে নাইম্যা আইল। আইয়া নাপতা ব্যাডারে জিগ্যাইল, ওই শীল, তুমি যে কইলা আমি মইর‍্যা যামু, তুমি কি কইতে পারবা, আমি কবে মরুম ? তুমি যহন কইতেই পারলা যে আমি মইর‍্যা যামু, তাইলে কবে মরুম, হেইডাও[১৯] কইতে পারবা। কও দেহি শীল বাই, আমি কবে মরুম ?

নাপতা পড়ছে অ্যাক মহা ফ্যাসাদে। অ্যাই বেকুফের কথার কি কোনো জোয়াব আছে ? যতোই হে বুজাইতো চায়, হ্যাতোই হে বুজতো চায় না। পরে ত্যক্ত-বিরক্ত অইয়া নাপতায় করলো কি, যেই আম গাছে উইড্যা অই বেকুব চাষায় ঠাইল কাটতে আছিল, হেই গাছের অ্যাকটা ছাল বাইর কইর‍্যা হেয়ার আতে[২০] দিয়া কইল, তুমি অ্যাকটা থালের মইদ্যে পানি লইবা। হেই পানির লগে এট্টু পান খাওনের চিবত[২১] বালা কইর‍্যা মিশাইবা। হেয়ার পরে হেই পানির মইদ্যে এই ছালডা চুবাইয়া ডলবা[২২]। দেখপা যে, ঐ পানিডা অউলদা[২৩] অইয়া গ্যাছে। পানিডা হালাইয়া[২৪] দিয়া ছালডারে উডাইয়া রাইখ্যা দিবা। পত্তিদিন বেয়াইন্যালা[২৫] এইরম করবা। যেদিন দেখবা যে পানিডা আর অউলদা অইতাছে না, তহনই বুজবা যে তুমি মইর‍্যা গ্যাছো। বুজলা এইবার?

এইরম দিন যাইতে লাগলো। চাষা তো পত্তিদিন বেয়াইন্যালা উইড্যা নাপতার পরামর্শ দইর‍্যা আমগাছের ছালডারে চিবতের পানির মইদ্যে ভিজাইয়া-ডইল্যা ডইল্যা দোয়। দিন যায়, মাস যায়। আস্তে আস্তে পানির রঙ-ও সাদা অইয়া আইতে লাগলো। দ্যাকতে দ্যাকতে একদিন দ্যাহা গ্যাল যে, ছাল বিজাইয়া[২৬] হাজার ডলাডলি করলেও পানির রং আর আউলদা অয় না। চাষায় মনে করলো, নাপতা কইয়া গ্যাছে, যেইদিন হাজার ডলাডলি[২৭] করলেও রং বাইরাইবো না, হেদিন বুজবা যে তুমি মইর‍্যা গ্যাছো। তাইলে আমি অ্যাহন আর বাইচ্যা নাই। আমি তো মইর‍্যা গেছি।

অ্যাহন মানুষ মইর‍্যা গ্যালো তো আর দুইন্যাইত থাকতো পারে না। তারে ত মাডিত কবর দিতোই অইবো। তাইলে ত আমারেও কবর দ্যাওন লাগবো। এই কতা বাবতে বাবতে চাষায় গ্যারোমের ব্যাকের দারে[২৮] যায় আর কয়, বাই, আইজ কয়দিন অইলো আমি মইর‍্যা গেছি। আমারে আমনেরা[২৯] দয়া কইর‍্যা কবর দাওনের ব্যবস্থা করেন। গ্যারামের ব্যাক মানুষ হেয়ার কতায় ত্যক্ত অইয়া গেল। হেরা চাষার যন্ত্রণায় খাইতোও পারে না, গুমও যাইতো পারে না। পরে ব্যাকে অ্যাক সালিশে বইল। বইয়া ঠিক করলো যে, অ্যাতোই যহন পাড়াপাড়ি করতেছে, তহন এক কাম করণ যায়। হেয়ারে একটা গর্ত কইর‍্যা বিতরে ডুকাই রাহন যায়। তয় হের দম লওনের লাইগ্যা বাইরের তন অ্যাকটা লম্বা বাঁশের নল কবরের মইদ্যে ডুকাইয়া রাকতো অইবো। আর মাডিটা হাল্কা কইর‍্যা দ্যাওন লাগবে, যাতে হে কবরের মইদ্যে দুক না পায়।

গ্যারামের ব্যাকের বুদ্দিমত চাষারে হের ঘরের পিছে মাডি দেওন অইলো। মাডিটা এক্কারে আস্তে আস্তে দেওয়া অইলো। আর এ্যাকটা বাঁশের নল কবরের মইদ্যের তন মাডির উরপে বাইর কইর‍্যা রাহন অইলো যাতে হে কবরের মইদ্যে থাইক্যা নিয়স[৩০] লইতো পারে।

যারা এই কবর দ্যাওনের কামে আইছিল, হেরা হাজ অওনের লগে লগে বাড়ির মিল রওনা দিল। রাইত অইয়া গ্যালে কেওর আর কবরের দারে থাওনের সাহস অইল না।

www.pathagar.com

এইদিগে অইছে কি, ওই গ্যারামে কয়দিন আগেই অ্যাক বাড়িত চুরি অইছিল। যার গরে চুরি অইছিল, হেই ব্যাডায় থানায় যাইয়া নালিশ করছিল। তয় থানার তন বড় দারোগা বাবু একজন পুলিশেরে চোর দরনের লাইগ্যা হেই গ্যারামে পাডাইয়া[৩১] দিছিল। হেয়ায় যাইতে যাইতে বহুত দূর গ্যাছে। একসুম পুলিশ দেইক্যা অ্যাক ব্যাডায় ডরে দৌড় দিয়া পলাইতে আছিল। পুলিশে মনে করছে যে এই ব্যাডায়ই ঠিক চোর অইবো। নইলে দৌড়-ই-বা দিবো ক্যান। ঐ ব্যাডার পিছে দৌড়াইতে দৌড়াইতে পুলিশে একসুম ঐ চাষার পোলাগো বাড়ির পিছে দিয়া যাইতে আছিল। আচুক্কা পুলিশে ঐ কবরের মইদ্যে পইড়্যা গেল। কবরের মইদ্যে পরনের লগে লগে কবরে হোয়াইয়ান্যা চাষায় লাফ দিয়া উইড্যা বিছনার উরপে উইড্যা বইয়া পড়লো। পুলিশ হেয়ারে দেইক্যা মনে করলো যে, এই বেডায়ই চোর অইবো, নইলে মাডির মইদ্যে গাতা কইর‍্যা হুইয়া থাকপো কেন। ওইদিগে চাষায় ডরে থরথর কইর‍্যা কাপতে আছিল। হেয়ায় মনে করলে যে, হায়রে আমার আর এ্যাহন কোনো উপায় নেই।

পুলিশ করলো কি, চাষারে চোর মনে কইর‍্যা পাছায় লাগাইয়া দিছে কয়েকটা বারি। তহন চাষায় মনে করলো যে, এইডাই বোদ অয় কবরের ফেরেশতা। ওইযে কবর দ্যাওনের পরে আইয়া জিগ্যাইবো, 'রব তেরা ক্যায়া হ্যায়, দ্বীন তেরা ক্যায়া?' বোদ অয়[৩২], হেই ফেরেশতাই আইছে। পুলিশ চাষার পোলারে দুই কান দইর‍্যা হিরহির কইর‍্যা উরপে টাইন্যা উডাইয়া দুই আত পিছমোরা কইর‍্যা বাইন্দা থানার মিল রওনা দিল।

এয়ার মইদ্যে আস্তে আস্তে আন্দার ফর্সা অইয়া অইতে লাগলো। দিরে দিরে[৩৩] ব্যাক দ্যাহা যাইতে লাগলো। এইবার পুলিশে চোরের মিল চাইয়া দ্যাহে কি, এই ব্যাডায় তো চোর না। এয়ায় তো ঐ গ্যারামের চাষা। এয়ায় তো চুরি করইন্যা মানুষ না। পুলিশ হেয়ারে জিগ্যাইল, তুমি কি চুরি করছিলা ? হে জোয়াব দিল, জ্বে না জে। আমি কোনো চুরি-টুরি করি নাই। আমি চোর না। তহন পুলিশ জিগ্যাইল, হ্যালে গাতার মইদ্যে কি করতা আছিলা ?

চাষায় তহন ব্যাক কতা পুলিশেরে খুইল্যা কওনের পর পুলিশ হেরে ছাইড়্যা দিল।

পুলিশ হ্যারে ছাইড়্যা দাওনে চাষায় মনে করলো, এইডা ক্যামন কতা অইলো। কবরের তন ত কেওরে দুইন্যাইত আবার আইতে দেহি নাই, হুনিও নাই। এইডা কি অইলো, হেইলে কি আল্লাহ হের হায়াত বাড়াইয়া দিছে ?

এইসব মনে করতে করতে চাষায় আটতে আছিল। আটতে আটতে[৩৪] এক মছইদের[৩৫] সামনে দিয়া যাইতে আছিল। হেয়ানো ম্যালা মাইনষের বিড়, আর অ্যাক হুজুর ওয়াজ করতে আছে। ওয়াজ হুইন্যা[৩৬] চাষায় খাড়াইল[৩৭]। হুজুরে ম্যালা বালা বালা কতা কইতে আছিল। একসুম হুজুর কইলে যে, বোজলেন মিয়ারা, এই দুনিয়াদারিই ব্যাক-না। আরো দুইন্যাই আছে। যহন কবরে নিয়া হোয়াইবো[৩৮], তহন দ্যাকবেন পইলাই দুইজন ফেরেশতা আইবো। মনকির নকির হ্যাগো নাম। হেরা আইয়া আমনেগোরে ছোয়াল করবো।

হুজুরের ওয়াজ হুইন্যা চাষায় ব্যাকেরে ঠেইল্যা হুজুরের সামনে যাইয়া কইল, না হুজুর, আমনে মিছা কতা কইতে আছেন, মাইনেষেরে মিছা কতা কইতে আছেন।

www.pathagar.com

ফেরেশতা দুইজন আইয়েনা, আইয়ে একজন। হেই ফেরেশতার লম্বা লম্বা মোচ, পান খায় আর আতো থাহে মোডা অ্যাকটা লাডি। হেই ফেরেশতায় বিড়িও খায়'। ব্যাক মানুষ তাজ্জব অইয়া গেল। হুজুরেও বেকুব অইয়া গ্যাল। এই ব্যাডায় কী কয় ? হারা জীবন কিতাবে পইড়্যা আইলাম, দুইজন ফেরেশতা আইয়া সোয়াল-জোয়াব করবো। এই ব্যাডায় কী কয়।

হুজুরে চাষারে জিগ্যাইল, এই মিয়া, আমি হারা জীবন বহুত কিতাবে পড়ছি, মনকির-নকির নামে দুইজন ফেরেশতা আইয়া সোয়াল-জোয়াব করে। তুমি কইতেছ অ্যাকজন ফেরেশতা আইয়ে। তুমি কোনো কিতাবে পড়ছে যে, অ্যাকজন ফেরেশতা আইয়া সোয়াল-জোয়াব করে ? তহন চাষায় জোয়াব দিল, হুজুর, হোনেন, ব্যাক কতা কিতাবে ল্যাহা থাহে না। কিছু জিনিস নিজের চউকেও দ্যাহন লাগে। আমনে ত মরেন নাই। আমনে ক্যামনে দ্যাখপেন যে ফেরেশতা দুইজন ? আমি মরছিলাম, আমি কইতাম পারি, ফেরেশতা অ্যাকজন, মোচয়ালা, আতে লাডি, বিড়ি-সিগারেট খায়।

ব্যাকে তাইজ্জব অইয়া গ্যাল। হুজুরের তনেও এই ব্যাডায় বেশি জানে ? আর মানুষ মইর‍্যা গ্যালে আবার হির‍্যা আইয়ে কেমনে ? তহন ব্যাকে দরলো চাষারে। চাষায় ব্যাক কতা খুইল্যা কইলো ব্যাকেরে।

ব্যাকে তো হুইন্যা আসাআসি[৩৯] করন লাগলো।

আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. একেবারে, ২. এ নিয়ে, ৩. তার, ৪. ওপরে, ৫. ডাল, ৬. কাটার জন্য, ৭. উঠে, ৮. ভালো দেখে, ৯. দা দিয়ে, ১০. বসে, ১১. ক্ষৌরকর্ম, ১২. দিকে, ১৩. দিয়ে, ১৪. চিৎকার, ১৫. পড়ে গিয়ে, ১৬. ভেঙে, ১৭. হয়ে, ১৮. সেখানে, ১৯. সেটাও, ২০. হাতে, ২১. চুন, ২২. পেষণ, ২৩. হলুদ বর্ণ, ২৪. ফেলে, ২৫. ভোরবেলা, ২৬. ভিজিয়ে, ২৭. পিষাপিষি বা ঘষাঘষি, ২৮. কাছে, ২৯. আপনারা, ৩০. শ্বাস, ৩১. পাঠিয়ে, ৩২. বোধ হয়, ৩৩ ধীরে ধীরে, ৩৪. হাঁটতে হাঁটতে, ৩৫. মসজিদের, ৩৬. শুনে, ৩৭. দাঁড়ালো. ৩৮. শোয়াবে ও ৩৯. হাসাহাসি।

মনপুরা উপজেলা

অশিক্ষিত জামাই

[**কাহিনি সংক্ষেপ :** এক অশিক্ষিত জামাইকে তাহার শ্বশুর বাড়িতে কিছুতেই গ্রহণ করিতেছিল না। অবশেষে জামাইয়ের দুলাভাই ও অন্যান্যরা তাহাকে কয়েকটি শুদ্ধ শব্দ শিখাইয়া লইয়া তাহার শ্বশুর বাড়িতে গেল। কিন্তু তিনটি শব্দ বলিবার পর শ্বশুর বাড়ির লোকজন সব হাসিয়া উঠিলে জামাই হাটে হাঁড়ি ভাঙিয়া দিল।]

জামাই যাইবো হোউর[১] বাড়িত। এয়ার আগে আর কোনোসুম যায় নাই। এইবারই পইলা[২] যাইবো। আওনের সুম লগে কইরা বউ লইয়া আইবো। কিন্তু যেয়ার লাইগ্যা বিয়া করনের দুই-তিন বচ্ছরের মইদ্যেও হোউর বাড়িত যায় নাই জামাই, হেই কারণডা অ্যামন শক্ত কোনো কারণ না। সমস্যা অ্যাকটাই আছিল। জামাই শুদ্দ[৩] কইর‍্যা কতা কইতো পারে না। এইয়া[৪] লইয়া হের হোউর বাড়িত ঠাট্টা মশকরা অয়—জামাই এক্কেরে[৫] খাডি[৬] বাঙ্গাল। শুদ্দ কতা কইতোই পারে না।

www.pathagar.com

যাই অউক, জামাইর দুলাবাই, বেয়াই এরা ব্যাকে[৭] মিইল্যা[৮] হ্যারে[৯] কয়দিন দইর‍্যা বালা[১০] কইরা বাংলা শুদ্দ কতা হিয়াইলো[১১]। যেই কতাগুলি হোউর বাড়িত গ্যালে পয়লাই লাগবো, হেইরম[১২] কয়ডা কতা জামাইরে হিয়াইয়া দিল। য্যামন, হোউর বাড়িত গ্যালে তো জামাইরে খাইতো দিবোই, বেশি বেশি কইর‍্যাই খাইতো দিবো। এমুন সময় জামাইরে কি কতা কইতো অইবো, এমন কতকগুলি শব্দ হেরে[১৩] বালা কইর‍্যা হিয়াইয়া দিল। অ্যাক দুলাবাই হিয়াইয়া দিল, যহন তোমারে বাত[১৪] বেশি দিতে থাকপো, তুমি আর খাইতা পারবা না, তহন কইবা যে, 'অন্ন' আর দিবেন না'। যহন তরকারি বেশি দিতে থাকপো, তহন কইবা যে, ব্যঞ্জন আর দিবেন না। আর সবশেষে তো দুধ বা দুই দিবোই। এইসুম বেশি দিতে থাকলে যদি 'দই' অয়, তাইলে কইবা 'দধি' আর দেবেন না, আর যদি 'দুধ' অয় তাইলে কইবা 'দুগ্ধ' আর দিবেন না।

সব তো হিয়াইয়া পড়াইয়া দেওয়া অইলো। জামাই রওয়ানা অইল হোউর বাড়ি। মনে মনে কতাগুলি মুখস্ত করতে লাগলো। 'অন্ন' 'ব্যঞ্জন' 'দধি' আর 'দুগ্ধ'। আল্লাহর নাম লইতে লইতে হোউর বাড়িত যাইয়া উপস্থিত অইলো জামাই। আত-পাও[১৫] দোওনের[১৬] পরে জামাইরে খাইতে দেওয়া অইলো। জামাইর পক্ষের লোকজন খুব খুশি। জামাইরে আর অশিক্ষিতের মত কতা কইতো আইবো না। এক্কেরে খাডি বাংলা বাষা হিয়াইয়া লইয়া আইছে।

জামাইরে বাত ত' দিতেই আছে। পেলেট[১৭] বইরা[১৮] উঠছে। এমন সুম জামাই কইয়া উঠলো, 'অন্ন আর দিবেন না'।

কাদিমদারসহ[১৯] ব্যাকে জামাইর মোহের[২০] মিল[২১] চাইয়া রইছে। কী ব্যাপার! জামাই বোলে অশিক্ষিত! অ্যাহন দেহি বাতেরে কয় অন্ন!

এট্টু পরে তরকারি দ্যাওন শুরু অইলো। তরকারি দিতে আছে ত' দিতেই আছে। জামাইর পেলেট আরো বইর‍্যা উটলো তরকারিতে। অ্যামন সুম জামাইয়া কইয়া উটলো, ব্যঞ্জন আর দিবেন না।

এইবার ব্যাকে এক্কেরে তাইজ্জব অইয়া গ্যাল। কারা এই বদনাম ছড়াইলো যে, জামাই বোকা। জামাই দেহি বহুত শিক্ষিত। ব্যাকে কতা বলাবলি করতে লাগলো। আইস্যা উইড্যা[২২] কইল, কে কইছে আমাগো জামাই বোকা। আমাগো জামাই বহুত শিক্ষিত জামাই। আবার তারা আইস্যা উটলো।

জামাই কতক্কন[২৩] চুপ কইর‍্যা থাইক্যা কইল, আরো আছে। আমনেরা ত' দুগ্ধের 'বাল' না কইতেই ব্যাটকাইয়া[২৪] দিলেন!

আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. শ্বশুর, ২. প্রথম, ৩. শুদ্ধ, ৪. এটা, ৫. একেবারে, ৬. খাঁটি, ৭. সবাই, ৮. মিলে, ৯. তাকে, ১০. ভালো, ১১. শেখানো, ১২. সে রকম, ১৩. তাকে, ১৪. ভাত, ১৫. হাত-পা, ১৬. ধোয়ার, ১৭. প্লেট, ১৮. ভরে, ১৯. খাদ্য বিতরণকারী, ২০. মুখের, ২১. দিকে, ২২. উঠে, ২৩. কতক্ষণ, ও ২৪. মুখ হা করে হেসে ওঠা।

www.pathagar.com

বুড়ি

কাহিনি সংক্ষেপ

[এক বৃদ্ধা রাস্তার পাশে বসিয়া ভিক্ষা করিতেছিল। এমন সময় ঐ রাস্তা দিয়া এক দারোগা ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতেছিল। দারোগা নিকটে আসিলে বৃদ্ধা তাহার কাছে ভিক্ষা চাহিলে দারোগা তাহাকে প্রার্থিত পয়সা দিয়া চলিয়া যাইতেছিল। বৃদ্ধা ভাবিল, সে যে পরিমাণ পয়সা চাহিয়াছে, দারোগা তো তাহাকে তাহাই দিয়াছে। আরো একটু বেশি চাহিলে তো আরো পয়সা পাওয়া যাইতো। এই ভাবিয়া সে দৌড়াইতে দৌড়াইতে আবার দারোগা বাবুর নিকটে গেল। এইবার সে পূর্বের চাইতে দ্বিগুণ পয়সা চাহিল। দারোগা বাবু বৃদ্ধাকে লোভী ভাবিয়া ঘোড়া হইতে নামিয়া বেত দিয়া কয়েক ঘা মারিয়া চলিয়া গেলেন। বুড়ি মনে মনে বলিতে লাগিল, পাইয়াছি আর না পাইয়াছি, সন্দেহটা তো দূর হইল। না হইলে একটা বিরাট আফসোস থাকিয়া যাইতো।]

অ্যাক বুড়ি রাস্ত্যর অ্যাক দারে[১] বইয়া বিক্কা[২] করতে আছিল। 'বাই[৩] দুইডা পইসা দ্যান, বাই দুইডা পইসা দ্যান' কইর‍্যা এট্টু বাদে বাদেই বোলাইতেছে[৪]। এট্টু পইসাঅলা মানুষ মনে অইলে হে'র মিটার বাইড়্যা যায়—বাই চাইর আনা পইসা দ্যান, বাই চাইর আনা পইসা দ্যান।

অনেক সুম দইর‍্যা ক্যাও আর রাস্তা দিয়া যাইতে আছিল না। ম্যালা পরে অ্যাক দারোগা হ্যাট মাতাত[৫] দিয়া গোড়ায়[৬] চইড়্যা হেই পত[৭] দিয়া যাইতে আছিল। বুড়ির মনে অইলো, এই ব্যাডা ত' গোড়ায় চইড়্যা আইতে আছে। হের মনে অয় বহুত পইসা আছে। আবার বাবতাছে, এই ব্যাডারে তো পুলিশ পুলিশ মনে অইতাছে। পুলিশেরা বহুত কিরপন[৮] অয়।

এইডা ওইডা বাবতে বাবতে দারোগা বাবু বুড়ির সামনে দিয়া যাইতে লাগলো। বুড়ি কইলো, 'দারোগা বাবু, দারোগা বাবু, আমারে আষ্ট আনা[৯] পইসা দ্যান। আমি বড় কষ্টে আছি।'

দারোগা বাবু গোড়াত তনে নাইম্যা আতের লাডি গুরাইতে গুরাইতে[১০] বুড়ির দারে[১১] আইয়া হের আতে আষ্ট আনা পইসা দিয়া আবার গোড়াত উইড্যা রওনা দিল।

এট্টু দূরে যাওনের পর বুড়ি বাবলো, হায় রে, কী বুলডাই[১২] না করলাম। দারোগা বাবু বড় বালা মানুষ। আষ্ট আনা পইসা চাইছিলাম দারোগা বাবুর দারে, আষ্ট আনাই দিছে। যদি অ্যাক ট্যাহা চাইতাম তাইলে ঠিক অ্যাক ট্যাহাই দিতো গো। এই কতা বাবতে বাবতে বুড়ি গোড়ার পিছে দৌড়াইতে লাগলো আর চিক্কইর[১৩] মাইর‍্যা কইতে লাগলো, 'ও দারোগা বাবু, ও দারোগা বাবু আমারে অ্যাকটা ট্যাহা দিয়া যান না।'

দারোগা বাবু গোড়ার পিডের তন[১৪] নাইম্যা বুড়িরে জিগ্গাইল, 'কী কইলা, আমি বুজি নাই।'

বুড়ি জোয়াব[১৫] দিল, 'দারোগা বাবু, আমারে অ্যাকটা ট্যাহা দ্যান, দারোগা বাবু।'

দারোগা বাবু বুড়ির লোব[১৬] দেইক্যা বিষণ রাগ অইল। হে আতের ব্যাতের[১৭] লাডিডা দিয়া বুড়ির পাছায় কয়ডা বারি[১৮] লাগাইয়া দিল। বুড়ি মাগো বাবাগো কইর‍্যা চিক্কইর দিতে দিতে দৌড় দিয়া পলাইতে লাগলো আর আত দিয়া পাছা গষতে[১৯]

www.pathagar.com

লাগলো। বুড়ি মনে মনে কইতে লাগলো, যাউকগা, পাইছি আর না পাইছি সন্দেহডা ত দূর অইছে। নইলে মনের মইদ্যে অ্যাকটা বড় খডখডি[২০] থাইক্যা যাইতো।

আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. একপাশে, ২. ভিক্ষা, ৩. ভাই, ৪. ডাকছে, ৫. মাথায়, ৬. ঘোড়ায়, ৭. পথ, ৮. কৃপণ, ৯. আট আনা, ১০. ঘুরাতে ঘুরাতে, ১১. কাছে, ১২. ভুলটাই, ১৩. চিৎকার, ১৪. পিঠ থেকে, ১৫. উত্তর, ১৬. লোভ, ১৭. বেতের, ১৮. আঘাত, ১৯. ঘষতে, ও ২০. দ্বিধা-দ্বন্দ্ব।

খ. কিংবদন্তি

ভোলা সদর উপজেলা

বুড়ির মসজিদ, বাপ্তা

অনুপম কারুকার্যমণ্ডিত এ জাতীয় মসজিদ ভোলায় দুর্লভ। 'বুড়ির মসজিদ' নামে পরিচিত এই বুড়ির প্রকৃত নাম কেউ জানে না।

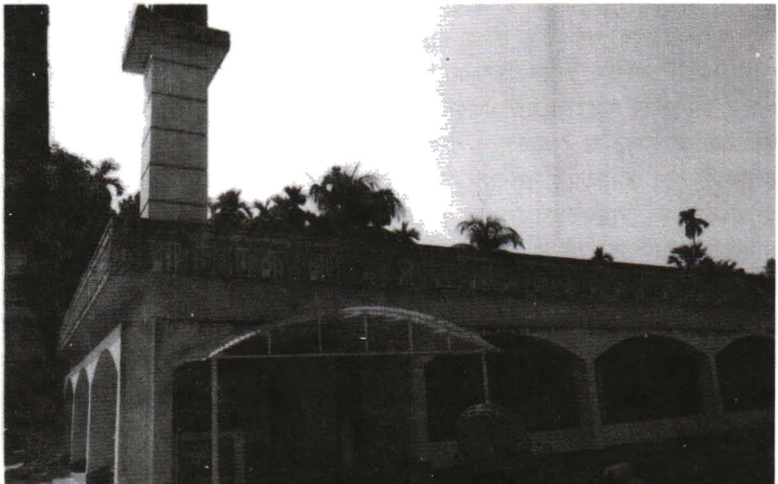

বুড়ির মসজিদ

স্থানীয় প্রবীণ অধিবাসীদের থেকে জানা যায়, এক বৃদ্ধা তার ছেলের কাছে একটি মসজিদ নির্মাণের ইচ্ছা ব্যক্ত করলে তিনি তার মায়ের ইচ্ছা পূরণের জন্য এই মসজিদ নির্মাণ করেন। মসজিদটি পরবর্তীকালে অনেক সংস্কার করে বর্তমান অবস্থায় নিয়ে আসা হয়।

জোলেখার বিল

বাপ্তা ইউনিয়নের এক বিশাল এলাকা 'জোলেখার বিল' নামে এলাকাবাসীর কাছে পরিচিত। কিন্তু এই জোলেখা বিবি কে, কি-ইবা তার পরিচয় এসব কিছুই জানা যায়

www.pathagar.com

না। তবে বাপ্তা ইউনিয়নের এক প্রবীণ অধিবাসী বলেন, শোনা যায়, এক যুবতী সারা বিল ঘুরে বিভিন্ন ধরনের শাক তুলতো। একদিন কে যেন একজন জিজ্ঞেস করেছে, এই, তোমার নাম কি? সারা বিল জুড়েই তুমি শাক তোল। সে তার নাম বলেছে 'জোলেখা বিবি'। সেই থেকেই নাকি এই বিলের নাম হয় 'জোলেখার বিল'।

দৌলতখান উপজেলা

কালা রায় (কালিকাপ্রসাদ রায়)

কিংবদন্তি এই যে, কালা রায় নামে খ্যাত কালিকাপ্রসাদ রায় ছিলেন এ অঞ্চলের এক প্রতাপশালী প্রজানিপীড়ক ও অত্যাচারী জমিদার। কিন্তু তার অধস্তন পুরুষদের কেউ কেউ এর সত্যতা স্বীকার করেননি, বরং তারা কালা রায়কে একজন প্রজাহিতৈষী জমিদার হিসেবে দাবি করেছেন। তবে কালা রায়ের ছেলেদের প্রজানিপীড়ন ও অত্যাচারের কথা তারা অস্বীকার করেননি।

কালা রায়ের পূর্বপুরুষরা ঢাকা জেলার ইদিলপুরের বাসিন্দা ছিলেন। কারো কারো মতে, কালা রায়ের পূর্বপুরুষ সিংহ রায় উত্তর শাহবাজপুরের পাল পাড়ার অধিবাসী ছিলেন। তিনি দক্ষিণ শাহবাজপুরের কিসমত কাটাসোনা গ্রামে তালুক লাভ করে সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। সিংহ রায়ের পুত্র অর্থাৎ কালা রায়ের পিতামহ পর্বত রায় হাজীপুর ও সৈয়দপুরে ইজারা গ্রহণ করেন। কালা রায়ের পিতা জসমন্ত রায়ও হাজীপুরে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। এ সময়ে একদল ডাকাতের হাতে স্ত্রী-পুত্র-কন্যাসহ নির্মমভাবে নিহত হন জসমন্ত সিংহ। তবে সুবি নামে এক ধাত্রীর অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের ফলে প্রাণে বেঁচে যান দশ বছর বয়সের কিশোর কালা রায়।

কালা রায়ের শৈশব-কৈশোর ও পরবর্তী জীবনকাল সম্পর্কেও বিভিন্ন ধরনের জনশ্রুতি রয়েছে। ডাকাতদলের হাতে পিতার মৃত্যুর পর অসহায় এতিম কালা রায় বেশ কিছুদিন পালিয়ে পলিয়ে বেড়ান। তিনি নাকি এক নায়েবের রাখাল হিসেবেও কিছুদিন কাজ করেন। কালা রায়ের জমিদারি প্রাপ্তি সম্পর্কেও বেশ চমকপ্রদ ঘটনা শোনা যায়। জনশ্রুতি এই যে, কালা রায় কৈশোরে একজন দক্ষ তীরন্দাজ হিসেবে বেশ সুখ্যাতি অর্জন করেন। এ সময়ে এক ইংরেজ লবণ ব্যবসায়ী ডেমোক্লিয়াস তার তীর নিক্ষেপের দক্ষতায় মুগ্ধ হয়ে তাকে তার দেহরক্ষী হিসেবে নিয়োগ দেন।

১৮০০ সালের দিকে স্থানীয় জনসাধারণ ইংরেজ লবণ এজেন্টদের অত্যাচারে ক্ষুব্ধ হয়ে পলিয়ে নামে এক লবণ কর্মচারীকে বর্শা দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করতে পারলেও কালা রায়ের সাহসিকতার ফলে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে প্রাণে বেঁচে যান ডেমোক্লিয়াস। এরই প্রতিদানস্বরূপ হাজীপুর ও সৈয়দপুরের কয়েকটি হাওলা কালা রায়কে প্রদান করেন ডেমোক্লিয়াস। আরেকটি জনশ্রুতি এই যে, কালা রায় কিশোর বয়সে দক্ষিণ শাহবাজপুরে এক ইংরেজ সাহেবের ফাই-ফরমাস খাটতো। একবার পানসি নৌকাযোগে বরিশাল যাবার পথে এক ডাকাতদলের কবলে পতিত হয় ঐ ইংরেজ সাহেবের পানসি বহর। কালা রায় নাকি এ সময় সুপারি ও জালের লোহার কাঠি দিয়ে

www.pathagar.com

ডাকাতদলের প্রতি রাতভর গুলাল ছুঁড়েন, যার ফলে তারা আর ইংরেজ সাহেবের পানসির ধারে-কাছেও ভিড়তে পারেনি। এভাবে তার জীবন রক্ষা করায় ইংরেজ সাহেব কালা রায়কে দৌলতখানে পাঁচ আনা অংশ জমিদারি লিখে দেন। এই জমিদারি পরে আরো বিস্তার লাভ করে। কালা রায় তার বসবাসের জন্য একটি দোতলা দালান নির্মাণ করেন এবং এই দালান, দরবার হল, মঠ ও দিঘি নিয়ে তার বাড়ির মোট আয়তন ছিল কয়েক কানি। তিনি প্রায় ১৫ বিঘা জমির ওপর একটি দিঘি নির্মাণ করেন, যার চারপাশে চারটি শান বাঁধানো ঘাট ছিল। তার বাড়ির দরজার দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় আধা মাইল (কারো কারো মতে দেড় মাইল)।

কালা রায়ের জমিদারি লাভ সম্পর্কে আরেকটি জনশ্রুতি হচ্ছে, জীবিকা নির্বাহের জন্য কালা রায় প্রথম জীবনে জেলের কাজ করতেন। একবার দিনের বেলা মাছ ধরার সময় তিনি নদীপাড়ের একটি ভেঙে পড়া পাড় থেকে কাঁচা টাকা পানিতে পড়তে দেখেন। তিনি অত্যন্ত সুকৌশলে গাছ-গাছালির ডালপালা ভেঙে তা দিয়ে টাকা পড়ার ঐ পাড়টি ঢেকে রাখেন। পরে রাতের বেলায় সেখানে গিয়ে নৌকাটিকে সামান্য কাত করে কাঁচা টাকায় নৌকা ভর্তি করে ফিরে আসেন। এই টাকা দিয়েই নাকি অনেক তালুক কিনেন। কেউ কেউ বলেন, বাল্য জীবনে তিনি ডাকাতি করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন এবং সেই অর্থের সাহায্যেই অনেক তালুক ক্রয় করেন।

প্রজাদের ওপর কালা রায়ের অত্যাচার নির্যাতন সম্পর্কে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। জনশ্রুতি রয়েছে, কালা রায়ের প্রাসাদে 'আন্ধারমানিক' নামে একটি কূপ ছিল। যেসব প্রজাদের বশে আনা যেতো না বা যারা তার বিরুদ্ধাচরণ করতো, তাদের নাকি অন্ধকূপে ফেলে দিয়ে হত্যা করা হতো।

কালা রায়ের নির্যাতন সম্পর্কে আর একটি বহুল প্রচলিত ঘটনা এই যে, তার বাড়ির সামনে দিয়ে কোনো গর্ভবতী মহিলাকে যেতে দেখলে তিনি নাকি তার গর্ভস্থ সন্তান ছেলে না মেয়ে তা পরীক্ষা করার জন্য পেট কেটে দেখতেন। কারো কারো মতে, এই বিষয়টি কালা রায় করতেন না, করতো তার তিন সন্তানের মধ্যে দুই অত্যাচারী সন্তান। তারা নাকি কোনো গর্ভবতী মহিলাকে যেতে দেখলে বাজি ধরতো। এক ভাই বলতো, গর্ভস্থ সন্তান পুত্র, অন্য ভাই বলতো কন্যা। এই বিরোধের মীমাংসা হতো গর্ভবতী মহিলার পেট কেটে।

কালা রায় তাঁর মায়ের স্মৃতি রক্ষার্থে একটি বিশাল মঠ নির্মাণ করেছিলেন। মঠ নির্মাণ শেষ হওয়ার পর তিনি নাকি বলেছিলেন, 'এবার আমি আমার মায়ের দুধের ঋণ শোধ করলাম।' একথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই নাকি মঠটি ভেঙে পড়েছিল। কালা রায় সম্পর্কে আরো জনশ্রুতি রয়েছে এই যে, কৃষক-প্রজারা কখনো তার বিরুদ্ধাচরণ করলে বা সামান্য কোনো অপরাধ করলে তার কাচারিতে রাখা জুতো দিয়ে তাদের ওপর নির্যাতন করা হতো। এই জুতার নাম ছিল 'কালেখা-পথেখা'।

কালা রায়ের সবকিছুই আজ শুধুই স্মৃতি। তার জমিদারি, আবাসিক প্রাসাদ, মন্দির, অন্ধকূপ, দিঘি, শান বাঁধানো ঘাট, সীমানা প্রাচীর, পুকুরের নীচে নির্মিত পাকা কোষাগার সবই স্থান করে নিয়েছে নদীগর্ভে।

www.pathagar.com

চরপাতা দায়রাবাড়ি মসজিদ

এই দায়রা বাড়ির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন প্রয়াত কমরুদ্দিন শাহ্ ও বাহাউদ্দিন শাহ। দু-থেকে আড়াই শ' বছর আগে এই বাড়ির মসজিদটি নির্মাণ করা হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়। এই মসজিদ নির্মাণের প্রকৃত ইতিহাস তেমন কিছু জানা যায় না। তবে স্থানীয় জনসাধারণের মুখে মুখে যা প্রচলিত তা হলো, বিভিন্ন স্থানের দায়রা বাড়ির হুজুরদের আদেশ-নির্দেশ পালনে কতিপয় জ্বীন ছিল। এসব জ্বীন হাতিয়া, সন্দ্বীপ, লালমোহন, ভোলা সদর উপজেলার বাপ্তা ও অন্যান্য দায়রা বাড়ির হুজুরদের বিভিন্ন সংবাদ আদান-প্রদানের কাজে নিয়োজিত ছিল। এরাই রাতারাতি এই মসজিদ নির্মাণ করে দেয়। সম্প্রতি প্রাচীন এই মসজিদটি ভেঙে ফেলা হয়েছে এবং এখানে একটি নতুন মসজিদ নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

বোরহানউদ্দিন উপজেলা

বিদ্যাসুন্দরীর দিঘি

দেউলার গুরিন্দা ('গুরিন্দা' শব্দের প্রকৃত অর্থ জানা যায় না। তবে তিনি কচুয়ার রাজসভার উজির এবং বিদ্যাসুন্দরীর স্বামী ছিলেন বলে জানা যায়। কারো কারো অনুমান, 'গোয়েন্দা' শব্দের পরিবর্তিত রূপ 'গুরিন্দা' এবং বিদ্যাসুন্দরীর স্বামী গোয়েন্দা হিসেবে কাজ করতেন। রানী কমলাসুন্দরীর আদেশ ও নির্দেশে বিদ্যাসুন্দরীর স্বামী দিঘিটির খনন কাজ তত্ত্বাবধান ও সম্পন্ন করেন।) বাড়ির পশ্চিম পাশে কচুয়ার রাজা জয়দেবের (মৃত্যু : ১৪৯০) জ্যেষ্ঠ কন্যা রানী কমলাসুন্দরী তার ছোট বোন বিদ্যাসুন্দরী এবং এ অঞ্চলের জনগণের কল্যাণের জন্য এ দিঘিটি খনন করেন। অবশ্য আজ আর একে দিঘি হিসেবে অভিহিত করার কোনো সুযোগ নেই। কারণ, দিঘিটির পশ্চিম পাড় বিলীন হয়ে গেছে তেঁতুলিয়া নদীর গর্ভে। অবশিষ্ট অংশে কয়েক যুগ আগে থেকেই কৃষিকাজ শুরু হয়।

মঙ্গলপুরের দিঘি

বিদ্যাসুন্দরী দিঘির দক্ষিণ-পূর্ব দিকে এক মাইলের মধ্যে এই মঙ্গলপুরের দিঘি। এটিও বিদ্যাসুন্দরী দেবীর নির্দেশে খনন করা হয়েছে বলে কারো কারো অনুমান। আবার অনেকে বলেন, কখন এবং কিভাবে দিঘিটি খনন করা হয়েছে, তা কেউ বলতে পারে না। তবে এক রাতের মধ্যেই এই বিশাল দিঘিটি খনন করা হয়েছে বলে জনশ্রুতি রয়েছে।

বিদ্যাসুন্দরী দিঘি বা মঙ্গলপুরের দিঘি নিয়ে অনেক কিংবদন্তি রয়েছে। বলা বাহুল্য, কোনো বড় দিঘি বা পুকুরকে ঘিরে এ ধরনের কিংবদন্তি বাংলাদেশের অনেক জেলায়ই রয়েছে। এখানে জনশ্রুতি এই যে, প্রতি অমাবস্যা-পূর্ণিমায় দিঘির পানির উচ্চতা বেড়ে কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে যেতো। রাতের শেষ প্রহরের দিকে ঐ দিঘিতে ভাসতে থাকতো সোনার বৈঠাসহ সোনার নৌকা। দিঘির উত্তর পাড়ের জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে একটি বিশাল বৃক্ষের নীচে দাঁড়িয়ে যদি কেউ বিয়ে-শাদী, পূজা-পার্বণ

www.pathagar.com

বা অন্য কোনো উৎসব-অনুষ্ঠান উপলক্ষে প্রয়োজনীয় থালা-বাটি, ইত্যাদি চাইতো তাহলে নির্দিষ্ট তারিখ ও সময়ে সে-সব জিনিস গাছটির নীচে চলে আসতো। অনুষ্ঠান শেষে সেগুলো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে ঐ গাছের নীচে রেখে আসলে দিঘির তলায় তলিয়ে যেতো।

কিন্তু এই থালা-বাটি আসা-যাওয়া একদিন বন্ধ হয়ে গেল। কেন? জনশ্রুতি এই, একদিন কোনো এক লোভাতুর ব্যক্তি ঐ থালাগুলির মধ্যে থেকে একটি থালা লুকিয়ে রেখে তার পরিবর্তে নিজেদের ব্যবহৃত পুরনো একটি থালা সেই বৃক্ষের নীচে রেখে দেয়। কিন্তু থালার জায়গায় থালা পড়ে থাকে, একটি থালাও নড়াচড়া করে না, অর্থাৎ দিঘির অতল তলে চলে যায় না।

গ্রামবাসীরা ভীত, আতঙ্কিত ও চিন্তিত হয়ে পড়ে। অবশেষে তারা যে বাড়িতে অনুষ্ঠান হয়েছিল, সে-বাড়ির ধানের গোলা থেকে ঐ থালাটি উদ্ধার করে দিঘির পাড়ের বৃক্ষটির নীচে রেখে আসে। তারপর এসব থালা-বাটি যে দিঘির ভেতরে তলিয়ে যায় আর কোনোদিন গ্রামবাসীর ডাকে সাড়া দেয়নি। একবার কলসি কাঁখে এক নববধূ দিঘির ঘাটে নেমেছিল। কিন্তু সে নাকি আর জীবিত ফিরে আসতে পারেনি। নাক-মুখ দিয়ে রক্ত উঠে সে মারা যায়।

জানখার দিঘি (দেউলা) : কে বা কারা এই দিঘি খনন করেছে, সে সম্পর্কে কোনো কিছু জানা যায় না। তবে এই দিঘি সম্পর্কে বিশেষ একটি কিংবদন্তি এই যে, তথ্যদাতা বলেন, আমাদের পূর্বপুরুষরা বলে গেছেন, তারা শুনেছেন যে, বিশেষ কোনো অনুষ্ঠান অর্থাৎ বিয়ে-শাদী, মেজবানি, পূজা-পার্বণ উপলক্ষে খাবার-দাবারের আয়োজন করা হলে এতো লোকের বাসন-কোসনের ব্যবস্থা করা ছিল একটি দুঃসাধ্য বিষয়। অনেক ভাগে ভাগে খাওয়াতে হতো। তখন তো আর বর্তমান সময়ের মতো ডেকোরেটরের ব্যবস্থা ছিল না। এই অবস্থায় মানুষ যে-কোনোভাবেই হোক জানতে পেরে এই দিঘির কাছে নিবেদন করলে প্রয়োজনীয় থালা-বাসন, প্লেট-পিরিচ, কাপ চামচ ইত্যাদি দিঘির মাঝখান দিয়ে ভেসে উঠে ভাসতে ভাসতে কিনারায় চলে আসতো। প্রয়োজন শেষ হয়ে গেলে আবার মানুষ সেগুলো রেখে আসতো। কিন্তু কবে থেকে এবং কী কারণে এটি বন্ধ হয়ে যায় সেকথা কেউ বলতে পারে না।

নৌবহরের গোলা (বোরহানগঞ্জ) : কিংবদন্তি এই যে, বোরহানউদ্দিন হাওলাদার বাড়ির পুকুরের পাশের বর্তমান বাগানের স্থানটিতে একসময় নৌবহরের গোলা ছিল। প্রায় ১০০ হাত (১৫০ ফুট) প্রশস্ত এই স্থানটিতে অসংখ্য সওদাগরী নৌকা এসে ভিড়তো। তারপর ধান বোঝাই করে তারা কোনো গন্তব্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা করতো। অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে পুকুরটির পানি যখন শুকিয়ে যেতে শুরু করতো কিংবা পানি সেচ দিয়ে ফেলা হতো, তখন বহুযুগ পরেও পুকুরের পাড় ঘেঁষে দৃশ্যমান হয়ে উঠতো ধানবিহীন অসংখ্য ধানের গোছা। অথচ এ স্থানে ধানের কোনো বীজ বপন করা হতো না।

যুগলার দিঘি : কিংবদন্তি এই যে, এই দিঘিতে যতোই মাছ ধরা হতো, মাছ কোনোদিন শেষ হতো না। পানি যতোই সেচ করা হতো, পানির শেষ ছিল না।

www.pathagar.com

চরফ্যাশন উপজেলা

কাজী বাড়ির পুকুর

এটি একটি বিশাল আয়তনের পুকুর। এর আয়তন ২ একর অর্থাৎ ৬ বিঘা। পুকুরটিতে দীর্ঘদিন কোনো মানুষ নামতো না। কোনো কারণ জানা না গেলেও জনশ্রুতি আছে যে, পুকুরটিতে 'খইট' (জলজ অশুভ শক্তি) আছে। এই 'খইট'কে কেউ কোনোদিন স্বচক্ষে দেখেছে, এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি, এর আকার বা আকৃতির বর্ণনাও কেউ স্পষ্ট করে দিতে পারে না। তবে 'খইট' বলতে এমন একটি জলজ অশুভ শক্তিকে বোঝায়, যে শক্তি পুকুরের পানিতে কোনো মানুষ পা নামালে তাতে লোহার মোটা শিকল পরিয়ে দিয়ে এক টানে পুকুরের তলদেশে নিয়ে যেতে পারে।

ধীরে ধীরে বাড়ির সদস্যদের 'খইট' ভীতি কেটে যায় এবং তারা যথারীতি পুকুরটি ব্যবহার করতে শুরু করে।

গ. কৌতুক

তজুমুদ্দিন উপজেলা

॥ এক ॥

[এক গ্রামের এক ভদ্রলোক জাহাজে খালাসীর চাকরি করিত। দিনে দিনে ঐ বাড়িটা 'খালাসি বাড়ি' নামে পরিচিতি লাভ করে। কিন্তু প্রচুর টাকা-পয়সা থাকা সত্ত্বেও বাড়িটি খালাসি বাড়ি নামেই পরিচিত থাকুক, এইটা খালাসী আলী মিয়ার একেবারেই পছন্দ নয়। কিছুতেই তিনি 'আলী মিয়ার বাড়ি' নামটা মানুষের কাছে পরিচিত করাইতে পারিলেন না। অবশেষে একদিন বাধ্য হইয়া একটি সাইনবোর্ড টানাইয়া দিলেন যাহাতে লিখা ছিল— 'আলী মিয়ার বাড়ি'। কিন্তু গ্রামের অনক্ষর লোকজন এই লেখা পড়িতে না পারিয়া 'সাইনবোর্ড আলাদের বাড়ি' বলিতে থাকে। এইভাবে বাড়িটি আবার 'সাইনবোর্ড আলাদের বাড়ি' নামে পরিচিতি লাভ করে, কিন্তু 'আলী মিয়ার বাড়ি' আর কেহই বলে না।]

অ্যাক গেরামে আছিল অ্যাক খালাসি। হে বহুত দিন জাহাজে খালাসির চারকি[১] করছে, বহুত দ্যাশ-বিদ্যাশ গুরছে। বহুত টাকা-পইসা কামাইছে। যেই বাড়িত টিনের গর আছিল, হেয়ানো অ্যাহন বিল্ডিং উডাইছে। কিন্তু তার মনের দুক্ক আর যায় না। ব্যাডায় অ্যাহন আর চায় না যে, হ্যাগো বাড়িরে কেউ খালাসীগো বাড়ি কউক। অ্যাতো ট্যায়া-পইসার কী দাম।

ব্যাডায় কষ্টে মাইনষেরে বোজানোর চেষ্টা করলো যে, এইডারে তো আমার নামেই—(আলী মিয়ার বাড়ি) মাইনষে কইতো পারে। কিন্তু কয়জনেরে আর দইর‍্যা দইর‍্যা[২] বুজান যায়। আলী মিয়ার বাড়ির বদলে মাইনষে অ্যাহনও খালাসীগো বাড়িই কয়।

আলী মিয়া অ্যাকদিন বুদ্দি কইর‍্যা অ্যাকটা সাইনবোর্ড লেখাইয়া আইন্যা বাড়ির সামনে টাঙ্গাইয়া দিল—'আলী মিয়ার বাড়ি'।

www.pathagar.com

অ্যাহন আরো সমস্যা অইয়া গ্যালো। গেরামের মানুষ কয়জনই আর লেহাপড়া জানে। হেরা তো আর সাইনবোর্ডের লেহা পড়তো পারে না। অ্যাহন অইল কি, 'আলী মিয়ার বাড়ি' তো অইল-ই না, খালাসীগো বাড়িও আর থাকলো না। অ্যাহন গেরামের মানুষের মুখে মুখে রইট্যা[৩] গেল— 'সাইনবোর্ড আলা গো বাড়ি।'

আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. চাকরি, ২. ধরে ধরে, ও ৩. রটে।

॥ দুই ॥

য্যামন[১] ওস্তাদ ত্যামন[২]ই হইল হ্যার শিষ্য। ওস্তাদ বিবিন্ন[৩] মানুষকে বিবিন্ন রকমের তাবিজ-কবজ, পানি পড়া দ্যাওয়ার তন শুরু কইর‍্যা বিবিন্ন রকমের সমস্যার সমাদান দ্যান। মানুষ আইয়া অনেক রকম দোয়া চায়। অনেকে আইয়া স্বপ্নের কথা কয়—হুজুর, আমি গতকাইল রাইতকা এই স্বপ্নডা দেকছি। এইডার কি অর্থ, আমারে এট্টু কইয়া দ্যান।

ওস্তাদের ওই যে শিষ্য, হে অ্যাকদিন আইয়া হের ওস্তাদেরে কইল, হুজুর, গত রাইতে আমি অ্যাকটা স্বপ্ন দ্যাকছি। এইডার অর্থ কি আমারে এট্টু বুজাইয়া দিবেন?

ওস্তাদ জিগ্যাইলেন, কী স্বপ্ন, ক দেহি।

শিষ্য কইতে থাকলো—হুজুর আমি স্বপ্নে দেহি কি, আমার আতের কইন্যা[৪] পইরযন্ত[৫] গুয়ে[৬] লেপটাইয়া রইছে, আর আমনের আতের কইন্যা পইরযন্ত মদু[৭] তে লেপটাইয়া রইছে।

এই পইরযন্ত হুইন্যাই হুজুর কইয়া উটলেন, আরে বেকুব, আমার আতো মদু থাকপো না তো তোর আতো থাকপো? আমি কি কাম করি আর তুই কি কাম করছ, এইডা চোহে দেহস্ না?

শিষ্য কইল, হুজুর, আমার স্বপ্ন ত' অ্যাহনো শেষ অয় নাই।

আর কি, আর কি দ্যাকছস?

শিষ্য জোয়াব দিল, হুজুর আমি দেহি কি, আমি আপনের ওই মদু মাখোইন্যা[৮] আতখানা চাটতাছি, আর আমনে আমার গু' মাখোইন্যা আতখানা চাটতাছেন।

আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. যেমন, ২. তেমন, ৩. বিভিন্ন, ৪. কনুই, ৫. পর্যন্ত, ৬. মলে, ৭. মধু, ৮. মাখানো।

চরফ্যাশন উপজেলা

কাহিনি সংক্ষেপ

[যজ্ঞেশ্বর বাবু আর রফিক মিয়া দুই বন্ধু। যজ্ঞেশ্বর বাবুর বয়স ষাট হইলেও প্রতিবছরই তিনি সন্তানের জনক হইতেছেন। এই বিষয় লইয়াই দুই বন্ধুর কথোপকথন।]

যজ্ঞেশ্বর বাবু আর রফিক মিয়া দুই বন্দু[১]। যজ্ঞেশ্বর বাবুর বয়স ষাইট[২] আর রফিক মিয়ার বয়স পঞ্চাশ। বয়সের ফারাক থাকলেও হেরা দুইজনে খুবই গনিষ্ট[৩]। পরায়দিনই[৪] হ্যাগো মইদ্যে দেহা-সাক্‌কাত[৫] অয়। অ্যাকদিনকার কতা। যজ্ঞেশ্বর বাবু আর রফিক মিয়া বেইন্যালা[৬] আড়া-আডি[৭] করতে আছিল। যজ্ঞেশ্বর বাবুর লগে অ্যাকটা বাচ্চা পোলা। রফিক মিয়া হ্যারে জিগ্যাইলেন, কী যজ্ঞেশ্বর বাবু, নাতি নাহি?

www.pathagar.com

যজ্ঞেশ্বর বাবু জোয়াব দিলেন, না পোলা।

রফিক মিয়া : বয়স কতো অইল?

যজ্ঞেশ্বর বাবু : এই তিনে পা দিছে।

রফিক মিয়া : এই শেষ পোলা, না?

যজ্ঞেশ্বর বাবু : না, না, আরো আছে।

রফিক মিয়া : হের বয়স কত?

যজ্ঞেশ্বর বাবু : এইডার পরেরডার বয়স দুই বচ্ছর।

রফিক মিয়া : ওইডাই শেষ, না?

যজ্ঞেশ্বর বাবু : না, না, আরো আছে।

রফিক মিয়া : আরো আছে? হেইডার বয়স কত?

যজ্ঞেশ্বর বাবু : অ্যাকটা কোলে। হেইডার বয়স অ্যাক বচ্ছর।

রফিক মিয়া : যাউক, আমনের এই শেষ পোলার নাম কি?

যজ্ঞেশ্বর বাবু : আইস্যা উইট্যা[৮] কইলেন, শেষ মানি? আরো আছে।

রফিক মিয়া অবাক অইয়া জিগ্যাইলেন, আরো আছে মানি? হের বয়স কত?

যজ্ঞেশ্বর বাবু এট্টু আইস্যা জোয়াব দিলেন, হে অ্যাহনও আহে নাই, তয় শিগগিরই আইবো।

আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. বন্ধু, ২. ষাট, ৩. ঘনিষ্ঠ, ৪. প্রায় দিনই, ৫. দেখা-সাক্ষাৎ, ৬. ভোরবেলা, ৭. হাঁটাহাঁটি, ও ৮. হেসে উঠে।

ঘ. কবিগান

ভোলা সদর উপজেলা

যাত্রাপালার মতো মহাজন বাড়ির কবিগানের ইতিহাসও শতবর্ষের। এ শিল্পেরও সংগঠক ও পৃষ্ঠপোষক মহাজন বাড়ির মহাজনরাই। তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় সংগঠিত কবিগানের দলটি 'বাপ্তা চার আনি কবিগানের দল' হিসেবে সমধিক খ্যাতি অর্জন করেছিল। এ দলের প্রধান 'সরকার' ছিলেন বোরহানউদ্দিন উপজেলার কাচিয়া ইউনিয়নের 'পটকা মনসা' গ্রামের প্রয়াত রায়মোহন সরকার। তারপরেই বিশেষ সুনাম অর্জন করেন তজুমুদ্দিন উপজেলার গুরিন্দা ইউনিয়নের নারায়ণচন্দ্র দাস এম.এড.। তিনি খাসেরহাট স্কুলের প্রধান শিক্ষক পদে কর্মরত ছিলেন। লালমোহন উপজেলার কালমার বিখ্যাত কবিয়াল নারায়ণ সরকার 'বাপ্তা চার আনি' কবির দলের আরেকজন জনপ্রিয় ও খ্যাতিমান কবিয়াল। সর্বশেষ (৬.৭.১২) প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী তিনি তজুমুদ্দিন উপজেলার 'বৈষ্ণব পল্লী' স্কুলের প্রধান শিক্ষক পদে কর্মরত। এই দলে আরো ছিলেন হরিনারায়ণ দে (প্রয়াত), প্রমোদনাথ দে, অমূল্যচরণ দে প্রমুখ।

বাপ্তা মহাজন বাড়ির কবিগানের লড়াইয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে, এমনকি, পশ্চিমবঙ্গের খ্যাতিমান কবিয়ালরাও অংশ নিতেন। বাংলাদেশের বিখ্যাত কবিয়াল বিজয় সরকার, ঘোড়াশালের কালো শশী, তারিন, গোপালগঞ্জের বিনয় বাগচী ও প্রশান্ত, নোয়াখালীর রায়হরণ সরকার, খুলনার যোগেশচন্দ্র সরকার ও বাগেরহাটের

www.pathagar.com

নিশিকান্ত সরকার এবং ত্রিপুরার সন্ধ্যারানী সরকার, কলকাতা জোড়াসাঁকোর শ্রী দুর্গারানী সরকার, প্রমুখের নাম এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পরিতাপের বিষয়, বর্তমানে এই দলে কোনো স্থানীয় কবিয়াল নেই। ঢাকা, নরসিংদী, গোপালগঞ্জ প্রভৃতি স্থান থেকে কবিয়ালদের এনে কবিগানের লড়াইয়ের আয়োজন করা হয়। মহাজন বাড়ির সুবিস্তৃত উঠান কবিয়ালদের বাকচাতুর্য ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বপূর্ণ লড়াইয়ে মুখরিত হয়ে উঠে। যতদূর জানা যায়, ভোলায় কবিগানের আরো তিনটি দল ছিল, 'ইলিশা কবিগানের দল', 'চরপাতা কবিগানের দল' ও 'তজুমুদ্দিন কবিগানের দল'। 'তজুমুদ্দিন কবিগানের দল'-এর দু'জন বিখ্যাত কবিয়াল ছিলেন হেমাঙ্গিনী ও কামিনী রায়। আড়ালিয়া আশ্রমের হলধর বৈষ্ণব হেমাঙ্গিনীকে নোয়াখালী থেকে তজুমুদ্দিনে নিয়ে আসেন। তারপর থেকে হেমাঙ্গিনী এখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। তাঁর মেয়ে কুমুদিনীও ঐ কবিগানের দলের একজন সদস্য ছিলেন। অপর কবিয়াল কামিনী রায়ের বাড়ি ছিল বোরহানউদ্দিন উপজেলায় মুন্সির হাটে। হেমাঙ্গিনী ও কামিনী রায় বিভিন্ন স্থানে কবির লড়াইয়ে অবতীর্ণ হতেন। 'ইলিশা কবিগানের দলে' ছিলেন মনমোহন রায়, কালীচরণ দে, নিত্যানন্দ শীল, লক্ষ্মীকান্ত রায়, হরেকৃষ্ণ সাধু প্রমুখ। 'চরপাতা কবিগানের দলে'র মুকুন্দলাল তেলী, অরুণাংশ মৈত্র, রমেশ ধোপী, বনবিহারী দে প্রমুখ বেশ খ্যাতি অর্জন করেন।

রতন মহাজন বাড়ির বিখ্যাত 'শ্রীগৌরাঙ্গ অপেরা' ও 'বাপ্তা চার আনি কবিগানের দল' গড়ে ওঠে প্রধানত এ বাড়ির সংস্কৃতিবান মহাজনদের প্রচেষ্টা, সাংগঠনিক দক্ষতা ও আর্থিক আনুকূল্যে। অভিনেতা-সংগঠক-ব্যবসায়ী রতন মহাজন ছিলেন এর পুরোধা। যাত্রা ও কবিগানের দলের বিভিন্ন সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড ও যাত্রাপালা মঞ্চায়নের সামগ্রিক ব্যয় সরকারি-বেসরকারি কোনো প্রকার আর্থিক সহায়তা ছাড়া এ-বাড়ির মহাজনরাই বহন করেন। এই বিশাল ব্যয় নির্বাহের জন্য বিদগ্ধ রতন মহাজন রেখে গেছেন ৫ (পাঁচ) কানি (৫০০ শতাংশ) জমি, যার বর্তমান আনুমানিক মূল্য প্রায় ৪০ (চল্লিশ) লক্ষ টাকা। মূলত এ জমিতে উৎপাদিত ফসলের আয় থেকেই যাত্রা ও কবিগানের দলের সামগ্রিক ব্যয়ের কিয়দংশ মেটানো হয়ে থাকে। এছাড়া আর কোনো সরকারি-বেসরকারি আর্থিক সহায়তা নেই।

আজকাল গ্রামাঞ্চল থেকে যাত্রা, জারিগান, কবিগান একেবারে উঠে গেছে বললেও বাড়িয়ে বলা হবে না। এখন যাত্রা ও কবিগান করতে গেলে প্রশাসনের অনুমতির প্রয়োজন হয়। আর এ অনুমতি পাওয়ার জন্য স্থানীয় চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ, স্বাস্থ্য বিভাগসহ অনেক জায়গায়ই ছোটাছুটি ও তদবির করতে হয়। এসব কর্তৃপক্ষ যদি আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন, তাহলে জেলা প্রশাসনেরও অনুমতি দেওয়ার ক্ষমতা থাকে না। এ কারণেই এখানে কোনো সৌখিন কিংবা পেশাদারী যাত্রাদল বা কবি গানের দল গড়ে উঠতে পারছে না।

বোরহানউদ্দিন উপজেলা

কবিগানের লড়াই ও যাত্রাপালা মঞ্চায়নে বোরহানউদ্দিন উপজেলার মৃজাকালুর একসময় বেশ খ্যাতি ছিল। এখানকার মহিলা কবিয়াল হেমাঙ্গিনী ও পুরুষ কবিয়াল

www.pathagar.com

কামিনীর সুখ্যাতি জেলার সীমানা ছাড়িয়ে জেলার বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছিল। হেমাঙ্গিনী নোয়াখালী থেকে এখানে এসে বসতি স্থাপন করেন। আড়ালিয়ার হলধর বৈষ্ণব তাঁকে এখানে নিয়ে আসেন। অন্যদিকে, বোরহানউদ্দিনের মুন্সির হাটের তরুণ কবিয়াল কামিনী রায়ও তখন বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন। দলে দলে মানুষ তাদের কবির লড়াই শোনার জন্য সমবেত হতো। একবার কবিয়াল হেমাঙ্গিনীর চেয়ে কনিষ্ঠ কবিয়াল কামিনী তার সাথে কবিগানের লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছিল। হেমাঙ্গিনী ঐ কবিয়ালকে বিব্রত করার জন্য মঞ্চে উঠেই আহ্বান জানান, 'যাদু আয় রে আয়, হেমাঙ্গিনী তোরে দুধ খাইতে বোলায় (ডাকে)'। হেমাঙ্গিনীর রসাত্মক ভাষার প্রয়োগ ও অঙ্গভঙ্গি দেখে উপস্থিত হাজার হাজার দর্শকশ্রোতা প্রচণ্ড হাসিতে ফেটে পড়ে। হেমাঙ্গিনীর মেয়ে কুমুদিনীও কবিগানের দলের সদস্য ছিলেন।

ঙ. শ্লোক : বোরহানউদ্দিন উপজেলা

ভোলা দ্বীপাঞ্চল দীর্ঘদিন ধরেই বরিশাল ও নোয়াখালী জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। এজন্য এ দুটি জেলার সাথে ভোলার যোগাযোগও ছিল খুবই নিবিড়। বরিশালের এমনি একটি ঘটনা ভোলার মানুষের মুখে শোলকের আকারে উচ্চারিত হয়। কেউ যদি অপরের ক্ষতি করে বা করতে চায়, তাহলে পরিণামে যে নিজেরও ক্ষতি হতে পারে, এমন সম্ভাবনার কথা জানিয়ে তাকে সতর্ক হতে উপদেশ দেওয়ার ক্ষেত্রে এই শ্লোকটি ব্যবহার করা হয় : 'পরের ক্ষতি আপন নাশ, তার সাক্ষী দয়াল দাস'।

মোগল শাসনামলে পরগনা, মহল ও মৌজায় কর্মরত বিভিন্ন শ্রেণির কর্মচারীরা অধিকাংশ সময়েই কর্মস্থল মফস্বলে না থেকে ঢাকা বা দিল্লিতে বিলাস-ব্যসনে মত্ত থাকতেন। তাদের কেউ কেউ শাসনকার্য পরিচালনায় যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন, আবার কেউ কেউ প্রজাদের ওপর নির্যাতন, নারী নির্যাতন কিংবা নারীসম্ভোগে জড়িয়ে পড়ে দুর্নামের শিকার হন। তারা যখন মফস্বলে আসতেন তখন স্থানীয় কিছু সুবিধাভোগী মানুষ এসব কাজে মোগল কর্মচারীদের সহায়তা করতেন এবং সুন্দরী সুন্দরী নারী সংগ্রহ করে তাদের ভোগের জন্য উপঢৌকন দিতেন। বিনিময়ে তারা বিশেষ আর্থিক ও অন্যান্য সুবিধা গ্রহণ করতেন।

উমেদ খাঁ ও আগা সাদেক ছিলেন ভোগ-বিলাসে মত্ত এমনি দু'জন মোগল কর্মচারী। তারা জমিদারির কাজ-কর্ম দেখা শোনার জন্য প্রায়ই বরিশালে আসতেন। এ সময় উমেদপুরের প্রতাপশালী ভূস্বামী দয়ালদাস চৌধুরী মোগল কর্মচারী আগা সাদেকের ভোগ-লালসা চরিতার্থ করার জন্য সুন্দরী সুন্দরী মেয়ে সংগ্রহ করে তাকে উপঢৌকন দিতো। এক পর্যায়ে ভোগে মত্ত আগা সাদেক দয়াল দাসের সুন্দরী কন্যা সাবিত্রীকে দেখে তার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং তাকে ভোগ করার জন্য হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েন। তিনি তার লোকজন দিয়ে সাবিত্রীকে তার ঘরে আসার আহ্বান জানালে দয়াল দাস উত্তেজিত হয়ে তাদের তিরস্কার করে তাড়িয়ে দেয়। এতে আগা সাদেক ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন। তিনি মুর্শিদাবাদ ফিরে যান এবং সেখান থেকে একদল সেনা এনে দয়াল দাসকে আক্রমণ করেন। এতে দয়াল দাস পরাজয় বরণ করেন। এই অপমানজনক সংবাদ শুনে দয়াল দাসের স্ত্রী, কন্যা সাবিত্রী ও বাড়ির অন্যান্য মহিলা

www.pathagar.com

বিষখালী নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মাহুতি দেন। এই ঘটনাকে অবলম্বন করেই সেখানকার লোকজন এই শ্লোকটি তৈরি করে।

তথ্যসূত্র

১. খালেদা বেগম লাইজু, পিতা : প্রয়াত মাওলানা আবদুল খালেক, মাতা : রাবেয়া বেগম, শিক্ষাঃ বি.এ., বয়স : ৩২ বছর, পেশা : গৃহিণী, ঠিকানা : হেলিপোর্ট রোড, ডাকঘর ও উপজেলা : ভোলা
২. মোহাম্মদ আবদুল্লাহ, পিতা : মোহাম্মদ ইছহাক, মাতা : প্রয়াত সুফিয়া বেগম, শিক্ষা : ফাজিল, বয়স : ৪০ বছর, পেশা : ব্যবসা, ঠিকানা : ৭ নং ওয়ার্ড, দৌলতখান পৌরসভা, ডাকঘর : দৌলতখান, উপজেলা : দৌলতখান
৩. নাম : মোঃ আনিসুর রহমান, পিতা : প্রয়াত কেরামত আলী, মাতা : প্রয়াত নূরুন্নাহার বেগম, শিক্ষাঃ নবম শ্রেণি, বয়স : ৫৭ বছর, পেশা : ব্যবসা, ঠিকানা : গ্রাম : আড়ালিয়া, উপজেলা : তজুমুদ্দিন
৪. কার্তিক দেবনাথ, পিতা : ননীগোপাল দেবনাথ, মাতা : শান্তি দেবনাথ, শিক্ষা : ডি.ইউ.এম.এস., বয়স : ৬১ বছর, ঠিকানা : গ্রাম : হাসাননগর, ডাকঘর : মৃজাকালু, উপজেলা : বোরহানউদ্দিন
৫. নোয়াব আলী হাওলাদার, পিতা : প্রয়াত আশরাফ আলী হাওলাদার, মাতা : শামসুন্নাহার খাতুন, পেশা : রিকশা শ্রমিক, শিক্ষা : নবম শ্রেণি, বয়স : ৫২ বছর, ঠিকানা : গ্রাম : মুন্সির হাওলা, উপজেলা : লালমোহন
৬. মোঃ সোলায়মান ফরাজি, পিতা : প্রয়াত আলিমউল্লাহ ফরাজি, শিক্ষা : তৃতীয় শ্রেণি, পেশা : দিনমজুর, বয়স : ৫২ বছর, ঠিকানা : কাশেমগঞ্জ বাজার, উপজেলা : চরফাশন
৭. মোঃ আলাউদ্দিন ব্যাপারী, পিতা : মোঃ আবুল হাশেম ব্যাপারী, মাতা : খায়রুন্নেছা বেগম, বয়স : ৩৭ বছর, শিক্ষা : তৃতীয় শ্রেণি, পেশা : রিক্সাশ্রমিক, ঠিকানা : গ্রাম : সোনারচর, ডাকঘর : হাজীরহাট, উপজেলা : মনপুরা
৮. ভোলা জেলার ইতিহাস
৯. মোস্তফা হারুণ সম্পাদিত
১০. শফিকুল মাওলা ফারুক (শ.ম.ফারুক), পিতা : প্রয়াত সিকান্দার আহমদ, মাতা : ফিরোজা বেগম, শিক্ষা : বি.এ. (অনার্স), এম.এ., বয়স : ৫১ বৎসর, পেশা : অধ্যাপনা, সাংবাদিকতা, ঠিকানা : গ্রাম : চরখলিফা, ডাকঘর : দিদারুল্লা, উপজেলা : দৌলতখান
১১. বিপ্লবকুমার পাল, পিতা : সুকুমার পাল, মাতা : নন্দরানী পাল, বয়স : ৩৭ বছর, শিক্ষা : এম.এ., পেশা : অধ্যাপনা, ঠিকানা : এসএস পাল প্লাজা, কুমার পট্টি, ভোলা, উপজেলা : ভোলা সদর
১২. কার্তিক দেবনাথ, পিতা : ননী গোপাল দেবনাথ, মাতা : শান্তি দেবনাথ, শিক্ষা : ডি.ইউ.এম.এস. বয়স : ৬১ বছর, ঠিকানা : গ্রাম : হাসাননগর, ডাকঘর : মৃজাকালু, উপজেলা : বোরহানউদ্দিন
১৩. মোশারেফ হোসেন হাওলাদার, পিতা : প্রয়াত আবদুর রাজ্জাক হাওলাদার, মাতা : প্রয়াত সবুরা খাতুন, বয়স : ৬৭ বছর, পেশা : অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ঠিকানা : গ্রাম : পক্ষীয়া, ডাকঘর : বোরহানগঞ্জ, উপজেলা : বোরহানউদ্দিন

www.pathagar.com

১৪. ভোলা জেলার ইতিহাস (তৃতীয় সংস্করণ, ২০০১), লেখক : মোহাম্মদ হোসেন চৌধুরী, ঠিকানা : চৌধুরী ভবন, পৌর কাঁঠালী
ডাকঘর : ভোলা, উপজেলা : ভোলা সদর
জেলা : ভোলা

১৫. কাজী মোহাম্মদ রাশেদ, পিতা : প্রয়াত মোহাম্মদ আলী, মাতা : জাকিয়া বেগম, বয়স : ৩৯, পেশা : ব্যবসা, ঠিকানা : রমজান আলী কাজীবাড়ি, দক্ষিণ ফ্যাশন, ডাকঘর ও উপজেলা : চরফ্যাশন

১৬. মোঃ আনিসুর রহমান, পিতা : প্রয়াত কেরামত আলী, মাতা : প্রয়াত নূরুন্নাহার বেগম, শিক্ষা : নবম শ্রেণি, বয়স : ৫৭ বছর, পেশা : ব্যবসা, ঠিকানা : গ্রাম : আড়ালিয়া, উপজেলা : তজুমুদ্দিন,

১৭. আবদুল আলিম, পিতা : মোঃ খোরশেদ আলম, মাতা : প্রয়াত খোদেজা খাতুন, শিক্ষা : পঞ্চম শ্রেণি, বয়স : ৪২ বছর, পেশা : কৃষি শ্রমিক, ঠিকানা : গ্রাম ও ডাকঘর : আসলামপুর, উপজেলা : চরফ্যাশন

১৮. মোহাম্মদ হোসেন চৌধুরী, পিতা : আলহাজ্ব আশেক আলী চৌধুরী, ঠিকানা : চৌধুরী ভবন, পৌর কাঠালী, উপজেলা : ভোলা সদর

১৯. আবদুর রহমান, পিতা : প্রয়াত মৌলভী একেএম ইউসুফ, মাতা : প্রয়াত জোলেখা খাতুন বয়স : ৬৮ বছর, পেশা : ব্যবসা, ঠিকানা : গ্রাম : বাপ্তা, ডাকঘর : উপজেলা : ভোলা

২০. মনোরঞ্জন দে ওরফে রিন্টু মহাজন (অভিনয়শিল্পী), পিতা : প্রয়াত আশুতোষ দে মহাজন, মাতা : জ্যোৎস্না রানী দে, বয়স : ৪৬ বছর, পেশা : চাকরি, ঠিকানা : গ্রাম : মধ্যবাপ্তা, ডাকঘর : ভোলা, উপজেলা : ভোলা

www.pathagar.com

স্থান নাম

ভোলা সদর উপজেলা

গাজীপুর ও কালুপুর (মেঘনার ভাঙনে বিলুপ্ত)

১৯৯০ সালে মেঘনার গর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়া গাজীপুর ও কালুপুরের পত্তন হয়েছিল প্রায় ১৬০-১৭০ বছর আগে, মেঘনা নদীর উত্তর-পশ্চিম তীর ঘেঁষে। দুটি এলাকাই পূর্ব-পশ্চিমে ৩-৪ মাইল লম্বা ছিল। একটি খাল স্থান দুটিকে বিভক্ত করে রেখেছিল। বর্তমান ভোলা শহরের গাজীপুর সড়কের পূর্ব প্রান্তে ক্রমাগত চর পড়ে এই এলাকা দুটির সৃষ্টি হয়। কারো কারো মতে, গাজী ও কালু ছিলেন দু-ভাই। গাজী ছিলেন একজন উঁচু মাপের আওলিয়া, আর কালু তারই খাদেম। এখানে গাজীর একটি দরগাহও ছিল। তৎকালীন ভোলার প্রধান নদীবন্দর ও সবচেয়ে বড় বাজার ছিল এই গাজীপুর। বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠান ও পার্বণের সময় ভোলার জনসাধারণ এখানে এসে বেচা-কেনা করতেন। এছাড়া এখানে হাজার হাজার মন সুপারি বেচা-কেনা হতো।

যোগীর ঘোল

ভোলা শহরের মধ্যদিয়ে প্রবাহিত এককালের স্রোতস্বিনী ও অশান্ত নদী (বর্তমানে খাল) বেতুয়া উত্তর থেকে দক্ষিণে কিংবা পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হওয়ার সময় ভোলা শহরের দক্ষিণ দিকের এই স্থানটিতে বিরাট ঘোলের সৃষ্টি হতো। আর এই ঘোলের দক্ষিণ পাশেই অনেক যোগী বা তাঁতির (কারো কারো মতে যোগসাধনরত হিন্দু তপস্বীদের) বসবাস ছিল। এই 'যোগী' এবং পানি প্রবাহের 'ঘোল' মিলে স্থানটির নাম 'যোগীর ঘোল' হয়েছে বলে অনেকের অভিমত।

দৌলতখান উপজেলা

সুবির চর

দক্ষিণ শাহবাজপুর পরগনায় সবচেয়ে বেশি পরাক্রমশালী জমিদার ছিলেন কালাচাঁদ রায় বা কালা রায়। তাঁর প্রকৃত নাম কালিকাপ্রসাদ রায়। এই কালাচাঁদ রায়ের পূর্বপুরুষ সিংহ রায় ইদিলপুর পরগনার অধিবাসী ছিলেন। তিনি একবার দক্ষিণ শাহবাজপুরে বেড়াতে এসে কাটাসোনা গ্রামে তালুক লাভ করে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। তাঁর নাতি জসমন্ত সিংহ স্ত্রী-পুত্র-কন্যাসহ ডাকাতদের হাতে নির্মমভাবে মৃত্যুবরণ করেন। 'সুবি' নামে এক ধাত্রীর উপস্থিত বুদ্ধিতে বেঁচে যান জসমন্ত সিংহের দশ বছর বয়সী কিশোর বালক কালাচাঁদ। দুর্ধর্ষ ডাকাত দল সুবিকে ধরে নিয়ে যায় এবং বেতুয়ার একটি চরে নির্মমভাবে হত্যা করে। এই ধাত্রী 'সুবি'র নামেই পরবর্তীকালে চরটি 'সুবির চর' নামে পরিচিতি লাভ করে। ১৭৭৫ থেকে ১৭৮৫ সালের মধ্যে ঘটনাটি ঘটেছে বলে অনুমান করা হয়।

www.pathagar.com

পাগড়ি ছেঁড়া খাল

তজুমুদ্দিনের শম্ভুপুরে একটি খাল রয়েছে। এর নাম পাগড়ি ছেঁড়া খাল। কথিত আছে, কোনো এক পীর সাহেবের যাতায়াতের সময় এখানে তাঁর পাগড়িটি ছিঁড়ে যায়। সে সময় থেকেই এর নাম হয় পাগড়ি ছেঁড়া খাল।

ফৌজদারকান্দি

মোগল সম্রাট আরোঙ্গজেবের সময়ে ১৬৬৪ সালে শায়েস্তা খান বাংলার সুবেদার নিযুক্ত হন। পরের বছর তিনি পর্তুগিজ ও আরাকান জলদস্যুদের দমন করার জন্য শাহবাজপুরে আসেন। ভোলা জেলার তজুমুদ্দিন উপজেলার ফৌজদারকান্দি গ্রামে শায়েস্তা খানের একটি দুর্গ ছিল। তিনি দীর্ঘদিন এ গ্রামে অবস্থান করেছিলেন। মোগল আমলে স্থানীয় শাসনকর্তারা 'ফৌজদার' নামে অভিহিত হতেন বলে এ গ্রামের নাম হয়েছে 'ফৌজদার কান্দি'।

বোরহানউদ্দিন উপজেলা

স্বরাজগঞ্জ

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন থেকে শুরু করে ভোলার অনেক সফল রাজনৈতিক আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল ছিল মৃজাকালু। এজন্য একসময় 'স্বরাজগঞ্জ' নামে এই এলাকাটি প্রসিদ্ধি লাভ করে। ১৯৩০ সালে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে সমগ্র ভারতে 'লবণ আন্দোলন' ছড়িয়ে পড়লেও এর আগেই ১৯২২ সনে বরিশাল জেলায় লবণ আন্দোলন শুরু হয়। ইংরেজ লবণ এজেন্ট এদেশে বিলেতি লবণের বাজার তৈরির উদ্দেশ্যে দেশীয় লবণ উৎপাদন, বিক্রয় ও বিপণন নিষিদ্ধ ঘোষণা এবং লবণ উৎপাদকদের ওপর নির্যাতন শুরু করে।

সরকারি নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও মৃজাকালু বাজারে লবণচাষীরা লবণ উৎপাদন, বিক্রয় ও বিপণন অব্যাহত রাখে। এ সংবাদ পেয়ে সরকার পুলিশ ও গুর্খা বাহিনী পাঠালে জনগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। মৃজাকালুর কাছে জগন্নাথপুরে জনতার ওপর গুর্খা পুলিশের গুলিবর্ষণে পেয়ারপুর গ্রামের কোরবান আলী এবং বিশারামপুর গ্রামের কেরামত আলী ঘটনাস্থলেই মৃত্যুবরণ করেন। অনেকে আহত এবং গ্রেফতার হন। এ ঘটনাকে অম্লান করে রাখার জন্যই স্থানটির নামকরণ হয় স্বরাজগঞ্জ। বোরহানউদ্দিনের রাস্তার পাশে স্থাপিত 'স্বরাজ' অফিসটি কিছুদিন আগেও জীর্ণশীর্ণ অবস্থায় দাঁড়িয়ে ছিল।

দেউলা

কচুয়ার (বাকলা চন্দ্রদ্বীপ বা মাধবপাশার রাজাদের আদি নিবাস। এটি বাউফলের কালাইয়ার কচুয়া গ্রামে অবস্থিত।) রাজা জয়দেব তার কনিষ্ঠ কন্যা বিদ্যাসুন্দরীর বিয়ে দিয়ে মেয়ে ও জামাতাকে তার রাজ্যের পূর্ব সীমান্তের বোরহানউদ্দিন থানার 'দেউলা' নামক এলাকাটি প্রদান করেন। পূর্ব সীমানা নির্দেশ করতো বিধায় একে 'দেউড়ি' বলা হতো। ধীরে ধীরে মানুষের মুখে মুখে উচ্চারণের বিকৃতির ফলে এটি 'দেউলা' নাম ধারণ করে। কারো কারো মতে 'দেউলিয়া' থেকে 'দেউলা' শব্দের উৎপত্তি হয়। কিন্তু এ অনুমানের পেছনে কোনো সঠিক তথ্য ও জোরালো যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না।

www.pathagar.com

লালমোহন উপজেলা

ইংরেজ বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের নামানুসারে লর্ড হার্ডিঞ্জ, জমিদার কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য চৌধুরীর ছেলে তারাপ্রসন্ন চৌধুরীর নামানুসারে তারাগঞ্জ এবং তারাপ্রসন্ন চৌধুরীর তিন ছেলে রমাপ্রসন্ন চৌধুরী, হরিপ্রসন্ন চৌধুরী ও কমলা প্রসন্ন চৌধুরীর বা কিশোরীপ্রসন্ন চৌধুরীর নামানুসারে যথাক্রমে রমাগঞ্জ বা কর্তার হাট, হরিগঞ্জ ও কিশোরগঞ্জ নামকরণ হয়। বরিশালের ডেপুটি কালেক্টর পিয়ারী মোহন বসুর নামানুযায়ী পিয়ারীমোহন মৌজা নামকরণ হয়।

চরফ্যাশন উপজেলা

কুকুরি-মুকুরি

চরফ্যাশনের মূল ভূখণ্ড থেকে প্রায় ৩৪-৩৫ কিলোমিটার দক্ষিণে চর কুকুরি-মুকুরির অবস্থান। জানা যায়, চর পত্তনের প্রথম দিকে এখানে ইঁদুর আর কুকুরের ব্যাপক আবির্ভাব ঘটেছিল। এমনও শোনা গেছে যে, মাঝে মাঝে নাকি ইঁদুরগুলো দলবদ্ধ হয়ে মানুষকে আক্রমণ করতো। ইঁদুরের অন্য একটি নাম মেকুর। এখান থেকেই কুকুরি-মুকুরি নামের উৎপত্তি হয় বলে স্থানীয় অধিবাসীদের সূত্রে জানা যায়। এই চর এলাকা প্রথমদিকে পটুয়াখালীর গলাচিপার অন্তর্ভুক্ত থাকলেও পরবর্তীকালে যাতায়াত, যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রভৃতি কারণে ভোলার সাথে যুক্ত করা হয়। এই চরটির আয়তন প্রায় ২৩/২৪ বর্গকিলোমিটার।

ঢালচর

আদি নাম চর সত্যেন। জনৈক ডেভেলপমেন্ট অফিসার সত্যেন বাবুর নামে প্রথমে এর নামকরণ হয়। বিশাল সমুদ্র সৈকত আর অস্বাভাবিক প্রশস্ত ঢালের জন্য চরটির নাম হয় ঢালচর। চরটির আয়তন প্রায় ২০-২২ বর্গকিলোমিটার।

ইউনিয়নসমূহের নামকরণ

খোলাফায়ে রাশেদীনের তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রা.)-এর নামানুসারে ওসমানগঞ্জ, স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি আসলাম হাওলাদারের নামানুসারে আসলামপুর, আবার আসলামপুরের ৬টি মৌজার নামকরণ হয় ৬জন বিশিষ্ট ব্যক্তির নামানুসারে। মৌজাগুলি হলো, হযরত মোহাম্মদের (সা.) সহধর্মিনী বিবি আয়েশা (রা.) ও বিবি খাদিজা (রা.)-র নামানুসারে আয়েশাবাগ ও খাদিজাবাগ, হযরত আলী (রা.) নামানুসারে আলীগঞ্জ, হযরত ওমরের (রা:) নামানুসারে ওমরপুর, হযরত মোহাম্মদের (সা.) কন্যা বিবি ফাতেমার নামানুসারে ফাতেমাবাগ এবং ইউনিয়নের নামানুসারে আসলামপুর।

অন্যান্য ইউনিয়নগুলি হলো, কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর নামানুসারে জিন্নাগর, হযরত মোহাম্মদের (সা.) মাতার নামানুসারে আমিনাবাদ (এই ইউনিয়নের আবার ৩টি মৌজার নামকরণ হয় ১. হযরত মোহাম্মদের (স.) কন্যা বিবি কুলসুমের নামানুসারে কুলসুমবাগ; ২. হযরতের ধাত্রীমাতা বিবি হালিমার নামানুসারে হালিমাবাগ ও ইউনিয়নের নামানুসারে আমিনাবাদ), ভারতের মাদ্রাজ নিবাসী ও বর্তমানে এখানে

www.pathagar.com

বসবাসকারী কিছু ব্যক্তির জন্য চর মাদ্রাজ (চর মাদ্রাজের একটি মৌজা খাজা নাজিমুদ্দিনের নামানুসারে চর নাজিমুদ্দিন ও তদানীন্তন পাকিস্তানের খাদ্যমন্ত্রী পিরোজপুরের আফজালের নামানুসারে চর আফজাল নামকরণ করা হয়), নীলকমল, চরমানিকা, চর কলমী (ধারণা করা হয়, এই চরে বেশ কলমিলতা ছিল বলে এই নামকরণ হয়), হাজারীগঞ্জ ও নূরাবাদ ইউনিয়ন। এই ইউনিয়ন ভোলার এককালের বিশিষ্ট মুসলিম লীগ নেতা এবং এমএলএ খান বাহাদুর নূরুজ্জামানের (এম.বি.ই.—মেম্বার অব ব্রিটিশ এম্পায়ার) নামানুসারে রাখা হয়।

মনপুরা উপজেলা

হাজীরহাট ইউনিয়ন : আদি নাম নায়েবের হাট। পরবর্তীকালে স্থানীয় বিশিষ্ট সমাজসেবী ও দাতা হাজী মোঃ আসলামের নামানুসারে এর নাম হয় হাজীরহাট।

মওলানার বাজার : স্থানীয় মওলানা আবদুল কাদের-এর নামানুসারে এই বাজারটির নামকরণ হয়।

কাউয়ার টেক : নদীতীরবর্তী ভূমির বিশেষ ভাঁজের জন্য 'টেক' এবং ঐ টেকের ওপর অসংখ্য কাকের উপস্থিতির কারণে স্থানটির এই নাম হয়।

মিয়া জমেস্যার হাট, চর ফৈজুদ্দি : মিয়া জমেস্যা নামে এক ফকিরের নামানুসারে এই নামকরণ হয়।

উত্তর সাকুচিয়া : এটি মাস্টারের হাট নামেও পরিচিত। স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি সাইদুল হক মাস্টারের নামে এই নামকরণ হয়। পরবর্তীকালে এর নাম হয় বাংলাবাজার।

চরনিজাম : মনপুরা থেকে এই চরের দূরত্ব ৫০ কিলোমিটার। আদি নাম কালকিনি। এই নামটি স্থানীয় জেলেদের দেওয়া। পরবর্তীকালে ১৯৭০ সালের বন্যার কিছু পূর্বে তজুমুদ্দিনের রেভিনিউ সার্কেল অফিসার নিজামউদ্দিনের নামানুসারে এই নামকরণ হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এখানে 'চিন্তা নিবাস' নামে একটি রেস্ট হাউজ স্থাপনের ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন।

তথ্যসূত্র

১. মোহাম্মদ আবু তাহের, পিতা : প্রয়াত আলহাজ্ব গোলাম রহমান, মাতা : প্রয়াত সাহেরা খাতুন, শিক্ষা : বিএ, বয়স : ৮০ বৎসর, পেশা : সাংবাদিকতা ও লেখালেখি, ঠিকানা : গ্রাম : দক্ষিণ সৈয়দপুর, ডাকঘর : সাবেক হাজীপুর মাদ্রাসা, উপজেলা : দৌলতখান
২. ভোলা জেলার ইতিহাস : মোহাম্মদ হোসেন চৌধুরী
৩. পলিমাটির দেশ ভোলা : মোস্তফা হারুণ সম্পাদিত
৪. কার্তিক দেবনাথ, পিতা : ননীগোপাল দেবনাথ, মাতা : শান্তি দেবনাথ, শিক্ষা : ডি.ইউ.এম.এস., বয়স : ৬১ বছর, পেশা : ব্যবসা, ঠিকানা : গ্রাম : হাসাননগর, ডাকঘর : মৃজাকালু, উপজেলা : বোরহানউদ্দিন

www.pathagar.com

৫. ভোলা জেলার ইতিহাস : মোহাম্মদ হোসেন চৌধুরী।

৬. কাজী মোহাম্মদ রাশেদ, পিতা : প্রয়াত মোহাম্মদ আলী, মাতা : জাকিয়া বেগম, বয়স : ৩৯, পেশা : ব্যবসা, ঠিকানা : রমজান আলী কাজীবাড়ি, দক্ষিণ ফ্যাশন, ডাকঘর ও উপজেলা : চরফ্যাশন

৭. ভোলা জেলার ইতিহাস : মোহাম্মদ হোসেন চৌধুরী

৮. মোহাম্মদ হোসেন চৌধুরী : ভোলা জেলার ইতিহাস

৯. এমএ তাহের, পিতা : প্রয়াত আলহাজ গোলাম রহমান, মাতা : প্রয়াত সাহেরা খাতুন, শিক্ষা : বিএ, বয়স : ৮০ বছর, পেশা : সাংবাদিকতা, ঠিকানা : গ্রাম : দক্ষিণ সৈয়দপুর, ডাকঘর : সাবেক হাজীপুর মাদ্রাসা, উপজেলা : দৌলতখান

www.pathagar.com

বস্তুগত লোকসংস্কৃতি

লোকশিল্প

ভোলা সদর উপজেলা

সরাচিত্র : ঘরকন্না বা সংসারের কাজের একটি নিত্যপ্রয়োজনীয় উপকরণ মাটির হাঁড়ি-পাতিলের ঢাকা 'সরা'কে চিত্রিত করে বিভিন্ন পূজা-পার্বণে ও অনুষ্ঠানে ব্যবহার করা হয়। লক্ষ্মীপূজার সময় এই সরায় ধানের শীষ, পদ্ম, কলসি ও বাহনসহ লক্ষ্মীমূর্তি আঁকা হয়ে থাকে। কখনো কখনো লক্ষ্মীপূজার সময় মাটির তৈরি লক্ষ্মীমূর্তির পরিবর্তে এই 'সরা'কে পূজা করা হয়ে থাকে। তবে মাটির সরাগুলো শরিয়তপুর জেলা থেকে এনে তার ওপর চিত্র আঁকা হয়। তাছাড়া দেব-দেবীর মূর্তি এঁকে সরাকে অনেক সময় পূজামণ্ডপের চালচিত্ররূপে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

ঘটচিত্র : পানি রাখার সাধারণ ছোট পাত্র হিসেবে ঘট ব্যবহৃত হলেও সনাতন ধর্মাবলম্বীদের বিভিন্ন পূজা-পার্বণ এবং আচার-অনুষ্ঠানে ঘট ব্যবহার করা হয়ে থাকে। পূজা-অর্চনার সময় মাটি দিয়ে নির্মিত ঘট পটুয়াখালীর বাউফল থেকে এনে রং তুলির সাহায্যে সাধারণ ও ধর্মীয় ভাবধারাযুক্ত বিভিন্ন চিত্র আঁকা হয়।

আলপনা : হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান যেমন, গায়ে হলুদ, বিয়ে, অন্নপ্রাশন ইত্যাদিতে আলপনা আঁকার প্রচলন রয়েছে। লক্ষ্মীপূজার সময় হিন্দু রমণীরা চালের গুঁড়ির সাথে পানি মিশিয়ে উঠান বা ঘরের দুয়ার থেকে লক্ষ্মীর আসন পর্যন্ত আলপনা এঁকে থাকেন।

পিঁড়ি-চিত্র : সনাতন ধর্মাবলম্বী শিশুদের অন্নপ্রাশনের অনুষ্ঠানে যে পিঁড়িতে বসিয়ে শিশুর মুখে ভাত দেওয়া হয় তাতেও বিভিন্ন প্রকার চিত্র আঁকা হয়। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বিয়ের অনুষ্ঠানে পিঁড়িতে চিত্র আঁকা হয়ে থাকে। মুসলিম সম্প্রদায়ের বর বা কনেকে যে পিঁড়িতে বসিয়ে গোসল করানো হয়, তাতেও চিত্র আঁকা হয়। এসব চিত্রে থাকে ফুল, ভ্রমর ইত্যাদি। এই চিত্রাঙ্কনে আলতা ও হলুদ ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

ডালা-কুলা চিত্র : শিক্ষিত-অশিক্ষিত ভেদে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের গায়ে হলুদের অনুষ্ঠানসমূহে বাঁশ-বেতের তৈরি ডালা-কুলায় ফুল, পাতা ইত্যাদি চিত্র এঁকে বিয়ের তত্ত্বসমূহ পাঠানো হয়ে থাকে।

মৃৎশিল্প : প্রতিমা নির্মাণ

দেবী দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশসহ সব দেব-দেবীর প্রতিমা নির্মাণে অভিজ্ঞ ও খ্যাতিমান পরিবার ভোলার কুমার পট্টির পাল পরিবার। পাল পরিবারের মনোরঞ্জন

www.pathagar.com

পাল ছিলেন এই নির্মাণশিল্পের মূল কর্ণধার। এই খ্যাতিমান মৃৎশিল্পী ১৯৮৫ সালে পরলোকগমন করেন। তার পিতা দীনবন্ধু পাল ফরিদপুরের নড়িয়া থেকে ভোলায় এসে বসতি স্থাপন করেন।

ভোলায় মৃৎশিল্পের বিকাশের পথে সবচেয়ে বড় বাধা এই শিল্পের প্রধান উপকরণ এঁটেল মাটির দুষ্প্রাপ্যতা। কারণ, ভোলার অধিকাংশ স্থানে কাঁদামাটি, মিশ্র ও দো-আঁশ এবং বেলে মাটির প্রাধান্য। একমাত্র তজুমুদ্দিন উপজেলার শশীগঞ্জ ও বোরহানউদ্দিন উপজেলার দেউলা, বোয়ালিয়া ও ডাওরিতে সামান্য কিছু এঁটেল মাটির সন্ধান পাওয়া গেলেও তা এখানকার মাটির তৈরি দ্রব্যাদির চাহিদা মেটানোর জন্য যথেষ্ট নয়। এ কারণেই দৈনন্দিন গৃহস্থালি কাজে ব্যবহৃত মাটির হাঁড়ি-পাতিল, কলসি, বাসন-কোসন তৈরির জন্য এক সময় পটুয়াখালীর ধুলিয়া ও মঠবাড়িয়া থেকে নৌকাযোগে আনা হতো প্রয়োজনীয় এঁটেল মাটি। কিন্তু এই প্রক্রিয়া অনেক ব্যয়বহুল ও সময়সাপেক্ষ ছিল বলে স্থানীয় পাল পরিবারগুলো একাজে উৎসাহ ও আগ্রহ হারিয়ে ফেলে এবং একসময় ভোলার বাইরের বিভিন্ন স্থান থেকে মাটির তৈরি এসব দ্রব্যাদির বড় বড় নৌকা এসে ভোলার খালে ভিড়তে শুরু করে।

প্রতিমা নির্মাণ (প্রাথমিক পর্যায়) কুমার পল্লি, ভোলা

প্রয়োজনীয় এঁটেল মাটির দুষ্প্রাপ্যতা সত্ত্বেও ভোলার বাইরের নিকটবর্তী স্থান পটুয়াখালী ও মঠবাড়িয়া থেকে নৌকাযোগে এঁটেল মাটি এনে সম্পন্ন করা হয় বিভিন্ন পূজা ও উৎসব-অনুষ্ঠানাদি উপলক্ষে বিভিন্ন দেব-দেবীর প্রতিমা নির্মাণের কাজ। এছাড়া পয়লা বৈশাখ উপলক্ষে তৈরি করা হয় হাতি, ঘোড়া, বাঘ, ভল্লুক, টিয়া, দোয়েল, পুতুল ইত্যাদি। বর্তমানে ভোলায় মাত্র দুটি পরিবার প্রতিমা নির্মাণ শিল্পের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে।

www.pathagar.com

আগে ৪টি পরিবার এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ছিল। এই পরিবারের প্রধান শিল্পীদের মধ্যে প্রদীপ পাল, কৃষ্ণ পাল ও বরুণ পালের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মনোরঞ্জন পালের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সুকুমার পাল ও সুরেশ পাল এবং তারপর সুকুমার পালের পুত্র প্রদীপকুমার পাল ভোলার এই বিলুপ্তপ্রায় শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার ঐকান্তিক প্রয়াসে নিবেদিত।

প্রতিমা নির্মাণ (সমাপ্তি পর্যায়ে) কুমার পাড়ি, ভোলা

খ্যাতিমান প্রতিমানির্মাণশিল্পী প্রদীপকুমার পাল জানালেন, দুর্গাপূজার সময় দেবীদুর্গার প্রতিমা নির্মাণের কাজ পঞ্জিকায় একটি শুভদিন দেখে 'ব্যানা যাত্রার' মধ্য দিয়ে শুরু করা হয়। খড়-কুটা দিয়ে দেবীর একটি কাঠামো নির্মাণই হচ্ছে 'ব্যানা যাত্রা'। এ সময়ে মহিলারা উলুধ্বনি দিতে থাকেন, একে অপরকে সিঁদুর পরিয়ে দেন এবং উপস্থিত সবার মধ্যে মিষ্টি, সন্দেশ, নাড়ু প্রভৃতি প্রসাদ বিতরণ করেন।

দেবী দুর্গার প্রতিমা নির্মাণে আকার ও আকৃতি ভেদে মাটির কাজে মোটামুটি সাত থেকে নয় দিন লাগে। এক্ষেত্রে বেলে ও এঁটেল মাটি ব্যবহার করা হয়। এরপর রং-তুলির নিপুণ স্পর্শে দেবী দুর্গাকে সর্বাঙ্গসুন্দরী করে গড়ে তুলতে সময় লাগে আরো দু' থেকে তিনদিন। ব্যবহার করা হয় ওয়াটার কালার, এনামেল, মুক্তা কালার, লাল ইত্যাদি। দেবীকে পোষাক-পরিচ্ছদ পরিয়ে থাকেন নির্মাণশিল্পী ও অভিজ্ঞ সনাতনধর্মী রমণীরা।

এই পাল পরিবার দুর্গাপূজার সময় জেলার প্রায় সবকটি উপজেলায়ই প্রতিমা নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করে থাকেন। প্রতিমা নির্মাণে সম্মানী নেওয়া হয় কুড়ি থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা। দুর্গাপূজার সময় প্রতিমা নির্মাণের সংখ্যা এতোটাই বেড়ে যায় যে,

www.pathagar.com

তখন ভোলার বাইরে থেকে, বিশেষত ফরিদপুরের রাজবাড়ি, ভাঙা ও অন্য দু-একটি স্থান থেকে প্রতিমা নির্মাণশিল্পী আনিয়ে কাজ সম্পাদন করার প্রয়োজন হয়।

নকশি কাঁথা : গ্রামীণ মহিলারা একসময় অবসরকালে পারিবারিক এবং সামাজিক প্রয়োজনে নকশি কাঁথা তৈরি করতেন। এখন এটা এক ধরনের বিলাসিতায় পরিণত হয়েছে। কারণ, একটি নকশি কাঁথা তৈরিতে মাসের পর মাস সময় লেগে যায়। কাজেই এই বিলাসিতা তাদের পোষায় না। তদুপরি আজকাল কিছু ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান নকশি কাঁথাকে ব্যবসা হিসেবে গ্রহণ করায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেদের প্রয়োজনেও নকশি কাঁথা তৈরিতে গ্রামীণ মহিলারা উৎসাহবোধ করেন না। কিছু কিছু উৎসাহী মহিলা ভোলা ও দৌলতখানের কিছু কিছু এলাকায় এ কাঁথা তৈরি করে থাকেন। এসব কাঁথায় হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত মহিলারা দেব-দেবী, চন্দ্র-সূর্য, বাঘ, সিংহ, হাতি, ঘোড়া, পাখি ইত্যাদি মটিফ সেলাইয়ের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলেন। অন্যদিকে, জীব-জন্তু-জানোয়ারের ছবি ঘরে রাখার ওপর ধর্মীয় বিধি-নিষেধের কারণে মুসলিম নারীরা ফুল, লতা, পাতা, গাছ-গাছালির জ্যামিতিক চিত্র ইত্যাদি সুই-সুতার মাধ্যমে চিত্রিত করে থাকেন।

নকশি টুপি : সাদা কাপড়ের ওপর বিভিন্ন ধরনের ডিজাইন করে তার ওপর রঙিন সুতা দিয়ে কাজ করা হয়। ভোলার কিছু কিছু এলাকায় গ্রামের দরিদ্র ও মেধাবী গৃহবধূরা তাদের ঘর-সংসারের কাজ সেরে অবসর সময়ে কয়েকজন একত্রে বসে এই কাজ করে।

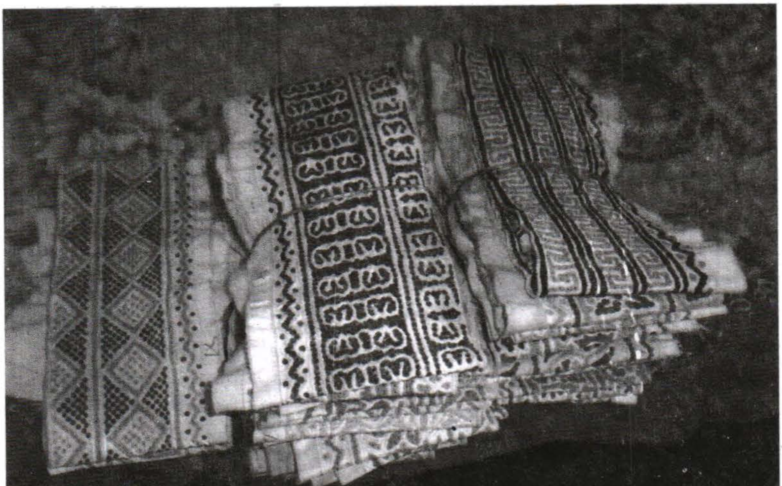

নকশি টুপির পাড়

স্কুল-পড়ুয়া কিছু ছাত্রীও বাড়তি উপার্জন করে সংসারে সাহায্য করার জন্য এই নকশি টুপি সেলাইয়ের সুযোগটুকু কাজে লাগায়। এসব নকশি টুপি দুই-তিন হাত হয়ে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে রফতানি হয়।

www.pathagar.com

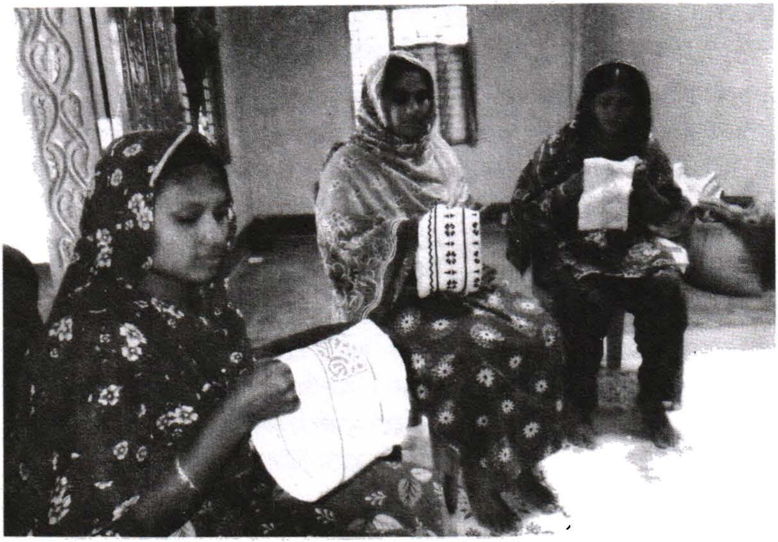

নকশি টুপির পাড় সেলাইরত তিনজন মহিলা

নকশি পাখা : গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহের ফলে নকশি পাখা তৈরি ও এর ব্যবহারও অনেকটা কমে গেছে। তবে বিদ্যুৎ বিভ্রাট যেহেতু নিত্য-নৈমিত্তিক বিষয়, সেহেতু পাখার ব্যবহার ফুরিয়ে যায়নি। নিতান্তই ব্যবহারিক এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সামাজিক প্রয়োজনে এখনও গ্রামের কিছু কিছু মহিলা নকশি পাখা তৈরি করে থাকেন।

নকশি পাখা দু-ধরনের উপকরণ দিয়ে তৈরি করা হয়ে থাকে, এক. কাপড় ও দুই. তালপাতা। কাপড়ের হাতপাখায় পরিমাণমত কাপড় গোল বা চারকোণা করে কেটে নিয়ে তাতে বিভিন্ন ধরনের চিত্র ফুল, পাতা, গাছ-গাছালি, পাখি বিশেষকরে টিয়া পাখি, গাছের ডালে মুখোমুখি দুটি পাখি বসে থাকা, ইত্যাদি পেন্সিল দিয়ে এঁকে তার ওপর বিচিত্র রঙের সুতা দিয়ে কাজ করা হয়। এসব পাখায় কখনো কখনো দুই, তিন বা ততোধিক লাইনের চিরস্মরণীয় কবিতা, মহান বাণী বা প্রবাদ বাক্য ইত্যাদিও লিখে নিয়ে সুতার কাজ করা হয়, যেমন—'সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে', 'খলের শপথে বৃথা বিশ্বাস স্থাপন, নিঠুরের কাছে বৃথা মুক্তি নিবেদন', 'আপনার দোষ যদি চাহ জানিবার, আরতির কাছে পাবে সন্ধান তাহার' ইত্যাদি। বাড়িতে কোনো বিশেষ মেহমান এলে, মেয়ে জামাই কিংবা বেয়াই-বেয়াইন এলে বাক্স বা আলমারি থেকে এসব পাখা বের করে বাতাস দেওয়ার রেওয়াজ এখনও আছে। সুই-সুতার কাজ শেষ হয়ে গেলে কাপড়টিকে বেত বা বাঁশের সাহয্যের চারপাশ মুড়িয়ে সুতা দিয়ে শক্ত করে আটকিয়ে হাতে ধরার সুবিধার্থে একটি সুপারি বা বাঁশের মসৃণ ডাটির সাথে বেঁধে দেওয়া হয়।

তালপাখা তৈরির ক্ষেত্রে প্রথমে একটি তালপাতাকে মাঝখান দিয়ে ডাটিসহ সমান দুভাগে ভাগ করা হয়। তারপর দুটি অংশকেই পাটার নীচে চার-পাঁচদিন চাপের মধ্যে

www.pathagar.com

রাখা হয়। এতে পাতার অমসৃণ ও খসখসে জায়গাগুলো মসৃণ হয়ে যায়। এরপর বাঁশের চিকন ফালি দিয়ে চার পাশটা মুড়িয়ে সুতা দিয়ে শক্ত করে আটকে বাতাস দেওয়ার উপযোগী করে তোলা হয়। এ পাখার মধ্যেও সুন্দর সুন্দর কথা লিখে রঙিন সুতা দিয়ে সেলাই করে দেওয়া হয়, যেমন—'নামটি আমার তালের পাখা, শীতকালেতে দেই না দেখা, কাজ আমার বাতাস করা', 'ভুলো না আমায়', 'তুমি সুন্দর তাই চেয়ে থাকি প্রিয়' ইত্যাদি।

দারুশিল্প : খাট-পালং, সো-কেস, দরজার পাল্লা, আলমিরা, ড্রেসিং টেবিল, ডাইনিং টেবিল প্রভৃতিতে দক্ষ সূত্রধররা তাদের বিভিন্ন ধরনের বাটালির সাহায্যে অত্যন্ত নিপুণভাবে বিভিন্ন চিত্র খোদাই করে থাকেন। এসব চিত্রের মধ্যে থাকে আরবিতে 'আল্লাহু আকবর' বা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ', ঢেউ খেলানো লতা, বৃক্ষ, গোলাপ ফুল, ময়ূর, একই বৃন্তে দুটি পাখি, চাঁদ-তারা, প্রভৃতি। সনাতন ধর্মাবলম্বী সৌখিন ব্যক্তিরা ঘরের দরজায় বা পাল্লায় রাধা-কৃষ্ণ, পদ্মফুল, গণেশের প্রতিকৃতি, প্রভৃতি অত্যন্ত চমৎকারভাবে খোদাই করিয়ে থাকেন। আমাদের এসব দারুশিল্পীরা নির্দিষ্ট কোনো চিত্র ছাড়া (যেমন রাধা-কৃষ্ণ, গণেশ) অন্য চিত্র খোদাই করার সময় তাদের সামনে কোনো দৃশ্যমান প্রতিকৃতি রাখার প্রয়োজন অনুভব করেন না, তারা তাদের মনের চোখ দিয়ে যা দেখতে পান তাকেই তাদের সূক্ষ্ম বাটালি ও হাতুড়ির সাহায্যে রূপদান করেন।

লোকশিল্প : দৌলতখান উপজেলা

১. আলপনা

হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বিয়ে, গায়ে হলুদ, সনাতন ধর্মাবলম্বী শিশুদের অন্নপ্রাশন ইত্যাদি অনুষ্ঠানে আলপনা আঁকার প্রচলন রয়েছে। লক্ষ্মীপূজার সময় হিন্দু রমণীরা চালের গুঁড়ি দিয়ে বাড়ির উঠানে, ঘরের মেঝেতে এবং বিশেষকরে দুয়ার থেকে লক্ষ্মীর আসন পর্যন্ত আলপনা এঁকে থাকে। সনাতন ধর্মাবলম্বীরা নবান্ন অনুষ্ঠানের দিনও আলপনা এঁকে থাকে।

ডালা-কুলা চিত্র

গায়ে হলুদের অনুষ্ঠানে বাঁশ-বেতের তৈরি ডালা-কুলায় ফুল, লতা, পাতা ইত্যাদির চিত্র এঁকে হলুদসামগ্রী বর ও কনে পক্ষ পরস্পরের বাড়িতে পাঠিয়ে থাকে।

পিঁড়ি চিত্র

বিয়ের পিঁড়িতে বসার আগে পিঁড়িটি চিত্রিত করা হয়। হিন্দু সম্প্রদায়ের শিশুদের অন্নপ্রাশনের সময় যে পিঁড়িতে শিশুর মুখে অন্ন তুলে দেওয়া হয় তাতে ধর্মীয় ভাবধারাসম্পন্ন চিত্রাদি আঁকা হয়। এছাড়া হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বর-কনেকে গোসল করানোর সময় চিত্রিত পিঁড়িতে বসানো হয়।

২. নকশি কাঁথা

গ্রামের মহিলারা এখনও অবসর সময়ে নকশি কাঁথা তৈরি করে থাকেন। আগে পুরনো শাড়ি দিয়ে নকশি কাঁথা তৈরি হতো। এখন নতুন কাপড় কিনেও তাতে রঙ-বেরঙের

www.pathagar.com

সুতা দিয়ে বিভিন্ন ধরনের চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়। এসব চিত্রসমূহের মধ্যে ফুল, (বিশেষত গোলাপ ফুল) লতা-পাতা, আঙুর লতা, টিয়া পাখি ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হিন্দু সম্প্রদায়ের রমণীরা এসব মটিফ ছাড়াও নিজ ধর্মীয় ভাবধারা সম্পন্ন কিছু চিত্র বিভিন্ন রঙের সুতার সাহয্যে ফুটিয়ে তুলে থাকে। দৌলতখান বাজারের পাশে সৈয়দপুর ইউনিয়নে চরসুবি এলাকায় উন্নতমানের নকশি কাঁথা তৈরি হয়।

৩. বালিশের কভার

নকশি কাঁথার মতো বালিশের কভারের চার কোণায় ত্রিভুজের মতো জ্যামিতিক চিত্র এঁকে রঙ-বেরঙের সুতার সাহায্যে সেলাই করা হয়।

৪. নকশি টুপি

এ উপজেলার প্রায় প্রতিটি গ্রামে বিভিন্ন ধরনের ডিজাইনের টুপির ওপর রঙিন সুতা দিয়ে কাজ করা হয়। এসব টুপি সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশে রফতানিও করা হয়ে থাকে।

লোকশিল্প : তজুমুদ্দিন উপজেলা

১. আলপনা

গায়ে হলুদ, বিয়ে, অন্নপ্রাশন প্রভৃতি অনুষ্ঠান উপলক্ষে বাড়ির উঠানে, ঘরের মেঝেতে, পিঁড়িতে এবং লক্ষ্মীপূজা উপলক্ষে ঘরের দরজা থেকে লক্ষ্মীর আসন পর্যন্ত আলপনা আঁকা হয়ে থাকে। মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকেরা গায়ে হলুদ ও বিয়ের অনুষ্ঠান উপলক্ষে ঘরের মেঝেতে ও ঘরে প্রবেশের সিঁড়িসমূহে আলপনা এঁকে থাকে।

ডালা-কুলা চিত্র

গায়ে হলুদের অনুষ্ঠান উপলক্ষে হলুদের যেসব সামগ্রী বর ও কনের বাড়িতে ডালা কুলায় করে পাঠানো হয়ে থাকে, সেসব ডালা কুলায়ও নানারকম চিত্রাদি আঁকা হয়ে থাকে। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকজনই এই চিত্রিত ডালা-কুলা ব্যবহার করে থাকেন।

পিঁড়ি চিত্র

বিয়ে উপলক্ষে বর-কনেকে যে পিঁড়িতে বসিয়ে গোসল করানো হয়, সে পিঁড়িতে চিত্রাঙ্কন করা হয়ে থাকে। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকজনই এই চিত্রিত পিঁড়ি ব্যবহার করে থাকেন। সনাতন ধর্মানুসারীদের শিশুদের মুখে ভাত দেওয়ার অনুষ্ঠানে চিত্রিত পিঁড়ি ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

২. নকশি কাঁথা

এই উপজেলার কিছু কিছু গ্রামে গ্রামীণ মহিলারা পারিবারিক ও সামাজিক প্রয়োজনে নকশি কাঁথা সেলাই করে থাকেন। এ কাজে তারা শাড়ির আঁচলের সুতা ও পুরনো শাড়ি কাপড় এবং কখনও কখনও প্রয়োজনে নতুন কাপড় ব্যবহার করে থাকেন।

নকশি পাখা

আজকাল এ জাতীয় পাখার ব্যবহার ও প্রয়োজন অনেকটা হ্রাস পেলেও কিছু কিছু পরিবার পারিবারিক ও সামাজিক মর্যাদা রক্ষার প্রয়োজনে নকশি পাখা তৈরি করে

www.pathagar.com

থাকেন। বাড়িতে কোনো বিশিষ্ট অতিথি এলে তাদের বাতাস দেওয়ার জন্য এই পাখাগুলো বের করে দেওয়া হয়।

নকশি পাখা কাপড় ও তালপাতা দিয়ে তৈরি করা হয়ে থাকে। কাপড়ের পাখায় বিভিন্ন ধরনের রঙিন সুতা দিয়ে মূল্যবান বাণী ও চিত্র অঙ্কন করা হয়ে থাকে।

লোকশিল্প : বোরহানউদ্দিন উপজেলা

১. ডালা-কুলাচিত্র

[ভোলা সদর উপজেলার অনুরূপ]

আলপনা

[ভোলা সদর উপজেলার অনুরূপ]

পিঁড়িচিত্র

[ভোলা সদর উপজেলার অনুরূপ]

২. নকশি কাঁথা

গ্রাম ও শহরাঞ্চলের প্রায় বাড়িতেই এক সময় নকশি কাঁথা সেলাই করা হতো। শাড়ির পাড় ও লুঙ্গির পাড়ের সুতা বের করে এসব কাঁথা সেলাই করা হতো। ভালো নকশি কাঁথা থাকা একটি পরিবারের মর্যাদা বহন করতো। এখনও এসব কাঁথা সেলাই করা হয়। তবে এখন বাজার থেকে রং-বেরঙের সুতা কিনে নতুন কাপড়ে কাঁথা সেলাই করা হয়। এসব কাঁথায় বড় বড় ফুল, ফুলের পাশে আবার ছোট ছোট ফুল, লতা-পাতা, গাছ-গাছালি, তারা, মসজিদের মিনার ইত্যাদি মটিফ লক্ষ্য করা যায়।

নকশি পাখা

প্রতি ঘরেই দু-চারটি নকশি পাখা পাওয়া যাবে। এসব পাখা তালপাতা অথবা কাপড় দিয়ে তৈরি করা হয়। কাপড়ের পাখাগুলিতে খ্যাতনামা কবি-সাহিত্যিকদের স্মরণীয় কবিতার অংশ বা বাণী পেন্সিলে লিখে নিয়ে তার ওপর রঙিন সুতা দিয়ে সেলাই করা হয়। যেমন :

পরের কারণে মরণেও সুখ,
সুখ সুখ করি কেঁদ না আর।
যতই কাঁদিবে যতই ভাবিবে,
ততই বাড়িবে হৃদয়-ভার।

কিংবা মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।

লোকশিল্প : লালমোহন উপজেলা

১. আলপনা

কোনো কোনো অনুষ্ঠান উপলক্ষে আলপনা আঁকা হয়ে থাকে। গায়ে হলুদ ও বিয়েতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই ঘরের সিঁড়িতে ও মেঝেতে আলপনা এঁকে

www.pathagar.com

থাকে। সনাতন ধর্মাবলম্বী রমণীরা লক্ষ্মীপূজার সময় ঘরের মেঝেতে এবং ঘরের দুয়ার থেকে লক্ষ্মীর আসন পর্যন্ত আতপ চালের গুঁড়ি দিয়ে আলপনা এঁকে থাকেন।

ডালা-কুলা-চিত্র

গায়ে হলুদ অনুষ্ঠানে বর ও কনে পক্ষ বাঁশ-বেতের তৈরি যে ডালা-কুলায় করে হলুদসামগ্রী পাঠিয়ে থাকে, সে ডালা-কুলায় আলপনা এঁকে দেওয়া হয়। এতে ফুল, পাতা ইত্যাদি মটিফ থাকে।

পিঁড়ি চিত্র

হিন্দু সম্প্রদায়ের শিশুদের মুখে ভাত দেওয়ার যে অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠান করা হয়, সে সময় শিশুকে যে পিঁড়িতে বসানো হয় সেটি চিত্রিত করা হয়। এছাড়া হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বর-কনেকে তেলাই দেওয়ার পর যে পিঁড়িতে বসে গোসল করানো হয়, সেটিও চিত্রিত করা হয়। তবে পিঁড়ি চিত্র খুব কমসংখ্যক পরিবারেই দেখা যায়।

২. নকশি কাঁথা

নকশি কাঁথা সেলাই করা একসময় গ্রামাঞ্চলের মহিলাদের বড় একটি সখের বিষয় ছিল। তবে একটি কাঁথা সেলাই করতে দীর্ঘদিন ধরে যে শ্রমের প্রয়োজন হয়, গ্রামাঞ্চলের মহিলাদের হাতে এখন আর সে অফুরন্ত সময় নেই। তারপরও পারিবারিক ঐতিহ্য ও সামাজিক মর্যাদা রক্ষার খাতিরে অনেক পরিবারেই নকশিকাঁথা সেলাইয়ের প্রচলন রয়েছে। বাড়িতে মেহমান এসে রাত যাপন করলে কিংবা নতুন জামাই বা বউ বাড়িতে আনা হলে আলমিরা থেকে নকশি কাঁথা বের করে দেওয়া হয়। এসব কাঁথায় যে সব চিত্র রঙ বেরঙের সুতা দিয়ে সেলাই করা হয়, তার মধ্যে লতা, আঙুরের থোকাসহ আঙুর লতা, গোলাপ ফুল, চাঁদ-তারা, টিয়া পাখি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। টিয়া পাখির নীচে দিয়ে সেলাই করা থাকে। 'যাও পাখি বল তারে'। অনেক কাঁথায় লেখা থাকে 'ভুল না আমায়' ইত্যাদি।

বালিশের কভার

গ্রামাঞ্চলের মহিলারা নকশি কাঁথার মতো বালিশের নকশি কভারও সেলাই করে থাকেন। বালিশের কভারগুলোর উপরের চার কোণাতেই ছোট ছোট চতুষ্কোণ ঘর দিয়ে একটি পিরামিডের মতো করে গড়ে তোলা হয়। ঘরগুলো এককেটি একেক রকমের রঙিন সুতা দিয়ে সেলাই করা হয়ে থাকে।

লোকশিল্প : চরফ্যাশন উপজেলা

১. আলপনা

ঘরের মেঝে, দেওয়াল, বারান্দা, সিঁড়ি প্রভৃতিতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের গায়ে হলুদ ও বিয়ে অনুষ্ঠানে আলপনা আঁকা হয়ে থাকে। হিন্দু-রমণীরা লক্ষ্মীপূজা উপলক্ষে বাড়ির উঠান কিংবা ঘরের দরজা থেকে লক্ষ্মীর আসন পর্যন্ত আতপ চালের গুঁড়ি দিয়ে আলপনা এঁকে থাকে।

www.pathagar.com

পিঁড়িচিত্র

সনাতন ধর্মাবলম্বী শিশুদের অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠানের সময় যে পিঁড়িতে তাদের বসানো হয় সেই পিঁড়িতে বিভিন্ন রকম আলপনা আঁকা হয়ে থাকে। এতে ছোট ছোট ফুল ও লতা-পাতা আঁকা হয়। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বিয়ের অনুষ্ঠানে বর বা কনেকে যে পিঁড়িতে বসিয়ে তেলাই দেওয়া হয় বা গোসল করানো হয়, সে পিঁড়িতে হলুদ বাটা বা আলতা দিয়ে আলপনা আঁকা হয়ে থাকে। আলপনায় সাধারণত পদ্মফুল, ভ্রমর, লতা-পাতা ইত্যাদি মটিফ থাকে।

ডালা-কুলাচিত্র

হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের গায়ে হলুদের অনুষ্ঠানে বর ও কনে পক্ষ বাঁশ ও বেতের ডালা-কুলায় করে হলুদের বিভিন্ন সামগ্রী একে অন্যের বাড়িতে পাঠিয়ে থাকে। এসব ডালা-কুলায় ফুল, লতা, পাতা, ভ্রমর ইত্যাদি আঁকা হয়ে থাকে।

২. নকশি কাঁথা

একটি নকশি কাঁথা তৈরি করতে যে পরিমাণ সময় লাগে, সেরূপ সময় আজকাল আর গ্রামের মহিলাদের হাতে থাকে না। এগুলি একসময় তারা তৈরি করতো অবসর সময়ে। কিন্তু সংসারের জটিলতা এখন এতোই বৃদ্ধি পেয়েছে যে, ওই সময় বের করে নেওয়ার কোনো উপায় থাকে না। এতদসত্ত্বেও গ্রামাঞ্চলে কিছু সৌখিন মহিলা রয়েছেন যারা পারিবারিক ও সামাজিক মর্যাদা রক্ষার্থে মাঝে মাঝে কিছু নকশি কাঁথা তৈরি করে থাকেন। কখনো তারা সাদা জমিনের পুরনো কাপড়, কখনো বা নতুন কাপড় কিনেই বিভিন্ন রকমের সুতা দিয়ে এ কাঁথা সেলাই করে থাকেন। এসব কাঁথায় তারা চন্দ্র, সূর্য, ফুল, লতা, পাতা, পাখি, মসজিদের মিনার, তারা, ইত্যাদি মটিফ হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন। আবার কখনো বা কাঁথার কেন্দ্রস্থলে একটি গোলাকার বৃত্ত থেকে সমান দূরত্ব বজায় রেখে চারদিকে আলোকরশ্মি ছড়িয়ে দেওয়ার মতো করেও সেলাই করে থাকেন।

নকশি পাখা

আজকাল নকশি হাতপাখার ব্যবহার আগের চেয়ে অনেকটাই কমে এসেছে। তা সত্ত্বেও নতুন কিংবা বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন মেহমানদের জন্য নকশি হাতপাখা অনেক ঘরেই তৈরি করে রাখা হয়। এই নকশি হাতপাখা দু-ধরনের হয়ে থাকে। এক, মোটা কাপড় কিনে তার ওপর রঙিন সুতার কাজ করে এবং দুই, তালপাতা কেটে। প্রথমে তালপাতার কথাই ধরা যাক। তালগাছের একটি পাতা ঠিক মাঝখান দিয়ে কাটলে দুপাশ থেকে দুটি পাখা তৈরি হয়ে যায়। এরপর পাখা দুটিকে পাটার নীচে কয়েকদিন চাপা দিয়ে রাখলে পাখার মাঝখানের শক্ত শক্ত রেখাগুলো মসৃণ হয়ে যায়। তখন এর চারপাশে বাঁশ বা বেত দিয়ে মুড়িয়ে সেলাই করে দেওয়া হয়। এরপর পাখার ভেতরে রুচি ও পছন্দ অনুযায়ী অনেকে অনেক কথা লিখে বা চিত্র এঁকে রঙিন সুতা দিয়ে সেলাই করে থাকেন।

কাপড়ের নকশি হাতপাখায় অনেক খালি জায়গা পাওয়া যায়, যেখানে একজন গৃহিণীর মনের অনেক না-বলা কথা ফুটিয়ে তোলা যায়। এই কাপড়ে প্রথমে কাঠপেন্সিল দিয়ে মোটা মোটা করে কাথাগুলো বা চিত্রগুলো এঁকে নেওয়া হয়। তারপর

www.pathagar.com

এর ওপর রঙিন সুতা দিয়ে সেলাই করা হয়। কোনো বাণী বা কবিতাংশ ছাড়াও এসব পাখায় নানারকম জ্যামিতিক চিত্র, চারকোণা ছোট ছোট ঘর দিয়ে তৈরি পিরামিড, টিয়া পাখি, ফুল, লতা-পাতা, ইত্যাদি এঁকে রঙ-বেরঙের সুতা দিয়ে সেলাই করা হয়।

লোকশিল্প : মনপুরা উপজেলা

১. আলপনা

হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই গায়ে হলুদ ও বিয়ের অনুষ্ঠানে ঘরের মেঝেতে, সিঁড়িতে আলপনা এঁকে থাকে। হিন্দু সম্প্রদায়ের রমণীদের অঙ্কিত আলপনায় ধর্মীয় ভাবধারা পরিস্ফুট, কিন্তু মুসলিম সম্প্রদায়ের ছেলে-মেয়েরা মূলত অলংকরণ ও সৌন্দর্যবৃদ্ধির জন্যই করে থাকে। সনাতন ধর্মাবলম্বীরা শিশুদের মুখে ভাত দেওয়ার অনুষ্ঠান অন্নপ্রাশনে এবং লক্ষ্মীপূজার দিনে বাড়ির দরজা থেকে লক্ষ্মীর আসন পর্যন্ত আতপ চালের গুঁড়ার সাথে পানি মিশিয়ে আলপনা এঁকে থাকে।

ডালা-কুলা চিত্র

গায়ে হলুদের অনুষ্ঠানে বর ও কনে পক্ষ থেকে যে কুলা-ডালায় করে হলুদসামগ্রী পাঠানো হয়ে থাকে, সে ডালা-কুলোগুলোতেও বিভিন্ন লতা-পাতা-ফুল ইত্যাদি আঁকা হয়ে থাকে।

২. নকশি কাঁথা

এক সময়ে মহিলাদের পুরনো শাড়ির ও পুরুষের পুরনো লুঙ্গির পাড় থেকে সুতা বের করে ব্যবহৃত সাদা জমিনের শাড়িতেই নকশি কাঁথা সেলাই করা হতো। আজকাল বাজার থেকে নতুন কাপড় ও রঙ-বেরঙের সুতা কিনেই নকশি কাঁথা সেলাই করা হয়। এসব কাঁথার মটিফ হিসেবে ব্যবহার করা হয় বিভিন্ন ধরনের ফুল, লতা, পাতা, গাছ-গাছালি, বক, টিয়া, মাছ ইত্যাদি।

নকশি কাঁথাগুলো প্রধানত পারিবারিক ও সামাজিক প্রয়োজনেই তৈরি করা হয়। প্রয়োজনের সাথে সঙ্গতি রেখে এগুলো পাতলা বা পুরু করে সেলাই করা হয়ে থাকে।

নকশি পাখা

মনপুরার রমণীদের সূচি ও বয়নশিল্পের এ এক অপূর্ব সৃষ্টি। নকশি পাখা প্রধানত দু-ধরনের উপকরণ দিয়ে তৈরি করা হয়ে থাকে। এক, একটু মোটা কাপড় দিয়ে, দুই. তালের পাতা দিয়ে, কাপড়ের নকশি পাখাগুলোকে চারদিকে গোল করে বাঁশ অথবা বেত দিয়ে মুড়িয়ে দিয়ে নীচের দিকে ধরার সুবিধার জন্য একটি বাঁশের অথবা সুপারি গাছের মসৃণ ডাটি আটকে দেওয়া হয় এবং চারপাশে ঝালর থাকে। তারপর পাখার মূল কাপড়ে কিছু কিছু মূল্যবান ও স্মরণীয় বাণী কাঠপেন্সিল দিয়ে পুরু করে লিখে রঙিন সুতোয় সেলাই করা হয়। এসব বাণীর মধ্যে থাকে 'নারী হয় জগতের মালা যদি হয় সে সতী, নারীই কলঙ্কের ডালা যে না ভজে পতি', 'আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে আসে নাই কেহ অবণী পরে, সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে' কিংবা 'সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে' ইত্যাদি। আবার এসব পাখার কোণে কোণে হয়তো

www.pathagar.com

একটি টিয়া পাখি বা পাখির আকৃতির একটি নাম না জানা পাখির প্রতিকৃতিতে সুই-সুতার কাজ করা হয়ে থাকে। তালপাখায় অতো বেশি বাক্য লিখার সুযোগ না থাকলেও দু'চারটি লাইন রঙিন সুতা দিয়ে লেখা থাকে এবং চারপাশটা বাঁশ বা বেত দিয়ে মুড়িয়ে দেওয়া হয়। একটি তালপাখায় এক রমণীর হৃদয়ের অব্যক্ত ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়েছে একটি গানের দুটি লাইনের মধ্য দিয়ে—'হয়তো তোমায় নাহি পাব, তবুও তোমায় আমি দূর হতে ভালবেসে যাবো'।

তথ্যসূত্র

১. এমএ তাহের, পিতা : প্রয়াত আলহাজ গোলাম রহমান, মাতা : প্রয়াত সাহেরা খাতুন, শিক্ষা : বি.এ, বয়স : ৮০ বছর, পেশা : সাংবাদিকতা, জেলা প্রতিনিধি, বাংলাদেশ টেলিভিশন, ঠিকানা : খালপাড়, বাংলা স্কুলের পিছনে, ডাকঘর ও উপজেলা : ভোলা

২. বিপ্লবকুমার পাল, পিতা : সুকুমার পাল, মাতা : নন্দরানী পাল, বয়স : ৩৭ বছর, শিক্ষা : এম.কম. (ব্যবস্থাপনা), পেশা : অধ্যাপনা, ঠিকানা : এসএস পাল প্লাজা, কুমার পট্টি, ভোলা, ডাকঘর : ভোলা, উপজেলা : ভোলা সদর

৩. নাম : হোসনে আরা মিনু, স্বামী : আ.ফ.ম. মিজানুর রহমান, বয়স : ৪৭ বছর, পেশা :

৪. গৃহিণী, ঠিকানা : গ্রাম : বাপ্তা, ডাকঘর : ভোলা, উপজেলা : ভোলা সদর, জেলা : ভোলা

৫. প্রাণগোপাল দেবনাথ, পিতা : ব্রজবাসী দেবনাথ, মাতা : কুঞ্জরানী দেবনাথ, শিক্ষা : বিএ বয়স : ৯০ বছর, পেশা : শিক্ষকতা (অবসরপ্রাপ্ত), ঠিকানা : গ্রাম : বাংলাবাজার, ডাকঘর : বাংলাবাজার, উপজেলা : দৌলতখান

৬. শফিকুল মাওলা ফারুক (শ.ম.ফারুক), পিতা : প্রয়াত সিকান্দার আহমদ, মাতা : ফিরোজা বেগম, শিক্ষা : বি.এ. (অনার্স), এম.এ., বয়স : ৫১ বছর, পেশা : অধ্যাপনা, সাংবাদিকতা, ঠিকানা : গ্রাম : চরখলিফা, ডাকঘর : দিদারুল্লা, উপজেলা : দৌলতখান

৭. আজিমউদ্দিন লিটন, পিতা : প্রয়াত সালাহ্উদ্দিন খান, মাতা : প্রয়াত অহিদা বেগম, শিক্ষা : বি.এ., বয়স : ৩৫ বছর, পেশা : সাংবাদিকতা, চাকুরি, ঠিকানা : গ্রাম : দড়িচাঁদপুর, ডাকঘর : হাট শশীগঞ্জ, উপজেলা : তজুমুদ্দিন

৮. কার্তিক দেবনাথ, পিতা : ননীগোপাল দেবনাথ, মাতা : শান্তি দেবনাথ, শিক্ষা : ডি.ইউ.এম.এস., বয়স : ৬১ বছ, পেশা : ব্যবসা, ঠিকানা : গ্রাম : হাসাননগর, ডাকঘর : মৃজাকালু, উপজেলা : বোরহানউদ্দিন

৯. তানিয়া, পিতা : মোশারেফ হোসেন হাওলাদার, মাতা : আকতার জাহান, শিক্ষা : বি.এ., বয়স : ২১ বছর, পেশা : ছাত্রী, ঠিকানা : গ্রাম : পক্ষীয়া, ডাকঘর : বোরহানগঞ্জ, উপজেলা : বোরহানউদ্দিন

১০. মোঃ অজিউল্লাহ মিয়া, পিতা : প্রয়াত আবদুর রহমান মিয়া, মাতা : প্রয়াত তহুরা খাতুন, বয়স : ৭১ বছর, পেশা : ব্যবসা, ঠিকানা : গ্রাম : ধলিগৌরনগর, ডাকঘর : সিরাজিয়া মাদ্রাসা, উপজেলা : লালমোহন

১১. সালেহা খাতুন (পারুল), স্বামী : মোঃ অজিউল্লাহ মিয়া, শিক্ষা : বি. এ., বয়স : ৫৭ বছর, পেশা : গৃহিণী, ঠিকানা : গ্রাম : ধলিগৌরনগর, ডাকঘর : সিরাজিয়া মাদ্রাসা, উপজেলা : লালমোহন

www.pathagar.com

১২. কাজী মোহাম্মদ রাশেদ, পিতা : প্রয়াত মোহাম্মদ আলী, মাতা : জাকিয়া বেগম, শিক্ষা : এসএসসি, বয়স : ৪০ বছর, পেশা : ব্যবসা, ঠিকানা : দক্ষিণ ফ্যাশন, ডাকঘর ও উপজেলা : চরফ্যাশন

১৩. মোঃ আলমগীর হোসেন, পিতা : মোহাম্মদ নূর হাফেজ মিয়া, মাতা : হাসিনা বেগম, শিক্ষা : বি.এ. (অনার্স) এম.এ., পেশা : শিক্ষকতা, বয়স : ৩৩ বছর, ঠিকানা : গ্রাম : চর ফৈজুদ্দিন, ডাকঘর : হাজীরহাট, উপজেলা : মনপুরা

www.pathagar.com

লোকপোশাক-পরিচ্ছদ

পোশাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে এই জেলার নারী-পুরুষ চিরকালই অত্যন্ত সচেতন, সৌখিন ও রুচিশীল। সময়, স্থান ও পরিবেশের সাথে সঙ্গতি রেখে তারা পোশাক পরলেও কখনোই তাতে উগ্রতা লক্ষ্য করা যায় না। ঘর-বাড়ির অভ্যন্তরে, আশে-পাশে, ঘর-বাড়ির কাছাকাছি স্থানে লুঙ্গি ও পাঞ্জাবি বা লুঙ্গি ও শার্ট পরতে তারা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। বাড়িতে কোনো মেহমান এলে তারা গেঞ্জির ওপর একটা শার্ট, লুঙ্গির সাথে নিদেনপক্ষে একটা পাঞ্জাবি চাপিয়ে দিয়ে আগন্তুকের সামনে উপস্থিত হন। ঘর-বাড়ির বাইরে একটু দূরে, দৈনন্দিন বাজার বা অন্য কোনো কেনাকাটা করতে বের হলে তারা মোটামুটিভাবে পাজামা-পাঞ্জাবি, প্যান্ট-সার্ট, প্যান্ট-পাঞ্জাবি বা প্যান্ট-টি শার্ট পরে থাকেন। প্যান্টের সাথে কখনো কখনো ফতুয়াও পরিধান করেন। মুসলিম সম্প্রদায়ের অনেকেই মাথায় টুপি পরেন। গ্রামাঞ্চলের মানুষের পোশাক মোটামুটিভাবে লুঙ্গি-শার্ট বা লুঙ্গি-পাঞ্জাবি বা লুঙ্গি-গেঞ্জি। কৃষক-শ্রমিক শ্রেণি প্রধানত লুঙ্গি-গেঞ্জি পরে থাকেন। সনাতন ধর্মানুসারীরা প্রায়শই ধুতি-পাঞ্জাবি বা ধুতি-শার্ট পরেন।

হিন্দু ও মুসলিম নারী উভয়ে শাড়ি পরিধান করেন। কিশোরী ও তরুণীরা পরে থাকেন সালোয়ার-কামিজ-ওড়না। মুসলিম বয়স্ক মহিলা ও তরুণীদের অনেকে বোরখা, কেউ কেউ শাড়ি কিংবা সালোয়ার-কামিজ এবং সাথে হিজাব পরেন। বয়স্ক মহিলারা অনেক সময় সালোয়ার-কামিজ ও ওড়নাও পরেন। তবে গ্রামের মহিলাদের অধিকাংশই শাড়ি পরে থাকেন। স্কুল-কলেজের তরুণীদের অনেকে জিন্সের প্যান্ট পরেন।

গায়ে হলুদ, বিয়ে, বিবাহ বার্ষিকী, জন্মদিন, ঈদোৎসব, দুর্গাপূজাসহ বিভিন্ন পূজা উৎসব ইত্যাদিতে উভয় সম্প্রদায়ের নারী-পুরুষ, যুবক-বৃদ্ধ, তরুণ-তরুণী ও শিশু-কিশোররা সামর্থ্য অনুযায়ী নানা ধরনের কারুকার্যখচিত বিভিন্ন ডিজাইনের বাহারি পোশাক পরে থাকেন। আধুনিক ফ্যাশন-সচেতন তরুণ-তরুণী ও মহিলারা সর্বাধুনিক ডিজাইনের তৈরি পোশাক পরেন কিংবা দর্জি দিয়ে তৈরি করিয়ে নেন।

অলংকার ও প্রসাধনী

গহনা তো বাঙালি রমণীর পরম সঞ্চয়। এ অঞ্চলের রমণীরা তার ব্যতিক্রম হবেন, এটা ভাবা তো ন্যায়বিচারের পরিপন্থি। গহনা ব্যবহারের ক্ষেত্রে গ্রাম ও শহর নয়, বলা যায় শিক্ষিত ও অল্পশিক্ষিত বা অশিক্ষিত মানুষের মধ্যে অনেক বিভিন্নতা রয়েছে। বিভিন্নতা রয়েছে সময়, স্থান ও পরিবেশের সাথে সঙ্গতি রেখে অলংকার ব্যবহারে রুচির ক্ষেত্রেও। শহর ও গ্রামের শিক্ষিত মেয়েরা সামর্থ্য অনুযায়ী সাধারণত কানে দুল, গলায় হালকা চেইন, হাতে আংটি ও নাকে নাকফুল পরে থাকেন। উৎসব বা বিশেষ কোনো অনুষ্ঠানে এর সাথে তারা যোগ করেন গলায় হার, ব্রেসলেট, হাতে বালা বা চুড়ি ইত্যাদি। একটু কম শিক্ষিত বা অশিক্ষিত গ্রাম ও শহরের তরুণী-যুবতী কিংবা বয়স্ক

www.pathagar.com

মহিলারা সাধারণত নাকে নাকফুল, মিনা ও কানে দুল, গলায় চিকন চেইন ও হাতে চুড়ি পরতে পছন্দ করেন। অনেক তরুণী ও মহিলা পায়ের আঙুলে আংটি পরে থাকেন। এখানে উল্লেখ করার বিষয় যে, এসব অলংকার সোনা, রূপা কিংবা ইমিটেশন ইত্যাদি যে কোনো কিছুর তৈরি হতে পারে। তবে ইদানীং ইমিটেশনের অলংকার পরতে মহিলারা বেশি আগ্রহ প্রকাশ করেন। সিঁথি পাটি, কোমরে বিছা, বাজুবন্ধ, পায়ে মল বা খাড়ু, নাকে চুঙ্গি বা বালি, গলায় কবজ, হাসুলি, বেত খাড়ু ইত্যাদি অলংকারের এখন আর প্রচলন নেই। তবে ইদানীং বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে মেয়েরা 'কবজ' পরতে শুরু করেছেন। পয়লা বৈশাখে ছোট ছোট শিশুদের পায়ে মল পরিয়ে সাজানো হয়।

অলংকার পরার ক্ষেত্রে বয়সেরও একটি বিষয় আছে। সব বয়সের মেয়েরা সব-ধরনের গয়না পরে না। সাধারণত বিয়ের আগে একটি মেয়ে একটু হালকা গয়না পরে। আবার বিয়ের পরে সামর্থ্য অনুযায়ী একটু ভারী. গয়না পরে। বিয়ের আগে কোনো মেয়ে বিশেষ কোনো অনুষ্ঠান ছাড়া সাধারণত হাতে বালা-চুড়ি বা গলায় লেকলেস ব্যবহার করে না। বিয়ের পর আবার এগুলো ছাড়া 'বউ বউ' লাগে না। বিয়ের পর একটি মেয়ে অবশ্যই নাকে 'নাকফুল' ও হাতে চুড়ি পরবে—তা সোনা, রূপা বা ইমিটেশন যা-ই হোক না কেন। নাকে 'নাকফুল' না পরলে স্ত্রীর শ্বাস-প্রশ্বাস স্বামীর গায়ে পড়লে তার অমঙ্গল কিংবা নানাবিধ রোগ-ব্যাধির উদ্ভব হতে পারে বলে বিশ্বাস পোষণ করে থাকেন আমাদের লোকসমাজ। আবার বিবাহিত নারীকে অবশ্যই হাতে চুড়ি পরতে হবে। এছাড়া নাকি বিবাহিত নারীকে বিধবা মনে হয়।

যেমন পোশাক-পরিচ্ছদ, তেমনি তার সাথে মিলিয়ে প্রসাধনী ব্যবহারের ক্ষেত্রেও আমাদের মেয়েরা যথেষ্ট সতর্ক ও যত্নবান। বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকার মেয়েদের মতো আমাদের এলাকার মেয়েরাও নিজেদের অধিকতর আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য যা প্রসাধনসামগ্রী প্রয়োজন তা ব্যবহার করে থাকেন। যেমন, স্নো-পাউডার, লিপস্টিক, কাজল, আলতা ও নেল পলিশ। বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষে সামর্থ্য অনুযায়ী তারা আরো ব্যবহার করে থাকেন মাসকারা, আই লাইনার, ফাউণ্ডেশন ক্রীম, ব্লাসন, আই-শ্যাডো ইত্যাদি। এসব ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাদের কোনো উগ্রতা নেই, আছে সংযম ও পরিমিতিবোধ, আছে স্থান-কাল ও প্রতিবেশের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি।

প্রসাধনের আর একটি উল্লেখযোগ্য উপকরণ মেহদি। এ অঞ্চলের প্রায় বাড়িতে মেহদি গাছ রয়েছে। নিতান্তই যাদের বাড়িতে নেই, তারা প্রয়োজনে পাশের ঘরের বারান্দার পাশে লাগানো গাছ থেকে কিংবা পাশের বাড়ির মেহদি গাছটা থেকে কিছু পাতা তুলে নিয়ে এসে শিল-পাটায় মিহি করে বেটে ব্যবহার করে থাকে। আজকাল অবশ্য অনেকে বাজারে প্রস্তুতকৃত মেহদির টিউব কিনে ব্যবহার করে থাকেন।

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে যখন প্রসাধনের একটি অতি প্রয়োজনীয় উপাদান চোখে দেওয়ার কাজলের প্রবেশাধিকার ঘটেনি, তখন আমাদের মেয়েরা নিজেরাই এক অভিনব পদ্ধতিতে কাজল তৈরি করে তা ব্যবহার করতেন। এ প্রসঙ্গে পশ্চিম বাপ্তা গ্রামের প্রয়াত আবদুল মালেকের স্ত্রী জনাব মোমেনা খাতুন জানালেন, আজ থেকে প্রায় ৫০/৫৫ বছর আগে তার ছোট ননদ রাহেলা খাতুনকে (প্রয়াত) অত্যন্ত সুনিপুণভাবে

www.pathagar.com

নিজ হাতে চোখে দেওয়ার কাজল তৈরি করতে ও চোখ সাজাতে দেখেছেন। রাহেলা খাতুন তখন কুমারী। তিনি প্রায় বিকেলে একটি কেরোসিনের 'চেরাগ' (কুপি), একটি পিতলের বড় চামচ, একটি পানের বোঁটা ও একটু সরিষার তেল নিয়ে কাজল বানানোর কাজে বসতেন। তিনি হাতের আঙুলে সামান্য সরিষার তেল নিয়ে চামচের নীচের অংশে লাগিয়ে নিতেন। এরপর চেরাগ থেকে কুণ্ডলি পাঁকিয়ে যে ধোঁয়াটা ওপরের দিকে উঠতে থাকতো, চামচটি তার ওপরে ধরে রাখতেন তিনি। কিছুক্ষণের মধ্যেই চামচের তলদেশে একটা পুরু কালো আবরণ পড়ে যেতো। এরপর তিনি একটা পানের বোঁটার আগা দিয়ে চামচের কালো বর্ণ ধারণ করা স্থান থেকে একটু একটু করে সদ্য প্রস্তুতকৃত কাজল দিয়ে ইচ্ছেমতো চোখ দুটোকে সাজিয়ে নিতেন। এটাই ছিল এককালে গ্রামের মেয়েদের কাজল তৈরি ও ব্যবহার করার পদ্ধতি।

রাহেলা খাতুনের বড় বোন মাহমুদা খাতুনও এ কথার সত্যতা স্বীকার করে বললেন, এখনকার মতো তখন তো আর আমরা মার্কেটে গিয়ে এসব কিনতে পারতাম না। তিনি আরো জানালেন, সে সময় তারা চুল ও গায়ের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি এবং সুগন্ধীর জন্য সোন্দা ও মেথি ব্যবহার করতেন। হাতের মেহেদির রং লাল টকটকে করার জন্য হ্যারিকেন ও চুলার আঁচের ওপর হাত সেঁকতেন।

গ্রামাঞ্চলে অনেক মেয়েই কোনো অনুষ্ঠান ছাড়াই পায়ে আলতা লাগিয়ে থাকেন। এতে সৌন্দর্যবৃদ্ধি ছাড়াও পায়ের গোড়ালি ফাটার সমস্যা থেকে নিরাপদ থাকা যায়।

দৌলতখান উপজেলা

[ভোলা সদর উপজেলার অনুরূপ, জেলার সর্বত্র একই রকম]

তজুমুদ্দিন উপজেলা

[ভোলা সদর উপজেলার অনুরূপ, জেলার সর্বত্র একই রকম]

বোরহানউদ্দিন উপজেলা

[ভোলা সদর উপজেলার অনুরূপ, জেলার সর্বত্র একই রকম]

লালমোহন উপজেলা

[ভোলা সদর উপজেলার অনুরূপ, জেলার সর্বত্র একই রকম]

চরফ্যাশন উপজেলা

[ভোলা সদর উপজেলার অনুরূপ, জেলার সর্বত্র একই রকম]

মনপুরা উপজেলা

[ভোলা সদর উপজেলার অনুরূপ, জেলার সর্বত্র একই রকম]

তথ্যসূত্র

১. বিপ্লবকুমার পাল, পিতা : সুকুমার পাল, মাতা : নন্দরানী পাল, বয়স : ৩৭ বছর, শিক্ষা : এম.কম. (ব্যবস্থাপনা), পেশা : অধ্যাপনা, ঠিকানা : এসএস পাল প্লাজা, কুমার পট্টি, ভোলা, ডাকঘর : ভোলা, উপজেলা : ভোলা সদর

www.pathagar.com

২. প্রাণগোপাল দেবনাথ, পিতা : ব্রজবাসী দেবনাথ, মাতা : কুঞ্জরানী দেবনাথ, শিক্ষা : বি.এ., বয়স : ৯০ বছর, পেশা : শিক্ষকতা (অবসরপ্রাপ্ত), ঠিকানা : গ্রাম : বাংলাবাজার, ডাকঘর : বাংলাবাজার, উপজেলা : দৌলতখান

৩. শফিকুল মাওলা ফারুক (শ.ম.ফারুক), পিতা : প্রয়াত সিকান্দার আহমদ, মাতা : ফিরোজা বেগম, শিক্ষা : বি.এ. (অনার্স), এম.এ., বয়স : ৫১ বছর, পেশা : অধ্যাপনা, সাংবাদিকতা, ঠিকানা : গ্রাম : চরখলিফা, ডাকঘর : দিদারুল্লা, উপজেলা : দৌলতখান

৪. কার্তিক দেবনাথ, পিতা : ননীগোপাল দেবনাথ, মাতা : শান্তি দেবনাথ, শিক্ষা : ডি.ইউ.এম.এস., বয়স : ৬১ বছর, পেশা : ব্যবসা, ঠিকানা : গ্রাম : হাসাননগর. ডাকঘর : মৃজাকালু, উপজেলা : বোরহানউদ্দিন

৫. মোশারেফ হোসেন হাওলাদার, পিতা : প্রয়াত আবদুর রাজ্জাক হাওলাদার, মাতা : প্রয়াত সবুরা খাতুন, পেশা : অরসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ঠিকানা : গ্রাম : পক্ষীয়া, ডাকঘর : বোরহানগঞ্জ, উপজেলা : বোরহানউদ্দিন

৬. সালেহা খাতুন (পারুল), স্বামী : মোঃ অজিউল্লাহ মিয়া, শিক্ষা : বি. এ., বয়স : ৫৭ বছর, পেশা : গৃহিণী, ঠিকানা : গ্রাম : ধলিগৌরনগর, ডাকঘর : সিরাজিয়া মাদ্রাসা, উপজেলা : লালমোহন

৭. কাজী মোহাম্মদ রাশেদ, পিতা : প্রয়াত মোহাম্মদ আলী, মাতা : জাকিয়া বেগম, শিক্ষা : এসএসসি, বয়স : ৪০ বছর, পেশা : ব্যবসা, ঠিকানা : দক্ষিণ ফ্যাশন, ডাকঘর ও উপজেলা : চরফ্যাশন

৮. মো. আলমগীর হোসেন, পিতা : মোহাম্মদ নূর হাফেজ মিয়া, মাতা : হাসিনা বেগম, শিক্ষা : বিএ (অনার্স) এমএ, পেশা : শিক্ষকতা, বয়স : ৩৩ বছর, ঠিকানা : গ্রাম : চর ফৈজুদ্দিন, ডাকঘর : হাজীরহাট, উপজেলা : মনপুরা

৯. কাজী মোহাম্মদ রাশেদ, পিতা : প্রয়াত মোহাম্মদ আলী, মাতা : জাকিয়া বেগম, শিক্ষা : এসএসসি, বয়স : ৪০ বছর, পেশা : ব্যবসা, ঠিকানা : দক্ষিণ ফ্যাশন, ডাকঘর ও উপজেলা : চরফ্যাশন

১০. মোঃ আলমগীর হোসেন, পিতা : মোহাম্মদ নূর হাফেজ মিয়া, মাতা : হাসিনা বেগম, শিক্ষা : বি. এ. (অনার্স) এম. এ., পেশা : শিক্ষকতা, বয়স : ৩৩ বছর, ঠিকানা : গ্রাম : চর ফৈজুদ্দিন, ডাকঘর : হাজীরহাট, উপজেলা : মনপুরা

www.pathagar.com

লোকস্থাপত্য

আমাদের অঞ্চলে ঘর-বাড়ি বা বাড়ি বলতে বোঝায় একটি নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে একাধিক ঘরের অবস্থান। এই ঘরের সংখ্যা হতে পারে চার, পাঁচ, সাত, দশ, বিশ, এমনকি অর্ধশত কিংবা তারও বেশি। একান্নবর্তী না হয়েও গায়ে গায়ে ঘেঁষে এই ঘরগুলো তৈরি করেন একই বংশোদ্ভূত পরিবারের সদস্যরা। এটিই হচ্ছে একটি বাড়ি। একটি বড় উঠানকে কেন্দ্র করে তার চারপাশ ঘিরে নির্মাণ করা হয় এসব ঘর।

এখানে মোটামুটিভাবে সঙ্গতিপন্ন একটি বাড়ির চিত্র দেখানো যেতে পারে। জনসাধারণের চলাচলের জন্য নির্মিত একটি রাস্তা কিংবা খালপাড় থেকে শুরু হয় এই শ্রেণিভুক্ত একটি বাড়ির দরজা। এই দরজা বা প্রবেশপথ বেশ কিছুটা লম্বাকৃতির হয়ে থাকে। এর দু'পাশে নারিকেল-সুপারির সারি বাঁধা গাছ, দু-চারটি আম-কাঁঠাল গাছ, একপাশে একটি বড় বা মাঝারি আকারের পুকুর, যেটি একান্তভাবেই বাড়ির পুরুষ সদস্যদের কিংবা বহিরাগত মেহমানদের ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত থাকে। এ ধরনের পুকুরগুলো একসময় গ্রামের একটা বিরাট এলাকার মানুষের খাবার পানি সংগ্রহের একমাত্র উৎসস্থল হিসেবে ব্যবহৃত হতো।

যাই হোক, লম্বাকৃতির পথটুকু অতিক্রম করলেই পড়বে প্রশস্ত দরজা। একটি সঙ্গতিপন্ন ও মধ্যবিত্ত কিংবা বিত্তবান পরিবারে এই প্রশস্ত দরজায় থাকে একটি মসজিদ, একটি কাছারি ঘর বা বৈঠকখানা ও একটি পারিবারিক কবরস্থান। বাড়ির অভ্যন্তরে প্রবেশাধিকার নেই এমন, কিংবা সংরক্ষিত লোকজনের বসার ঘর হিসেবে ব্যবহৃত হয় কাছারি ঘর। বাড়ির ভেতরে প্রবেশাধিকার আছে এমন স্বজনরাও কাছারি ঘরে এসে প্রথমে অবস্থান গ্রহণ করেন। এই কাছারি ঘরটি বিভিন্ন গ্রামীণ ও পারিবারিক সভা, পড়াশোনা কিংবা গৃহ-শিক্ষকের আবাসস্থল হিসেবেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্রশস্ত দরজাটির সীমানা পার হলে মূল বাড়িতে ঢোকার প্রবেশপথ, আর তার পরেই বাড়ির 'উডান' বা উঠান, যাকে ঘিরে তৈরি হয় বাড়ির বিভিন্ন সদস্যদের ঘর। এই উঠানের ব্যবহার বহুবিধ। প্রতিটি ঘর যার যার সামনের অংশটুকু ব্যবহার করে থাকেন। বাড়ির সদস্যদের মধ্যে সৌহার্দ্য ও মিলমিশ থাকলে প্রয়োজনবোধে একজনের ঘরের সামনের স্থান আরেকজনও ব্যবহার করতে পারেন। ধান শুকানো, চালের গুঁড়ি শুকানো, সুপারি-মরিচ শুকানো থেকে শুরু করে তার বা বাঁশ টানিয়ে তার ওপর মহিলাদের শাড়ি, লেপ-কাঁথা, শিশুদের ব্যবহারের ছোট ছোট কাঁথা বা ন্যাকড়া শুকানোর কাজে এই উঠানের ভূমিকা অনন্য। ছোট ছোট বাচ্চাদের দৌড়াদৌড়ি, অ্যাক্কা-দোক্কা, ষোলগুটি, চোখ পলানি ইত্যাদি খেলায় এই উঠানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আবার বিভিন্ন ঘরের বিয়ে, মুসলমানি বা অন্য কোনো অনুষ্ঠানের ছোট ছোট খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা কাছারি ঘর ছাড়া এখানেও করা হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

এই উঠানের আবার কিছু ক্ষতিকর দিকও রয়েছে। যেমন, কোনো গৃহবধূর ওপর থেকে জ্বীন-ভূতের 'আসর' ছাড়ানোর নামে নারী নির্যাতন, এক ঘরের সাথে আরেক ঘরের দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের ফলে সৃষ্ট মারামারি, খুনাখুনি ইত্যাদিও প্রায়শই এই উঠানেই হয়ে থাকে।

অনেক অবস্থাপন্ন বাড়িতেই বাড়ির ভেতরে থাকে এক বা একাধিক পুকুর, যা প্রধানত বাড়ির মহিলা ও শিশু-কিশোর সদস্যরাই ব্যবহার করে থাকে। থালা-বাসন-হাড়ি-পাতিল, কাপড়-চোপড় ধোয়া থেকে গোসল করা এই পুকুরেই সম্পন্ন হয়ে থাকে। পুকুরে থাকে একাধিক ঘাট। কোথাও ইট-সিমেন্টের তৈরি ঘাট, কোথাও বা তিন-চার হাত লম্বা নারিকেল গাছের টুকরা পর্যায়ক্রমে নীচের দিকে সাজিয়ে বাঁশ বা অন্য কোনো গাছ পুঁতে আটকে দেওয়া হয়, যাতে পাকা সিঁড়ির বদলে ব্যবহৃত নারিকেল গাছের টুকরোগুলো গড়িয়ে গড়িয়ে পুকুরের গভীরে চলে না যায়। পাড়ের কাছাকাছি স্থানের পানি যদি ময়লা, অপরিচ্ছন্ন বা ঘোলা থাকে, সেক্ষেত্রে স্বচ্ছ পানি পাওয়ার জন্য সুপারি গাছ বা অন্য কোনো গাছ বা বাঁশ কেটে জলের উপরিভাগ দিয়ে পাড় থেকে পুকুরের মাঝখানের দিকে বেশ কিছুদূর নিয়ে যাওয়া হয়, যা দেখলে একটা সাঁকোর মতো মনে হবে। এর ওপর বসে বয়স্করা নিরাপদে স্বচ্ছ পানি ব্যবহার করতে পারেন।

গ্রামে ও শহরে এবং উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও স্বল্পবিত্ত কিংবা বিত্তহীনদের ঘরবাড়ি নির্মাণের পরিকল্পনা, পদ্ধতি ও উপকরণ ব্যবহারে নানান যৌক্তিক কারণেই বিস্তর ফারাক বিদ্যমান। সাধারণভাবে বলা যায় যে, সচ্ছল পরিবারের ঘর আটচালা, চারচালা ও টিনের তৈরি। এসব ঘরের বেড়া এক সময় টিনের কিংবা বাঁশের খলপা দিয়ে দেওয়া হতো। বর্তমানে কোথাও টিনের, কোথাও বা ইট-সিমেন্টের। কিছু কিছু ঘরের বেড়া আবার বিভিন্ন গাছের তক্তা দিয়েও দেওয়া হতো। এসব ঘরের মতো এতো সুন্দর কাঠামোর ঘর দেশের অন্যান্য অংশে কমই দেখা যেতো।

সচ্ছল পরিবারের একটি ঘরকে মোটামুটিভাবে তিনটি অংশে ভাগ করা যায়। একেবারে পেছনের অংশকে 'পেছনের বারান্দা', মাঝখানের অংশকে 'বড় ঘর' (আকৃতিতে ও আয়তনে বড় বলে) ও সামনের অংশকে 'সামনের বারান্দা' বা আইতনা (হাতিনা) ঘর বলা হয়ে থাকে। নিজেদের ইচ্ছা ও প্রয়োজন মতো এই তিনটি অংশে আবার ছোট ছোট পৃথক পৃথক কক্ষও করা হয়ে থাকে। কাঠের ফ্রেমে আটকানো টিন বা উন্নতমানের মুলিবাঁশের খল্পার বেড়া দিয়ে কক্ষগুলোকে আলাদা করা হয়ে থাকে।

পুরোপুরি টিনের তৈরি কিংবা ইট-সিমেন্ট দিয়ে তৈরি বেড়া (ওয়াল) ও চারচালা বা আটচালা টিনের ঘরের সামনের বারান্দার বেড়ার ওপরের দিকে 'ভেলকিতে' অনেক সময় সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য টিনের ওপর লতা-পাতা কিংবা 'স্বাগতম', আরবিতে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ্' বা 'আল্লাহু আকবর' লেখাটি খোদাই করে দেওয়া হয়। অনেক ঘরের সামনের বারান্দার একেবারে শেষে দুয়ারের বাইরে দু'পাশে থাকে ইট-সিমেন্টের তৈরি হেলান দিয়ে বসার মতো লম্বা টুলের আকৃতির দুটি স্থান (আঞ্চলিক ভাষায় 'ডেলনি' বলা হয়), ওপরে দোচালা টিনের ছাউনি। এটাকে আঞ্চলিক ভাষায় বলা হয় 'নাক বারান্দা'। এখানে বসে বাড়ির সদস্য-সদস্যারা অনেক সময় গল্প-গুজব করে বা অবসর সময় কাটান। এটি আবার ঘরের অভ্যন্তরে প্রবেশের

www.pathagar.com

পূর্বে স্বল্প সময়ের জন্য অপেক্ষা করার স্থান হিসেবেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ঘরের সদ্যোজাত শিশুকে দেখতে আসা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনকেও এখানে কিছু সময়ের জন্য বিশ্রাম নিতে হয়। কারণ লোকবিশ্বাস আছে যে, দূর থেকে আসা লোকজনের সাথে অনেক অশুভ শক্তির অনুপ্রবেশ ঘটতে পারে।

এসব ঘরের খুঁটি হিসেবে অবস্থাপন্ন লোকেরা একসময় লোহা কাঠ, শাল কাঠ, কিংবা সেগুন কাঠ ব্যবহার করতেন। এখন এগুলো দুষ্পাপ্য ও দুর্মূল্য হওয়ায় অপেক্ষাকৃত কম দামের কাঠ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ইদানীং কাঠের খুঁটির স্থান দখল করে নিচ্ছে কংক্রিটের তৈরি খুঁটি।

এ পর্যায়ের ঘরগুলোর মাটির মেঝে বা পাকা মেঝে থেকে ১০/১১ ফুট ওপরে 'পাটাতন' তৈরি করা হয়। আঞ্চলিক ভাষায় একে বলা হয় 'কার'। এই 'পাটাতন' বা 'কার' মজবুত ও পুরু তক্তা দিয়ে খিলানো থাকে। এসব 'কার' বা 'পাটাতনে' সংসারের অনেক প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র রাখা হয়। এখানে ওঠার জন্য স্থায়ী কাঠের সিঁড়ি ব্যবহৃত হয়।

অভিজাত ও অবস্থাপন্ন ব্যক্তিরা এ পদ্ধতিতে দোতলা বা আড়াই-তলা ঘরও একসময় তৈরি করতেন। এই দোতলায় আবার কাঠের রেলিং দিয়ে ছোট বারান্দা করা হতো। আজকাল আর এমনটি দেখা যায় না। সচ্ছল ব্যক্তিরা মাঝখানের ঘরের (বড় ঘরের) এক কোণে মেঝে থেকে দু থেকে আড়াই ফুট উচ্চতায় বাঁশের কিংবা কাঠের খুঁটির ওপর তক্তা স্থাপন করে একটি 'চালা' তৈরি করতেন। আঞ্চলিক ভাষায় একে বলা হয় 'উগুইর'। এই উগুইর এর ওপর ধান, গম, চাল, ডাল ইত্যাদির 'মটকা' বা 'ডোলা'গুলো রাখা হতো। ইদানীং এই 'উগুইর' তৈরির প্রবণতা বলতে গেলে খুবই কম, এর পরিবর্তে তৈরি হচ্ছে স্টোর রুমের মতো আলাদা একটি ছোট ঘর। 'সিঁধেল' চোরের ভয়ে এখনও কোনো কোনো ঘরের মাটির মেঝের চারপাশে ভেতরের দিক দিয়ে তক্তা আটকে দেওয়া হয়।

মূল ঘরের সাথে বা দু-তিন ফুট দূরত্বে থাকে 'রান্নাঘর'—আঞ্চলিক ভাষায় যাকে বলে 'রসি' (রসুই) ঘর। একই ঘরে অথবা পৃথক আরেকটি ঘর করা হয় লাকড়ি রাখার জন্য। রান্নাঘরে এক সময় ঢেঁকিও স্থাপন করা হতো। ঢেঁকিঘর আবার পৃথকও তৈরি করা হতো। এখন গ্রামে কোনো ঢেঁকি খুঁজে পাওয়া যায় না।

দ্বিতীয় পর্যায়ের টিনের ঘরগুলো কখনো চারচালা কখনো দোচালা হয়ে থাকে। এসব ঘরের খুঁটি সাধারণত দেশীয় গাব কাঠ, গজারি, সুন্দরী কাঠ ও কড়ই কাঠের হয়ে থাকে। এসব ঘরের গঠন-প্রকৃতিও মোটামুটি একই রকম। প্রয়োজন, রুচি ও সামর্থ্যের হেরফেরে উপকরণ ব্যবহারেও পার্থক্য হয়ে থাকে।

দরিদ্র শ্রেণির ঘর-বাড়ি একান্তই সাধারণ। মাটির মেঝের ওপর একচালা ও দোচালা এসব ঘরের চালা এই কিছুদিন আগেও সাধারণত ছন, নাড়া (খড়), গোলপাতা (ডাবনা পাতা), তালপাতা, নারিকেল পাতা, কাচিয়া ইত্যাদি দিয়ে তৈরি করা হতো। বাঁশ, সুপারি গাছ, কাফুলা (আঞ্চলিক ভাষায় কাউফলা) কিংবা গাব গাছ দিয়ে দেওয়া হতো ঘরের খুঁটি। ঘরের বেড়া সুপারি বা বাঁশ গাছ চিঁড়ে বাঁশের ফ্রেমে খিলান দিয়ে

www.pathagar.com

করা হতো। একে বলা হয় খলপার বেড়া। অধিকতর দরিদ্র শ্রেণি 'হরমুল' (পাটকাঠি) দিয়ে বেড়া দিতো। এ জাতীয় ঘর তৈরিতে আরো যেসব উপকরণ ব্যবহার করা হতো, তার মধ্যে ছিল নারিকেলের দড়ি, জালি বেত, নারিকেল গাছের মাথার 'তোয়াল', যা চিরে চিরে লোহার তারের চেয়েও মজবুত ও দীর্ঘস্থায়ী গিরা দেওয়া যায়। ঘর নির্মাণের উপকরণ ব্যবহারে এবং নির্মাণশৈলীর পরিবর্তনের সাথে সাথে আজকাল এসব উপকরণের ব্যবহারও কমে গেছে।

দরিদ্র মানুষের বসতঘর তৈরির প্রধান উপকরণ একসময় ছিল যে 'ছন' ও 'খড়', প্রবল বর্ষার কারণে তা কিছু দিনের মধ্যেই পচে যেতো। বছর বছর পাল্টাতে হতো। তাই এখন 'ছন' ও 'খড়'-এর ব্যবহার নেই বললেই চলে। একদিকে 'ছন'-এর উৎপাদন নেই, অন্যদিকে নিম্নমানের হলেও কম দামের টিন পাওয়া যাওয়ায় বাড়ি তৈরিতে গৃহস্থরা এক্ষেত্রে বেশি আগ্রহী হচ্ছেন।

গ্রামাঞ্চলের একটি বাড়ির বেড়া। সুপারি গাছের 'বাইল' দিয়ে এভাবে দীর্ঘ বেড়া দেয়া হয়ে থাকে।

এখানে একটি উল্লেখযোগ্য ও অন্যান্য এলাকার জন্য অনুকরণযোগ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ হচ্ছে যে, সম্প্রতি ভোলার একটি সামাজিক সংগঠন 'জাতীয় বন্ধুজন পরিষদ'-এর উদ্যোগে ভোলাকে 'কুঁড়েঘরমুক্ত' ঘোষণা করা হয়েছে। সংস্থাটি ৭ হাজার কুঁড়েঘরকে টিনের ঘরে রূপান্তরিত করেছে।

একই সঙ্গে বা সামান্য দূরত্বে থাকে 'রসি' ঘর বা রান্নাঘর। রান্নাঘরের এক পাশে মাটির ঢিবি তৈরি করে তার ওপর রাখা হয় খাবার পানির মাটির কলস বা ঠিল্যা। এটাকে বলা হয় 'পইডা'। অন্যদিকে মাটিতে গর্ত করে তৈরি করা হয় চুলা। সাধারণত দুটো চুলা তৈরি করা হয়ে থাকে। অনেক সময় থাকে পরপর দুটি একক চুলা, অনেক সময় একটি একক চুলা ও তার পাশে একটি জোড় চুলা—আধুনিক পদ্ধতিতে যা ডাবল

www.pathagar.com

বার্নার। যাদের আলাদা রান্নাঘর করার সামর্থ্য নেই, তারা উঠানে খোলা আকাশের নীচে চুলা তৈরি করে রান্না-বান্নার কাজ সারে। রোদ-বৃষ্টি থেকে রক্ষার জন্য টানিয়ে দেওয়া হয় পলিথিন।

সনাতন ধর্মাবলম্বীদের বাড়িতে আবাসিক ঘরের সাথেই পূজা-অর্চনার জন্য থাকে আর একটি ছোট আকৃতির ঘর, যা 'ঠাকুরঘর' নামে অভিহিত। ঠাকুরঘরের সঙ্গে থাকে তুলসিতলা, সেখানে জ্বলে সন্ধ্যা প্রদীপ, বাজে ঘণ্টা, রমণীরা দেন উলুধ্বনি। বাড়ির এককোণে থাকে কৃষিকাজের সাথে জড়িত পরিবারগুলোর গোয়াল ঘর।

ভোলা জেলায় রয়েছে বিস্তীর্ণ চরাঞ্চল। এসব এলাকায় বাড়িঘর নির্মাণের পদ্ধতি একটু ভিন্নতর। ভূমি থেকে ১০/১২ ফুট (কোথাও বা তারও বেশি) উচ্চতায় মাচা তৈরি করে 'টংয়ের' মতো ঘর তৈরি করে তার মধ্যে বসবাস করে এসব অঞ্চলের বেশিরভাগ মানুষ।

সাম্প্রতিককালে শহর কিংবা গ্রাম উভয়স্থানের বাড়িঘর নির্মাণে আসছে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন। পরিকল্পনায়, উপকরণ ব্যবহারে ও নির্মাণশৈলীতে এই পরিবর্তনের ছোঁয়া স্পষ্ট হয়ে উঠছে। অবস্থাপন্ন ব্যক্তিরা রাজধানীর সুদৃশ্য ভবনের অনুকরণে নির্মাণ করছেন তাদের ঘরবাড়ি ও ব্যবসাকেন্দ্র। অপেক্ষাকৃত কম সচ্ছল ব্যক্তিরা টিন ও কাঠের পরিবর্তে ব্যবহার করছেন ইট ও সিমেন্ট, সামর্থ্য অনুযায়ী নির্মাণ করছেন টিনশেড দালান। মূল ঘরের বাইরে পৃথক পৃথক গোসলখানা ও টয়লেট ব্যবহারের বদলে এখন একটি আধুনিক ভবনের মতোই মূল আবাসিক ভবনের মধ্যেই তার সংকুলান করা হচ্ছে।

এ জেলার দীর্ঘ আয়তনের প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই নারিকেল, সুপারি, আম, কাঁঠাল ছাড়াও ঘরের আশে-পাশে লাগানো হয় গাব, বড়ই, আমরুজ (জামরুল), বেল, গৈয়ম (পেয়ারা), জাম, আতাফল, শরিফা, ডালিম, কাউ, জাম্বুরা, চালতা, ককেয়া (পেঁপে) কামরাঙা, ডেউয়া, খেঁজুর, কলা, লিচু প্রভৃতি ফলজ গাছ। ধনী-দরিদ্র প্রায় সবাই সামান্য একটু জায়গা পেলেই কিছু না কিছু গাছ লাগিয়ে থাকেন। অনেক বাড়িতেই এসব গাছে তুলে দেওয়া হয় লতা আলুগাছ। এ আলুর লতা গাছ বেয়ে বেয়ে উঠে যায় একেবারে শীর্ষদেশে। বাড়ির সীমানা ঘেঁষে থাকে কাঁটাযুক্ত মান্দার (মাদার) গাছ। এসব গাছ ছাড়াও কিছু কিছু ঔষধি গাছও লাগানো হয়ে থাকে।

লোকস্থাপত্য (ঘরবাড়ি) : দৌলতখান উপজেলা

লোকস্থাপত্য (ঘরবাড়ি) : তজুমুদ্দিন উপজেলা

লোকস্থাপত্য (ঘরবাড়ি) : বোরহানউদ্দিন উপজেলা

লোকস্থাপত্য (ঘরবাড়ি) : লালমোহন উপজেলা

লোকস্থাপত্য (ঘরবাড়ি) : চরফ্যাশন উপজেলা

লোকস্থাপত্য (ঘরবাড়ি) : মনপুরা উপজেলা

www.pathagar.com

তথ্যসূত্র

১. এমএ তাহের, পিতা : প্রয়াত আলহাজ গোলাম রহমান, মাতা : প্রয়াত সাহেরা খাতুন, শিক্ষা : বি.এ., বয়স : ৮০ বছর, পেশা : সাংবাদিকতা; জেলা প্রতিনিধি, বাংলাদেশ টেলিভিশন, ঠিকানা : খালপাড়, বাংলা স্কুলের পিছনে, ডাকঘর ও উপজেলা : ভোলা

২. মোহাম্মদ আবদুল্লাহ, পিতা : মোহাম্মদ ইছহাক, মাতা : প্রয়াত সুফিয়া বেগম, শিক্ষা : ফাজিল, বয়স : ৪০ বছর, পেশা : ব্যবসা, ঠিকানা : গ্রাম : ৭ নং ওয়ার্ড, দৌলতখান পৌরসভা, ডাকঘর : দৌলতখান, উপজেলা : দৌলতখান

৩. শফিকুল মাওলা ফারুক (শ.ম.ফারুক), পিতা : প্রয়াত সিকান্দার আহমদ, মাতা : ফিরোজা বেগম, শিক্ষা : বি.এ. (অনার্স), এম.এ., বয়স : ৫১ বছর, পেশা : অধ্যাপনা, সাংবাদিকতা, ঠিকানা : গ্রাম : চরখলিফা, ডাকঘর : দিদারুল্লা, উপজেলা : দৌলতখান

৪. আজিমউদ্দিন লিটন, পিতা : প্রয়াত সালাহ্উদ্দিন খান, মাতা : প্রয়াত অহিদা বেগম, শিক্ষা : বিএ, বয়স : ৩৫ বছর, পেশা : সাংবাদিকতা, চাকরি, ঠিকানা : গ্রাম : দড়িচাঁদপুর, ডাকঘর : হাট শশীগঞ্জ, উপজেলা : তজুমুদ্দিন

৫. আজিমউদ্দিন লিটন, পিতা : প্রয়াত সালাহ্উদ্দিন খান, মাতা : প্রয়াত অহিদা বেগম, শিক্ষা : বিএ, বয়স : ৩৫ বছর, পেশা : সাংবাদিকতা, চাকরি, ঠিকানা : গ্রাম : দড়িচাঁদপুর, ডাকঘর : হাট শশীগঞ্জ, উপজেলা : তজুমুদ্দিন

৬. কার্তিক দেবনাথ, পিতা : ননীগোপাল দেবনাথ, মাতা : শান্তি দেবনাথ, শিক্ষা : ডি.ইউ.এম.এস., বয়স : ৬১ বছর, পেশা : ব্যবসা, ঠিকানা : গ্রাম : হাসাননগর, ডাকঘর : মৃজাকালু, উপজেলা : বোরহানউদ্দিন

৭. মোঃ অজিউল্লাহ মিয়া, পতা : প্রয়াত আবদুর রহমান মিয়া, মাতা : প্রয়াত তহুরা খাতুন, বয়স : ৭১ বছর, পেশা : ব্যবসা, ঠিকানা : গ্রাম : ধলিগৌরনগর, ডাকঘর : সিরাজিয়া মাদ্রাসা, উপজেলা : লালমোহন

৮. সালেহা খাতুন (পারুল), স্বামী : মোঃ অজিউল্লাহ মিয়া, শিক্ষা : বি. এ., বয়স : ৫৭ বছর, পেশা : গৃহিণী, ঠিকানা : গ্রাম : ধলিগৌরনগর, ডাকঘর : সিরাজিয়া মাদ্রাসা, উপজেলা : লালমোহন

৯. মোঃ আলমগীর হোসেন, পিতা : মোহাম্মদ নূর হাফেজ মিয়া, মাতা : হাসিনা বেগম, শিক্ষা : বিএ (অনার্স) এমএ, পেশা : শিক্ষকতা, বয়স : ৩৩ বছর, ঠিকানা : গ্রাম : চর ফৈজুদ্দিন, ডাকঘর : হাজীরহাট, উপজেলা : মনপুরা

১০. প্রতিমা রানী দাস, স্বামী : বিধানকৃষ্ণ দাস, শিক্ষা : বি.এ. (অনার্স), এম.এ., বয়স : ৩৩ বছর, পেশা : অধ্যাপনা, ঠিকানা : গ্রাম : সোনারচর, ডাকঘর : হাজীরহাট, উপজেলা : মনপুরা

www.pathagar.com

লোকসংগীত

ক. মাজারের গান

১
এবাদত করলিনা রে পাগল মনা
এবাদত তুই করলি না।
দেহের বশে হইলি বশী
দেহের খবর লইলি না।

দেহখানা চামড়ার ছাউনি
গইরছে দিয়া আগুন-পানি
দেকলি না তুই দেহখানি
দেহের তোর কি নমুনা।

যেদিন তোর শমন আইবো
দিশা-মিশা হারাইয়া যাইবো
দুই চোউখ তোর যাইবো বুইজা
সেদিন আখেরে হইবে ফানা।

তোমার হাওয়ার পাখি উইড়া যাইবো
খালি দেহ পইড়্যা রইবো
সঙ্গে নাহি যাইবো কেহ
ডরে-ভয়ে কেউ ছুঁইবো ন।
মন রে সময় থাকতে এবাদত কর
আপন দেহের খবর কর।

২
মন রে, রইবো না তোর কিছুই রইবো না
আয়ুর ব্যালা চইল্যা গ্যালে
সঙ্গে কিছুই যাইবো না।
রইবো না তোর কিছুই রইবো না।

মন রে, কর যত বাবুগিরি
কোচা মাইরা মাতব্বরী
লাট-বাহাদুর জমিদারি
দেমাগ্ তোর থাকবো না
রইবো না তোর কিছুই রইবো না।
মন রে, খাট-পালঙ্ক, চাবি-তালা

www.pathagar.com

সোনার চেইন গলার মালা
সাধের বাড়ি বালাখানা
সঙ্গে কিছুই যাইবো না
রইবো না তোর কিছুই রইবো না।

মন রে, ভাই-বন্ধু আছে যত
আত্মীয়-এগানা বলবো কত
দারা পরিবার যত
সঙ্গে যাইতে চাইবো না,
রইবো না তোর কিছুই রইবো না।

মন রে ক্ষ্যান্ত দাও রে বাবুগিরি
কর গুরুর কেরানিগিরি
মিছা ভবের মায়াত পড়ি
পরকালে ঠাঁই অইবো না
রইবো না তোর কিছুই রইবো না।

খ. মেয়েলি গীত

দুলাভাই শ্যালিকাকে নিয়ে নৌকায় করে বেড়াতে যাবার কথা বললে শ্যালিকা দুলাভাইয়ের মন্দ স্বভাবের কথা এভাবে প্রকাশ করে ও তার সাথে যেতে অস্বীকৃতি জানায় :

আমি যামু না গো যামু না দুলাবাইয়ের নায়[১]
এট্টু[২] দারে[৩] পাইলে দুলাবাই মদুর কথা কয়।
আমি যামু না গো যামু না দুলাবাইয়ের নায়
তেঁতুলতলা যাইয়া দুলাবাই গোমটা উডাইতে[৪] কয়।
আমি যামু না গো যামু না দুলাবাইয়ের নায়
এট্টু দারে পাইলে দুলাবাই গলা দইর‌্যা রয়।
আমি যামু না গো যামু না দুলাবাইয়ের নায়
ছাতিমতলায় যাইয়া দুলাবাই পাছায় হাত দেয়।
আমি যামু না গো যামু না দুলাবাইয়ের নায়
বটতলায় যাইয়া দুলাবাই গালে চুমা দেয়।
আমি যামু না গো যামু না দুলাবাইয়ের নায়
বইয়া থাকলে দুলাবাই হুইয়া পরতে কয়।
আমি যামু না গো যামু না দুলাবাইয়ের নায়
মাচায় উটতে গ্যালে দুলাবাই পাছার দিকে চায়।
আমি যামু না গো যামু না দুলাবাইয়ের নায়

লজ্জা-শরম খাইয়া দুলাবাই বুকের দিকে চায়।
আমি যামু না গো যামু না দুলাবাইয়ের নায়
বাত[৫] খাইতে ডাইক্যা দুলাবাই আত[৬] দইর‌্যা রয়।
আমি যামু না গো যামু না দুলাবাইয়ের নায়
নৌকার বিতরে[৭] যাইয়া দুলাবাই কাপড় টাইন্যা দেয়।
আমি যামু না গো যামু না দুলাবাইয়ের নায়
নৌকার বিতরে বইয়া দুলাবাই মাজায় দইর‌্যা বয়।
আমি যামু না গো যামু না দুলাবাইয়ের নায়
আদর সোহাগ কইর‌্যা দুলাবাই কাইততরাইতে[৮] কয়।
আমি যামু না গো যামু না দুলাবাইয়ের নায়
কাইত অইয়া থাকলে দুলাইবাই চিততরাইতে[৯] কয়।
আমি যামু না গো যামু না দুলাবাইয়ের নায়
সুযুগ[১০] পাইলে দুলাবাইও স্বামী অইতো চায়।

আঞ্চলিক শব্দের প্রতিশব্দ : ১. নৌকায়, ২. একটু, ৩. কাছে, ৪. ওঠাতে, ৫. ভাত, ৬. হাত, ৭. ভিতরে, ৮. কাত হতে. ৯. চিত হতে, ও ১০. সুযোগ।

২

বয়সের নারী উরুমের[১] আড়ি[২]
আড়ি অইছে মাইড্যা[৩]
হায় রে উরুমের আড়ি[৪]
কে জানি খাইলো বাইঙ্গা গো
কে জানি খাইলো চুইষ্যা
হায় রে আমার উরুমের আড়ি গো।

বয়সের নারী উরুমের আড়ি
আড়ি কইর‌্যা হালাইছে[৫] খাইল্যা[৬]
হায় রে উরুমের আড়ি
কে জানি খাইছে ডাইল্যা[৭] গো
কে জানি খাইছে চাইট্যা[৮]।

বয়সের নারী উরুমের আড়ি
আড়ি অইছে বাঙ্গা
হায় রে উরুমের আড়ি
কে জানি করছে উদলা[৯] গো
কে জানি খাইছে নুন-মরিচ দিয়া।

আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. মুড়ি, ২. হাঁড়ি, ৩. মেটে, ৪. ভেঙে, ৫. ফেলেছে, ৬. শূন্য করে, ৭. ঢেলে, ৮. চেটে, ও ৯. খোলা মেলা।

www.pathagar.com

৩

হায় গো আমি
বাবার মানা ক্যান হুনলাম না
মায়ের মানা ক্যান হুনলাম না
বাঙ্গা কোয়ালের[১] জোড়া আমার
লাইগ্যাও হায় রে লাগলো না
কিয়ারে[২] আমি বাপ-মায়ের মানা হুনলাম না।

হায় গো আমি বাইয়ের[৩] মানা হুনলাম না
বোইনের[৪] মানা হুনলাম না,
বাঙ্গা কোয়ালের জোড়া আমার
লাইগ্যা ও হায় রে লাগলো না।

হায় গো আমি বাড়ির মাইনষের মানা হুনলাম না
গ্যারামের মাইনষের মানা হুনলাম না
নিচা কোয়াল দেহি আমার
উচ্চা[৫] আর রে হইল না,
হায় রে আমার ...।

আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. কপালের, ২. কি জন্য, ৩. ভাইয়ের, ৪. বোনের, ও ৫. উঁচু।

গ. জারি গান

মহররমের জারি

ফোরাত নদী ঘির্যা রাখছে এজিদ কাফের বেঈমান
পানি বিনা বাপজান মরলে কি ফল হবে রাইখ্যা জান,
অনাহারে রাখছে এজিদ অন্ধকার কয়েদ ঘরে
পাও ধরি মা বিনয় করি বিদায় দ্যাও আমারে।

কোথায় আছো দারুণ বিধি আছো বুঝি ঘুমাইয়া
নদীর বংশের এতো যে দুঃখ দেখতেছ বুঝি চাইয়া,
কি দোষ কইরাছি রে বিধি তোমার দরবারে
নগরসহ ঘির্যা রাখছে বেঈমান এজিদ কাফেরে।

আইজ অইলেও মরব কাইল অইলেও মরব, মরণে নাই ভয়
আমার জীবন দিয়া মাগো যদি বংশ রক্খা অয়,
কাইন্দো না কাইন্দো না মাগো দোয়া কর আমারে
তোমার দোয়ায় রণেতে জয় কে মোরে হারাতে পারে।
নগরসহ কাইন্দা রে ওঠে, 'দ্যাও পানি, দ্যাও পানি'

www.pathagar.com

জয়নাল কান্দে করজোড়ে কোথায় তুমি রব্বানী,
আহা রে দারুণ বিধি তোর কি এই মনে ছিল
চাচা মরলো জহর খাইয়া পানিতে মরলো বাপজান।

জিব্রাইল (আ.) বলে, আল্লাহতাআলা, তোমার মহিমা বোঝা ভার
তোমার খেলা তুমি খেল আমরা দ্যাহি অন্ধকার,
বংশের দুলাল একজন রে জয়নাল, তারে পাঠাও রণেতে
দেখিয়া এজিদরে কাফের তীর মারিবে বক্ষেতে।

নগরসহ কাইন্দা ওঠে 'পানি পানি' বলিয়া
জিবরাইল বলে, আল্লাহতাআলা কে বোঝে তোমার মহিমা,
ভাই জিয়াদা সব গিয়াছে বংশে আছে এক জয়নাল
দুইন্যাই ভরা কত রে পানি, নবীর বংশে পায় না জল।

পশু কান্দে, পাখি কান্দে, কান্দে আসমান জমিন
দুগ্ধের ছাওয়াল জয়নাল কান্দে, কোথায় রাব্বুল আলামীন,
পাথরকে ভাসাইতে পারো, সোনাকে ডুবাও তুমি
নবীর বংশ রক্ষা কর রে, আমার জীবন নেও তুমি।

দুলদুল সাজিল রে রণে জয়নাল হইল সোয়ার
কাফেরগণ দেইখ্যা তারে চোউখে দেখে অন্ধকার,
ঘোড়ার উরপে বইসা রে জয়নাল মারতে লাগলো তীর
দৌড়াদৌড়ি কইর‍্যা পলায় কাফের অইলো অস্থির। ...

এই জারিগানের অংশবিশেষ জারিগানের একজন বিশেষ শ্রোতা আবদুর রহমানের কাছ থেকে শুনে লেখা হয়েছে। তিনি বললেন, এতবার এই জারিগানটি তিনি শুনেছেন যে, পুরো জারিগানটাই তার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। বয়সের কারণে এখন অনেকটাই তিনি ভুলে গেছেন। এই জারিটি কে কে গেয়েছিল, তাও এখন আর তিনি নিশ্চিত করে মনে করতে পারছেন না। জারিগানের সেসব দলও এখন আর নেই।

দৌলতখান উপজেলা

নাবালকের জারি : মূলত বেশির-ভাগ অপ্রাপ্তবয়স্কের (নাবালক) অংশগ্রহণে এই জারিগান গাওয়া হতো বলে 'নাবালকের জারি' নামে এটি খ্যাতি লাভ করে। এই নাবালকদের দ্বারা বিভিন্ন বিষয়ে, যেমন—কারবালা কাহিনি, বাল্য বিবাহ ইত্যাদি বিষয়ে জারি গান পরিবেশন করানো হতো। এই দলের মূল নেতা ছিলেন প্রয়াত মুজিবুল হক খান ও ছিড্ডু। মুজিবুল হক সাহেব আমিনগিরিও (জমি-জমা মাপার কাজ) করতেন।

এছাড়া নলগোড়ার জোনাব আলী বয়াতি কিস্সা-গীত পরিবেশনে বেশ খ্যাতিলাভ করেছিলেন। তাঁর পরিবেশিত 'লালচান বাদশাহ্র' কাহিনি-কিস্সা পরিবেশনা এতদঞ্চলে বেশ জনপ্রিয় ছিল।

www.pathagar.com

উত্তর দিঘলদি'র মোসলেহ আহমদ মোল্লার জনপ্রিয় লোককাহিনি 'আপন দুলাল'-এর কাহিনিভিত্তিক একটি গানের দল ছিল।

বাংলাবাজারের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক প্রাণগোপাল দেবনাথ আজ নব্বই বছরের বৃদ্ধ। তিনি তাঁর যৌবনে সারিগানের সরকার হিসেবে সুনামের অধিকারী ছিলেন। বালিয়া, উত্তর দিঘলদির আবদুর রশিদ বয়াতি ও দক্ষিণ দিঘলদির মোফাজ্জল বয়াতির খ্যাতি ছিল সমগ্র জেলাব্যাপী।

তথ্যসূত্র

১. মোঃ আফসার উদ্দিন বাবুল, (সংগীতশিল্পী, পিতা : প্রয়াত হেলালাউদ্দিন, মাতা : প্রয়াত নূরজাহান বেগম, শিক্ষা : এম.এ, এলএলবি, পেশা : অধ্যাপনা, ঠিকানা : প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ, ফাতেমা খানম, কলেজ, বাংলাবাজার

২ মোমেনা খাতুন, স্বামী : প্রয়াত আবদুল মালেক, বয়স : ৭৩ বছর, পেশা : গৃহিণী, ঠিকানা : গ্রাম : বাপ্তা, ডাকঘর : ভোলা, উপজেলা : ভোলা সদর

৩. আবদুর রহমান, পিতা : প্রয়াত একেএম ইউসুফ, মাতা : প্রয়াত জোলেখা খাতুন, পেশা : ব্যবসা, বয়স : ৬৫ বছর, ঠিকানা : গ্রাম : চাঁচড়া বাপ্তা, ডাকঘর : বাপ্তা পাইলট, উপজেলা : সদর উপজেলা, ভোলা

৪. এমএ তাহের, পিতা : প্রয়াত আলহাজ গোলাম রহমান, মাতা : প্রয়াত সাহেরা খাতুন, শিক্ষা : বি.এ., বয়স : ৮০ বছর, পেশা : সাংবাদিকতা, ঠিকানা : গ্রাম : দক্ষিণ সৈয়দপুর, ডাকঘর : সাবেক হাজীপুর মাদ্রাসা, উপজেলা : দৌলতখান

www.pathagar.com

লোকবাদ্যযন্ত্র

ভোলা সদর উপজেলা

১. কাঁসি বা কাঁসর
২. খঞ্জরি বা খঞ্জনি
৩. খোল
৪. ঢাক
৫. ঢোল
৬. দোতারা
৭. বাঁশি
৮. মন্দিরা
৯. কত্তাল বা করতাল
১০. সারিন্দা
১১. শঙ্খ বা শাঁখ
১২. ঢোলক
১৩. ঘুঙুর
১৪. চটি বা প্রেমজুড়ি
১৫. গোপীযন্ত্র
১৬. খমক
১৭. সানাই
১৮. বেহালা

দৌলতখান উপজেলা

[ভোলা সদর উপজেলার অনুরূপ]

১. দোতারা
২. ঢাক
৩. ঢোল
৪. বাঁশি
৫. মন্দিরা বা জুড়ি
৬. শঙ্খ বা শাঁখ
৭. ঘুঙুর
৮. চটি বা প্রেমজুড়ি
৯. খমক
১০. খোল
১১. খঞ্জরি বা খঞ্জনি

www.pathagar.com

১২. সারিন্দা
১৩. সানাই

তজুমুদ্দিন উপজেলা

১. দোতারা
২. বাঁশি
৩. ঢাক
৪. ঢোল
৫. মন্দিরা বা জুড়ি
৬. সারিন্দা
৭. শঙ্খ বা শাঁখা
৮. ঘুঙুর
৯. চটি বা প্রেমজুড়ি
১০. খোল
১১. করতাল
১২. কাঁসি
১৩. খমক

বোরহানউদ্দিন উপজেলা

[ভোলা সদর উপজেলার অনুরূপ]

১. দোতারা
২. কাঁসি বা কাঁসর
৩. খঞ্জনি
৪. খোল
৫. ঢাক
৬. ঢোল
৭. বাঁশি
৮. ঘুঙুর
৯. করতাল
১০. সারিন্দা
১১. শঙ্খ
১২. ঢোলক
১৩. মন্দিরা

লালমোহন উপজেলা

[ভোলা সদর উপজেলার অনুরূপ]

১. দোতারা
২. কাঁসি বা কাঁসর
৩. খঞ্জনি
৪. খোল

www.pathagar.com

৫. ঢাক
৭. ঢোল
৭. বাঁশি
৮. মন্দিরা
৯. করতাল
১০. সারিন্দা
১১. শঙ্খ
১২. ঢোলক

চরফ্যাশন উপজেলা

[ভোলা সদর উপজেলার অনুরূপ]

১. দোতারা
২. কাঁসি বা কাঁসর
৩. খঞ্জনি
৪. খোল
৫. করতাল
৬. ঢাক
৭. ঢোল
৮. বাঁশি
৯. মন্দিরা
১০. সারিন্দা
১১. শঙ্খ
১২. ঢোলক
১৩. একতারা

মনপুরা উপজেলা

[ভোলা সদর উপজেলার অনুরূপ]

১. দোতারা
২. কাঁসি বা কাঁসর
৩. খঞ্জনি
৪. খোল
৫. করতাল
৬. ঢাক
৭. ঢোল
৮. বাঁশি
৯. মন্দিরা
১০. সারিন্দা
১১. শঙ্খ
১২. ঢোলক

www.pathagar.com

তথ্যসূত্র

১. মোহাম্মদ আবদুল্লাহ, পিতা : মোহাম্মদ ইছহাক, মাতা : প্রয়াত সুফিয়া বেগম, শিক্ষা : ফাজিল, বয়স : ৪০ বছর, পেশা : ব্যবসা, ঠিকানা : ৭ নং ওয়ার্ড, দৌলতখান পৌরসভা, ডাকঘর : দৌলতখান, উপজেলা : দৌলতখান

২. মনজুর আহমেদ (সংগীতশিল্পী), পিতা : প্রয়াত এমদাদুল হক, মাতা : আয়েশা সিদ্দিকা, শিক্ষা : বি.এ., বয়স : ৪৫ বছর, পেশা : চাকরি, ঠিকানা : গাজীপুর রোড, ভোলা, ডাকঘর : ভোলা, উপজেলা : ভোলা সদর

www.pathagar.com

লোকউৎসব

১. ঈদুল ফেতর ও ঈদুল আজহা

ভোলা সদর উপজেলার মুসলমানদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব ঈদুল ফেতর ও ঈদুল আজহা বা কোরবানির ঈদ। পবিত্র রমজান মাসে কখনো ত্রিশটি কখনো বা ঊনত্রিশটি রোজা রাখার পর আরবি শাওয়াল মাসের ১ তারিখে পালন করা হয় পবিত্র ঈদুল ফেতর। ভোলার ধর্মভীরু মুসলমান সমাজ অত্যন্ত আনন্দ, উদ্দীপনা ও ধর্মীয় ভাব-গাম্ভীর্যের সাথে এই ঈদের আনন্দ উপভোগ করে।

ঈদের বেশ ক'দিন আগেই শুরু হয়ে যায় ঈদের প্রস্তুতি। এই প্রস্তুতি 'রসি ঘর' বা রান্নাঘর থেকে মুদি দোকান, কাপড়ের দোকান, জুতার দোকান, কসমেটিক্স, গহনা, ফার্নিচার, কাঁচাবাজার পর্যন্ত ব্যাপ্তি লাভ করে। একসময় পরিবারের গৃহিণীরা ঈদের কয়েকদিন আগেই মেশিনে সেমাই বানিয়ে রোদে শুকিয়ে রেখে দিতেন। তখন কোনো কোনো সচ্ছল পরিবারে পিতলের তৈরি সেমাই বানানোর মেশিন ছিল। এতে দু'তিন ধরনের সরু ও মোটা ছিদ্রযুক্ত পাত থাকতো। এই প্লেট দিয়ে নিজেদের পছন্দমাফিক চিকন অথবা মোটা সেমাই তৈরি করে নেওয়া যেতো। এক বাড়িতে একটা মেশিন থাকলে দশ বাড়ির প্রয়োজন মিটে যেত। মাটির ঘরের মেঝে, 'পিড়া' নতুন মাটি দিয়ে লেপ দিয়ে সম্পূর্ণ ঘরটাকে ঝকঝকে তকতকে করে তোলা হতো। এই কিছুদিন আগে পর্যন্ত আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও শুভার্থীদের আগাম ঈদ শুভেচ্ছা জানানোর জন্য ঈদকার্ড কেনার ধুম পড়ে যেতো। বইয়ের দোকান, স্টেশনারি দোকানসহ বিভিন্ন দোকান বিচিত্র ধরনের ঈদকার্ডে ছেয়ে যেতো। আজকাল যেন মানুষের অতো সময় ও ধৈর্য নেই। তাই কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতী থেকে শুরু করে বড়রাও বেছে নিয়েছেন ঈদ শুভেচ্ছা পাঠানোর দ্রুত ও সংক্ষিপ্ততম পদ্ধতি—সেল ফোনে এসএমএস।

বড় উত্তেজনাময় ও চিত্তচাঞ্চল্যে ভরপুর একটি সময় ঈদের চাঁদ ওঠার দিন। সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ লক্ষ চোখের দৃষ্টি নিপতিত হয় আকাশে, ঠিক যেখানটায় নতুন চাঁদ ওঠে, সে-প্রান্তে। গ্রামাঞ্চলে বাড়ির উঠানে মহিলা ও শিশু, আর দরজায় পুরুষেরা সব সমবেত হয়ে আকাশের ঐ কোণটিতে খুঁজতে থাকে তাদের প্রিয় ঈদের ক্ষীণ চাঁদটিকে। দল বেঁধে ঈদের চাঁদ দেখার এই আনন্দ অবর্ণনীয়। অনেক সময় মেঘ বা আবহাওয়ার কারণে চাঁদ দৃষ্টিগোচর হয় না। তখন সবাই কান পেতে থাকে রেডিও'র দিকে, দৃষ্টি থাকে টিভির পর্দায়। আর যেই বেজে ওঠে 'ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে'... তখন আর কারো বুঝতে বিলম্ব হয় না যে কাল ঈদ। বহু আকাঙ্ক্ষিত, প্রার্থিত খুশির ঈদ। সঙ্গে সঙ্গে আরো ব্যস্ততা বেড়ে যায় সবার। ছুটোছুটি শুরু হয়ে যায়। শেষ মুহূর্তের কেনাকাটা করতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে মানুষ।

www.pathagar.com

ঈদের দিন পরিবারের পুরুষ সদস্য সবাই খুব ভোরে উঠেই গায়ে সাবান মেখে গোসল সেরে নিয়ে নতুন জামা-কাপড় বা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পুরনো পোশাক পরে ঈদগাহে গিয়ে নামাজ আদায়ের প্রস্তুতি নিতে থাকে। অন্যদিকে, মহিলারা সামর্থ্য অনুযায়ী সেমাই, ফিরনি, জর্দা, চটপটি ইত্যাদি হালকা নাশতা এবং পোলাও-কোর্মা, রেজালা রান্নার কাজে অতিশয় ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এ অঞ্চলের অধিবাসীদের অনেকেই নারিকেলের দুধের পোলাও ভীষণ পছন্দ করেন। এজন্য ঈদের দিনের দুপুরের কিংবা রাতের খাদ্য তালিকায় তারা এটি দেখতে খুবই উদগ্রীব হয়ে থাকেন।

ঈদের দিনে তো নারী-পুরুষ সবাই নিজেকে একটু আলাদাভাবে সাজিয়ে নিতে ভালবাসেন। এক্ষেত্রে মহিলাদের প্রস্তুতি একটু বেশিই থাকে সম্ভবত। কিশোরী, তরুণী, যুবতী, এমনকি বয়স্ক মহিলারাও আগের রাতেই হাত-পায়ের নখ, হাতের তালু, এমনকি কনুইয়ের নিচ পর্যন্ত মেহেদি দিয়ে খুব সুনিপুণভাবে বিচিত্র নক্‌শায় চিত্রিত করে নিজেকে অপরূপ সাজে সাজিয়ে তোলে। সাধারণত বাড়ির আঙিনায় লাগানো মেহেদি গাছের পাতা তুলে নিয়ে পাটায় বেঁটে নেওয়া হয়। আজকাল এই বাঁটার কষ্ট অনেকটা কমে গেছে। এখন বাঁটা মেহেদির টিউবই কিনতে পাওয়া যায়.বাজারে। যারা মেহেদি পাতা বেঁটে নিয়ে মেহেদি লাগিয়ে থাকেন, তারা এর সাথে একটু খয়ের ও কচুর ডাটা বাঁটা মিশিয়ে নেন। এতে নাকি মেহেদির রং অধিকতর উজ্জ্বল হয়।

এই কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত সমগ্র ভোলা জেলার দৌলতখান ঈদগাহে ঈদের সর্ববৃহৎ জামাত অনুষ্ঠিত হতো। এই ঈদগাহ সম্ভবত ভোলার প্রাচীনতম ঈদগাহ, যেখানে ঈদুল ফেতরের সময় জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে অসংখ্য মুসল্লি নামাজ আদায় করতে সমবেত হতেন। এই ঈদের জামাতে এত বেশি সংখ্যক মুসল্লির অংশগ্রহণের প্রধান কারণ হচ্ছে, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ভোলার সব শ্রেণির মানুষের পরম শ্রদ্ধাভাজন জৌনপুরী পীরের কেউ না কেউ এই জামাতে ইমামতি করতেন। জৌনপুরের বিখ্যাত আধ্যাত্মিক সাধক ও ইসলামি চিন্তাবিদ মাওলানা কেরামত আলী জৌনপুরী (র.)-র বড় ছেলে মাওলানা হাফেজ আহমদ (র.) সাহেবের আমলেই দৌলতখানে এই ঈদগাহ প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন থেকেই প্রতিটি ঈদুল ফেতরে এই ঈদগাহ ময়দানে তিনি বা তার উত্তরসূরি কেউ ইমামতি করতেন। ভোলার লক্ষ লক্ষ মুসলমান এই দুটি ঈদে তাঁদের পেছনে নামাজ আদায় করার জন্য ব্যাকুলচিত্তে অপেক্ষা করতো। এই রীতি দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত ছিল। কিন্তু দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া ও ঝড়-বন্যার কারণে প্রচলিত এই রীতি এখন বহাল না থাকলেও জৌনপুরের পীর প্রতিবছরই ভোলায় আগমন করে থাকেন। ভোলার ঈদগাহ ময়দানসহ বিভিন্ন স্থানের বড় বড় মসজিদগুলোতে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

ঈদের আগে ঈদ উৎসবের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তুতির উল্লেখ প্রয়োজন। এটি হলো ঈদের নতুন পোশাক কেনা কিংবা পুরনো পোশাক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে তা পরে নিজেদের সাজিয়ে তোলা। নতুন পোশাক কেনা ও পরার ক্ষেত্রে শিশু-কিশোরদের মধ্যে একটি চমকপ্রদ মানসিকতা লক্ষ্য করা যায়। ঈদের আগে পোশাক কেনা হলেও তারা

www.pathagar.com

তাদের পোশাকগুলো লুকিয়ে রাখে, বন্ধু-বান্ধবকে দেখতে কিংবা জানতে দেয় না। একেবারে ঈদের দিনে পরে সবাইকে চমকে দেবে বা সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে—এমন একটি মানসিককতা থেকেই বোধহয় শিশু-কিশোররা এটা করে থাকে। তরুণী ও ততোধিক বয়সের মেয়েরা সর্বাধুনিক ডিজাইনের কামিজের সাথে সালোয়ার ও ওড়না, মহিলারা শাড়ি এবং ছেলেরা সার্ট-প্যান্ট ও পাঞ্জাবি পড়ে থাকে। তবে যে-কোনো বয়সের পুরুষের ঈদের জামাতে যাওয়ার জন্য পায়জামা-পাঞ্জাবি চাই-ই। পাঞ্জাবি না পরলে ঈদের মেজাজটা পুরোপুরি যেন অনুভূত হয় না।

পবিত্র রমজান শুরু হওয়ার কয়েকদিনের মধ্যেই উপজেলা শহরসহ প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের হাট-বাজারের কাপড়ের দোকান, জুতার দোকান, কসমেটিক্স, চুড়ি, ইমিটেশন, জুয়েলারি প্রভৃতি দোকানগুলিতেও নতুন সামগ্রীর সমাবেশ ঘটতে থাকে। দর্জির দোকানগুলির সেলাই মেশিনগুলো অবিরাম চলতে থাকে চাঁদ রাত পর্যন্ত। দর্জিদের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ছাড়াও এ সময়ে অনেক গৃহবধূ—যারা সেলাইয়ের কাজ করে কিছুটা বাড়তি উপার্জন করে সংসারের সচ্ছলতা বাড়াতে সাহায্য করে থাকেন, তাদের কাজও বেড়ে যায়। পাড়া-প্রতিবেশীরাও একটু কম মজুরিতেই এ সুবিধা পেয়ে যান।

অনেক ক্রেতা রমজান শুরুর পরপরই তাদের কেনাকাটা করেন, কারণ, ঈদ যতই ঘনিয়ে আসবে, দাম ততই বৃদ্ধি পাবে। বিত্তবান ও সম্পদশালীরা উপজেলা ছাড়িয়ে জেলা সদরে গিয়ে কিংবা জেলা ছাড়িয়ে রাজধানী ঢাকায়, এমনকি দেশের বাইরে গিয়েও কেনাকাটা করে থাকেন।

যাদের ঈদের নতুন কাপড়-চোপড় ও অন্যান্য জিনিস কেনার সামর্থ্য নেই, তারা ঈদের কয়েকদিন আগেই পুরনো পোশাকটাকেই ভালো করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে ইস্ত্রি করে রেখে দেন। যারা লন্ড্রিতে ইস্ত্রি করতে দিতে পারেন না বা বাসায়ও ইস্ত্রি করার ব্যবস্থা নেই, তারা কাপড়ে হাল্কা 'ভাতের মাড়' দিয়ে ভাঁজ করে দু'চারদিন বালিশের নীচে রেখে দেন। যাদের নতুন জুতো কেনার সামর্থ্য থাকে না, তারা পুরনো জুতো বা স্যান্ডেলটাকেই রং-পালিশ করে ঝকঝকে তকতকে করে রেখে দেন।

ঈদের প্রাক্কালে ক্ষৌরকাররাও ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। গ্রামের বাড়ি বাড়ি গিয়ে এক সময় যেসব ক্ষৌরকার বা নাপিত শিশু, কিশোর ও বৃদ্ধদের ক্ষৌরকর্ম সেরে আসতেন, এখন তাদের সেভাবে কম দেখা যায়। রাস্তার মোড়ে বা রাস্তার বিশেষ স্থানে কোনো ছায়া সুশীতল বৃক্ষের নীচে তার সাথে আয়না বেঁধে একখানা চেয়ারে কিংবা টুলে বসিয়ে ক্ষৌরকাররা তাদের পেশাগত দায়িত্ব পালন করে থাকেন। জুতা সেলাই ও রং-কালি করার দোকানেও লেগে যায় লম্বা লাইন।

বাজারে-মহল্লায় মুদি দোকানগুলোর ব্যস্ততা থাকে ঈদের দিনেও। সেমাই, দুধ, পোলাওর চাল, ঘি, তেল, গরম মশলা ইত্যাদি যার যার সামর্থ্য অনুযায়ী কেনার জন্য লাইন পড়ে যায়। একটি তো দিন। নিজেদের খাওয়া, মেহমানদারি করা। বাজারে আতর-সুরমা ও টুপির দোকানগুলোতেও ভিড় লেগে যায়। বছরের এই দুটি ঈদের

www.pathagar.com

দিনে একটু আতর লাগিয়ে, মাথায় টুপি পরে ঈদগাহে বা মসজিদে ঈদের নামাজ আদায় করতে সবাই ইচ্ছে পোষণ করেন। অনেক বয়স্ক পুরুষ চোখে সুরমাও লাগিয়ে থাকেন।

নামাজের পর শুরু হয় কোলাকুলির পালা। শিশু-কিশোর-তরুণ-যুবক-বৃদ্ধ ঈদের মাঠে অথবা মসজিদে একে অপরের সাথে আলিঙ্গনাবদ্ধ হন আর মুখে উচ্চারণ করেন 'ঈদ মোবারক'।

নামাজ শেষে নিকটবর্তী কবরস্থানে আত্মীয়-স্বজনদের কবর জেয়ারত করে কেউ হেঁটে কেউ বা রিক্সায় নিজ নিজ বাসায় ফিরে আসেন। হেঁটে আসলে সওয়াব বেশি পাওয়া যায়, এজন্য বয়স্ক মুরুব্বিদের বেশির-ভাগই হেঁটে হেঁটে তাদের বাড়িতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ছোটদেরকেও এ ব্যাপারে উৎসাহিত করেন। তারপর তো শিশু-কিশোর ও তরুণ-তরুণীদের ঈদের অনাবিল আনন্দে গা ভাসিয়ে দেওয়া। শিশু-কিশোরদের জন্যই যেন ঈদ। ওরা বয়স্কদের কদমবুচি করে, 'ঈদি' বা ঈদের বখশিশ নিয়ে পকেটে পুরে। এতে ওদের ভীষণ আনন্দ। কিছুক্ষণ পর পরই গুণে গুণে দেখে, কত টাকা হলো। এ-বাড়ি ও-বাড়ি, নানা প্রতিবেশী ও আত্মীয়ের বাসা, বন্ধুর বাসা পর্যায়ক্রমে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়ে ঈদের দিনটি কাটিয়ে দেয়।

বিকেলে তরুণ-যুবকরা অনেক সময় প্রীতি ফুটবল ম্যাচ কিংবা হাডুডু খেলারও আয়োজন করতো, আজকাল খুবই কম হয়। ঈদের দিনে বিনোদনের একটি প্রধান মাধ্যম হচ্ছে বন্ধু-বান্ধব, দলবল নিয়ে সিনেমা হলে গিয়ে বড় পর্দায় সিনেমা দেখা। এমনও দেখা গেছে, ঈদের দিনেই অনেকের জীবনে প্রথমবারের মতো সিনেমা হলে গিয়ে সিনেমা দেখার সূচনা হয়েছে। যারা সিনেমা দেখে না বা অভ্যাস নেই বা সুযোগ নেই তারা টেলিভিশনের সামনে বসে ঈদ উপলক্ষে নির্মিত বিভিন্ন বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান দেখে থাকেন। এভাবেই ঈদের পুরোটা দিন হৈ চৈ, আনন্দ উল্লাস, খাওয়া-দাওয়া আর বেড়ানোর মধ্য দিয়ে দিনটি অতিবাহিত করে এখানকার মুসলিম সমাজ।

উল্লেখ করা প্রয়োজন, হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেক শিশু-কিশোর, তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতীও এই দিনে তাদের মুসলিম বন্ধুদের বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করে থাকে। আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ প্রয়োজন। ভোলার ১৪/১৫টি গ্রামের মুসলমানেরা সৌদি আরবের সাথে সঙ্গতি রেখে একদিন আগেই অর্থাৎ 'আগাম ঈদ' করে থাকেন।

ঈদুল আজহা বা কোরবানি ঈদের আয়োজন, প্রস্তুতি ও দিনটি উদ্‌যাপনের ধরনটি একটু আলাদা। এ দিনটি মনে হয় একটু বেশি দ্রুতগতিসম্পন্ন অর্থাৎ দেখতে না দেখতেই দিনটি ভীষণ কর্মব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে অতিক্রান্ত হয়।

এ ঈদেরও প্রস্তুতি চলতে থাকে বেশ কয়েকদিন আগে থেকেই। বিশেষকরে গরু-ছাগল কেনার প্রস্তুতি চলতে থাকে এ সময়টায়। যাদের গরু-ছাগল রাখার জায়গা থাকে, লোকবল থাকে, তারা অন্তত সপ্তাহ খানেক আগেই এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সেরে রাখেন। তারপর আছে দা-বটি-ছুরি শান দেওয়া, ইত্যাদি। রোজার ঈদে যেমন মিষ্টান্ন

www.pathagar.com

কিছু মুখে দিয়ে ঈদের জামাতে যেতে হয়, এ ঈদে তা নয়। এ-ঈদে নামাজ পড়া ও কোরবানি দিয়ে তারপর কিছু খাওয়া যায়।

কোরবানির ঈদে কর্মব্যস্ততা এজন্য বেশি যে, যারা কোরবানি দেওয়ার সামর্থ্য রাখেন তাদের কোরবানি দিতে হয়। তারপর থাকে মাংস কাটাকুটি, চামড়া বিক্রি করা, বিভিন্ন বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীর বাড়ি কোরবানির মাংস পৌঁছে দেওয়া, দরিদ্রদের মধ্যে মাংস বিতরণ ইত্যাদি। এ ঈদে রোজার ঈদ, অর্থাৎ ঈদুল ফেতরের মতো আনন্দ-উল্লাস করে বেড়াবার ফুরসত পাওয়া যায় একটু কম। কোরবানির মাংস কিছুটা ঘরে এলেই গৃহিণীদের তৎপরতা যায় বেড়ে। শ্বশুর-স্বামী-দেবর আর সন্তানদের সামনে একটু কষানো মাংস আর চালের গুঁড়ির রুটি পরিবেশন করার জন্য তারা অস্থির হয়ে ওঠেন।

মাংস কাটা-কুটির পর গরু বা ছাগলের মাথার কঙ্কালটি ঘর বা বাড়ির সামনে কোনো একটি গাছের সাথে লটকিয়ে রাখা হয় অনেক বাড়িতে। মূলত জ্বীন-পরী, ভূত-প্রেত ইত্যাদি অশুভ শক্তির হাত থেকে নিজেদের নিরাপদ রাখার জন্যই এ ব্যবস্থা।

দুই ঈদেরই একটি বাড়তি আনন্দের বিষয় হচ্ছে, পরিবারের সদস্যদের নিয়ে রাজধানী ঢাকাসহ অন্যান্য শহরে কর্মরত লোকজন গ্রামের বাড়িতে চলে আসেন। মা-বাবা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন সবার সাথে ঈদের ছুটির বা বন্ধের কয়েকটি দিন কাটাতে সমবেত হন। অন্তত দু'একটি দিনের জন্য হলেও সবারই মুখে ফুটে ওঠে এক অনাবিল আনন্দের হাসি, দুঃখ-কষ্টের বেদনাবোধ কয়েকটি দিনের জন্য হলেও বিদায় নেয়।

২. শবেবরাত

মুসলমানদের জীবনে 'লাইলাতুল বারায়াত' বা শবেবরাতের তাৎপর্য ও গুরুত্ব অপরিসীম। পরম করুণাময় আল্লাহ ইহকাল ও পরকালের সবকিছুর একমাত্র মালিক ও স্রষ্টা—এটা মুসলমানরা দৃঢ়চিত্তে বিশ্বাস করেন। তাঁর ভাণ্ডার এতোই অফুরন্ত যে, তিনি প্রিয় বান্দাদের চাইলে তো দেন-ই, না চাইলেও দেন। তবে আল্লাহ্‌তাআলার কাছে চাওয়া বা প্রার্থনা করা ঈমানের অঙ্গ বলে বিবেচিত। এমনই একটি রাত হচ্ছে শবেবরাত। আরবি শাবান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত রাতকেই শবেবরাতের রাত বলা হয়।

শবেবরাতের রাত হচ্ছে আল্লাহ্‌তাআলার কাছে প্রার্থনা জানাবার রাত, তাঁকে একাগ্রচিত্তে স্মরণ করার, তাঁর সান্নিধ্য কামনা করার পরম লগ্ন। পরবর্তী একটি বছরের জন্য বিশ্বের প্রতিটি প্রাণীর ভাগ্য যেমন নির্ধারিত হয়, তেমনি এই পবিত্র রাতে মোমেনদের ওপর আল্লাহ্ অশেষ অনুকম্পাও বর্ষিত হয়। আল্লাহ্ এ রাতে প্রিয় বান্দাদের প্রার্থনা এবং তওবা কবুল করেন, তাদের গোনাহ্ ক্ষমা করে দেন এবং রেজেক বাড়িয়ে দেন। মানুষের জন্ম-মৃত্যু, রেজেক-দৌলত, মঙ্গল-অমঙ্গল, ভালো-মন্দ সবকিছুই এ রাতে নির্ধারিত হয়ে থাকে। এ জন্যই মুসলমানরা এ-রাতে নির্ভেজাল ও অকৃত্রিম হৃদয়ে মহান স্রষ্টার এবাদত করেন, নফল নামাজ পড়েন, পবিত্র কোরআন

www.pathagar.com

তেলাওয়াত করেন, জেকের-আজকার করেন এবং সারারাত নির্ঘুম কাটিয়ে দেন। ভোলার বড় মসজিদ খলিফা পট্টি মসজিদ কাবিল মসজিদ, কোর্ট মসজিদসহ প্রতিটি মসজিদে সারারাত চলে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের এবাদত ও জেকের-আজকার। এটি শবেবরাতের ধর্মীয় দিক। এর একটি সামাজিক দিকও রয়েছে। অন্যান্য এলাকার মতো এ এলাকার মুসলমানদের ঘরে ঘরেও এইদিন আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। দু'তিনদিন আগে থেকেই শুরু হয় এ দিনটি পালনের প্রস্তুতি। এ দিনটি যেহেতু রেজেক ও ধন-দৌলতের সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত, সেহেতু দরিদ্ররাও চেষ্টা করে রাতে ভালো-মন্দ একটু কিছু রান্না করার। নিজ নিজ সাধ্যানুযায়ী নানা রকম সুস্বাদু খাবার তৈরি করে প্রতিটি পরিবার। তাদের বিশ্বাস, এদিনে একটু ভালো খেতে পারলে হয়তো পরবর্তী একটি বছরই আল্লাহ্ তাদের ওপর সুপ্রসন্ন থাকবেন। পূর্ববর্তী একটি বছর যাদের কেটেছে কষ্টে-সৃষ্টে, অর্ধাহারে, অভাব-অনটনে, সেই বিষণ্ন ঘরটিতেও এই কল্যাণের রজনীতে একটু সময়ের জন্য হলেও আশার আলো জ্বলে ওঠে।

এ সময়ে বাজারে খাদ্যদ্রব্যের দোকানগুলোতে একটি বাড়তি চাপ পড়ে। বিশেষকরে গরু-খাসির মাংস ও মুরগির দোকান এবং পোলাওর চাল, ঘি, তেল, মশলাদির দোকানেই ক্রেতার সমাগম ঘটে থাকে বেশি। ফলে এসব দ্রব্যের দামও বৃদ্ধি পায়। দু'একটি জায়গায় অ-পেশাদার কসাইরাও গরু জবাই করে রাস্তার পাশে 'ভাগা' দিয়ে বিক্রি করে থাকেন।

এই দিনের একটি বিশেষ খাবার বুট-ডালের হালুয়া, সুজির হালুয়া ইত্যাদি। ঘরে ঘরে প্রস্তুত করা হয় এসব খাবার। ট্রেতে করে ঢেকে পাড়া-প্রতিবেশীর ঘরে এ খাবার পৌঁছে দেন অনেকে। একসময় সমাজের সবার সঙ্গেই ভাগ করে খাওয়া হতো। এসব রীতি আজকাল অনেকটাই কমে গেছে। গরিব-দুঃখীদের মধ্যে বিতরণ হয় খাবার ও নগদ অর্থ। এ এক অনাবিল আনন্দ, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির রাত।

৩. দুর্গোৎসব

সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় উৎসব এই দুর্গাপূজা। দেবী দুর্গার পিতৃগৃহে আগমন উপলক্ষে এ উৎসব মহাসমারোহে উদ্‌যাপন করা হয়। এ পূজাকে এখানেও বারোয়ারি বা সর্বজনীন দুর্গা পূজা নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। সব ধর্ম ও বর্ণের মানুষই এতে অংশগ্রহণ করতে পারে। জাঁকজমক ও অনুষ্ঠানের চেয়ে সব ধর্ম ও বর্ণের মানুষের সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের বন্ধনই এই পূজাকে সর্বজনীনতা দিয়ে থাকে।

সনাতন ধর্মাবলম্বীরা দুর্গা পূজা শেষ হওয়ার পর থেকেই পুরো একটি বছর অপেক্ষা করেন এই দিনটির জন্য। পুজোর বেশ কিছুদিন আগে থেকেই ব্যক্তি ও সমষ্টি পর্যায়ে চলতে থাকে পূজা উদ্‌যাপনের প্রস্তুতি। ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে পূজামণ্ডপ তৈরি ও প্রতিমা নির্মাণ কাজের আয়োজন ও প্রস্তুতি চলতে থাকে। উপজেলার বিভিন্ন স্থানে তো বটেই, একমাত্র ভোলা পৌরসভা এলাকায়ই প্রায় ২২/২৩টি পূজামণ্ডপ তৈরি করা হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

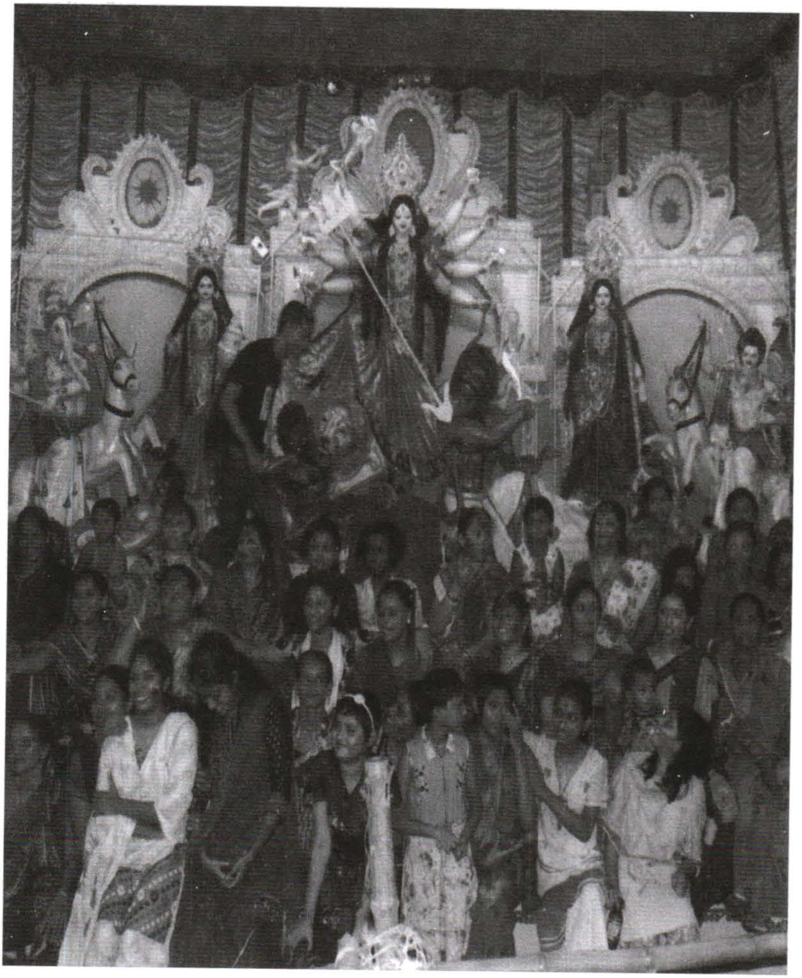

মিহিরলাল সাহার মাঠের পূজামণ্ডপে দেবী দুর্গার সামনে ভক্তবৃন্দ।

এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে লক্ষ্মীগোবিন্দ জিউর ঠাকুর মন্দির, মদন মোহন জিউর ঠাকুর মন্দির, কালীবাড়ি রোডে কালীমন্দির, বৈদ্যবাড়ি, ভদ্রবাড়ি, বাপ্তা কালীমন্দির, দেবেন্দ্র কাহালী লেন, বীরেন রায়ের বাসা, মিহিরলাল সাহার বাড়ি ও

www.pathagar.com

শতদল বিকাশ ক্লাব মাঠ পূজামণ্ডপ। দুর্গাপূজার সবচেয়ে বড় আয়োজন করা হয় মিহিরলাল সাহার বাড়ি ও শতদল বিকাশ ক্লাব মাঠে।

এ দুটি পূজামণ্ডপই এ এলাকার মধ্যে সবচেয়ে বড় পূজামণ্ডপ বলে বিবেচিত। আলোকসজ্জায় বৈচিত্র্য ও চমৎকারিত্ব সৃষ্টির জন্য নওগাঁ থেকে আনা হয় এ বিষয়ে বিশেষভাবে অভিজ্ঞ কর্মীদল।

প্রতিমা নির্মাণশিল্পীরাও এ সময়ে সবচেয়ে ব্যস্ততম সময় অতিবাহিত করেন। ভোলা শহরে তিন-চারজন প্রতিমা-নির্মাণশিল্পী রয়েছেন। এরা আগে থেকেই চুক্তিবদ্ধ হয়ে যান। ভোলার বাইরে অন্য জেলা থেকেও চড়া সম্মানী দিয়ে এসব শিল্পীদের আনিয়ে কাজ করানো হয়। একেক জন শিল্পী এজন্য সম্মানী নিয়ে থাকেন ১৫/২০ হাজার টাকা থেকে ৮০/৯০ হাজার টাকা পর্যন্ত। দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে তারা এই নির্মাণকাজ সম্পন্ন করেন। কাদা-মাটির কাজ শেষ হতেই সময় লেগে যায় ৩/৪ দিন। এরপর আছে রং ও তুলির কাজ। নিখুঁত মানানসই বর্ণিল প্রলেপ ও টানা টানা চোখের রেখা অঙ্কনের মধ্য দিয়ে অনিন্দ্যসুন্দর হয়ে ওঠেন দেবী দুর্গা, ষষ্ঠীর দিনে পান পূর্ণাঙ্গ রূপ। শেষ হয় প্রতিমা নির্মাণশিল্পীর অনবদ্য শিল্পসৃষ্টির প্রয়াস। দেবীকে মর্ত্যে নেমে আসার আমন্ত্রণ জানানো হয়। শঙ্খ, উলুধ্বনি আর মঙ্গলধ্বনিতে দেবীকে বরণ করে নেয় সনাতন ধর্মানুসারীরা।

উৎসব মানেই একটা সাজ-সাজ অবস্থা। চারদিকে ঢাক-ঢোলের বাদ্য-বাজনা, শঙ্খধ্বনি, ধূপের ঘ্রাণ আর বিভিন্ন মন্ত্রোচ্চারণের শব্দে মুখরিত পূজার আয়োজনে নিজেকে না সাজালে কি চলে? তাই আরেকদিকে পূজায় অংশগ্রহণের জন্য ব্যক্তিগত পর্যায়েও উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে চলতে থাকে ব্যাপক প্রস্তুতি। সামর্থ্য অনুযায়ী ঘরে ঘরে শিশু-কিশোর, তরুণ-তরুণী এবং বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাদের জন্য কেনা হয় নতুন পোশাক। পুজোর পাঁচদিনের প্রতিদিন নতুন পোশাক পরে নিজেদের নতুনভাবে সাজিয়ে তোলা চাই। এদিনেও যে সালোয়ার-কামিজ, জিন্স পরা যাবে না বা পরা হয় না তা নয়। তবে সেটা ঠিক পূজোর পোশাক হয় না। আগেই ঠিক করে রাখা হয় কোনোদিন কোনো পোশাকটি পরে বেরুবে। বাঙালি মেয়েরা অঞ্জলির দিনে শাড়ি পড়তেই বেশি পছন্দ করে। ছেলেরা ধুতি-পাঞ্জাবি বেশি পছন্দ করেন। তবে আগের মতো এখন আর তারা শুধু সাদা ধুতি পছন্দ করে না, ভালবাসে বিভিন্ন রঙের ধুতি পরতে। এ সময়ে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনকেও উপঢৌকন হিসেবে দেওয়া হয় নতুন পোশাক। দর্জির দোকান, তৈরি পোশাকের দোকানসহ শাড়ি, জুতা, প্রসাধনী এবং অলংকারের দোকানসমূহেও অধিক রাত অবধি চলে কেনাকাটা।

পূজামণ্ডপগুলিতে প্রতিমা-নির্মাণ শেষে ষষ্ঠীতে শুরু হয় প্রার্থনা; সপ্তম, অষ্টম ও নবম দিনে দেওয়া হয় পূজা, দশমীর দিনে হয় বিসর্জন। সনাতন ধর্মানুসারীরা পূজা উপলক্ষে এক মণ্ডপ থেকে আরেক মণ্ডপে গিয়ে দেবী দর্শন করেন, আরতি নিবেদন করেন ও প্রসাদ গ্রহণ করেন। অনেক মুসলিম শিশু-কিশোর,তরুণ-তরুণী ও যুবক-যুবতীও বিভিন্ন পূজামণ্ডপে ঘুরে বেড়ায় ও প্রতিমা অবলোকন করে। সনাতন ধর্মানুসারীরা তাদের মুসলিম ও অন্যান্য ধর্মানুসারী বন্ধু-বান্ধবকে তাদের মণ্ডপে ও

www.pathagar.com

বাসায় আমন্ত্রণ জানিয়ে থাকেন। এ সময়ে বিভিন্ন পূজামণ্ডপে রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের যাতায়াত বেড়ে যায়।

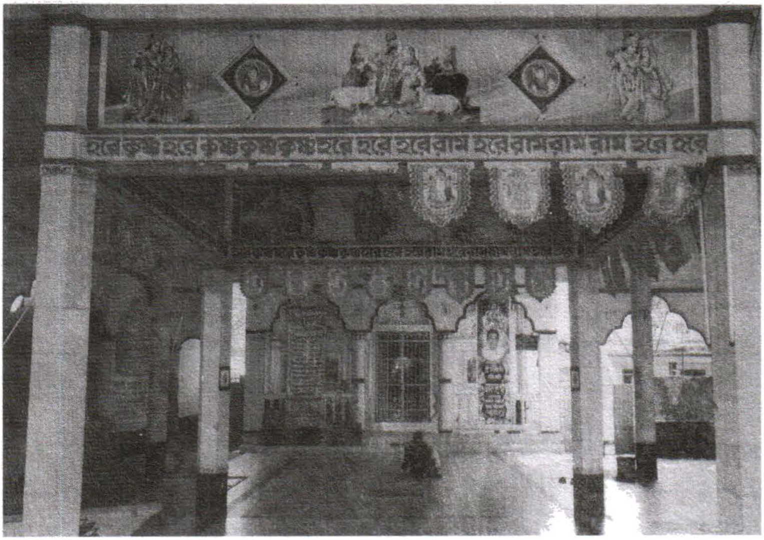

মদনমোহন ঠাকুর ভিত্তির মন্দিরের (ভোলা সদর) ভেতরের দৃশ্য

কুমার পন্ডির শ্রী শ্রী কালিমাতার মন্দির

www.pathagar.com

তারা সনাতন ধর্মাবলম্বী এবং পূজা উদ্‌যাপন কমিটির সদস্যদের সাথে সার্বিক পূজা অনুষ্ঠান এবং নিরাপত্তাজনিত যাবতীয় বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করেন এবং তাদের অসুবিধাসমূহ দূর করার প্রতিশ্রুতি দেন ও তদ্‌নুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করে থাকেন।

আমাদের এই উপজেলাসহ সমগ্র জেলায় মুসলিম ও হিন্দু সম্প্রদায়ের অনুসারীরা যুগযুগ ধরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের মধ্যে বসবাস করে আসছে। এই দুই সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান থাকায় এখানে শারদীয় দুর্গোৎসবসহ সনাতন ধর্মানুসারীদের বিভিন্ন পূজা ও উৎসব অত্যন্ত সাড়ম্বরে পালন করা হয়ে থাকে।

দেখতে না দেখতে দশমীর দিন ঘনিয়ে আসে। এইদিনে ঘরের সবাই মিলে একসঙ্গে আহার করে, বড়দের ছোটরা প্রণাম করে। এদিন দেবীর বিসর্জন হয় ভোলার খাল, নিকটস্থ অন্য কোনো খাল, পুকুর কিংবা জলাশয়ে। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে বেজে ওঠে একটি বিষাদের সুর। মা দুর্গা চলে যাবেন স্বামীগৃহ কৈলাসে। আবার ফিরে আসবেন সেই এক বছর পর।

ভোলা সদর উপজেলার সব পূজামণ্ডপের প্রতিমাগুলো মিছিল সহকারে নতুন বাজার টাউন হলের সামনে এনে জড়ো করা হয়। তারপর মোটর শোভাযাত্রা ও পায়ে হেঁটে ভোলা শহর প্রদক্ষিণ করে খেয়াঘাট খালে বিসর্জন দেওয়া হয়।

৪. লক্ষ্মীপূজা

সমৃদ্ধি ও সৌভাগ্য এবং সৌন্দর্য ও সম্পদের দেবী লক্ষ্মী। আশ্বিন মাসের কোজাগরি পূর্ণিমায় প্রচুর জাঁকজমক ও ধুমধামের সাথে লক্ষ্মীর বার্ষিক পূজা অনুষ্ঠিত হয়। অন্যান্য স্থানের মতো এ এলাকারও সনাতন ধর্মাবলম্বীদের বিশ্বাস, এ-রাতে যারা সারারাত জেগে দেবীর উপাসনায় রত থাকে, তিনি ঘরে ঘরে গিয়ে তাদের প্রতি আশীর্বাদ বিতরণ করেন। এ রাতে দেবীর বিশেষ কৃপা লাভের আশায় সনাতন ধর্মানুসারীরা সারারাত জেগে থাকে এবং চিড়া ও ডাবের পানি দিয়ে আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের আপ্যায়ন করে থাকে। দেবী লক্ষ্মীকে নিবেদন করে জল, আতপ চাল, দূর্বা, চন্দন, মধু, ফল, ফুল, দধি, ঘি, বিল্বপত্র, বস্ত্র, স্বর্ণ ও রৌপ্যনির্মিত অলঙ্কারসহ নানাবিধ সামগ্রী।

কেউ কেউ প্রতি বৃহস্পতিবার লক্ষ্মীপূজা করে থাকেন। গ্রামাঞ্চলের প্রায় প্রতিটি হিন্দু সম্প্রদায়ের সদস্যের বাড়িতেই লক্ষ্মীর জন্য একটি আসন রাখা হয়। অনেকে দেবী লক্ষ্মীর মুদ্রিত ছবি সরা অথবা অন্য কোনো পাত্রের ওপর রেখে তার পূজা করে থাকেন। লক্ষ্মীপূজা উপলক্ষে আতপ চালের গুঁড়ার সাথে পানি মিশ্রিত করে ঘরের দরজা থেকে শুরু করে মেঝে এবং উঠান, বিশেষকরে ঘরের দরজা থেকে লক্ষ্মীর আসন পর্যন্ত আলপনা আঁকা হয়ে থাকে।

৫. কালীপূজা

কালীপূজা সনাতন ধর্মাবলম্বীদের আরেকটি ধর্মীয় উৎসব। প্রতিদিনই দেবী কালীর আরাধনা করা হয়, তবে দীপান্বিতা, মাঘী কৃষ্ণাচতুর্দশী ও জ্যৈষ্ঠের কৃষ্ণাচতুর্দশীতে

www.pathagar.com

বিশেষভাবে এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। দেবীর বিশেষ বর বা অনুগ্রহ লাভের আকাঙ্ক্ষায়ও কালীপূজা করা হয়। তাছাড়া গ্রামাঞ্চলে কোনো রোগ-ব্যাধি মহামারি আকারে দেখা দিলে হিন্দু সম্প্রদায়ের ভক্তরা মিলিতভাবে এই পূজার আয়োজন করেন। সাধারণত পাঁঠা ও মহিষ এই পূজা অনুষ্ঠানকালে দেবীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়ে থাকে।

ভোলা পৌরসভার আওতাধীন কালীবাড়ি রোডে অবস্থিত কালী মন্দিরটি অতি প্রাচীন মন্দির। এছাড়া রয়েছে শ্মশান কালীবাড়ি। এখানে হাজার হাজার কালীভক্ত দেবী কালীকে পূজা নিবেদন করে থাকেন। পূজা উপলক্ষে এখানে কীর্তন ও ধর্মীয় গানের আয়োজন করা হয় এবং প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

৬. সরস্বতীপূজা

সরস্বতী হলেন জ্ঞান, সংগীত, শিল্পকলা ও বিজ্ঞানের দেবী। সনাতন ধর্মানুসারীরা এই বিশ্বাস পোষণ করেন যে, যদি কোনো শিক্ষার্থী প্রকৃত অর্থেই দেবীর অন্তর্নিহিত ও মৌলিক অর্থ অনুধাবন করতে পারেন, তাহলে সে অতি সহজেই জ্ঞানার্জনের পথে এগিয়ে যেতে পারে এবং সফলতা লাভ করতে সক্ষম হয়।

আমাদের উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই মহাসমারোহের সাথে এই সরস্বতীপূজা উদ্‌যাপন করা হয়। অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই দেবী সরস্বতীর প্রতিমা স্থাপন করা হয় এবং দিনব্যাপী চলে পূজা অর্চনা। এ উপলক্ষে শিক্ষার্থী এবং আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে দেবীর প্রসাদ ও মিষ্টান্ন বিতরণ করা হয়। এই পূজায়ও সনাতন ধর্মের অনুসারী সহপাঠী ও বন্ধুদের সাথে মুসলিম ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের তরুণ-তরুণীরা দেবী সরস্বতীকে দেখার জন্য বিভিন্ন পূজামণ্ডপ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ঘুরে বেড়ায় এবং পূজার প্রসাদ গ্রহণ করে থাকে।

৭. জন্মাষ্টমী

শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টম দিনে শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিন জন্মাষ্টমী পালন করা হয়। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের অনেকে এই দিনে মধ্যরাত অবধি উপবাস পালন করে থাকেন। তারা ভগবতগীতা পাঠ করেন এবং ঘরে টানিয়ে দেন শ্রীকৃষ্ণের শৈশবের ছবি। তারা পরস্পরের মধ্যে উপহার বিনিময় করেন এবং দুধ, মাখন ও নারিকেলের নাড়ু দিয়ে ঘরে আগত অতিথিদের আপ্যায়ন করেন।

ভোলা জেলা পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের উদ্যোগে কালীনাথ রায়ের বাজার লক্ষ্মীগোবিন্দ জিউর মন্দিরে আলোচনা অনুষ্ঠান শেষে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ নিয়ে সনাতন ধর্মাবলম্বী নারী-পুরুষের বর্ণাঢ্য মিছিল বের করা হয়। দুটো শিশুকে রাধা-কৃষ্ণ সাজিয়ে মিছিলের অগ্রভাগে রাখা হয়। মিছিলে অংশগ্রহণকারী সবার পরনে থাকে শ্রীকৃষ্ণের ছবি অঙ্কিত সাদা গেঞ্জি ও হলুদ ধুতি। মিছিলটি কালীনাথ রায়ের বাজার থেকে শুরু করে বাংলা স্কুলের মোড়, নতুনবাজার ও কাশীশ্বর ব্রীজ হয়ে পুনরায় কালীনাথ বাজারে গিয়ে শেষ হয়। এরপর প্রসাদ রিতরণ করা হয়।

www.pathagar.com

৮. রথযাত্রা

রথযাত্রা সনাতন ধর্মাবলম্বীদের আরেকটি প্রধান ধর্মীয় উৎসব। সুদীর্ঘকাল থেকে এ অঞ্চলে রথযাত্রা উৎসব পালিত হয়ে আসছে।

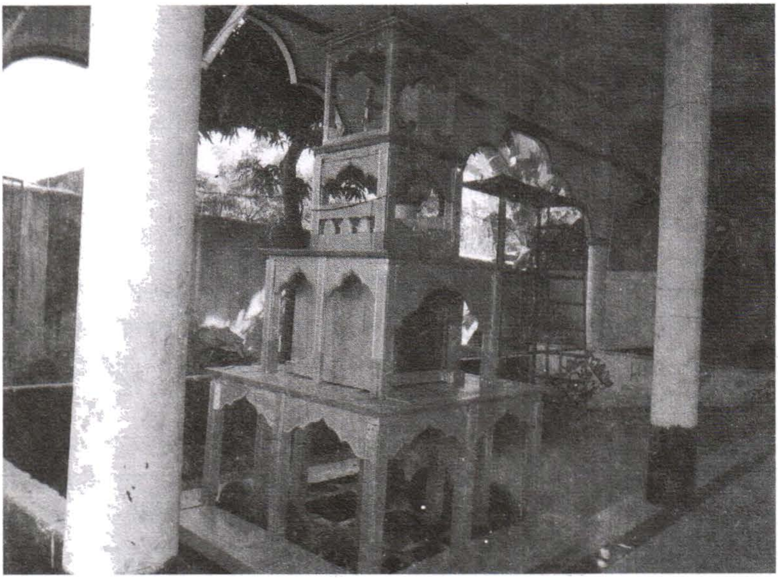

মদনমোহন ঠাকুর জিউর মন্দিরে রক্ষিত রথ।

বিভিন্ন মন্দির থেকে দেবতাদের মূর্তি এনে রথের ওপর স্থাপন করে সেটি টানা হয়। সনাতন ধর্মানুসারীরা বিশ্বাস করেন যে, জগতের প্রভু জগন্নাথের অনুগ্রহ লাভের মধ্য দিয়েই কেবল মানুষের মুক্তি ঘটতে পারে। তারা আরো বিশ্বাস করেন যে, রথের ওপর যে প্রভু জগন্নাথকে দেখতে পারে, তার আর পুনর্জন্ম হবে না এবং সে মুক্তিলাভ করবে। জগন্নাথের কৃপা ও অনুগ্রহ লাভের প্রত্যাশায় এ কারণেই রথযাত্রার আয়োজন করা হয়ে থাকে। এ অঞ্চলের সনাতন ধর্মাবলম্বীদের বিশ্বাস যে, রথযাত্রার দিনে যদি দিনের প্রথম ভাগে মেঘ ডাকে, তাহলে একটু আগে-ভাগেই বর্ষা চলে আসে, আর যদি দিনের শেষাংশে মেঘ ডাকে, তাহলে বর্ষা আসতে দেরি হয়।

ভোলা সদর উপজেলায় মোট ৩টি রথ বের হয়। একটি তরকারি পট্টি খালপাড় রোডের মদন মোহন জিউর ঠাকুর মন্দির থেকে, আরেকটি কালীনাথ রায়ের বাজার লক্ষ্মীগোবিন্দ জিউর ঠাকুর মন্দির থেকে এবং অপরটি চর নোয়াবাদের কালীখোলা কালী মন্দির থেকে। রথগুলোকে বের করে বাংলা স্কুলের মোড় ঘুরিয়ে পাঁচ আনি তহবিল রোড হয়ে যার যার পূর্ব অবস্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। এ সময়ে জগন্নাথ দেবের উদ্দেশ্যে সকল ধরনের ফল, মুড়ির মোয়া ইত্যাদি প্রদান করা হয়; যা ঠাকুর পরে সবার মাঝে বিলিয়ে দেন।

www.pathagar.com

রথযাত্রা উৎসবের একটি দৃশ্য।

৯. নববর্ষ

গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষের জীবনের সঙ্গে বিভিন্নভাবে জড়িয়ে আছে বাংলা নতুন বছর বা নববর্ষ। এটি বাঙালির জাতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। দ্বীপাঞ্চল ভোলার সর্বস্তরের, ধর্মবর্ণনির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের, সকল শ্রেণি-পেশা, সকল বয়সের মানুষ, সবাই মিলে ঘরে ও বাইরে নববর্ষের বিভিন্ন আনন্দোৎসবে যোগদান করে জীবনকে নতুনভাবে আবিষ্কার করে, নতুন শক্তি, সাহস ও উদ্দীপনা সঞ্চয় করে নতুন বছরের সকল প্রতিকূলতা মোকাবিলা করায় সচেষ্ট হয়।

চৈত্র শুরু হলেই মোটামুটিভাবে নববর্ষকে বরণের একটা প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। গ্রামবাংলায় এটি বেশি স্পষ্ট। ঘরের চাল, খুঁটি, বেড়া নষ্ট হয়ে গেলে সেগুলো পরিবর্তন করা থেকে বিভিন্ন রকম সংস্কার কাজ, কোথাও প্রয়োজন হলে নতুন মাটি ফেলা, নতুন মাটি দিয়ে ঘর-দুয়ার লেপা, বাসগৃহ ও দোকানপাটের অপ্রয়োজনীয় কাগজপত্র, খুঁটিনাটি জিনিস বেছে বেছে ফেলে দিয়ে ঘর আবর্জনামুক্ত করা, পাকা ঘর হলে তাতে চুনকাম করা, দোকান বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের হাল বছরের হিসাব-নিকাশ চূড়ান্ত করা, ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক দেনা-পাওনা মিটিয়ে ফেলা ইত্যাদি কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত হয়ে পড়ে কম-বেশি সবাই। একদিকে পুরনো বছরকে বিদায় অন্যদিকে নতুন বছরকে বরণ করার প্রস্তুতি চলতে থাকে সমান তালে।

www.pathagar.com

নববর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

নববর্ষ উপলক্ষে তিন দিনব্যাপী আয়োজিত অনুষ্ঠানমালার সূচনা হয় অফিসার্স ক্লাবের সামনের টেনিস গ্রাউন্ডে স্থানীয় শিল্পীদের পরিবেশিত নববর্ষের সূচনা সংগীত ও নৃত্য পরিবেশনের মধ্য দিয়ে।

নববর্ষ উপলক্ষে র‍্যালি।

www.pathagar.com

শিশু পার্কের বটমূলে বা বাংলা স্কুলের মাঠে পৌর মেয়রের উদ্যোগে পান্তা-ইলিশের আয়োজন করা হয়। এতে বিভিন্ন স্তরের প্রচুর মানুষ অংশগ্রহণ করে থাকেন। ঢাকা থেকে আনা ঐতিহ্যবাহী ঘোড়ার গাড়ি, ভোলার বিলুপ্ত গরুর গাড়ি, পালকি ও ঢেঁকি এবং ইলিশ মাছের প্রতিকৃতি নিয়ে এক বিরাট র‍্যালি শহরের প্রধান প্রধান রাস্তাসমূহ প্রদক্ষিণ করে। স্টেডিয়ামে পোড়ানো হয় আতশবাজি, স্থানীয় ও ঢাকা থেকে আগত শিল্পীরা পরিবেশন করেন লোকসংগীত।

আমাদের নববর্ষের প্রধান আকর্ষণ হালখাতা উৎসব ও মেলার আয়োজন করা। চৈত্রের শেষভাগ থেকেই বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, গদিঘর, মুদি দোকান থেকে তাদের নিয়মিত গ্রাহকদের 'শুভ হালখাতা' করার আমন্ত্রণ জানিয়ে কার্ড পাঠানো হয়। উদ্দেশ্য, বকেয়া পাওনা আদায়। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর এ উদ্দেশ্য অনেকাংশেই সফল হয়। তবে হালখাতায় আগের সেই জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশ, উৎসাহ-উদ্দীপনা আজকাল আর ততোটা লক্ষ্য করা যায় না।

১০. হালখাতা

দোকানপাট ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পয়লা বৈশাখ বছরের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দিন। শহরে-নগরে আমরা আমাদের নিজেদের জীবনকে ইংরেজি বছরের সঙ্গে একাকার করে ফেললেও গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষ তাদের চাষাবাদসহ সকল কর্মকাণ্ডে বিশেষকরে কাপড়ের দোকান, মুদি দোকান, মিষ্টির দোকান, স্বর্ণালংকারাদির দোকান, বড় বড় গদিঘরসহ যাবতীয় ব্যবসাকেন্দ্রের মালিকরা নিজেদের হিসাব-পত্র সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বাংলা সনকেই আঁকড়ে ধরে আছেন। পয়লা বৈশাখে তারা উদ্‌যাপন করেন হালখাতা। ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে সকল বাঙালি ব্যবসায়ীই এই দিনটি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে পালন করে। এ উপজেলায়ও এর ব্যতিক্রম নেই।

চৈত্র মাসের শেষদিকে অর্থাৎ পয়লা বৈশাখের আগেই সমস্ত দোকান, গদিঘর, ব্যবসাকেন্দ্র ঝাড়ু দিয়ে, মাকড়সার জাল সরিয়ে সমস্ত ধুলাবালি পরিষ্কার করে, মেঝেতে পানি ঢেলে পরিষ্কার করে ঝকঝকে তকতকে করে তোলা হয়। ঘরের মেঝে মাটির হলে নতুন মাটি এনে পানির সাথে গুলিয়ে 'লেপা' হয়। দোকানের ভেতরটা রকমারি সাজে সাজানো হয়।

পয়লা বৈশাখের অন্তত সপ্তাহখানেক আগেই হালখাতা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানিয়ে গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের চিঠি দেওয়া হয়, কার্ড পাঠানো হয়। পয়লা বৈশাখে হিসেবের নতুন খাতা খোলা হয়। এদিন মুসলিম ব্যবসায়ীদের অনেকে তাদের ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে মিলাদ-মাহফিলের আয়োজন ও মিষ্টি বিতরণ করে থাকেন। সনাতন ধর্মাবলম্বী ব্যবসায়ীরা গণেশ পূজা করেন। একটি পিতলের থালে পদ্মফুল, তুলসিপাতা, হরিতকি, আমসরা, দূর্বা, তিল, চন্দন, সিঁদুর ও সরিষার তেল সিন্দুকের সামনে রাখা হয়। তারপর একটি রূপার টাকায় সরিষার তেল ও সিঁদুর মাখিয়ে নতুন খাতার প্রথম পৃষ্ঠার চারকোণে চারটি ও মাঝখানে একটি—সর্বমোট পাঁচটি ছাপ দিয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ একজনকে দিয়ে খাতাটির শুভ উদ্বোধন করা হয়। তাঁকে উপহার হিসেবে প্রদান করা হয় একটি ধুতি ও সামর্থ্য অনুযায়ী নগদ সম্মানী।

www.pathagar.com

বৈশাখের প্রথম তারিখ থেকে তিনদিন চলে এই হালখাতা। তবে প্রথমদিনেই বেশি সংখ্যক গ্রাহক ও সুধীজনের আগমন ঘটে। আগত অতিথিদের সাথে দোকান-মালিক ও ব্যবসায়ীরা শুভেচ্ছা বিনিময় করেন, গত বছরের বকেয়া পাওনার সম্পূর্ণ বা আংশিক গ্রহণ করে খাতায় লিপিবদ্ধ করেন। আন্তরিক ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে নানাবিধ বিষয়ে আলাপ করেন এবং মিষ্টিমুখ করিয়ে পুনরায় তাদের ব্যবসাকেন্দ্রে পদধূলি দেওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় দেন। আগের দিনের মতো সেই আবেগ, উত্তেজনা, ব্যস্ততা ও আন্তরিকতা পুরোমাত্রায় না থাকলেও আমাদের অঞ্চলে হালখাতা এখনও একটি আনন্দময় অনুষ্ঠান। মূলত অতীতের হিসেব-নিকেশ চুকিয়ে দিয়ে নতুন বছরে আবার নতুন করে লেন-দেন শুরু করার জন্য মিষ্টিমুখ করানোই এই অনুষ্ঠানের মূল লক্ষ্য। একটি বিষয় লক্ষ্য করার মতো, সেটি হলো বছরের অন্যান্য দিনগুলিতে কোনো দোকানদার বা ব্যবসায়ীকে পাওনা পরিশোধ করতে এসে সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধ না করে আংশিক পরিশোধ করলে সেক্ষেত্রে পাওনাদার হয়তো বা কখনো কখনো আরো একটু বেশি অর্থ পরিশোধের অনুরোধ জানান বা হালকা বাক-বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন, কিন্তু এই দিনটিতে হাজার টাকা পাওনাদারের প্রতিষ্ঠানে হালখাতা করতে এসে যদি কোনো গ্রাহক একশত টাকাও দেন, সেক্ষেত্রে কোনো ব্যবসায়ী পাওনাদার উচ্চ বাক্য বলেন না। খাতায় লিখে রাখেন।

১১. নবান্ন

হেমন্তে অর্থাৎ কার্তিক-অগ্রহায়ণে পাকা ধানের গন্ধে মেতে উঠে বাংলার কৃষকসমাজ। এ আনন্দ ফসল কাটার, এ আনন্দ কাটা ফসল ঘরে তোলার। একটি শুভদিন দেখে ক্ষেত থেকে নতুন ধান কেটে আনে কৃষক। আগ কাটা ধানের একগোছা ধান ঘরের যে-কোনো একটি খুঁটির সাথে ঝুলিয়ে রাখে।

ক্ষেত থেকে নতুন ধান কাটার আনন্দে উৎসবের সাড়া পড়ে যায় কৃষকের ঘরে ঘরে। নিজের শ্রমে উৎপাদিত ফসল ঘরে তোলা। এ যে কী আনন্দের! গৃহবধূরা নতুন ধানের চালের গুড়োঁ দিয়ে তৈরি করেন বিভিন্ন ধরনের সুস্বাদু পিঠা-পায়েস। পুলি পিঠা, চিতই পিঠা, পাক্কন পিঠা, পাডি (পাটি) পিঠা, চই পিঠা, দুই (ভাঁপা) পিঠা, পচা পিঠা, কলার পিঠা, ইত্যাদি কত রকমারি পিঠা। কৃষক পরিবার পরিবারের অন্য সদস্যদের নিয়ে, আত্মীয়-স্বজনকে নিয়ে মাটিতে পাটি বা হোগলা বিছিয়ে পরমানন্দে এসব পিঠার স্বাদ গ্রহণ করে।

এদিনে মুসলিম কৃষকদের কেউ কেউ মিলাদ পড়ায়, সনাতন ধর্মাবলম্বীদের কেউ কেউ চালের গুঁড়ায় পানি মিশিয়ে তা দিয়ে ঘরের মেঝেতে আলপনা আঁকে, দেবীলক্ষ্মীকে পূজা দেয়। এটিই নবান্নের আনন্দ। তারা নবান্নের রান্না করা খাবার-দাবার দেবী লক্ষ্মী, পিতৃপুরুষ, গবাদি পশু, কাক ইত্যাদির জন্যও উৎসর্গ করে থাকে। আজকাল প্রাণের ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ নবান্নের সেই আনন্দ অনেকটাই ম্লান গেছে। নতুন ধানের চালের ভাত মুখে দেয় ঠিকই, কিন্তু তাতে উৎসবের প্রাণ থাকে না, আগের মতো আর আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীকে নিয়ে খাওয়ার উৎসবে মেতে ওঠে না। নবান্নের পরদিন 'বাসি নবান্ন' দিবস পালন করা হয়ে থাকে। এইদিনে আগের দিনে অনুষ্ঠিত

www.pathagar.com

নবান্নের বেঁচে যাওয়া খাবার চুলার আগুনে জ্বাল দিয়ে 'বরফি' তৈরি করা হয়, যা খেতে খুবই সুস্বাদু।

১২. বরণকুলা বা বরণডালা

বিয়ের যাবতীয় প্রাথমিক প্রস্তুতিপর্ব শেষ হয়ে গেলে, অর্থাৎ কথাবার্তা পাকাপাকি ও দিনক্ষণ নির্ধারণ হয়ে যাবার পর বর বা কনের গায়ে হলুদের জন্য কুলা বা ডালা পাঠানো হয়ে থাকে। পরিবারের সদস্য/সদস্যা, নিকট আত্মীয় কিংবা বর বা কনের বন্ধুস্থানীয় তরুণ-তরুণীরা এই ডালা নিয়ে যায়। বিভিন্ন রং-এর কাগজে সজ্জিত বাঁশ বা বেতের তৈরি এই কুলা বা ডালা উভয় পক্ষই পাঠিয়ে থাকে। এটি আজকাল কোনো করণ ক্রিয়ার মধ্যে পড়ে না, এটা এখন রীতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। এই কুলা বা ডালায় এবং তার সঙ্গে পাঠানো হয় নানাবিধ প্রসাধনসামগ্রী, অলংকার, পোশাক-পরিচ্ছদ ও কিছু খাবার-দাবার। গায়ে হলুদের জন্য পাঠানো হয় বাঁটা কাঁচা হলুদ, বাঁটা মেহেদি, সোন্দা, মেথি, পারফিউম, সাবান, তেল ইত্যাদি। আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী উভয় পক্ষ প্রসাধনী, পোশাক-পরিচ্ছদ ও অলংকারাদি পাঠিয়ে থাকে। কিন্তু খাবারের ব্যাপারে কিছু কড়াকড়ি রয়েছে। যেমন পান-সুপারি, চুন, রসগোল্লা, দই এবং একটি বা দুটো বড় মাছ। বরণকুলায় কোনো দ্রব্য বাদ পড়ে গেলে কিংবা উপযুক্ত বলে বিবেচিত না হলে সেটা নিয়ে অনেক বাক-বিতর্ক ও মৃদু ঝগড়া-বিবাদও হয়ে থাকে।

হিন্দুসমাজে বরণকুলা তত্ত্ব পাঠানো হয় অধিবাসের দিন। বিয়ের একদিন আগে অধিবাস হয়।

১৩. গায়ে হলুদ বা 'তেলাই'

আগে বিয়ের কমপক্ষে তিনদিন আগে গায়ে হলুদ বা 'তেলাই' দেওয়া হতো। ইদানীং দুইদিন বা একদিন আগেও এই অনুষ্ঠান হয়। সাধারণত কনের হলুদের পরের দিন ছেলের গায়ে হলুদ হয়। হলুদের পরের দিন গোসল করানো হয়। কনে বা বরের বাড়ি থেকে হলুদের জন্য যেসব সামগ্রী পাঠানো হয়, তা দিয়ে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠানটিকে সুগন্ধযুক্ত করার লক্ষ্যে হলুদের সঙ্গে মেথি, সোন্দা বেঁটেও গায়ে মাখানো হয়।

হিন্দু-মুসলমান, বিত্তবান-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত—সব পরিবারের বর ও কনেকেই হলুদ বা 'তেলাই' দেওয়া হয়ে থাকে। বর বা কনের বাড়ি থেকে পাঠানো পাটিতে বা পিঁড়িতে বসিয়ে এই হলুদ বা তেলাই দেওয়া হয়। মা-খালা, মাসী-দাদী বা মুরব্বি স্থানীয় কেউ প্রথম কপালে বা মুখমণ্ডলে একটু হলুদ লাগিয়ে দিলে পরে অন্য সবাই—শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত সবাই হলুদ দিতে থাকেন। এ সময় বর বা কনেকে একটু একটু করে মিষ্টান্ন ও দুধের সরবতও খাওয়ানো হয়ে থাকে।

হিন্দুসমাজে ছেলের গায়ে-ছোঁয়ানো হলুদ কনের গায়ে মাখানোর জন্য পাঠানো হয়। বরণডালা বা কুলাতে ধান-দূর্বা ও প্রদীপ সহযোগে হলুদ পাঠানো হয়।

গায়ে হলুদ কিংবা তেলাই দেওয়ার পর কিছু বিধি-নিষেধ মেনে চলা বর-কনের জন্য অত্যাবশ্যক। বিশেষকরে হলুদের পর আর তাদের বাড়ির বাইরে বের হওয়া

www.pathagar.com

নিষেধ। কারণ, লোকসমাজে এমন বিশ্বাস প্রচলিত যে, হলুদ-সোন্দা-মেথির গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে জ্বীন-পরী-ভূত-প্রেত ইত্যাদি বর বা কনের ওপর 'আসর' বা 'ভর' করতে পারে।

যে শিল-পাটায় হলুদ, সোন্দা মেথি ইত্যাদি বাঁটা হয়, সেই শিল-পাটা আড়াই দিন পর্যন্ত সেভাবেই সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে। এরপর এগুলো ধুয়ে পরিষ্কার করা হয়। ইদানীং গায়ে হলুদ বা তেলাই-এর বেশিরভাগ অনুষ্ঠানেই জমজমাট গান-বাজনার আয়োজন করা হয়ে থাকে।

১৪. বধূবরণ

বিয়ের পর বর তার বধূকে নিজ বাড়িতে ফিরে এলে তাদের বরণ করে নেওয়ার রীতি মুসলিম ও হিন্দু উভয় সমাজে দীর্ঘদিন থেকেই চলে আসছে। রিক্সা, নৌকা বা ভাড়াকরা গাড়িতে করে বর-বধূ এসে পৌঁছলে বরের মা, খালা বা নানী-দাদী মুখে সামান্য মিষ্টি দিয়ে ধান-দূর্বা ও এক টুকরা হলুদ দিয়ে যান থেকে নামিয়ে আনেন। তার পর তাকে দুধের সরবত পান করিয়ে একটি নতুন শাড়ির ওপর দিয়ে হাঁটিয়ে অথবা কোলে করে ঘরের ভেতরে নেওয়া হয়।

সনাতন ধর্মাবলম্বীদের একটি বিয়ের অনুষ্ঠান, বর-উত্তম বিশ্বাস, কনে-মৌসুমী সরকার

এরপর বরের মা (যদি জীবিত থাকেন) বা খালা বা নানী-দাদীর যে কেউ বর ও বধূকে দুই উরুর ওপর বসিয়ে দুধের সরবত পান করান। তারপর তারা উরুর ওপর থেকে

www.pathagar.com

নেমে আসে। এরপর অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন একের পর এক বর-বধূর সামনে রাখা পাত্র থেকে রসগোল্লা, ফিরনি বা চিনি বা গুড় বর-কনেকে খাওয়াতে থাকে।

দৌলতখান উপজেলা

'রোজার ঈদ' নামে অভিহিত ঈদুল ফেতর এবং 'কোরবানির ঈদ' অর্থাৎ ঈদুল আজহা মুসলমানদের দুটি প্রধান ধর্মীয় উৎসব। এ'দুটি উৎসব এ উপজেলার ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা অত্যন্ত ভাবগাম্ভীর্য ও আনন্দ-উদ্দীপনার সাথে উদ্‌যাপন করে থাকে।

১. রোজার ঈদ বা ঈদুল ফেতর

তিরিশ রোজা আদায়ের পর (কোনো কোনো বছর ঊনত্রিশটিও হয়) ধর্মপ্রাণ মুসলমান সম্প্রদায় আরবি শাওয়াল মাসের ১ তারিখে রোজার ঈদ উৎসবে মেতে ওঠে। অবশ্য উৎসবের আয়োজন ও প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায় কয়েকটা রোজা পর হলেই। এ সময় থেকে প্রথমে শুরু হয়ে যায় ছেলেদের সার্ট-প্যান্ট, পাঞ্জাবি ও মেয়েদের সালোয়ার-কামিজ ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের আধুনিক ডিজাইনের পোশাক তৈরির পালা। ধীরে ধীরে শেষ হয় কাপড় কিনে পোশাক তৈরির সময়। দরজিরাও অর্ডার নেওয়া বন্ধ করে দেয়। এরপর শুরু হয় সর্বাধুনিক ডিজাইনের তৈরি পোশাক কেনা। দেশি-বিদেশি নানা ধরনের তৈরি পোশাকে ইতোমধ্যেই বাজার ছেয়ে যায়। স্থানীয় বাজারের দোকানগুলোতে অধিক রাত পর্যন্ত বেচা-কেনা চলে। অনেকে জেলাশহর ভোলা বা রাজধানী ঢাকায় গিয়েও কেনাকাটা করে থাকেন। যাদের নতুন পোশাক কেনার মতো সামর্থ্য নেই, তারা পুরনোটাকেই সোডা-সাবান দিয়ে ধুয়ে-টুয়ে পরিষ্কার করে ইস্ত্রি করে রেখে দেন। অসংখ্য দরিদ্র মা-বাবা আছেন, যারা নিজেরা কোনো কিছু না নিয়ে ছেলে-মেয়েদের সাধ সাধ্যমতো পূরণের চেষ্টা করেন। তবে সমগ্র জনগোষ্ঠীর একটা বৃহৎ অংশই ঈদে নতুন পোশাক পরার আনন্দ থেকে বঞ্চিত রয়ে যান।

মুসলিম নারী-পুরুষের জীবনে দুই ঈদের দুটি দিন খুবই ব্যতিক্রমধর্মী দুটি দিন। এদিনে তারা নিজেদের একটু ব্যতিক্রমী সাজে সাজিয়ে তুলতে চান। এজন্য নতুন পোশাকের পাশাপাশি মেয়েরা সৌন্দর্য চর্চার জন্য যা যা উপকরণ প্রয়োজন, তা তা ব্যবহার করে থাকেন। এ ব্যাপারে মেহেদির ব্যবহারে খুবই সতর্ক ও সযত্ন দৃষ্টি দিয়ে থাকেন। তারা ঈদের আগের দিন বিকাল থেকেই মেহেদি বাটা শুরু করে দেন। কারণ, মেহেদি লাগিয়ে তা আবার শুকাতে সময় লাগে বেশ। শিশু-কিশোরী-তরুণীরা সন্ধ্যা থেকেই বিভিন্ন চিত্র এঁকে হাত দুটোকে মোহনীয় করে তুলতে সচেষ্ট হয়। গৃহকর্মে ব্যস্ত নারীরা বসেন সংসারের যাবতীয় কাজ সেরে, সবাইকে খাইয়ে-দাইয়ে তারপর। তারা নিজেরা একে অপরকে এ ব্যাপারে সহযোগিতা করে থাকেন। কিশোর এবং তরুণরাও এক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই। তারা তাদের দু'হাতের নখগুলোকে মেহেদির রঙে রাঙিয়ে নেন। আজকাল মেহেদি বাটার কষ্ট দূর করে দিয়েছে কিছু ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান। তাদের কল্যাণে এখন তো বাজারে টিউবজাত মেহেদি কিনতে পাওয়া যায়। তবে গাছ থেকে মেহেদি পাতা ছিঁড়ে তা বেঁটে হাতে লাগানোর আনন্দই আলাদা। ছোট ছোট কিশোর-কিশোরীরা গোল হয়ে বসে। বড়দের কোনো একজন এক এক করে তাদের সবার

www.pathagar.com

হাতের নখ, তালু, তালুর উপরিভাগ মেহেদি দিয়ে নানান রূপ-সৌন্দর্যময় চিত্র এঁকে হাত দুটোকে আকর্ষণীয় করে তোলেন।

ঈদের দিন। শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের ঈদের আগের রাতটি কাটে প্রায় আধো-ঘুম আধো-জাগরণে। সকাল হলেই ঈদ। এই উত্তেজনায় আবেগে সুনিদ্রা হয় কীভাবে? পাখ-পাখালির ডাক শুনলে, বাড়ির বড়দের জেগে ওঠার শব্দ পেলেই আড়মোড়া ভেঙ্গে তারা বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে। কাটাতে থাকে বিরক্তিকর অপেক্ষার প্রহর—কখন নতুন পোশাক পরবে, নতুন পোশাক পরে বন্ধুদের দেখাবে, তাদের বাসায় বেড়াতে যাবে।

বাড়ির মহিলাদেরও কি আর সুনিদ্রা হওয়ার কোনো উপায় আছে। বিভিন্ন রকম আয়োজন, যোগাড়-যন্তরে, সকালের জন্য প্রয়োজনীয় কাজকর্মের প্রস্তুতি সেরে তাদেরও বিছানায় যেতে রাত গভীর হয়। নামাজে যাবার আগে সবাইকে সেমাই-ফিরনি দিতে হবে। নামাজ পড়তে যাওয়ার আগে কিছু খেয়ে নেওয়া সুন্নত। প্রায় অন্ধকার থাকতেই তারা চুলায় চাপিয়ে দেন দুধ—যদি দুধের ফিরনি-পায়েস করতে হয়। আর গরিবের সংসারে হয়তো গুড়ের পায়েস, নয়তো চালের গুঁড়ি, ময়দা বা আটা দিয়ে আলবান রান্নার প্রস্তুতি নেওয়া হয়।

ঈদগাহ্ থেকে মাইকের শব্দ শোনা যায়, 'ঈদগাহে ঈদের প্রথম জামাত শুরু হবে সকাল ৮টায়। দ্বিতীয় জামাত...টায়।' এই দৌলতখান ঈদগাহ বহু প্রাচীন। উপমহাদেশের মহান আধ্যাত্মিক সাধক হযরত মওলানা কেরামত আলী (র.)-র জ্যেষ্ঠ পুত্র হযরত মওলানা হাফেজ আহমদ (র.)-এর সময়ে এই ঐতিহাসিক ঈদগাহ প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি প্রতিটি রমজানের ঈদে এই ঈদগাহে আর ঈদুল আজহায় ভোলার যুগীর ঘোলের ঈদগাহে নামাজ পড়াতেন। সমগ্র ভোলা জেলার ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা এই দুটি জামাতে তাঁর পেছনে নামাজ আদায় করার জন্য সারাটি বছর অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতেন। তাঁর ইনতেকালের পর পর্যায়ক্রমে তাঁর অন্যান্য উত্তরসূরী এই ঈদগাহে ঈদের জামাতে ইমামতি করতেন। দীর্ঘদিন যাবৎ দৌলতখানের এই ঈদের জামাতই ছিল ভোলার সর্ববৃহৎ ঈদের জামাত। এই জামাতে প্রায় ৫০/৬০ হাজার মুসল্লি নামাজ আদায় করতেন। ভোলার বিভিন্ন উপজেলা ছাড়াও নোয়াখালী, পটুয়াখালী প্রভৃতি স্থান থেকেও মুসল্লিরা দলে দলে এই ঈদের জামাতে অংশগ্রহণ করতেন। কালক্রমে প্রাকৃতিক দুর্যোগ-দুর্বিপাকের জন্য জৌনপুরী পীর সাহেবদের ঈদের সময়ে আসাটা অনিয়মিত হয়ে যায়।

বাড়ির কিশোরীরা, যাদের ঈদের জামাতে যেতে হয় না, তারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে মুরুব্বিদের সালাম করে, সমবয়সীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করে আর ঈদের পোশাকাদী নিয়ে আলোচনায় মেতে ওঠে। যুবকদের কেউ কেউ বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি বেড়াতে যায়, কেউ বড় পর্দায় চলচ্চিত্র দেখার জন্য সিনেমা হলে ঢুকে পড়ে। তরুণীরা ঘুরে বেড়ায় এ-বাসা থেকে ও বাসা। ঘুরতে ঘুরতে যখন ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে, তখন ঘরের পাখিরা ঘরে ফেরে। আর সন্ধ্যার পর থেকে বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে প্রচারিত ও ঈদ উপলক্ষে নির্মিত বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানগুলো দেখতে থাকে। এভাবেই কেটে যায় ঈদুল ফেতরের একটি আনন্দময় দিন।

www.pathagar.com

২. ঈদুল আজহা

ঈদুল আজহা মুসলিম সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব। এ ঈদের আয়োজন মোটামুটি দিন পনেরো আগে থেকেই শুরু হয়। এ ঈদেও সচ্ছল পরিবারের অনেক ছেলেমেয়ে নতুন পোশাক নেয়। তবে শিশু-কিশোর ও তরুণ-তরুণীরাই নতুন পোশাকের জন্য বেশি বায়না ধরে থাকে।

কোরবানির গরু বা ছাগল কেনা নিয়ে বাড়ির গৃহকর্তাদের অনেককেই আগের কয়েকটি দিন খুব বেশি ব্যস্ত থাকতে হয়। যাদের দেখাশোনা করার লোক আছে, তারা একটি ঈদ শেষ হয়ে যাবার দু'তিন মাস বা চার-পাঁচ মাস পরই গরু বা ছাগল কিনে লালন-পালন করতে থাকে, যাতে পরবর্তী কোরবানিতে কোরবানি দেওয়া যায়। যাদের লোকজন নেই, তারা ঈদের দু'একদিন আগে পশু কেনার কাজটি করেন। বাড়ির মুরুব্বীরা ছাগল কিনে আনলে শিশু-কিশোররা আনন্দে মেতে ওঠে। ছাগলকে কাঁঠালের পাতা খাওয়ানোর জন্য তারা দু'একটি করে পাতা নিয়ে ধীর পায়ে এগিয়ে যায় ও ছাগলের মুখের সামনে পাতাটি এগিয়ে ধরে। গরুতে শিশু-কিশোররা সন্তুষ্ট হতে পারে না। গরু দেখলে তারা ভয় পায়। কখন শিং দুটো খাড়া করে তেড়ে এসে গুঁতো মেরে দেয়!

মসজিদের ইমাম, মোয়াজ্জিন ও মাদ্রাসার ছাত্ররা উন্মুক্ত ছুরি হাতে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে গরু-ছাগল জবেহ করার জন্য। এর বিনিময়ে তারা গ্রহণ করে থাকেন পশুটির চামড়া বা নগদ হাদিয়া। অধিকাংশ মানুষই এই হুজুর ও মাদ্রাসা ছাত্রদের দিয়ে জবাই করিয়ে থাকেন। হাতে গোনা দু-একজন পাওয়া যাবে যারা নিজেদের কোরবানির পশু নিজেরাই জবেহ্ করে থাকেন।

একে একে শেষ হয়ে যায় জবাই ও কাটাকুটির পালা। এরপরও বহু ঝামেলা থাকে। মাংসগুলোকে সমান ভাগ করে গরিব-মিসকিনের অংশ, আত্মীয়-স্বজনের অংশ ও নিজেদের অংশ আলাদা করে বণ্টন করা হয়। এই দিনে অনেককেই গরিব-দুঃখী ও আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি অধিকতর সচেতন হতে এবং তাদের প্রতি যথাযথ দায়িত্বপালনে তৎপর হতে দেখা যায়। এইদিনে শিশু-কিশোরদের বন্ধু-বান্ধবের বাড়িতে বেড়াবার সময় হাতে থাকে কম। তারা বসে বসে মাংস কাটা পর্যবেক্ষণ করে। ঈদের দিনে আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের বাড়িতে গিয়ে বেড়ানো ছাড়া আনন্দ-বিনোদনের বিশেষ কোনো ব্যবস্থা নেই। যুবক ও তরুণদের অনেকে ঈদ উপলক্ষে সিনেমা হলে ঢুকে পড়ে।

দুটি ঈদেই নামাজ পড়া হয় ঈদগাহে। তবে বৃষ্টি বা এ জাতীয় কোনো প্রাকৃতিক বৈরিতার সম্মুখীন হলে বড় বড় মসজিদগুলোতে ঈদের নামাজের জামাত অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। মার্কাজ মসজিদ, উপজেলা মসজিদসহ বিভিন্ন এলাকার বড় বড় মসজিদ এবং মাঠগুলোতে ঈদের নামাজের জামাত অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

৩. শবেবরাত

বিশ্বের সকল মুসলমানের কাছে শবেবরাত হচ্ছে 'সৌভাগ্যের রজনী'। বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকার মুসলমানদের মতো দৌলতখানের মুসলমান সম্প্রদায়ও এ-রাত

www.pathagar.com

অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও একাগ্রতার সাথে এবাদত-বন্দেগীর মাধ্যমে কাটিয়ে থাকেন। কারণ, এ রাতে আল্লাহতাআলা তাঁর প্রিয় বান্দাদের প্রার্থনা কবুল করেন, তওবা কবুল করেন এবং গোনাহ্ মাফ করে দেন। এ রাতেই মহান আল্লাহতাআলা সমস্ত সৃষ্টির জন্ম-মৃত্যু, ভালো-মন্দ, মঙ্গল-অমঙ্গল, রেজেক ও ধন-দৌলত নির্ধারণ করেন। এখানকার বড় বড় মসজিদগুলোতে, বিশেষত মার্কাজ মসজিদ, উপজেলা মসজিদসহ অন্যান্য মসজিদে ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা সারারাত এবাদত ও জিকির করে কাটিয়ে দেন।

ধর্মীয় অনুশাসনমালার অনুসরণ যে-কোনো ধর্মীয় উৎসবের মূল বিষয় হলেও শবেবরাতে বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকার মতোই, সামাজিকতার বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে প্রাধান্য পায়। এ দিনে আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীর সাথে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির নতুন সেতুবন্ধন রচিত হয়। এ দিনে মুসলমানরা বাসায় বুট ডালের হালুয়া, সুজির হালুয়া, আলবান, চইপিঠা ও চালের গুঁড়ার রুটিসহ বিভিন্ন খাবার তৈরি করে থাকেন ও সেগুলো প্রতিবেশীদের বাড়ি বাড়ি পাঠিয়ে দেন। এরাতে সবাই একটু ভালো ভালো খাবার খেয়ে থাকেন, কারণ তাদের মধ্যে এই বিশ্বাস রয়েছে যে, যেহেতু আল্লাহতাআলা এই রাতে সমস্ত সৃষ্টির উপায় নির্ধারণ করে থাকেন, সেহেতু এ রাতেও একটু ভালো-মন্দ খেতে পারলে সারা বছরটা একটু ভালোভাবেই কাটবে। অনেকে আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীর বাসায় বাসায় খাবার পৌছানোর মতো সামাজিকতা রক্ষা করতে গিয়ে এতোটাই ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েন যে, আল্লাহতাআলার এবাদত করার মতো আর কোনো সুযোগ তাদের হাতে থাকে না। এ রাতে অনেকেই গোরস্থানে গিয়ে তাদের মৃত মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজন ও কবরবাসীর জন্য দোওয়া করেন এবং তাদের সমস্ত গোনাহ্ ও কবর আজাব মাফ এবং বেহেশতবাসী করার জন্য পরম করুণাময়ের দরবারে কান্নাকাটি করেন।

৪. দুর্গোৎসব

দেবী দুর্গার স্বামীগৃহ থেকে পিতৃগৃহে আগমন উপলক্ষে অন্যান্য এলাকার মতো দৌলতখান উপজেলায়ও অত্যন্ত আড়ম্বরের সাথে পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। সব ধর্ম ও বর্ণের মানুষই এ পূজার মণ্ডপে উপস্থিত থাকতে পারেন। দৌলতখান উপজেলার মদনমোহন বাউদির মন্দির, চরপাতা সৃষ্টিতলা মন্দির, বালাবাড়ির মন্দিরসহ অন্যান্য মন্দিরেও দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। প্রতিমা নির্মাণের জন্য উপজেলার বাইরে থেকে, বিশেষকরে ভোলা থেকেও শিল্পী আনা হয়। তিন-চারদিন ধরে চলে মাটির কাজ। তারপর রং-তুলির আঁচড়ে দেবী দুর্গার প্রতিমাকে করে তোলা হয় অনিন্দ্যসুন্দর ও আকর্ষণীয়। সনাতন ধর্মাবলম্বী হাজার হাজার নর-নারী, শিশু-কিশোর, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা দেবী দর্শন, আরতি নিবেদন ও প্রসাদ গ্রহণের জন্য বিভিন্ন মন্দিরে ঘুরে বেড়ান।

পুজোর কয়েকদিন এ ধর্মের অনুসারীরা নতুন নতুন পোশাক পরেন। রমণীরা এ সময়ে লালপেড়ে শাড়ি এবং তরুণীরা সালোয়ার-কামিজ পড়তে ভালোবাসেন। তবে অনেক তরুণী পূজা উপলক্ষে শাড়িও পরে থাকেন। শুধু সালোয়ার-কামিজ কেন, জিন্স, ফতুয়া পরেও পূজামণ্ডপে ঘুরে বেড়ানো যায়, কিন্তু কপালে টিপ, হাতে আলতার বিচিত্র

www.pathagar.com

ও মনোহর নকশা এবং খোঁপায় তাজা ফুলের মালা জড়িয়ে তরুণীরা যখন এক পূজামণ্ডপ থেকে আরেক পূজামণ্ডপে ঘুরে বেড়ায়, তখন মনে হয় এটিই পূজার প্রকৃত সাজ, সনাতনী সাজ। পুরুষদের তো পূজায় ধুতি পরতেই হবে। আজকাল আর ধুতি শুধু সাদা রং-এর মধ্যেই সীমিত থাকে না—অফ হোয়াইট, লাল, হলুদ ধুতিও পরে থাকেন অনেকে। তবে বয়স্করা সাদা ধুতি আর পাঞ্জাবিকেই আবহমান বাংলার দুর্গাপূজার পোশাক বলে মনে করেন।

সনাতন ধর্মানুসারীরা তাদের ভিন্ন ধর্মাবলম্বী বন্ধু-বান্ধবদেরও নিমন্ত্রণ করে থাকেন। মুসলমানসহ সবাই এতে অংশগ্রহণ করে থাকেন। অতিথিদের নারিকেলের নাড়ু, মুড়ির মোয়া, সন্দেশ, লুচি ইত্যাদি দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়।

৫. লক্ষ্মীপূজা

আশ্বিন মাসের কোজাগরী পূর্ণিমায় সনাতন ধর্মাবলম্বী প্রতিটি মানুষের ঘরে ঘরে অত্যন্ত জাঁকজমক ও আড়ম্বরের সাথে সমৃদ্ধি, সৌভাগ্য, সৌন্দর্য ও সম্পদের দেবী লক্ষ্মীর বার্ষিক পূজা অনুষ্ঠিত হয়। দেবী লক্ষ্মীকে জল, আতপ চাল, চন্দন, দূর্বা, মধু, ফল, ফুল, দধি, বিল্বপত্র, বস্ত্র ও সোনা-রূপার গহনা নিবেদন করা হয়। এ রাতে সনাতন ধর্মানুসারীরা সারারাত নির্ঘুম কাটায়। কারণ, তারা বিশ্বাস করেন যে, এ রাতে যারা সারারাত জেগে থেকে দেবীর উপাসনায় নিমগ্ন থাকেন দেবী তাদের ঘরে ঘরে গিয়ে আশীর্বাদ বিতরণ করেন। চিড়া ও ডাবের পানি দিয়ে বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনকে আপ্যায়ন করা হয়। সনাতন ধর্মাবলম্বীরা এই পূজা উপলক্ষে আতপ চালের গুঁড়ার সাথে পানি মিশিয়ে ঘরের দরজা, মেঝে, উঠান এবং বিশেষকরে ঘরের দরজা থেকে দেবী লক্ষ্মীর আসন পর্যন্ত আলপনা এঁকে থাকেন।

৬. সরস্বতীপূজা

উপজেলার প্রায় প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই জ্ঞান-বিজ্ঞান, সংগীত ও শিল্পকলার দেবী সরস্বতীপূজা উদ্‌যাপন করা হয়ে থাকে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে মন্দিরেও পূজামণ্ডপ তৈরি করা হয়। এ পূজা উপলক্ষে সনাতন ধর্মাবলম্বীরা তাদের মুসলিম বন্ধুদের আপ্যায়ন করে থাকে।

৭. নবান্ন

কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে গ্রাম-বাংলার ফসলের ক্ষেতগুলো যখন পাকা ধানে ভরে যায়, কৃষকেরা তখন ফসল তোলার আনন্দে মেতে ওঠে। একটি ভালো দিন, অর্থাৎ শুভ দিন দেখে কৃষক নতুন ধান কাটা শুরু করে। এই ধানের অন্ন গ্রহণের মুহূর্তটি যে কতো-আনন্দময়, কতো তৃপ্তিদায়ক, তা যারা ক্ষেতে ফসল ফলায় তারা ছাড়া আর কে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। আনন্দময় ও শুভ মুহূর্তটিকে বাড়ির সবাই মিলে উপভোগ করাটাই নবান্ন।

স্থানীয় প্রজাতির একমুট নতুন ধান কাঁচি দিয়ে কেটে মাথায় নিয়ে কৃষক ঘরে প্রবেশ করে কয়েকটি জায়গায় তা বেঁধে রাখে। কিছু ধান থেকে চাল করে অন্য চালের সাথে মিশিয়ে ভাত রান্না করে। কয়েক রকমের তরকারি ও মাছ রান্না করা হয়। তারপর

www.pathagar.com

আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী মিলে একত্রে বসে খাওয়া-দাওয়া করে। কেউ আসতে অসমর্থ হলে তার ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্বের এরূপ বন্ধনই নবান্ন উৎসবের প্রাণ।

বাড়ির গৃহিণীরা নতুন ধানের চালের গুঁড়ি দিয়ে নানান রকম পিঠা-পায়েস তৈরি করে। আত্মীয়-স্বজনকে দাওয়াত দেয়, পাতিল ভর্তি করে মেয়ের শ্বশুর বাড়ি পাঠায়। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের কেউ কেউ চালের গুঁড়োর সাথে পানি মিশিয়ে তা দিয়ে বাড়ির উঠানে, ঘরের মেঝেতে আলপনা আঁকে, লক্ষ্মীদেবীর পূজা দেয়।

৮. নববর্ষ

এ দিনটি গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষের জীবনের সঙ্গে নানাভাবে জড়িত। বাংলা নতুন বছরের এই দিনটি বিভিন্ন আনন্দোৎসবের মধ্য দিয়েই মোটামুটিভাবে কেটে যায়। বাড়িতে একটু ভালো খাবার-দাবারের ব্যবস্থা করা হয়, পিঠা-পায়েস তৈরি করেন গৃহিণীরা। বছরের প্রথম দিনটিতে একটু ভালো খাবার-দাবার উদরস্থ না খেলে কেমন হয়। তাই বিত্তবান-বিত্তহীন যার যার সামর্থ্য অনুযায়ী একটু ভালো রান্না-বান্নার আয়োজন করে থাকেন। বাজারের দোকানগুলোতে হালখাতার উৎসবে আমন্ত্রিত অতিথিদের আগমন ঘটে। দোকান-মালিকরা তাদের পুরনো ক্রেতাদের সামনে পুরনো বছরের হিসাবটি মেলে ধরেন, তারপর পাওনার সম্পূর্ণ কিংবা আংশিক গ্রহণ করে নতুন বছরের নতুন খাতায় লিপিবদ্ধ করেন এবং তাদের সন্দেশ-রসগোল্লা, চা ও পানে আপ্যায়িত করেন।

নববর্ষ উপলক্ষে গ্রামে-গঞ্জের বিভিন্ন স্থানে স্বতঃস্ফূর্ত মেলা বসে। মিরধার হাট-খায়ের হাটের মাঝামাঝি 'কলাকোপা' বিলে অনুষ্ঠিত হয় 'গরুর লড়াই'। বিভিন্ন উৎসাহী গরুর মালিকেরা তাদের গরুগুলোকে ঝলমলে সাজে সাজিয়ে আনেন। এই 'গরুর লড়াই' প্রতি বছরের ১লা বৈশাখে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

বাজারের রাস্তার পাশে, চরপাতার সৃষ্টিতলায় স্বতঃস্ফূর্ত মেলা বসে। মাটির খেলনা, পুতুল, বাঁশি, বেলুন, তালপাখা, জিলাপি, মিষ্টির দোকান বসে যায় এখানে সেখানে। শিশু-কিশোররা বেলুন উড়িয়ে, বাঁশিতে ফুঁ দিতে দিতে মেলা প্রাঙ্গণে ঘুরে বেড়ায়।

সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে।

৯. হালখাতা

ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে ছোট-বড় সব ব্যবসায়ীই এই দিনটি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পালন করে থাকেন। এর জন্য প্রস্তুতিও প্রয়োজন হয়। দোকানপাট, বাড়ি-ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা, দেওয়ালে চুনকাম করা, বিভিন্ন তাক থেকে মালামাল নামিয়ে সেগুলোর ধুলা-বালি পরিষ্কার করা, ঘরের কোণে জমে ওঠা মাকড়সার জালগুলো ঝুল ঝাড়ু দিয়ে তুলে আনা, পানি ঢেলে দিয়ে কিংবা ন্যাকড়া দিয়ে ঘরের মেঝে সাফ করা এবং মাটির মেঝে হলে নতুন মাটি দিয়ে লেপ দেওয়া। তারপর হিসেবের খাতা নিয়ে বসে কার

www.pathagar.com

কাছে কত পাওনা আছে তার একটি তালিকা প্রস্তুত করা। এরপর আমন্ত্রণপত্র অর্থাৎ কার্ড ছাপানো। কার্ডের মধ্যে বকেয়া পাওনার পরিমাণের কথা উল্লেখ করে দিয়ে ১লা, ২রা, ও ৩রা বৈশাখ 'শুভ হালখাতা' করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়।

এদিন নতুন বছরের জন্য নতুন হিসাবের খাতা খোলা হয়। একটি রূপার মুদ্রায় সরিষার তেল লাগিয়ে সিঁদুর মেখে খাতার চারকোণে চারটি ও মাঝখানে একটি ছাপ দেওয়া হয়। বয়োজ্যেষ্ঠ একজনকে দিয়ে নতুন খাতাটি খোলানো হয়। তাঁকে ধুতি-পাঞ্জাবি ও নগদ অর্থ সম্মানী দেওয়া হয়।

হালখাতার দিন যথারীতি আমন্ত্রিতরা নির্দিষ্ট দোকানগুলোতে যান, যাদের সাথে তাদের লেনদেন রয়েছে। এইদিন আর দেনা-পাওনা নিয়ে কেউ বাকবিতণ্ডা করেন না। যে গ্রাহক যে পরিমাণ টাকা দেন, হিসেবের নতুন খাতায় তাই জমা নেওয়া হয়। কোনো দোকানের মালিক বলেন না যে, ভাই এতো টাকার মধ্যে মাত্র এই কটা টাকা। দোকানের মালিক সহাস্যে শুভেচ্ছা বিনিময় এবং চা-মিষ্টি খাইয়ে আমন্ত্রিত অতিথি বিদায় দেন।

দৌলতখানে একটি ব্যতিক্রমধর্মী হালখাতার আয়োজন করে থাকেন টিনব্যবসায়ী হাফেজ। এদিন বিশাল প্যান্ডেল তৈরি করে শহরের সমস্ত গণ্যমান্য ব্যক্তিসহ তিনি তাঁর গ্রাহকদেরও আমন্ত্রণ এবং মধ্যাহ্নভোজে আপ্যায়িত করেন।

১০. বরণকুলা

বর ও কনের গায়ে হলুদের জন্য উভয়পক্ষ থেকে আলপনা আঁকা বাঁশ-বেতের তৈরি হলুদের কুলা-ডালা পাঠানো হয়। এতে গায়ে হলুদের জন্য বাঁটা হলুদ, সাতটি গোটা হলুদ, সাতটি দুল্পা (দূর্বা), সাতটি পান, সাতটি ধান, সোন্দা, মেথি, গিলা, পারফিউম, সাবান ও তেল ইত্যাদি ছাড়াও সামর্থ্য অনুযায়ী দুই পক্ষই হলুদের পোশাক-পরিচ্ছদ, রাখী, প্রসাধনী ও কিছু হাল্কা অলংকারাদি পাঠায়। দুই পক্ষ থেকেই একদল কিশোরী-তরুণী হলুদ শাড়ি পরে খোঁপায় বা বেণীতে ফুল দিয়ে সেজে অপর পক্ষের বাড়িতে ডালা-কুলা নিয়ে যায়। হলুদসামগ্রীর সঙ্গে বিভিন্ন মিষ্টান্ন দ্রব্য, সঙ্গে বড় একটি বা দুটি মাছ ও পান-সুপারি-চুনও পাঠাতে হয়। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের ক্ষেত্রে বিয়ের একদিন আগে অর্থাৎ অধিবাসের দিন বরণকুলা-তত্ত্ব পাঠানো হয়ে থাকে।

১১. তেলাই দেওয়া

মুসলমান-হিন্দু, ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত বা অশিক্ষিত সব পরিবারের বর ও কনেকে বিয়ের দুদিন বা একদিন আগে 'তেলাই' বা গায়ে হলুদ দেওয়া হয়। বর বা কনের বাড়ি থেকে পাঠানো সামগ্রী দিয়ে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। হিন্দুসমাজে ছেলের গায়ে-ছোঁয়ানো হলুদ মেয়ের গায়ে মাখানো হয়। সর্বাগ্রে ধোপা ও নাপিতকে হলুদ স্পর্শ করে দিতে হয়। গায়ে হলুদ বা তেলাই দেওয়ার পর বর ও কনে উভয়কেই কিছু বিধি-নিষেধ মেনে চলতে হয়। বিশেষকরে, গায়ে হলুদ দেওয়ার পর কেউ ঘরের বাইরে যেতে পারে না।

www.pathagar.com

১২. বধূবরণ

হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ নতুন বউকে বরণ করে থাকেন। জামাই-বউ গাড়ি, রিক্সা বা নৌকায় করে এলে তাদের মিষ্টি খাইয়ে কোলে করে নামিয়ে আনা হয়। একটি পানি অথবা দুধভর্তি হাঁড়িতে আমপাতা ভিজিয়ে নিয়ে নববধূর গায়ে ছিটা দিতে হয়। এরপর তার হাতের কনিষ্ঠাঙুলি ঐ দুধ বা পানিতে ভিজিয়ে নেওয়া হয়। একটি কুলায় সাত টুকরা হলুদ, সাতটি ধান ও সাতটি দুল্পা (দূর্বা) নিয়ে কুলাটি বউয়ের কপালে ছোঁয়ানো হয়। এরপর মা-চাচীরা ছেলে ও বৌয়ের মাথায় ধান-দূর্বা ছিটিয়ে দিয়ে নতুন শাড়ির ওপর দিয়ে হাঁটিয়ে অথবা কোলে করে বরণ করে ঘরের ভেতরে নিয়ে যায় এবং মা তার দুই উরুর ওপর দুজনকে বসিয়ে দুধের সরবত ও মিষ্টি পান করায়। ধীরে ধীরে অন্য আত্মীয়-স্বজনরা একের পর এক বর ও বধূকে রসগোল্লা বা ফিরনি খাইয়ে নতুন বউকে বরণ করে নেয়।

তজুমুদ্দিন উপজেলা

১. ঈদ উৎসব

মুসলমানদের দুটি বড় ধর্মীয় উৎসব ঈদুল ফেতর ও ঈদুল আজহা। ঈদুল ফেতর রোজার ঈদ আর ঈদুল আজহা কোরবানির ঈদ নামেই সমধিক পরিচিত। রমজান মাস শেষে নিজের চোখে ঈদের চাঁদ দেখা যাক আর না যাক, সন্ধ্যার পর রেডিও-টিভিতে যদি কাজী নজরুল ইসলামের 'ও মন রমজানের রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ' গানটি প্রচারিত হতে থাকে বারবার, তখনই বুঝতে হবে, জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দেশের কোথাও চাঁদ দেখা গেছে এবং কাল ঈদ—রোজার ঈদ। সঙ্গে সঙ্গে ঘরে-বাইরে উৎসবের আমেজ পড়ে যায়। রোজার মধ্যেই কেনা-কাটা শুরু হয়ে থাকলেও শেষ রোজার দিনের জন্য কিছু না কিছু থেকেই যায়। আগে মনে ছিল না, ঈদের ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায়—ছুটতে হয় বাজারে। বিশেষকরে এদিনে অনেকে কেনাকাটা করে আনন্দ পান, চাঁদ রাত তো। অনেকে জুতা কিংবা তৈরি পোশাক কিনতে বের হয়ে যান ঘর থেকে, কেউ বা কাঁচা বাজারে, কেউ বা মুদি দোকানে।

ঈদের কেনাকাটা বলতে যা বোঝায়, ঈদের পোশাক, তা শুরু হয়ে যায় বলতে গেলে শবেবরাতের পর থেকেই। তারপর রমজানের চাঁদ দেখা গেলে তার গতি আর একটু বৃদ্ধি পায়। লোকজন, যারা কাপড় কিনে জামা-কাপড় তৈরি করিয়ে নেবেন, তারা একটু আগে-ভাগেই দোকান থেকে পছন্দের কাপড়টা কিনে নিয়ে দরজির দোকানে তা তৈরির জন্য অপেক্ষা করেন। কারণ, অনেক দরজিকেই ১৫ রোজার পর থেকে অর্ডার নেওয়া বন্ধ করে দিতে দেখা যায়। তারপরও যে নেয় না, তা নয়। অনেকে অনুরোধে, পরিচয়ের খাতিরে অসুবিধা হলেও অর্ডার নেয়। আর দরজিদেরও বিশ্রাম নেওয়ার কোনো অবকাশ নেই। ঈদের দিন সকাল অবধি তারা সর্বশেষ অর্ডার ডেলিভারি দিতে প্রাণান্ত চেষ্টা করে থাকেন।

ঘরের গৃহিণীরা তো বটেই, ছোট শিশুরাও জেগে যায় ভোর না হতেই। ঈদ বলে কথা! গৃহিণীরা আবার ছোটদের এতো ভোরে ওঠার তড়িঘড়ি দেখে বিরক্ত হন, আরো

www.pathagar.com

কিছুক্ষণ শুয়ে থাকতে বলেন। তারা উঠে গেলেই তাদের কাজে কিছুটা বিঘ্ন সৃষ্টি হবে। গৃহিণীরা চুলা জ্বেলে ফিরনি, জর্দা এসব বসিয়ে দেন। অনেকে ঈদের দিনের অধিক ব্যস্ততা এড়াতে কিংবা ঈদের দিনের কাজটি আগের দিনে সেরে রেখে ঈদের দিনটিতে একটু ঘোরাঘুরি কিংবা বিশ্রাম নেওয়ার সুযোগটুকু করে নেন।

ঘরের পুরুষ সদস্যরা গোসল সেরে নিয়ে নতুন বা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড় পরে ঈদের মাঠে রওয়ানা দেন। এক অসাধারণ ব্যস্ততা কখন ঈদের মাঠে গিয়ে পৌঁছাবে। সারি বেঁধে জায়নামাজ বিছিয়ে বসবে। সদর উপজেলা মসজিদ, দক্ষিণ খামেরহাট ঈদগাহ্, শিবপুর খামেরহাট বড় জামে মসজিদ কিংবা অন্য কোনো মসজিদে। এদিকে ঘরের ভিতরে রান্নাঘরে মহিলাদের ছুটোছুটি। নিজস্ব সামর্থ্য অনুযায়ী ফিরনি, পায়েস, পোলাও, কোর্মা, রেজালা, জর্দা, চটপটি ইত্যাদি রান্না করে থাকেন। এদিন, যাদের আর্থিক সচ্ছলতা নেই, প্রকৃতপক্ষে তাদের দিনটি কাটে বড় নিরানন্দে, বিষণ্নতায়। ঘরের গৃহকর্তা বা গৃহকর্ত্রী বাচ্চা-কাচ্চাদের নতুন পোশাক না দিতে পারার অক্ষমতায় ভাগ্যকে দোষারোপ করেন, সৃষ্টিকর্তার প্রতি অভিযোগের আঙুল তুলেন, কিংবা আল্লাহ্‌তাআলার ইচ্ছার প্রতি সন্তুষ্ট থেকে তারই শোকর করেন। কিন্তু সন্তানদের গায়ে নতুন কাপড় তুলে না দিতে পারার ব্যর্থতা তাদের জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দগ্ধ করে। এরা না পারে কারো কাছে চেয়ে নিতে, না পারে রাস্তায় বসে হাত পাততে।

যারা ফেতরা দেওয়ার সামর্থ্য রাখেন, তাদের ঈদের নামাজের আগেই তা পরিশোধ করতে হয়। এজন্য দুস্থরা মুসল্লিদের যাতায়াতের পথে, কিংবা মসজিদের আশেপাশে ফেতরার টাকার জন্য হাত বাড়িয়ে দেন।

ঈদ উপলক্ষে সবাই তো নিজেকে একটু সুন্দর করে সাজিয়ে তুলতে চান, নারী-পুরুষ সবাই। পুরুষদের সাজ তো আর অতোটা বিস্তৃত নয়, যতটা মেয়েদের। মেয়েরা অবশ্য ঈদের আগের দিন রাতেই কিছুটা সেরে নেয়। যেমন, মেহেদি দিয়ে নখ, হাতের তালু, তালুর উপরিভাগ থেকে কনুই পর্যন্ত মেহেদি দিয়ে নানা রূপে চিত্রিত করে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তোলেন। তরুণীরা তো অনেকটা আগে-ভাগেই, অর্থাৎ ঈদের নামাজ শেষ হয়ে গেলেই তারা এ-ঘর, ও-ঘর, এ-বাড়ি ও-বাড়ি একটু ঘুরে আসা, দেখা-সাক্ষাৎ করার জন্য বেরিয়ে পড়ে। গৃহিণীদের বের হতে হলে সন্ধ্যার পর হয়ে যায়। কারণ, সংসারের সমস্ত কাজ সেরে, স্বামী-শ্বশুর-শাশুড়ি, দেবর ননদ ও নিজের সন্তানদের পাতে খাবার তুলে দিয়ে শেষ না করা পর্যন্ত তাদের এতটুকু অবসর নেই। তারপর হয়তো দু-এক ঘরে গেলেও যাওয়া যায়। সারাদিনের ক্লান্তিটা যৎসামান্য লাঘব করা আর কি।

ঘরের তরুণ-যুবকদের এদিন কোনোকিছুরই বালাই থাকে না। পড়াশোনার চাপ নেই, বাবা-মা'র শাসন নেই, কেবল বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেওয়া আর ঘুরে বেড়ানো। কেউ কেউ সিনেমা হলে বড় পর্দায় নতুন কোনো সিনেমা দেখার জন্য। অনেকের এমনও হয়, ঈদ উপলক্ষেই প্রথম সিনেমা হলের চৌকাঠ পেরুনো হয়।

বিকালে যুবক-তরুণদের আড্ডা দেওয়া ছাড়া তেমন কোনো কাজ থাকে না। আগে যেমন বিকেলে ঈদ উপলক্ষে প্রীতি ফুটবল ম্যাচ কিংবা হাডুডু প্রতিযোগিতা

www.pathagar.com

হতো, আজকাল আর তেমনটি দেখা যায় না। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে আত্মীয়-বাড়ি বেড়িয়ে দিনটি দেখতে না দেখতে শেষ হয়ে যায়। সন্ধ্যায় টেলিভিশন। ঈদ উপলক্ষে নির্মিত বিভিন্ন অনুষ্ঠান, নাটক, আনন্দমেলা ইত্যাদি অধিক রাত অবধি জেগে দেখা।

কোরবানির ঈদ বা ঈদুল আজহায় নতুন পোশাক-পরিচ্ছদ নেওয়ার খুব একটা তাগিদ থাকে না। তবে বিত্তবানদের অনেকে নিয়ে থাকেন। এ ঈদের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হলো কোরবানি দেওয়া। যাদের সামর্থ্য থাকে, তারা কোরবানি দিয়ে থাকেন। আর এই কোরবানির গরু-ছাগল কেনা আর তার পরবর্তী ঝক্কি-ঝামেলাও কম নয়। হাটে গিয়ে গরু কেনা, কোরবানি দেওয়া পর্যন্ত সেগুলো লালন-পালন করা, এটা খুবই কষ্টসাধ্য ও ঝামেলাপূর্ণ। ছাগল কেনা হলে তো কাঁঠাল পাতা খাইয়েই খালাস। আর এ কাজটি ছোট ছোট শিশুরাই করে থাকে।

এরপর সময় চলে যায় খুব দ্রুত। নামাজ আদায়ের সঙ্গে সঙ্গেই কোরবানি দেওয়া, মাংস কাটা, নিয়মমাফিক ভাগ করা, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী ও দুস্থদের জন্য যার যার নির্ধারিত অংশ বিতরণ করতে করতেই দুপুর গড়িয়ে বিকাল, কখনো বা বিকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা। যেসব আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি মাংস পৌঁছাতেই হবে, এমন আত্মীয়দের বাড়ি দূরে হলে তো মাংস বিতরণ করে বাড়ি ফিরে আসতেই রাত।

২. শবেবরাত

সারাদেশের মুসলমানদের মতো এ উপজেলার মুসলমানরাও বিশ্বাস করে থাকেন, এ-রাতে আল্লাহতাআলা তার সমস্ত সৃষ্টির, তাঁর বান্দাদের জন্ম-মৃত্যু, ধন-সম্পদ ইত্যাদি সবকিছু নির্ধারণ করে থাকেন। একটি বিশ্বাস সেই কোনো সময় থেকে প্রচলিত জানা যায় না যে, এ রাতে একটু ভালো খাবার খেতে পারলে সারা বছরই ভালো ভালো খাবার খাওয়া যাবে। এখনো মানুষ এ বিশ্বাস পোষণ করে থাকেন বলে এ রাতে একটু ভালো খাবার-দাবারের আয়োজন করে থাকেন যার যার সামর্থ্য অনুযায়ী। এমনকি যিনি নিতান্ত গরিব, তিনিও চেষ্টা করেন একটু সামান্য উন্নততর খাবার খেতে। এই দিনেও সাধারণত বছরের পয়লা দিনের মতোই কেউ কারো কাছ থেকে ধার-কর্জ নেন না, দেনও না। মুসলিম দোকান-মালিকরাও এদিনে বাকি বিক্রি থেকে বিরত থাকেন। তারা এমন বিশ্বাস পোষণ করে থাকেন যে, এ দিন বাকিতে বিক্রি করলে বা বাকিতে কিনতে গেলে সারাটা বছরই একইভাবে চলবে।

শবেবরাতের দিনের আর একটি সংস্কৃতি একসময় ভীষণভাবে চালু ছিল। বুটের ডালের হালুয়া, সুজির হালুয়া, পেঁপের হালুয়া, গাজরের হালুয়া ইত্যাদি তৈরি করে পাড়া-প্রতিবেশীর ঘরে ঘরে পাঠানো। প্রথাটি এখনও কিছুটা চালু থাকলেও আগের মতো অতোটা অবশ্য পালনীয় এখন আর মনে করা হয় না।

৩. দুর্গোৎসব

হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব হচ্ছে দুর্গোৎসব। এইদিনে দেবী দুর্গা স্বামীগৃহ থেকে পিতৃগৃহে আগমন করে থাকেন। এ উপলক্ষে এ অঞ্চলের সনাতন ধর্মাবলম্বীরা দিনটি খুব জাঁকজমকের সাথে উদ্‌যাপন করে থাকে।

www.pathagar.com

পূজা শুরুর কয়েকদিন আগে থেকেই অনিল বাবাজীর মন্দির, রায়মোহন মেম্বারবাড়ি মন্দির, কালীবাড়ি মন্দির, ভুবনঠাকুর বাজার ঠাকুরজী মন্দিরসহ বিভিন্ন মন্দিরে ও স্থানে প্রতিমা নির্মাণের কাজটি শুরু হয়ে যায়। ভোলা কিংবা ভোলার বাইরে থেকেও প্রতিমা নির্মাণশিল্পী আনা হয়। মাটির কাজ শেষ হতে সময় লাগে ৪/৫দিন। তারপর রং-তুলির স্পর্শে দেবী-দুর্গা হয়ে ওঠেন সর্বাঙ্গসুন্দর। তারপর তাঁকে পরানো হয় বিভিন্ন মূল্যবান পোশাক। ষষ্ঠীর দিনে দেবী লাভ করেন পূর্ণাঙ্গ রূপ। শঙ্খ, উলুধ্বনি আর মঙ্গলধ্বনিতে সনাতন ধর্মাবলম্বীরা বরণ করে নেন দেবী দুর্গাকে।

উপজেলার মদনমোহন মন্দিরসহ বিভিন্ন মন্দির ও পূজামণ্ডপে ঢল নামে সনাতন ধর্মানুসারী শত শত শিশু-কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতী এবং বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার। তারা নতুন পোশাক পরে দেবী দর্শন করে আরতি নিবেদন এবং প্রসাদ গ্রহণ করেন। এভাবে তারা মণ্ডপে মণ্ডপে ঘুরে বেড়ান।

এদিনে মুসলমান সম্প্রদায়ের বন্ধুরা তাদের হিন্দু বন্ধুদের আতিথ্য গ্রহণ করে থাকেন। তারা পূজামণ্ডপে কিংবা বাসায় গিয়ে হিন্দু বন্ধুদের শারদীয় শুভেচ্ছা জানান।

৪. লক্ষ্মীপূজা

আশ্বিন মাসের কোজাগরী পূর্ণিমায় সমৃদ্ধি ও সম্পদের দেবী লক্ষ্মীর বার্ষিক পূজা অনুষ্ঠিত হয়। সনাতন ধর্মাবলম্বীরা বিশ্বাস করেন যে, এ রাতে যারা সারারাত দেবীর উপাসনা করে, তিনি তাদের ঘরে ঘরে গিয়ে আশীর্বাদ বিতরণ করেন। সনাতন ধর্মাবলম্বীরা তাই সারারাত জেগে থেকে দেবীর উপাসনা করে এবং চিড়া ও ডাবের পানি দিয়ে আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীদের আপ্যায়ন করে থাকে। তারা আতপ চাল, দূর্বা, চন্দন, মধু, ফুল, ফল দধি, ঘি, বিল্বপত্র, বস্ত্র ইত্যাদি দেবী লক্ষ্মীকে নিবেদন করে থাকেন।

অনেকে প্রতি বৃহস্পতিবার লক্ষ্মীপূজা করে থাকেন। সনাতন ধর্মাবলম্বী প্রায় প্রতিটি পরিবারে লক্ষ্মীর জন্য একটি আসন রাখা হয়। এ পূজা উপলক্ষে উঠান এবং ঘরের দরজা থেকে লক্ষ্মীর আসন পর্যন্ত আতপ চালের গুঁড়ির সাথে পানি মিশিয়ে আলপনা আঁকা হয়।

৫. সরস্বতী পূজা

শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের দেবী সরস্বতীর পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে প্রায় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে। দেবী সরস্বতীর প্রতিমা স্থাপন করা হয় এবং দিনব্যাপী চলে পূজা-অর্চনা। এ সময়ে সনাতন ধর্মানুসারী শিক্ষার্থীরা তাদের সতীর্থদের আমন্ত্রণ জানিয়ে থাকে এবং তাদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করে।

৬. কালীপূজা

দেবী কালীর আরাধনা প্রতিদিনই করা হলেও দীপান্বিতা, মাঘী কৃষ্ণা চতুর্দশী ও জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশীতে বিশেষভাবে এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। সাধারণত কালী দেবীর বিশেষ বর বা অনুগ্রহ লাভের প্রত্যাশায় এই পূজা করা হয়ে থাকে। কোনো কোনো সময় গ্রামে মহামারী আকারে কলেরা বা বসন্ত দেখা দিলে সনাতন ধর্মের অনুসারীরা মিলিতভাবে এই পূজার আয়োজন করে থাকে।

www.pathagar.com

৭. জন্মাষ্টমী

শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টম দিনে কয়েকটি পরিবার মিলে সৌহার্দ্য ও আনন্দময় পরিবেশে শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিন জন্মাষ্টমী পালন করে থাকে। এদিন সনাতন ধর্মাবলম্বীরা পরস্পরের মধ্যে উপহার আদান-প্রদান এবং নারিকেলের নাড়ু, দুধ ও মাখন দিয়ে অতিথিদের আপ্যায়ন করেন।

৮. নববর্ষ

গ্রামপ্রধান বাংলাদেশের মানুষের জীবনে এক আনন্দমুখর দিন নববর্ষ বা পয়লা বৈশাখ। সাধারণ মানুষের জীবনের সঙ্গে নানাভাবে জড়িত এই নববর্ষ। চৈত্রের মাঝামাঝি থেকেই নতুন বছরকে বরণ করে নেওয়ার প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। কাঁচা মাটির ঘর, মেঝে নতুন মাটি দিয়ে লেপা হয়, ঘর-দোর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে তোলা হয়। বাজারের দোকানগুলোর জিনিসপত্র বাইরে এনে ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে ঝকঝকে তকতকে করা হয়।

ঘর-বাড়ি সর্বত্রই দিনটির শুরু হয় অত্যন্ত আনন্দ-উত্তেজনায়। আজকের দিনে প্রায় ঘরেই ভালোমন্দ কিছু রান্না করা হয়। যার যার সাধ্যমতো ফিরনি-পায়েস, পিঠালাটা, পোলাও ইত্যাদি রান্না করে নিজেরা গ্রহণ করে ও ঘনিষ্ঠ দু'চারজনকে আপ্যায়ন করে থাকে। বিশ্বাস, এই দিনে ভালো খেতে পারলে সারাটা বছরই হয়তো ভালো খাওয়া যাবে। এদিন কোনো দোকান-মালিক বাকিতে মাল বিক্রি করেন না, ক্রেতারাও এদিন বাকিতে কিছু নিতে দোকানে যান না। এদিন গৃহিণীদের রাগারাগি, বকাঝকা ইত্যাদি থেকেও শিশুরা রক্ষা পায়। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান নববর্ষ উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে।

এদিন সকালে পান্তা-ইলিশের আয়োজন করা হয়। যদিও আবহমানকাল থেকেই এ অঞ্চলের মানুষ সকালে পান্তা-ইলিশে অভ্যস্ত, তারপরও এদিনের এই আয়োজনটা একটু ভিন্ন স্বাদ ও অনুভূতির জন্ম দেয়। এককালের প্রভাবশালী জমিদার ভুবনঠাকুরের বিস্তীর্ণ জমির ওপর অনুষ্ঠিত হয় বিশাল মেলা। এই মেলায় মাটি ও কাঠের তৈরি হাড়ি, ঘোড়া, পাখি থেকে শুরু করে নিত্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন দ্রব্যের সমাবেশ ঘটে।

৯. হালখাতা

দোকানপাট ও বিভিন্ন ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে হালখাতা গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে অধিকাংশ ব্যবসায়ীই এই অনুষ্ঠানটি পালন করে থাকেন। চৈত্র মাসে তাগাদা দিয়েও যখন কিছু কিছু পাওনা অনাদায়ী থেকেই যায় তখন দোকান-মালিকরা কার্ড পাঠিয়ে শুভ হালখাতা মহরতে অংশগ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানান। হালখাতার আগের সেই আনন্দ-উত্তেজনা বর্তমানে লক্ষ্য করা না গেলেও অনেক ব্যবসায়ীই এটি পালন করে থাকেন। এ উপলক্ষে দোকানপাটগুলোর অভ্যন্তরভাগ কিছুটা সাজানো হয়, একটা উৎসবের আমেজ লক্ষ্য করা যায়। নিয়মিত গ্রাহকগণ আমন্ত্রণকারী দোকান বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে যান এবং পূর্বের কিছু লেনদেন পরিশোধের ব্যবস্থা করেন। মুসলিম ব্যবসায়ীদের অনেকেই দোকানে মিলাদের ব্যবস্থা করেন এবং

www.pathagar.com

মিষ্টিমুখ করান। সনাতন ধর্মাবলম্বী ব্যবসায়ীরাও হাসিমুখে তাদের গ্রাহকদের স্বাগতম জানান, শুভেচ্ছা বিনিময় করেন এবং আগত অতিথিদের মিষ্টিমুখ করান।

নতুন বছরের হিসাব-নিকাশ রাখার জন্য সবাই নতুন খাতা খোলেন। সনাতন ধর্মাবলম্বী ব্যবসায়ীরা একটি রূপার মুদ্রায় সরিষার তেল লাগিয়ে ও সিঁদুর মাখিয়ে নতুন হিসেবের খাতার প্রথম পৃষ্ঠায় চার কোণে চারটি ও মাঝখানে একটি, মোট পাঁচটি ছাপ দেন। এরপর বয়োজ্যেষ্ঠ কোনো ব্যক্তিকে দিয়ে খাতাটি খোলানো হয়।

১০. নবান্ন

নবান্নের সেই আনন্দমুখর উৎসবের দিন আর এখন নেই। কেবলমাত্র কৃষিকাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিছু পরিবার হেমন্তের এই নতুন ফসল ঘরে তোলার দিনে সামান্য কিছু অনুষ্ঠানাদি করে থাকে। শুভদিন দেখে ক্ষেত থেকে একগোছা ধান কেটে মাথায় করে বয়ে এনে কেউ ঘরের কোণে, কেউ বা ঘরের বিভিন্ন কোণে খুঁটির সাথে বেঁধে রাখে। এরপর নতুন ধানের চালে রান্না করা ভাত গ্রহণ করে, পিঠা-পায়েস তৈরি করে। পাটিসাপটা, পুলি, দুই (ভাপা পিঠা) পুয়া পিঠা, ছিট রুটি, রসবড়া, পাক্কন পিঠা ইত্যাদি তৈরি করে, নিজেরা খায়, সম্ভব হলে আত্মীয়-স্বজনকেও নিমন্ত্রণ করে। তবে আজকাল এই নিমন্ত্রণের ঝামেলাটি অনেকেই করতে চান না।

এদিনে সনাতন ধর্মাবলম্বী অনেকে দেবী লক্ষ্মীকে পূজা দেন; ঘরের মেঝেতে, ঘরের দরজা থেকে দেবী লক্ষ্মীর আসন পর্যন্ত আলপনা এঁকে থাকেন।

১১. বরণকুলা-বরণডালা

বিয়ের পাকাপাকি কথাবার্তা হয়ে গেলে দিন-ক্ষণ নির্ধারণ করা হয়। অতঃপর নির্দিষ্ট দিনে বর ও কনে পক্ষ পরস্পরের বাড়িতে হলুদের দ্রব্যাদি পাঠিয়ে দেয়। এগুলো পাঠানো হয় কুলা ও ডালায় করে। বাঁশ বেতের তৈরি এসব কুলা-ডালায় আলপনা আঁকা থাকে অথবা আলপনা আঁকা না থাকলে তা আঁকিয়ে নেওয়া হয়। হলুদের কাপড়সহ বিভিন্ন দ্রব্যাদির সঙ্গে পাঠানো হয় সাতটি আস্ত হলুদ, সাতটি দুলপা (দূর্বা) সাতটি পান, সাতটি ধান, বাঁটা হলুদ, বাঁটা মেহেদি, সোন্দা-মেথি, সাবান, তেল, ইত্যাদি। এছাড়া সামর্থ্য অনুযায়ী একটি বা দুটি বড় মাছ এবং পান-সুপারি-চুন-জর্দা ইত্যাদি পাঠানো আবশ্যক। সঙ্গে রসগোল্লা, সন্দেশ, নিমকি ইত্যাদি তো থাকছেই।

১২. তেলাই দেওয়া

হলুদসামগ্রী প্রাপ্তির পর কনে ও বরপক্ষের বাড়িতে শুরু হয়ে যায় তেলাই দেওয়ার সর্বশেষ প্রস্তুতি। এই অনুষ্ঠান হিন্দু-মুসলমান, ধনী-গরিব সব পর্যায়ের পরিবারেই হায়ে থাকে। প্রথমে বরপক্ষ থেকে কনের গায়ে হলুদ ছোঁয়ানো হয়। সনাতন ধর্মে বরের গায়ে ছোঁয়ানো হলুদ কনের গায়ে মাখানো হয়ে থাকে। অনেক পরিবারে আগের দিনের মতো এখনও সুগন্ধির জন্য সোন্দা-মেথি বেটে বর-কনের গায়ে মাখানো হয়। তেলাই বা হলুদ দেওয়া হয়ে গেলে কনেকে তার ভাবী বা চাচাতো-ফুফাতো-খালাতো বোনরা গোসল করায় এবং এজন্য বরকে সম্মানী প্রদান করতে হয়। গায়ে হলুদ বা তেলাইয়ের পর বর-কনে উভয়কেই কিছু নিয়ম মেনে চলতে হয়। তাদের কোনোক্রমেই ঘরের

www.pathagar.com

বাইরে যেতে দেওয়া হয় না। কারণ ভূত-প্রেত তেলাইয়ের মধুর গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে বর-কনের সমূহ বিপদ ঘটাতে পারে।

১৩. বধূবরণ

হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায় নতুন বউকে বরণ করে নেওয়ার রীতি আবহমানকাল ধরে প্রচলিত। বাড়ির ছেলে ও তার আত্মীয়-স্বজন নতুন বউকে তার পিতৃগৃহ থেকে নিজ বাড়িতে নিয়ে এলে তাকে গাড়ি অথবা রিক্সা থেকে নামিয়ে একটু মিষ্টিমুখ করানো হয়। পরে একটি কুলায় সাতটি ধান, সাতটি দূর্বা, সাতটি পান, সাতটি হলুদ নিয়ে কুলাটি বউয়ের মুখমণ্ডলের সামনে দিয়ে ঘুরিয়ে আনা হয়। অতঃপর তার মাথায় ধান-দূর্বা ছিটিয়ে দিয়ে কোলে করে অথবা একটি নতুন শাড়ির ওপর দিয়ে হাঁটিয়ে ঘরের ভেতরে নিয়ে যায়। বরের মা এক উরুতে বউ ও আরেক উরুতে ছেলেকে বসিয়ে দুধের সরবত খাওয়ায়। তারপর উপস্থিত আত্মীয়-স্বজন সবাই নববধূ ও বরের মুখে একটু একটু করে মিষ্টি অথবা ফিরনি তুলে দেন। এভাবেই নববধূকে বরণ করে নেওয়া হয়।

বোরহানউদ্দিন উপজেলা

১. ঈদুল ফেতর ও ঈদুল আযহা

ঈদুল ফেতর ও ঈদুল আযহা মুসলমানদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুটি ধর্মীয় উৎসব। আমাদের এলাকার মানুষের কাছে এ দুটি ঈদ সাধারণভাবে রোজার ঈদ ও কোরবানির ঈদ নামেই পরিচিত। পবিত্র রমজান মাসের ৩০ দিন রোজা রাখার পর আরবি শাওয়াল মাসের ১লা তারিখে ঈদুল ফেতর বা রোজার ঈদ এবং জিলহজ্জ মাসের ১০ তারিখে ঈদুল আযহা বা কোরবানির ঈদ হয়ে থাকে। ধনী-গরিব নির্বিশেষে সকল শ্রেণির মানুষই ঈদের আনন্দ কম-বেশি উপভোগ করে থাকে। তবে বিত্তহীনদের সংসারে ঈদের আনন্দ বিশেষ কোনো মাত্রা বয়ে আনে না। ঈদ হবে, অমুক দিন ঈদ—এই সংবাদটি শিশু-কিশোরদের কাছে অনেক বড় একটি সংবাদ। কারণ, এদিন উপলক্ষে নতুন পোশাক, জুতো, টুপি কেনা হবে, বাসায় রান্না হবে মজার মজার খাবার। তবে খাবারের প্রতি শিশু-কিশোরদের যতোটা না আগ্রহ তারচেয়ে বেশি আগ্রহ থাকে নতুন জামা-কাপড় কেনা বা পরে বাড়ি বাড়ি যাওয়ার প্রতি।

ঈদের আগের দিন। এ দিন অধিক রাত পর্যন্ত জেগে থাকে শিশু-কিশোররা। ঘুমে ঢুলু ঢুলু চোখেও কষ্ট করে জেগে থাকে, বাড়ির গৃহিণীরা ঈদের দিনের যেসব খাবার-দাবারের আয়োজন করতে থাকেন তার প্রতি উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। বাড়ির গৃহিণীদের থাকে অসম্ভব রকমের ব্যস্ততা। ঈদের দিনে কী রান্না হবে সে যোগাড়-যন্তর তো আগেই থেকেই করা থাকে। তবে রান্নার জন্য প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক কাজ যেমন, পেঁয়াজ-রসুন-আদাসহ অন্যান্য মশলাদি পাটায় বেঁটে ঠিক করে রাখা, শিশু-কিশোরদের জামা-কাপড় সব যথাস্থানে রাখা, বাড়িতে যেসব মেহমান আসবে তাদের আপ্যায়ন করার জন্য প্রয়োজনীয় প্লেট, পিরিচ, কাপ, গ্লাস ইত্যাদি ধুয়ে মুছে তকতকে ঝকঝকে করে রাখা, ইত্যাদি আরো হাজারো রকমের কাজ ঈদের আগের রাতেই শেষ করে রাখতে হয়।

www.pathagar.com

ঈদের দিনে সামর্থ্যবানরা নতুন পোশাক পরেন। যাদের ক্ষমতা নেই তারা পুরনো পোশাক বাড়িতে পরিষ্কার করে ধুয়ে ইস্ত্রি করে রাখেন। নতুন পোশাক কেনার ব্যাপারে শিশু-কিশোর তরুণ-যুবকদের আগ্রহটাই যেন খুব বেশি। তবে বয়স্করাও যে কেনে না, তা নয়।

শিশু থেকে বৃদ্ধ সবাই ঈদের জামাতে যায়। ঘর থেকে বেরোবার আগে একাধিক সন্তানের মা যিনি বা যারা, শিশুদের বুকে হালকা থুথু ছিটিয়ে থাকেন, যাতে করে এক সঙ্গে এতো শিশুকে দেখলে কারো 'মুখ' বা 'নজর' না লাগে। আবার সবাইকে একসঙ্গে ঘর থেকে বেরুতে না দিয়ে এক এক করে বেরোতে বলেন। এটাও ঐ একই কারণে।

উপজেলায় আলীয়া মাদ্রাসার মাঠ, বাজারের উত্তর পাশের দাখিল মাদ্রাসার মাঠ, বাটামারায় দারোগা বাড়ির দরজার মসজিদ, হায়দার আলী মিয়া বাড়ির মসজিদ, বোরহানউদ্দিন স্কুলের পুরান মসজিদ, আবদুল জব্বার মিয়ার মসজিদ, বাজার জামে মসজিদ, মসজিদের সামনের ঈদগাহ, বোরহানউদ্দিন হাওলাদার বাড়ির জামে মসজিদ, দেউলার হাজী জুম্মা মসজিদ প্রভৃতি মসজিদে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়। নামাজ শেষে মুসলমানদের চিরাচরিত নিয়ম অনুসারে পরস্পরের সাথে কোলাকুলি, 'ঈদ মোবারক' বিনিময় ইত্যাদি শেষে সবাই বাড়ি ফেরে। যাদের পিতা-মাতা প্রয়াত হয়েছেন, তারা কবরস্থানে গিয়ে দোওয়া-দরুদ পড়ে মা-বাবাসহ সকল কবরবাসীর গুনাহ ও কবর আজাব মাফসহ বেহেশতবাসী করার জন্য আল্লাহতাআলার কাছে প্রার্থনা জানান।

নতুন জামাইদের শ্বশুর বাড়িতে আগেই নিমন্ত্রণ করা হয়। শ্যালক-শ্যালিকারা দুলাভাইকে ঈদের সালাম করে 'ঈদি' আদায় করে নেয়। শিশু-কিশোররা বড়দের নিকটস্থ দোকানে নিয়ে যায়। আইসক্রিম কিংবা চিপস কিংবা লাঠিওয়ালা লজেন্স কিনে দেওয়ার আবদার করে।

গ্রামের ও উপজেলা শহরের গরিব-দুঃখীরা মসজিদের সামনে সারি বেঁধে ও রাস্তায় রাস্তায় ফেতরার টাকা ও আর্থিক সাহায্যের জন্য করুণ মিনতি জানায়। ছোট ছোট দরিদ্র ও ভিক্ষুক শিশুরা ছিন্নবস্ত্রে কিংবা খালি গায়ে ভিক্ষার জন্য বিত্তবানদের পিছু পিছু হাঁটে। আর একটি শ্রেণি আছে, যাদের নতুন পোশাক পরে ঈদের জামাতে যাওয়ার সামর্থ্য তো নেই-ই, বাড়িতে সামান্য ফিরনি পায়েসটুকুও করার সামর্থ্য নেই, আবার এরা অন্যের কাছে হাতও পাততে পারে না।

ঈদের দিনে শিশু-কিশোরদের বিনোদনের অবলম্বন হচ্ছে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়ানো, এ-বাসা ও-বাসায় যাতায়াত করা। রাস্তায় বা ফাঁকা কোনো জায়গায় একটু-আধটু ক্রিকেট খেলা আর টিভি দেখা। তরুণদের অনেকে ঈদ উপলক্ষে মুক্তিপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র দেখার জন্য সিনেমা হলে ভিড় জমায়, চায়ের দোকানে বসে গল্প-গুজব করে।

কোরবানির ঈদের দিনের অবস্থা একটু ভিন্ন রকম। এদিন আরো সকালে ঈদগাহে বা মসজিদে ঈদের নামাজ আদায়ের জন্য যেতে হয়। এই ঈদের জামাত রোজার ঈদের চেয়ে আর একটু আগে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। তারপর সারা বাংলাদেশে যা হয়, এখানেও তা-ই। সামর্থ্যবানরা কোরবানি দিয়ে থাকেন। মসজিদের ইমাম বা মুয়াজ্জিন সাহেব কিংবা মাদ্রাসার কোনো ছাত্রকে দিয়ে গরু বা ছাগলটিকে জবাই করা, মাংস

www.pathagar.com

কাটাকুটি, নিকটাত্মীয়, পাড়া-প্রতিবেশী ও দুস্থদের মধ্যে তাদের প্রাপ্য অংশ কিংবা তারও বেশি মাংস বিতরণ, সুযোগ পেলে দু'এক আত্মীয়ের বাসায় গিয়ে চালের রুটি-মাংস খাওয়া, টেলিভিশনের আনন্দমেলা, নাটক বা গানের অনুষ্ঠান কিংবা চলচ্চিত্র দেখা—তারপর ক্লান্ত, শ্রান্ত দেহে একটি চমৎকার ঘুম। তবে একটি বিষয় অবশ্যই বলা প্রয়োজন, যারা কোরবানি দিয়ে থাকেন, তাদের অনেকেই গরু বা ছাগলের মাথার কঙ্কালটিকে ঘরের সামনে গাছের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখেন। এতে করে অশুভ শক্তি ভীত হয়ে আর ঐ বাড়ির ত্রিসীমানায় পা দেবে না বলে তাদের বিশ্বাস।

এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করার রয়েছে। সেটি হচ্ছে এই যে, এই কোরবানি ঈদের একটা বাড়তি সুবিধা আছে। কেউ কেউ কিংবা এমন অনেকে আছেন যারা তাদের নিকট আত্মীয়-স্বজনকে অনেক সময় অতিরিক্ত ব্যয় বহনের ভার বহন করতে হয় বলে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতে ব্যর্থ হন। কোরবানির ঈদে সেই সুযোগ তাদের আসে। ঘরে প্রচুর মাংস থাকে বলে মেহমানকে পেট ভরে খাইয়ে তৃপ্তি লাভ করেন তারা। এ কারণেই এ সময়ে, অর্থাৎ ঈদের পরদিন থেকে শুরু করে প্রায় সপ্তাহব্যাপী চলে এই দাওয়াতের আমেজ।

বোরহানউদ্দিনের মনিরামে সুরেশ্বরী পীর সাহেবের অনুসারীরা সউদি আরবের সাথে মিল রেখে একদিন আগে থেকেই রোজা রাখতে শুরু করেন। তদ্‌নুযায়ী সারা দেশে অনুষ্ঠিত ঈদের একদিন আগেই তারা ঈদ উৎসব পালন করে থাকেন।

২. শবেবরাত

এই রাত মুসলমানদের জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ রাত। কারণ, এ রাতে আল্লাহতাআলা তাঁর প্রিয় বান্দাদের তওবা কবুল করেন ও তাদের গুনাহ্ মাফ করে দেন। এ রাতে আল্লাহতাআলা বিশ্বের প্রতিটি সৃষ্টির জন্ম-মৃত্যু, মঙ্গল-অমঙ্গল, রেজেক-দৌলত সবকিছু নির্ধারণ করেন। এ জন্যই মুসলিম সম্প্রদায় এরাতে জেগে থাকে নানান রকম নফল এবাদত, কোরান তেলাওয়াত, নফল নামাজ, জেকের-আজকার করেন। আমাদের উপজেলায় বোরহানউদ্দিন বাজার জামে মসজিদ, বোরহানউদ্দিন হাওলাদার বাড়ি জামে মসজিদ, দেউলা হাজী জুম্মা মসজিদসহ ছোট-বড় প্রায় সব মসজিদে মুসল্লিরা সারারাত জেগে থেকে এবাদত করেন।

এতো গেল শবেবরাতের ধর্মীয় দিক। এর একটি সামাজিক দিকও এ এলাকায় মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে লক্ষ্য করি। এই দিনে ধনী-গরিব সবার ঘরেই যার যার সামর্থ্য অনুযায়ী কিছু ভালো-মন্দ রান্নাবান্না করা হয়। একটু ফিরনি, তা চিনির হোক আর গুড়ের হোক, আর তার সাথে চালের বা আটার রুটি, সম্ভব হলে একটু মুরগি বা গরুর মাংস অনেকেই রান্না করে থাকেন, আর বুট ডালের হালুয়া ছাড়া শবেবরাত চলে যাবে—এমনটি ভাবা যায় না। তারা এমনটি ভেবে থাকেন যে, এইদিনে একটু ভালো খেতে পারলে আল্লাহতাআলা সারা বছরেই সেভাবে খাওয়াবেন। আরেকটি বিষয় অনেকের মনে এ চিন্তার উদ্রেক করে যে, আজকে শবেবরাতের একটি রাত, আজকে এটু ভালো খাবো না। সারা বছর ভালো খাবারের আশায় একটি রাতের জন্য একটু বাড়তি খরচ করলে এমন আর কী কষ্ট হবে। এটাই হচ্ছে খেটে খাওয়া, অসচ্ছল মানুষের বিশ্বাস।

www.pathagar.com

শবেবরাতের আর একটি সংস্কৃতি—পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজনদের বাসায় একটি ট্রেতে করে বুট ডালের হালুয়া, সুজির হালুয়াসহ কিছু মিষ্টান্ন পৌঁছে দেওয়া। সাধারণত কিশোর-কিশোরীদের দিয়ে এগুলি পাঠানো হয় এবং সবাই খুব হাসি-মুখেই তা গ্রহণ করে। তবে এ সংস্কৃতি এখন অনেকটা বিলুপ্তির পথে।

এদিনে সূর্যাস্তের পর থেকেই দরিদ্র শিশু-কিশোর যাদের কেনা বা তৈরির সামর্থ্য নেই, তারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে শবেবরাতের হালুয়া-রুটির জন্য আবদার জানায়, ভিক্ষুকেরা মসজিদের সামনে বা রাস্তার পাশে বসে শবেবরাত উপলক্ষে কিছু দান–খয়রাত ভিক্ষা করেন।

৩. দুর্গোৎসব

হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব স্থানীয় মন্দিরসমূহে অত্যন্ত জাঁকজমক ও আড়ম্বরের সাথে পালন করা হয়ে থাকে। গ্রামের মানুষ এ-পূজাকে 'বড় পূজা' বলে আখ্যায়িত করে থাকে। এ উপজেলা সদরের মন্দিরসমূহসহ প্রায় ১৬/১৭টি স্থানে পূজামণ্ডপ তৈরি করা হয়। সনাতন ধর্মাবলম্বী নারী-পুরুষ, শিশু-যুবক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে উপজেলার শতশত মানুষ নতুন পোশাক পরে এক পূজামণ্ডপ থেকে আরেক পূজামণ্ডপে ঘুরে বেড়ায়, দেবী দর্শন করে ও আরতি দেয়। এ সময় তারা বর্ণভেদ, ধনী-গরিবের ব্যবধান ভুলে যায়, সবরকম হিংসা-বিদ্বেষের ঊর্ধ্বে উঠে দেবী-দুর্গার পদতলে একাত্ম হয়ে যায়। মুসলমান সম্প্রদায়ের অনেক কিশোর ও তরুণ-তরুণী তাদের সনাতন ধর্মাবলম্বী বন্ধুদের আমন্ত্রণে পূজামণ্ডপ ও বাসায় যায় এবং আতিথ্য গ্রহণ করে।

৪. সরস্বতী পূজা

উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে জ্ঞান-বিজ্ঞান, সংগীত ও শিল্পকলার দেবী সরস্বতীর পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এখানেও সনাতনধর্মী বন্ধুদের আমন্ত্রণে মুসলিম শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন পূজামণ্ডপে যায় ও দেবীদর্শন এবং প্রসাদ গ্রহণ করে থাকে।

৫. জন্মাষ্টমী

শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিন জন্মাষ্টমী পালন করা হয় শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টম দিনে। এদিন সনাতন ধর্মাবলম্বীরা নিজেদের ঘরে শ্রীকৃষ্ণের শৈশবের ছবি টানিয়ে রাখে এবং নিজেদের মধ্যে যার যার সামর্থ্য অনুযায়ী উপহার বিনিময় এবং ঘরে আগত অতিথিদের নারিকেলের নাড়ু, মাখন ও দুধ দিয়ে আপ্যায়ন করে।

৬. নববর্ষ

বাংলা বছরের প্রথম দিন পয়লা বৈশাখ অন্যান্য এলাকার মতো এই এলাকার মানুষের জীবনেও একটি আনন্দঘন শুভদিন। চৈত্র মাস এলেই এই দিনটির আগমনবার্তা অনুভূত হতে থাকে ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক নানাবিধ কাজ-কর্মে। নতুন মাটি দিয়ে কাঁচাঘরের মেঝে ও পিড়া লেপা, ঘরের ভেতরে সারা বছরের জমাকৃত অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ফেলে দিয়ে ঘরটাকে হালকা করা, বিভিন্ন স্থানে জমে থাকা মাকড়সার জাল, কালো কালো ঝুল পরিষ্কার করা, পাকা দোকানপাট চুনকাম করা, ব্যবসা

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠানসমূহের সারা বছরের বাকির একটি তালিকা প্রস্তুত করা এবং সর্বোপরি বছরের পাওনা আদায়ের জন্য বাড়ি বাড়ি গিয়ে অথবা ফোনের মাধ্যমে তাগাদা দেওয়া শুরু হলেই বোঝা যায় বৈশাখ, মানে নববর্ষ এই এলো বলে।

নববর্ষের প্রথম দিন অর্থাৎ পয়লা বৈশাখের সূর্যোদয়ের পরেই কেমন যেন একটা ব্যস্ততা বেড়ে যায় সবার, সাথে আনন্দ, উদ্বেগ দুটোই অনুভূত হয়। গরু নিয়ে মাঠে রওয়ানা হওয়ার জন্য কৃষকের ব্যস্ততা, দোকানে গিয়ে তালা খুলে দ্রুত দোকান খোলায় দোকানির ব্যস্ততা, একটু ভালো-মন্দ খাওয়ার জন্য বাজার-সদাই করার ব্যস্ততা, রাস্তার পাশে গরু জবাই করে ভাগা দিয়ে বিক্রি করার ব্যস্ততা, এমনি নানান ধরনের ব্যস্ততা অধিকাংশ মানুষের মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়। এমনকি, ছাত্র-ছাত্রীরাও এদিনে একটু আগে-ভাগে উঠে কিছু সময়ের জন্য হলেও পড়ালেখায় মনোযোগী হয়। যারা পণ্য বিক্রয় করে জীবনধারণ করে তাদের মধ্যে থাকে একটু বাড়তি অস্থিরতা, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা—আজকে না জানি বিক্রির অবস্থাটা কেমন দাঁড়ায়। আজকে ভালো হলে তো সারাবছরই ভালো, খারাপ হলে তো গোটা বছরে কপালে কী না দুর্ভোগ কে জানে!

আজকের দিনে সম্ভবত অন্যান্য এলাকার মতো এই উপজেলার মানুষও কোনো দোকানে বাকিতে কিছু আনার জন্য যায় না। দোকানিরাও বাকিতে মালামাল বিক্রি করেন না। প্রতিটি ভোক্তা এ বিষয়ে খুবই সচেতন যে, পয়লা বৈশাখে অন্তত বাকি চাওয়া যাবে না। তাহলে হয়তো বাকির ওপরই সারাটা বছর কাটাতে হবে। অর্থাভাব হলে প্রয়োজনবোধে তারা দোকান থেকে খুব বেশি প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো আগের দিন এনে রেখে দেবে, তবুও বছরের শুরুতে বাকি চাইবে না, আর কেউ বাকি দেবেও না। কেউ কারো কাছে আরো চাইবে না, কেউ ধার দেবেও না।

বছরের প্রথম দিনটিতে ঘরের গৃহিণীরা অতিমাত্রায় সতর্ক থাকেন। তারা ধীরে সুস্থে সংসারের যাবতীয় কাজ সম্পাদন করেন। এতোই সতর্কতার সাথে তারা কাজ কর্ম ও চলাফেরা করেন যে, তাদের গায়ের সাথে ধাক্কা লেগে কিংবা হাত থেকে পড়ে গিয়ে কোনো কিছু যেন না ভাঙে, না ক্ষতি হয়। এমনকি তারা শিশুদেরকেও রাগারাগি, বকা-ঝকা বা গায়ে হাত তোলা থেকে নিজেদের সম্পূর্ণভাবে বিরত রাখেন। পারতপক্ষে ঝগড়া-ঝাটি বা বাদানুবাদ থেকে নিজেদের সামলে রাখেন। ঘরের গৃহিণীরা এইদিনে হাঁস-মুরগি, কবুতর যার যার সামর্থ্য অনুযায়ী রান্না করে থাকেন। বছরের প্রথম দিনটিতে যদি একটু ভালো খাওয়া যায় তাহলে পুরো বছরটাই হয়তো ভালভাবে কাটবে। অনেক ঘরে এখন শহরের মতো পান্তা-ইলিশেরও আয়োজন করা হয়। এই ইলিশ কিংবা পান্তার সঙ্গে অন্য কোনো মাছ বা ভর্তা যদিও তাদের ...লেরই ঐতিহ্য, তবুও শহরের প্রথার অনুসরণ করতে গিয়ে তারা নিজেদের একটু ...ভাবে উপলব্ধি করার সুযোগ পায়।

এ উপজেলার অনেক ইউনিয়নেই নতুন বছর উপলক্ষে যুব শ্রেণির উদ্যোগে মেলার আয়োজন করা হয়। মেলায় মিষ্টির দোকান, জিলিপির দোকান, শিশু-কিশোরদের মাটি ও প্লাস্টিকের খেলনা, মৌসুমী ফলের দোকানসহ সংসারের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিরও দোকান বসে। ছোট ছোট শিশুরা তাদের নানা-দাদার

www.pathagar.com

কোমর বা হাত ধরে মেলায় যায়। আবদার করে রসগোল্লা, জিলিপি, আইসক্রিম বা বেলুন, বাঁশি, ভেঁপু কিংবা অন্য কোনো খেলনা কিনে দেওয়ার। ঘোরাঘুরি শেষে বাঁশি ফুঁ দিতে দিতে, বেলুন উড়িয়ে অথবা আইসক্রিম চুষতে চুষতে ওরা ক্লান্ত-শ্রান্ত দেহে বাড়ি ফেরে।

মেলায় লোকসংগীত, বাউল গানসহ বিভিন্ন ধরনের গান-বাজনারও আয়োজন করা হয়ে থাকে। এছাড়া বিভিন্ন স্থানে সৌখিন খেলোয়াড়রা ক্ষুদ্র পরিসরে হা-ডু-ডু ও ফুটবল খেলারও আয়োজন করে থাকে।

নববর্ষের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হালখাতা। কাপড়ের দোকান, মুদি দোকান, সোনার দোকানসহ যে-সব দোকানে বা ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে সারা বছর নগদের পাশাপাশি বাকিতেও বিভিন্ন সামগ্রী বিক্রি করতে হয় সেসব দোকান থেকে চৈত্র মাসের তৃতীয় সপ্তাহেই গ্রাহকদের নামে হালখাতার রঙিন কার্ড পাঠানো হয় 'শুভ হালখাতা' করার জন্য। নববর্ষের প্রথম দিনে যেসব গ্রাহক নিজে একা কিংবা ছোট শিশু-সন্তানদের নিয়ে হালখাতা করতে যান, অর্থাৎ পুরনো দেনার পুরোটা বা আংশিক পরিশোধে উদ্যোগী হন, দোকান-মালিক তাদের মিষ্টান্ন ও চা পানে আপ্যায়িত করেন।

৭. হালখাতা

বাঙালি ব্যবসায়ীদের জীবনে 'হালখাতা' অর্থাৎ পয়লা বৈশাখের দিনটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে এ এলাকার ব্যবসায়ী মাত্রই দিনটি পালন করে থাকেন। এইদিনে নতুন বছরের হিসাব-নিকাশ লেখার জন্য পুরনো খাতা ফেলে দিয়ে নতুন খাতা শুরু করা হয়। এ উপলক্ষে ব্যবসায়ী বা দোকান-মালিকরা তাদের গ্রাহককে চিঠি দিয়ে আমন্ত্রণ জানান অন্তত দশ-বারো দিন আগে। তারও আগে, অর্থাৎ চৈত্র মাস শুরু হয়ে গেলেই দোকান-মালিকরা পাওনা আদায়ে কোমর বেঁধে নেমে পড়েন। তারা গ্রাহকদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে অথবা কর্মচারী পাঠিয়ে বা ফোনে পাওনা আদায়ের তাগাদা দিয়ে থাকেন। গ্রাহকরাও তাদের পাওনা মিটিয়ে দেওয়ার জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করেন, কারণ, তারা বংশানুক্রমিকভাবে জেনে এসেছেন যে, চৈত্র মাস হচ্ছে পূর্বের লেনদেন মিটিয়ে দেওয়ার শেষ মাস।

হালখাতার আগে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বা দোকানগুলোকে খুব সুন্দরভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হয়। কাঁচা মেঝে হলে নতুন মাটি দিয়ে লেপা হয়। আর কাংক্রিটের তৈরি হলে চুনকাম করা হয় এবং চমৎকারভাবে সমস্ত দোকান বা প্রতিষ্ঠানটিকে সাজানো হয়।

হালখাতা তিনদিনও হয়ে থাকে—১, ২ ও ৩রা বৈশাখ। এদের উপজেলার হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের ব্যবসায়ীরা এই দিনগুলো খুবই গুরুত্বসহকারে থাকেন। সনাতন ধর্মের ব্যবসায়ীরা এইদিনে একটি রূপার মুদ্রায় সরিষার তেল ও সিঁদুর মাখিয়ে হিসাবের নতুন খাতার প্রথম পৃষ্ঠায় পাঁচটি ছাপ মেরে বয়োজ্যেষ্ঠ কোনো ব্যক্তিকে দিয়ে খাতাটির শুভ উদ্বোধন করিয়ে থাকেন। এ সময়ে ইতোপূর্বে পাওয়া হালখাতার আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে গ্রাহকরা ঐসব ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে বা দোকানে পদার্পণ করেন। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কর্ণআরো তাদের স্বাগতম জানান, শুভেচ্ছা বিনিময় করেন এবং মিষ্টিমুখ করিয়ে তবে বিদায় দেন।

www.pathagar.com

৮. নবান্ন

অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে কৃষক যখন ক্ষেত থেকে পাকা ধান কাটে, তখন ঘরে ধান তোলার এক অনির্বচনীয় আনন্দরসে তাদের হৃদয় আপ্লুত হয়ে যায়। কয়েকটি মাস উদয়াস্ত খাটুনি খেটে একটি শুভদিন দেখে তারা ধান কেটে বাড়ি নিয়ে এসে ধানের 'ছড়া'র (গোছা) নরম অংশটি চুলের বেণীর মতো পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ঘরের কোণে বা কোনো একটি খুঁটির সাথে বেঁধে রাখে। এ সময় বাড়ির মহিলারাও ব্যস্ত হয়ে পড়ে। নতুন ধান সিদ্ধ করা, রোদে শুকানো—এসবই মহিলারা করে থাকে। আগে তো ঢেঁকিতে ধান ভানার কাজ শেষ করে চাউল করা পর্যন্তও তাদের কাজের আওতায় ছিল। এখন ঢেঁকি উঠে গেছে ঘর থেকে। সময় ও শ্রম বাঁচানোর জন্য এখন বাজারের রাইস মিলে নিয়ে যায়, চাউল করে ঘরে ফেরে কৃষক।

নিজের শ্রমে উৎপাদিত নতুন ধানের চালের ভাত রান্না করে খাওয়ার আয়োজন করে। পিঠা-পায়েস তৈরি করে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনকে দাওয়াত করে। সবাই মিলে খায়। এটিই নবান্নের উৎসব। আগে ঘরে ঘরে এই উৎসব অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে হতো। কিন্তু এখন শুধু কৃষিকাজের সঙ্গে সরাসরি সংশ্লিষ্টরাই ঘরোয়াভাবে এই আনন্দ উপভোগের আয়োজন করে।

৯. বরণকুলা

বিয়ের কথাবার্তা চূড়ান্ত এবং দিনক্ষণ স্থির হয়ে গেলে বর ও কনের গায়ে হলুদের জন্য উভয়পক্ষ থেকে হলুদের কুলা-ডালা পাঠানো হয়। বরপক্ষ থেকে পাঠানো হয় কুলা আর কনের পক্ষ থেকে ডালা। বাঁশ ও বেতের তৈরি এ ধরনের কুলা-ডালা বাজার থেকে সংগ্রহ করা হয়। এতে গায়ে হলুদের জন্য বাঁটা হলুদ, সাতটি গোটা হলুদ, সাতটি দুলপা (দূর্বা), সাতটি পান, সাতটি ধান, বাঁটা মেহেদি, সোন্দা, মেথি, গিলা পারফিউম, সাবান ও তেল ইত্যাদি ছাড়াও সামর্থ্য অনুযায়ী দুই পক্ষই হলুদের পোশাক-পরিচ্ছদ, রাখী, প্রসাধনী ও কিছু হাল্কা অলঙ্কারাদি পাঠায়। এছাড়া বিভিন্ন মিষ্টান্ন দ্রব্যের সঙ্গে বড় আকৃতির রুই বা কাতলা মাছ, মাছের মুখের ভেতরে ৫০০, ১০০০ বা সাধ্যানুযায়ী নগদ টাকা এবং পান-সুপারি-চুনও পাঠাতে হয়। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের ক্ষেত্রে বিয়ের একদিন আগে অর্থাৎ অধিবাসের দিন বরণকুলা-তত্ত্ব পাঠানো হয়ে থাকে।

১০. তেলাই দেওয়া

মুসলমান-হিন্দু, বিত্তহীন-বিত্তবান, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সব পরিবারের বর ও কনেকে বিয়ের দুদিন বা একদিন আগে 'তেলাই' বা গায়ে হলুদ দেওয়া হয়। বর বা কনের বাড়ি থেকে পাঠানো সামগ্রী দিয়ে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। প্রথমে বরের পক্ষ থেকে কনেকে হলুদ ছোঁয়ানো হয়। গ্রামাঞ্চলের অনেক বর-কনেকে, আগের দিনের মতো এখনও সোন্দা-মেথি বেঁটে গায়ে মাখানো হয়। হিন্দুসমাজে ছেলের গায়ে-ছোঁয়ানো হলুদ মেয়ের গায়ে মাখানো হয়। কনের ভাবী, চাচাতো বোন, খালাতো বোন কিংবা ফুফাতো বোনরা তাকে গোসল করায়। এর বিনিময়ে জামাইকে গুণতে হয় সম্মানজনক পরিমাণ অর্থ। গায়ে হলুদ বা তেলাই দেওয়ার পর বর ও কনে উভয়কেই কিছু বিধি-

www.pathagar.com

নিষেধ মেনে চলতে হয়। বিশেষকরে, গায়ে হলুদ দেওয়ার পর কেউ ঘরের বাইরে যেতে পারে না। কারণ সোন্দা-মেথির গন্ধে ভূত-প্রেত আকৃষ্ট হয়ে বর বা কনের ওপর 'ভর' করতে পারে বলে অনেকে বিশ্বাস করে থাকেন।

১১. বধূবরণ

নতুন বউ নিয়ে বাড়ি ফিরে এলে বউকে বরণ করে নেওয়ার রীতি আমাদের সমাজে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। এটি হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ করে থাকেন। জামাই-বউ গাড়ি, রিক্সা বা নৌকায় করে এলে তাদের মিষ্টি খাইয়ে কোলে করে নামিয়ে আনা হয়। এর আগে পানি বা দুধভর্তি একটি কলসিতে আমপাতা ভিজিয়ে রাখা হয়। বউ নেমে এলে ঐ আমপাতা দিয়ে তার গায়ে পানি বা দুধ ছিটিয়ে দেওয়া হয় এবং আমপাতা ভেজানো কলসির পানিতে বা দুধে কনের কনিষ্ঠাঙ্গুলি ভিজিয়ে নেওয়া হয়। পরে মা-চাচীরা ছেলে ও বৌয়ের মাথায় ধান-দূর্বা ছিটিয়ে দিয়ে তাকে বরণ করে একটি নতুন শাড়ি কাপড়ের ওপর দিয়ে হাঁটিয়ে বা কোলে করে ঘরের ভেতরে নিয়ে যায় এবং মা তার দুই উরুর ওপর দুজনকে বসিয়ে দুধের সরবত ও মিষ্টি পান করায়। ধীরে ধীরে অন্য আত্মীয়-স্বজনরা একের পর এক বর ও বধূকে রসগোল্লা বা ফিরনি খাইয়ে নতুন বউকে বরণ করে নেয়। পিতৃগৃহ থেকে বের হওয়ার সময় কনের মা তার শাড়ির আঁচলে যে টাকা বেঁধে দিয়েছিল, স্বামীগৃহে প্রবেশের পর সে ঐ টাকাটা ঘরের এক কোণে রেখে দেয়।

১২. মেজবানি

স্থানীয় ভাষায় একে 'হতিয়া' বলা হয়ে থাকে। মুসলমানদের মৃত্যুর চল্লিশ দিন অতিবাহিত হয়ে গেলে ঐদিন বা তার আগে-পরে চল্লিশা উপলক্ষে একই বাড়ির বিভিন্ন ঘর, গ্রামের ভেতরের বিভিন্ন বাড়ির সদস্য (নারী-পুরুষ নির্বিশেষে), বিশিষ্ট আলেম এবং যারা কবর খোদাই করে থাকে, তাদের দাওয়াত দিয়ে খাওয়ানো হয়। দাওয়াত ছাড়াও খাওয়ানো হয়। অনেক সময়ই এতো লোকের বাসন-কোসনের ব্যবস্থা সম্ভব হয় না বলে কলাপাতা কেটে কেটে বিছিয়ে দেওয়া হয়।

লালমোহন উপজেলা

১. ঈদ উৎসব

মুসলমানদের কাছে রোজার ঈদ বা ঈদুল ফেতর এবং কোরবানি ঈদ বা ঈদুল আজহা প্রধানতম ধর্মীয় উৎসব। দুটি ঈদই এ এলাকার মুসলমানরা খুবই আনন্দ-উদ্দীপনার সাথে উদ্‌যাপন করেন। তবে এটা অত্যন্ত বাস্তব যে, সবার কাছেই ঈদ সমান আনন্দ বয়ে নিয়ে আসে না। সমাজের একটি শ্রেণি ঈদ উদ্‌যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি শুরু করেন রোজার আগমনের পরপরই, অনেকে বা রোজার দু'এক সপ্তাহ আগে থেকেই।

আজকাল মনে হয় হাজার হাজার উৎসুক চোখের দৃষ্টি চাঁদ দেখার জন্য আকাশের ওপর নিপতিত হয় না। মানুষ বোধহয় এখন চোখের চেয়ে কানের ওপরই গুরুত্ব দিয়ে

www.pathagar.com

থাকে বেশি। শেষ রোজার দিন সন্ধ্যায় একটা কি দুটো পটকার আওয়াজ শোনা গেলেই বুঝতে হবে যে, ঈদের চাঁদ দেখা গেছে এবং কাল ঈদ হবে।

ঈদের চাঁদ দেখার এক মাস আগে রমজান যখন ঈদের আগমনী বার্তা জানান দেয়, তখন থেকেই শুরু হয় ঈদকে স্বাগতম জানানোর আয়োজন। মসজিদে মসজিদে প্রতি জুম্মাবারে রোজার এবং ঈদের গুরুত্ব বর্ণনা করে দেওয়া হয় বিশেষ খোতবা, জাকাত এবং ফেতরা আদায়ের গুরুত্ব সম্পর্কে বারবার বলা হয়। অন্যদিকে শুরু হয়ে যায় যার যার সামর্থ্যের মধ্যে থেকে প্রয়োজনীয় ও পছন্দনীয় পোশাকটি কেনার। কিন্তু একটি শ্রেণির সাধ এবং সাধ্যের মধ্যে কোনো সীমারেখা না থাকলেও সমাজের আরেকটি শ্রেণি কিছুতেই যেন এ দুয়ের মধ্যে কোনো মিলন ঘটাতে পারে না। একদিকে ঈদ উপলক্ষে নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের, অন্যদিকে পোশাক-সামগ্রীর অব্যাহত মূল্যবৃদ্ধি কোনোটাই যেন কম যায় না। তবুও এরই মধ্যে অনেককে দু'দিকই সামলাতে হয়। হয়তো সবদিকেই কিছু কাটছাট করতে হয়—পরিমাণ কমাতে হয় নয়তো মানটা আশানুরূপ হয় না। এভাবেই স্বপ্ন আর সাধ্যের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে হয়। সমাজের অবশিষ্ট আর একটি শ্রেণির কথা বলে কোনো লাভ নেই। তাদের কোনো স্বপ্ন নেই, স্বপ্ন দেখতেও মানা। তারা শুধু পূর্বোক্ত দুটি শ্রেণির দিকে তাকিয়ে তাকে আর দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। এই হলো আমাদের রোজার পরের ঈদ উদ্‌যাপন।

রমজান শুরু হওয়ার কয়েকদিনের মধ্যেই বাজারের কাপড়ের দোকান কিংবা পোশাকের দোকানগুলোতে নতুন রং, প্রিন্ট ও ডিজাইনের থান কাপড় ও তৈরি পোশাকের সমাবেশ ঘটতে শুরু করে। ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায় ক্রেতার সংখ্যা, যা চাঁদরাত অর্থাৎ ঈদের পূর্ব রাত পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। অনেকে জেলা শহর ভোলা কিংবা রাজধানী ঢাকাতেও কেনাকাটা করে থাকেন বা আনিয়ে নেন।

থান কাপড় ও তৈরি পোশাকের পাশাপাশি জুতা, স্যান্ডেল ও প্রসাধনসামগ্রীর দোকানেও প্রচুর ভিড় জমে ওঠে। ঈদের আগের রাতে মুদি দোকানগুলোতে ক্রেতার সমাগমে দোকান মালিক ও তার সহযোগীরা শ্বাস ফেলার সময়টুকুও পান না। চিনি, সুজি, গুড়া দুধ, সেমাই, লাচ্ছা সেমাই, কিসমিস, এলাচ, দারচিনি, চটপটির জন্য মটর ডাল, চটপটির মশল্লা, তেঁতুল, ইত্যাদি ওজন করতে করতে তারা হাঁপিয়ে ওঠেন।

বাজারে চায়ের দোকানগুলো আবার সরগরম হয়ে ওঠে। দীর্ঘ একমাস দোকানগুলো দিনের বেলা বন্ধ থাকার পর আগামীদিন অর্থাৎ ঈদের দিন থেকেই খোলা থাকবে সকাল থেকে অধিক রাত অবধি। আবার জমে উঠবে আড্ডা।

ইতোমধ্যে উপজেলার যেসব বাসিন্দা পেশাগত কারণে জেলা শহর ভোলা কিংবা রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় অবস্থান করছিলেন, তারা তাদের প্রিয়জনের সাথে ঈদের আনন্দ ভাগ করে নেওয়ার জন্য গ্রামের বাড়িতে এসে পৌঁছে গেছেন। কেউ এসেছেন একা, কেউ বা সপরিবারে। পরিবারের সদস্যদের সাথে মিলিত হতে পেরে ঘুচে যায় তাদের পথ ভ্রমণের সব কষ্ট, উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা। অন্তত দু'একদিনের জন্য হলেও সবার হৃদয়ে বয়ে যায় অনাবিল আনন্দের জোয়ার।

এখানে ঈদগাহ ও ঈদগাহ মসজিদ ছাড়াও প্রতিটি ইউনিয়নের বড় বড় মসজিদ কিংবা মাদ্রাসা সংলগ্ন মাঠগুলোতে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

আত্মত্যাগের মহান আদর্শে সমুজ্জ্বল আমাদের আরেকটি ধর্মীয় উৎসব ঈদুল আজহা বা কোরবানির ঈদ। এ ঈদের নাম শুনলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে গরু, ছাগল, ভেড়া, গরুর হাট, ছাগলের হাট, কোরবানি, জবাই, রক্ত, মাংস, ইত্যাদি দৃশ্য। এ ঈদে যতটা তাড়াতাড়ি পারা যায় নামাজ শেষ করা হয়। নামাজ শেষ করার সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন মসজিদের ইমাম, মুয়াজ্জিন বা মাদ্রাসার ছাত্ররা গরু-ছাগল জবাই করার জন্য ছুরি হাতে নেমে পড়েন। লাভ করেন ঐ মাদ্রাসা ও মসজিদের জন্য জবাইকৃত পশুটির চামড়া। অনেকে আবার চামড়া বিক্রি করে সেই অর্থ দুস্থদের মধ্যে বিতরণ করে দেন ধর্মীয় বিধি-বিধান অনুযায়ী।

কোরবানির ঈদে অনেক সময় লক্ষ্য করা যায়, কোরবানির পশু কেনা নিয়ে একটা নীরব প্রতিযোগিতা চলে। অপ্রকাশ্যে চলে মর্যাদার লড়াই। অমুক বাড়ির অমুক মিয়া অতো টাকা দিয়ে গরু কিনেছে। আমার গরুটির দাম তার চেয়েও কিছুটা বেশি হওয়া প্রয়োজন। আমার প্রতিবেশী কিনেছেন ত্রিশ হাজার দিয়ে, আমি আর একটু বেশি দাম দিয়ে না কিনলে মর্যাদা থাকে না। এভাবে একটা অঘোষিত প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়।

কোরবানির ঈদের নাম শুনে শুনলেই একটা ভুরিভোজনের গন্ধ যেন নাকে চলে আসে। জিহ্বায় একটা অন্যরকম অনুভূতি হতে থাকে। গরুর মাংস, ছাগলের মাংস আর চাউলের রুটি—বছরের এই দিনের মাংসের স্বাদই যেন সম্পূর্ণ আলাদা। বিকাল পর্যন্ত চলে কাঁচা মাংস ধোয়াধুয়ির কাজ। রান্না তো কিছুটা দুপুরেই হয়ে যায়।

কোনো বিশেষ দিন বা বিশেষ ব্যক্তি উপলক্ষে একটু ভালো খাবার-দাবারের আয়োজনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হলে কোরবানির ঈদ তার অনেকটা খরচ পুষিয়ে দেয়।

মাংস কাটার ঝামেলা শেষ হয়ে গেলে অনেকেই গরুর বা ছাগলের মাথার খুলি বা হাড় বাড়ির সামনে গাছের সাথে ঝুলিয়ে রাখে। এতে বাড়িতে অনভিপ্রেত অশুভ শক্তির অনুপ্রবেশ বাধাগ্রস্ত হয় বলে লোকসমাজের বিশ্বাস।

২. শবেবরাত

শবেবরাত ও শবেকদরের রাত বিশেষ মর্যাদার সাথে লালন করা হয়ে থাকে। শবেবরাতের পবিত্র রাতে আল্লাহতাআলা তার প্রিয় বান্দাদের তওবা কবুল করেন ও তাদের গুণাহ মাফ করে দেন। এ রাতে পৃথিবীর তাবৎ সৃষ্টির জন্ম-মৃত্যু, রেজেক-দৌলত নির্ধারিত হয়ে থাকে। আমাদের লোকসমাজের বিশ্বাস, এদিন একটু ভালো ও উন্নতমানের খাবার-দাবার খাওয়া গেলে বছরের পুরোটা সময়ই সেভাবে খেতে পারা যাবে। এজন্য এদিন ধনী-গরিব যার যার সামর্থ্য অনুযায়ী বাড়িতে খাবারের মানটা একটু উন্নত করার প্রয়াস পান। এদিন বাড়ির গৃহকর্তা বা গৃহিণীরা পারতপক্ষে বাচ্চাদের গালমন্দ করা থেকে বিরত থাকেন। বাড়ির গৃহকর্মীরাও এদিন গৃহকর্ত্রীর অনভিপ্রেত বকা-ঝকা থেকে রক্ষা পেয়ে থাকেন। বছরের এই একটি-দুটি দিন তারা একটু নিশ্চিন্ত দিন অতিবাহিত করেন।

www.pathagar.com

একসময় এইদিনে ঘরে তৈরি করা হালুয়া রুটি প্রতিবেশীদের মধ্যেও বিতরণ করা হতো। আজকাল ধীরে ধীরে সহমর্মিতা ও আন্তরিকতাপূর্ণ এই রেওয়াজগুলি একেবারেই উঠে যাচ্ছে।

৩. দুর্গোৎসব

সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব এই দুর্গোৎসব। এদিন দেবী দুর্গা স্বামীগৃহ থেকে পিতৃগৃহে আগমন করেন। এ উপলক্ষে এ অঞ্চলের সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে এক বিশেষ আনন্দের সাড়া পড়ে যায়। দেবী দুর্গার প্রতিমা নির্মাণ করা হয় পূজামণ্ডপগুলিতে। চার-পাঁচটি পূজামণ্ডপে ঢল নামে শিশু-কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতী ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের। সবাই নতুন নতুন কাপড় পরে মন্দির থেকে মন্দিরে, মণ্ডপ থেকে মণ্ডপে ঘুরে বেড়ায়। দেবী দুর্গাকে আরতি দেয় এবং প্রসাদ গ্রহণ করে। তারপর নির্দিষ্ট দিনে নিকটস্থ কোনো পুকুরে অথবা খালে দেবী দুর্গাকে দেওয়া হয় বিসর্জন।

এদিন সনাতন ধর্মাবলম্বীরা তাদের নিজ ধর্মানুসারী ছাড়াও মুসলমান বন্ধুদের তাদের ঘরে ও মণ্ডপে আমন্ত্রণ জানায় এবং তারা সে আমন্ত্রণ সানন্দে গ্রহণ করে। তাদেরকে নারিকেলের নাড়ু, সন্দেশ, লুচি প্রভৃতি দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়।

৪. লক্ষ্মীপূজা

দেবী লক্ষ্মী হলেন সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সৌভাগ্য, সৌন্দর্য ও সম্পদের দেবী। সনাতন ধর্মাবলম্বী প্রতিটি পরিবারেই দেবী লক্ষ্মীর বার্ষিক পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এদিন তারা সারারাত জেগে থাকেন। কারণ, তারা বিশ্বাস করেন যে, এই রাতে জেগে থেকে যারা উপাসনায় কাটিয়ে দেবে, দেবী লক্ষ্মী তাদের ঘরে ঘরে গিয়ে আশীর্বাদ ও সৌভাগ্য বিতরণ করে থাকেন। দুর্গাপূজার মতো এই পূজাতেও সনাতন ধর্মাবলম্বীরা তাদের ভিন্ন ধর্মাবলম্বী বন্ধু-বান্ধবদের নিজ গৃহে আমন্ত্রণ জানিয়ে আপ্যায়ন করে থাকেন।

৫. সরস্বতী পূজা

অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই এ পূজা উদ্‌যাপনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়ে থাকে। কারণ সরস্বতী হচ্ছেন বিদ্যার দেবী। এ পূজাতেও সনাতনধর্মী শিক্ষার্থীরা তাদের ভিন্ন ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থী সতীর্থদের আমন্ত্রণ জানিয়ে থাকেন এবং তারাও সে আমন্ত্রণে সাড়া দেন।

৬. নববর্ষ

বছরের প্রথমদিন মানেই একটি শুভদিন। তাই এই দিনের মর্যাদাও একটু ভিন্নতর। কিন্তু এই দিনকে বরণের জন্য আনুষ্ঠানিক কোনো আয়োজন, উদ্যোগ না থাকলেও গ্রামাঞ্চলের কৃষিজীবী, তাদের গৃহিণী এবং বাজারের সনাতন ধর্মাবলম্বী ব্যবসায়ীদের মধ্যে একটা বিশেষ সচেতনতা লক্ষ্য করা যায়। গৃহিণীরা চৈত্রের শেষ সপ্তাহের শেষ দিকে তাদের ঘর-দোর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করেন, মাটির ঘরের মেঝে, পিড়া ইত্যাদি নতুন মাটি দিয়ে লেপা-মোছা করেন, রসিঘরের মাটির চুলাগুলোর সংস্কার করেন এবং সারা বছরের তুলনায় একটু অপেক্ষাকৃত উন্নতমানের খাবার-দাবারের প্রয়োজনীয়

www.pathagar.com

উপকরণ বাজার থেকে আনার জন্য গৃহকর্তাদের তাড়া দেন। স্কুল-কলেজে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীরাও এইদিনে খুব ভোরে ঘুম থেকে জেগে অল্পসময়ের জন্য হলেও পড়াশোনায় মনোনিবেশ করে। গৃহিণীরা তাদের বাচ্চাদের বকা-ঝকা, রাগারাগি বা মারধর করা থেকে বিরত থাকেন—এ সব একই কারণে। বছরের প্রথম দিন। এদিনে ঝগড়াঝাটি, বাচ্চাদের গালমন্দ কিংবা মারধর করা কোনোক্রমেই সঙ্গত নয়। দুষ্ট বাচ্চারা একদিনের জন্য হলেও মায়ের বকুনি ও মারধর থেকে রক্ষা পায়। গৃহিণীদের অনেকে এদিন কিছু পিঠা-পায়েসও তৈরি করে তাদের স্বামী-সন্তানদের মুখে তুলে দিতে সচেষ্ট হন।

বাজারের সনাতন ধর্মাবলম্বী ব্যবসায়ীরা পুরনো ঐতিহ্য বজায় এবং বকেয়া পাওনা আদায়ের জন্য হালখাতার আয়োজন করে থাকেন।

৭. হালখাতা

সনাতন ধর্মাবলম্বী ব্যবসায়ীরা নতুন বছর উপলক্ষে হালখাতার আয়োজন করেন। নতুন বছরের জন্য হিসাবের নতুন খাতা খোলা হয়। একটি রূপার মুদ্রা সরিষার তেলে ভিজিয়ে সিঁদুর মাখিয়ে নতুন খাতাটির চারকোণে চারটি ও মাঝখানে একটি—সর্বমোট পাঁচটি ছাপ দেওয়া হয় এবং নিজ ধর্মের একজন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকে দিয়ে খাতাটির উদ্বোধন করানো হয়। মুসলিম ব্যবসায়ীদের কেউ কেউ দোকানপাট পরিষ্কার করে মিলাদ-মাহফিলের আয়োজন করে থাকেন।

৮. নবান্ন

প্রধানত কৃষিজীবীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ঘরোয়াভাবেই তারা নতুন ধানের চাল দিয়ে ভাত রান্না করে। কিছু পিঠা-পায়েস তৈরি করে নিজেরা খায় ও খুব ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনকে খাওয়ায়। এই উপলক্ষে আত্মীয়-স্বজনকে ডেকে দাওয়াত দিয়ে খাওয়ানোও অনেক কমে গেছে।

কৃষকেরা যেদিন নতুন ধান কেটে নিয়ে আসে, সেদিন ধানের একটি গোছাকে পেঁচিয়ে চুলের বেণীর মতো করে ঘরের এককোণে খুঁটির সাথে বেঁধে রাখে।

৯. বরণকুলা-বরণডালা

উভয় পক্ষের কথাবার্তা পাকাপাকি হয়ে গেলে বিয়ের দিন-তারিখ নির্ধারণ করা হয়। বিয়ের একদিন বা দু'দিন আগে হলুদের জন্য বর ও কনে উভয়পক্ষ থেকে বাঁশ-বেতের তৈরি ও আলপনায় চিত্রিত কুলা ও ডালায় বিভিন্ন সামগ্রী পাঠানো হয়ে থাকে। এর মধ্যে থাকে বাটা হলুদ, সাতটি আস্ত হলুদ, সাতটি দুলপা বা দূর্বা, সাতটি পান, সাতটি ধান, বাটা মেহেদি, সোন্দা, মেথি, সাবান, তেল, ইত্যাদি। বরের বাড়িতে অতিরিক্ত কিছু জিনিস পাঠানো হয়, যেমন, রেজার, সেভিং ক্রিম ও আফটার সেভ। দু-পক্ষই হলুদের পোশাক, প্রসাধনী, ছোটখাটো কিছু অলংকার, রাখী ও রসগোল্লা, আমিত্তি, সন্দেশ, নিমকি ইত্যাদি পাঠিয়ে থাকে। এছাড়া বর পক্ষ একটি বা দুটি বড় আকৃতির মাছ এবং সামর্থ্য অনুযায়ী মাছের মুখের ভেতরে ৫০০, ১০০০ টাকা পুরে দেয়।

www.pathagar.com

এসবের সঙ্গে পান-সুপারি-চুন অবশ্যই থাকতে হবে। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের ক্ষেত্রে এসব তত্ত্ব বিয়ের একদিন আগে পাঠানো হয়ে থাকে।

১০. তেলাই দেওয়া

বিয়ের দুদিন বা একদিন আগে বর-কনেকে হলুদ বা তেলাই দেওয়া হয়। বর বা কনের বাড়ি থেকে পাঠানো সামগ্রী দিয়ে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়ে থাকে। সনাতন ধর্মে বরের গায়ে-ছোঁয়ানো হলুদ দিয়ে কনের গায়ে হলুদ দেওয়া হয়। হলুদ দেওয়া সম্পন্ন হলে কনের বোন-ভাবীরা তাকে গোসল করিয়ে থাকে। তবে এজন্য বরকে যথাযথ সম্মানী প্রদান করতে হয়।

গায়ে হলুদের পর বর-কনে উভয়কেই কিছু বিধি-নিষেধ মেনে চলতে হয়, বিশেষকরে তাদের ঘরের বাইরে যেতে দেওয়া হয় না। কারণ, হলুদসামগ্রীর মনভোলানো গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে ভূত-প্রেত বা এ জাতীয় কোনো অশুভ শক্তি তাদের ওপর 'ভর' বা কোনো অনিষ্ট সাধন করতে পারে।

১১. বধূবরণ

বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হওয়ার পর বর-বধূকে নিয়ে আত্মীয়-স্বজন সবাই বাড়ি ফিরে এলে বর-বধূকে বরণ করে নেওয়ার প্রচলন আমাদের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যেই রয়েছে। এটি মূলত বধূবরণ। নববধূকে একটু চিনি বা মিষ্টি খাইয়ে তাকে বহনকারী যান থেকে নামিয়ে আনা হয়। পানি বা দুধ ভর্তি একটি হাঁড়িতে আমপাতা ভিজিয়ে নববধূর গায়ে ছিটিয়ে দেওয়া হয় এবং তার হাতের কনিষ্ঠাঙুলি ঐ হাঁড়ি বা কলসির ভেতরে ডুবিয়ে আনা হয়। এরপর একটি কুলায় সাতটি ধান, সাতটি পান, সাতটি দূর্বা ও সাতটি হলুদ নিয়ে নববধূর মুখমণ্ডলের সামনে দিয়ে ঘুরিয়ে আনা হয়। পরে তার মাথায় ধান-দূর্বা ছিটিয়ে দিয়ে কোলে করে অথবা নতুন শাড়ির ওপর দিয়ে হাঁটিয়ে ঘরের ভেতরে নিয়ে যাওয়া হয়। বরের মা তার ছেলে ও নববধূকে দুই উরুর ওপর বসিয়ে দুধের শরবত পান করান। ধীরে ধীরে উপস্থিত শিশু-কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সবাই মিলে বর ও কনেকে মিষ্টি খাইয়ে বরণ করেন।

চরফ্যাশন উপজেলা

১. ঈদুল ফেতর ও ঈদুল আজহা

ঈদ মানেই খুশি, ঈদ মানেই আনন্দ। পবিত্র রমজান মাসের ত্রিশ রোজা রাখার পর শাওয়াল মাসের ১ তারিখে আমাদের জীবনে আসে ঈদুল ফেতর বা মুসলমানদের অন্যতম বৃহৎ ধর্মীয় উৎসব। তবে এর আগমনবার্তা ধ্বনিত হয় পয়লা রমজান থেকেই। রোজা শুরুর দিন থেকেই রোজা শেষে ঈদের আমেজ অনুভূত হতে থাকে সর্বত্র। অন্যান্য এলাকার মতো আমাদের চরফ্যাশনও এর বাইরে নয়।

শেষ রোজার দিন বাড়ির উঠান, খেলার মাঠ, প্রশস্ত রাস্তা বা অন্য কোনো উন্মুক্ত স্থান, যেখান থেকে আকাশের অনেকটা অংশ দেখা সম্ভব, এমন সব জায়গায় শিশু-কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা আকাশের বিশেষ কোণটিতে খুঁজতে

www.pathagar.com

থাকেন তাদের খুশির ঈদের চাঁদখানাকে। পেয়ে গেলেই তাদের আর খুশির সীমা থাকে না। ছুটোছুটি, হুড়াহুড়ি পড়ে যায়—রান্নাঘর থেকে বাজারের সর্বত্র। এ সময়টাতে যার যার প্রয়োজনীয় শেষ মুহূর্তের কেনাকাটায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন চরফ্যাশন উপজেলার মানুষ।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, রোজা শুরুর দিন থেকেই শুরু হয়ে যায় অনাগত ঈদের আমেজ। রোজার দু-চারটে পার হলেই শুরু হয়ে যায় ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে ঈদ-প্রস্তুতি। বাজারের দোকানগুলোতে ধীরে ধীরে উঠতে থাকে মালামাল, বিপুল দ্রব্য সম্ভারে পরিপূর্ণ হয়ে যায় থান কাপড়ের দোকান, শাড়ি-লুঙ্গির দোকান থেকে শুরু করে তৈরি পোশাকের দোকানগুলো। তবে প্রথমদিকে থান কাপড়ের দোকানগুলোতেই ভিড় হয় বেশি। যার যার পছন্দ মত প্রয়োজনীয় কাপড় কিনে নিয়ে সালোয়ার কামিজ, ফ্রক, পায়জামা-পাঞ্জাবি, শিশু-কিশোরদের বিভিন্ন ডিজাইনের পোশাক তৈরির জন্য দর্জির দোকানের দিকে ছুটে যায়। যারা আগে-ভাগে দর্জিকে কাপড়ের পিসটি ধরিয়ে দিতে পারবে, সিরিয়াল অনুযায়ী তারাই আগে তৈরি করে নিতে পারবে। দর্জিরাও এ সময়ে ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এর সঙ্গে বেড়ে যায় সুতার দোকান, বোতাম, চেইন, ইত্যাদি সেলাইয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত দোকানগুলোর বেচা-কেনাও। মেয়েদের ব্যাগ, স্যান্ডেল, চুড়ি, ফিতা, কিছু কিছু অলংকারের দোকান এবং ইমিটেশনের অলংকারের দোকানে কিশোরী-তরুণী ও মহিলাদের ভিড় বাড়তে থাকে—ঈদের রাত পর্যন্ত।

ঈদে পুরুষেরাই বা পিছিয়ে থাকবে কেন। ঈদ তো সবার জন্যই। তারা কেউ কেউ নতুন প্যান্ট-সার্টের কাপড় কিনে দর্জির দোকানে অর্ডার দেন। আর পায়জামা-পাঞ্জাবি না হলে তো ঈদই হলো না। বলা যায়, এটা আমাদের ঈদের পোশাক। আর আজকাল তো শুধু আর সাদা পায়জামা-পাঞ্জাবির যুগ নেই। রং-বেরংয়ের পাঞ্জাবিতে কত রকমের যে কাজ, তার ইয়ত্তা নেই। নিত্য-নতুন ডিজাইনে বাজার ছেয়ে যায়। তারই মধ্য থেকে পছন্দেরটি বেছে নিয়ে ঈদের দিনের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে তারা। সামর্থ্যবানরা জেলা শহর ভোলায় অথবা ঢাকাতে গিয়েও সর্বশেষ ডিজাইনের পোশাকটি কেনার চেষ্টা করেন।

ঈদের আনন্দের বিপরীত চিত্রও আছে। দরিদ্র মানুষ পরিপূর্ণভাবে ঈদের আনন্দ ভোগ করতে পারে না। অনেকেই নিজের জন্য না হোক, স্ত্রীর কিংবা ছোট ছোট বাচ্চা-কাচ্চাদের নতুন জামা-কাপড় না দিতে পারায় মনোকষ্টে ভোগেন। এসব শিশুরাও পাড়া বা মহল্লায় অন্যান্য সমবয়সীদের পরনে নতুন নতুন পোশাক দেখে নিদারুণ দুঃখে চোখের পানি ফেলে। বাবা-মার কাছে নতুন জামা-কাপড়ের নিষ্ফল আবদার করে। অনেক সময় বাবা-মার, বিশেষকরে বাবার হাতে লাঞ্ছনাও ভোগ করে। এভাবেই কাটে তাদের খুশির ঈদ, আনন্দের ঈদ।

মোরগ-মুরগির দোকান, মাংসের দোকান ও মুদির দোকানগুলো সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকে। ক্রেতারা তাদের প্রয়োজন ও সামর্থ্য অনুযায়ী পোলাওর চাল, ঘি, তেল, চিনি, সুজি, সেমাই ইত্যাদি কিনে নেন ঈদের দিনের জন্য। আগে তো প্যাকেট সেমাই

www.pathagar.com

পাওয়া যেতো না। তখন অনেক বাড়িতে সেমাই তৈরির মেশিন ছিল। এক বাড়িতে একটা থাকলে দশ বাড়ি ঘুরে আসতো ঐ মেশিন। একেবারে চিকন থেকে একটু মোটা—এমন তিন-চার ধরনের ছিদ্র ছিদ্র যুক্ত পাত ছিল, যেগুলো দিয়ে সেমাই বেরিয়ে আসতো। কুলা বা এ জাতীয় কিছুতে কাপজ বিছিয়ে কাঁচা সেমাইগুলো রাখা হতো। এরপর রোদে শুকিয়ে বড় বৈয়মে রেখে দেওয়া হতো ঈদের দিন বা তার পরবর্তী সময়ে মেহমানদারি করার প্রয়োজনে।

গ্রাম বা শহরের কাঁচা মেঝের ঘরে ঘরে পড়ে যায় ঘর লেপার ধুম। পরিষ্কার ও শক্ত মাটি এনে বিশেষ কোনো পাত্রে পানি দিয়ে গুলিয়ে পাতলা ও নরম পুরনো কাপড়ের সাহায্যে ঐ মাটি দিয়ে ঘরের মেঝে, পিড়া, রান্নাঘর ইত্যাদি 'লেপা' হয়। ঘরটাকে ঝকঝকে তকতকে একটা নতুন ঘরের মতো করে তোলা হয়। মাটির ঘরে মাটি দিয়ে চুনকাম আর কি। ঘরের সব ব্যবহার্য জিনিসের ওপরই একটা পরিচ্ছন্নতার ছোঁয়া পড়ে। বিছানা চাদর, বালিশের কভার, মশারি, সবকিছু সোডা দিয়ে সিদ্ধ করা হয়, যাতে বেশি পরিষ্কার হয়। ঘরের বিভিন্ন শোনাকুনি, খাট বা চৌকির নীচে 'কার' (পাটাতন)-এর নীচে যে সমস্ত জায়গায় মাকড়সার জাল বা 'ঝুল' জমে, সে-সব কিছুই 'ঝুল ঝাড়ু' দিয়ে পরিস্কার করে সারা ঘরটিকে পরিচ্ছন্ন করে তোলা হয় পবিত্র ঈদের দিনের জন্য। আর একাজে বাড়ির গৃহিণীদের অবদান থাকে শতকরা নিরানব্বই ভাগ।

ঈদের আগের রাতে আমাদের মহিলাদের সাজ-সজ্জার একটি ব্যাপার আছে। কে-না চায় নিজেকে একটু আকর্ষণীয় করে তুলতে? সে মহিলা হোক আর পুরুষই হোক। বাংলার মেয়েরা এ সময় বিশেষভাবে মেহেদি লাগানোটাকে সৌন্দর্যচর্চার একটি বিশেষ দিক বলে মনে করেন। নিজের বাড়ির বা ঘরের জানালার পাশের মেহেদি গাছ থেকে কিংবা পাশের বাড়ির আত্মীয় বা পরিচিতজনের কাছ থেকে মেহেদিপাতা নিয়ে একে পাটায় মিহি করে বেঁটে হাতের নখে, আঙুলে, তালুতে বিভিন্ন নকশার মাধ্যমে লাগিয়ে থাকে। আজকাল অবশ্য কেউ কেউ মেহেদি বাটার কষ্টটা এড়াতে টিউবের মেহেদি লাগিয়ে থাকেন।

ঈদের দিন সূর্য ওঠার আগেই শিশু-কিশোরী-তরুণী ও ঘরের গৃহিণীরা ঈদ উদ্‌যাপনের আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ঈদ আনন্দের উত্তেজনায় কিশোর-কিশোরীদের রাতে ভালো করে ঘুমই হয় না। গৃহিণীরা যার যার সাধ্যমতো ফিরনি-পায়েস উঠিয়ে দেন চুলায়। কেউ চিনির, কেউবা গুড়ের। অসচ্ছল পরিবারগুলো দুধের ফিরনি-পায়েসের পরিবর্তে আলবান রান্না করেন। এই আলবান তৈরিতে প্রয়োজন হয় চালের গুঁড়া বা ময়দা বা আটা ও গুড়। সামর্থ্য থাকলে নারিকেলও দেওয়া হয়। এই আলবান তারা নিজেরা খান, অতিথিকেও আপ্যায়ন করে থাকেন।

নামাজ পড়ার জন্য যাত্রা শুরু। যাদের সামর্থ্য ছিল তারা নতুন পোশাক কিনেছেন,আর তা পরেই তারা যাত্রা করেন ঈদগাহের দিকে। আর যাদের সামর্থ্য ছিল না, তারা পুরনো পায়জামা-পাঞ্জাবিটাকে বের করেই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে ধুয়ে ইস্ত্রি করে রেখেছিলেন। সেটা পরেই যাত্রা করেন নামাজ আদায়ের জন্য।

চরফ্যাশনের প্রধান ঈদ জামাতগুলি অনুষ্ঠিত হয় আলিয়া মাদ্রাসা ঈদগাহ মাঠ, খাসমহল মসজিদ, থানা মসজিদ ও বিআরডিবি মসজিদে। এছাড়া দূর-দূরান্তরের বড়

www.pathagar.com

বড় মসজিদগুলোতেও ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ঈদের নামাজের পর তো সারা পৃথিবীর মুসলমানের একই কাজ—কোলাকুলি করা। শিশু থেকে বৃদ্ধ, গরিব-ধনী সবাই এ সময়টাতে কোলাকুলি করতে পরস্পরের দিকে এগিয়ে যায় আর মুখে উচ্চারণ করে 'ঈদ মুবারক'।

এবার ঈদগাহ থেকে ফেরা। পথিমধ্যে পরিচিত দু'একজনের সাথে দেখা হলে তার সাথে আবার কোলাকুলি করা, আর এভাবেই নিজ ঘরে ফিরে আসা।

ঈদের দিনে শিশু-কিশোরদের আনন্দ যেন আর ধরে না। তারা তাদের পোশাকটা পরে নিয়ে পাড়ার বা আশপাশের সব বাসায় দলবেঁধে ঘুরতে যায়। মুরুব্বিদের কদমবুচি করে। মুরুব্বিরাও তাদের খুশি করার জন্য সামর্থ্য অনুযায়ী 'ঈদি' দিয়ে থাকেন।

ঈদুল ফিতরের দিনের বাকি সময়টা কাটে কিভাবে? অনেক আগে আমাদের অঞ্চলে ঈদের দিন প্রীতি ফুটবল ম্যাচ, হাডুডু খেলা ইত্যাদি খেলাধুলার আয়োজন করা হতো। এখন আর এসব নেই। এখন তো টেলিভিশনের অনেক চ্যানেল। সব চ্যানেলে ঈদ উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, নির্মাণ করা হয় নতুন নতুন নাটক, দেখানো হয় পুরনো দিনের চলচ্চিত্র। মোটামুটি এসব অনুষ্ঠান দেখেই তাদের বাকি সময়টা কেটে যায়। দু'একজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধু-বান্ধবের বাড়ি ঘুরে আসা, বসে কিছুক্ষণ গল্প-গুজব করা, বন্ধুদের নিয়ে সিনেমা হলে গিয়ে বড় পর্দায় ছবি দেখা, এইতো ঈদ—আমাদের প্রধানতম উৎসব।

'কোরবানির ঈদ' বা ঈদুল আজহার দিনটি আবার কাটে অন্যরকম। এ ঈদে 'রোজার ঈদ' বা ঈদুল ফেতরের দিনের মতো অফুরন্ত অবসর নেই। এ ঈদেরও প্রস্তুতি শুরু হয় কয়েকদিন আগে থেকে। যাদের লোকজন আছে, তারা কোরবানি করার জন্য পশুটি, সে ছাগল হোক বা গরু হোক, আগে-ভাগে কিনে রাখেন। অনেকে আবার ৬/৭ মাস বা ৭/৮ মাস আগেই কিনে লালন-পালন করে কোরবানি দেওয়ার উপযোগী করতে নিজ হাতে গড়ে তোলেন।

ঈদের দু'চারদিন আগে থেকেই শুরু হয়ে যায় ছুরি, কাঁচি, বটি, দা, চাপাতি ইত্যাদি শান দেওয়ার কাজ। এসময় কামাররা অসম্ভব রকম ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তারা কিছু কিছু দা-ছুরি-বটি তৈরি করেও রাখেন, যাতে চাওয়া মাত্র গ্রাহকের প্রয়োজন মেটানো যায়। আবার অনেক গ্রাহক তাদের পুরনো জিনিসগুলোকেই 'লবণ পানি' দিয়ে ধার করানোর জন্য কামারের দোকানে দিয়ে থাকেন আগেই।

তারপর যথারীতি সময় ঘনিয়ে এলে বিভিন্ন স্থানে বসে কোরবানির হাট। হাটগুলোতে প্রচুর মহিষ-গরু-ছাগল-ভেড়ার আমদানি হয়। সামর্থ্যবানরা কিনে নেন এক বা একাধিক গরু-ছাগল।

ঈদগাহ মাঠসহ বড় বড় মসজিদগুলোতে ঈদের জামাত অনুষ্ঠানের পর লোকজন ছুটতে থাকে নিজ নিজ বাসা বা বাড়ির দিকে, যেখানে তাদের পালিত কিংবা ক্রীত পশুটিকে কোরবানি দেওয়া হবে আল্লাহতাআলার নামে। মসজিদের ইমাম, মুয়াজ্জিন ও অন্যান্য আলেম ও মাদ্রাসার ছাত্রদের অনেকে পশু জবাই করার জন্য উন্মুক্ত ছুরি হতে বেরিয়ে পড়েন। শতশত পশু কোরবানি হয়ে যায়।

www.pathagar.com

কোরবানির ঈদের দিনটি কাটে অসম্ভব রকমের একটা ব্যস্ততার মধ্য দিয়ে। মাংস কাটার পর সেগুলো যথানিয়মে ভাগ করা, গরিব-দুঃখী, পাড়া-প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বন্টন করা ইত্যাদিতে প্রায় সারাটা দিন কেটে গিয়ে রাত অবধিও গড়ায়। এ ঈদে যারা কোরবানি দিয়ে থাকেন, তারা দিনশেষে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়েন। এভাবেই একটি আনন্দময় ব্যস্ততার মধ্য দিয়ে দিনটি অতিবাহিত হয়।

২. শবেবরাত

পরম করুণাময় আল্লাহতাআলার দানের অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে কিছু প্রাপ্তির আশায় প্রার্থনা জানাবার রাত এই শবেবরাতের রাত। আল্লাহতাআলাকে নিবিষ্ট চিত্তে স্মরণ করার রাত এই রাত, তাঁর পরম সান্নিধ্য, অনুকম্পা লাভের জন্য প্রার্থনা জানাবার রাত এই শবেবরাতের রাত। আল্লাহতাআলা তাঁর প্রিয় ও মুমিন ব্যক্তির ডাকে সাড়া দিয়ে এই রাতে তাদের প্রার্থনা ও তওবা কবুল করেন। এ-রাতেই নির্ধারিত হয় সমস্ত সৃষ্টির জন্ম-মৃত্যু, ভালো-মন্দ, মঙ্গল-অমঙ্গল এবং রেজেক ও ধন-দৌলত। ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা তাই সারারাত এবাদত-বন্দেগি, জেকের-আজকার ও পবিত্র কোরান শরিফ তেলাওয়াত করেন, নির্ঘুম কাটিয়ে দেন। খাসমহল মসজিদ, থানা মসজিদ ও বিআরডিবি মসজিদসহ সব মসজিদেই মুসল্লিদের আসা-যাওয়া চলতে থাকে ফজরের নামাজ অবধি। তবে আমাদের দেশের মুসলিম জনগোষ্ঠীর একটি অংশের মধ্যে অন্যান্য স্থানের মতোই এ রাতটি সামাজিক নিয়মনীতি পালনের একটা রাতে পরিণত হয়। একসময় দিনের শেষভাগ থেকেই শুরু হতো বুট ডালের হালুয়া, সুজির হালুয়া, রুটি ইত্যাদি তৈরি এবং প্রতিবেশী ও ফকিরদের মধ্যে বিতরণের পালা। সাম্প্রতিককালে এই প্রবণতা অনেকটাই হ্রাস পেয়েছে। তবে ফকিরদের দান করা হয়। সবারই বিশ্বাস, এ রাতে একটু ভালো খেতে পারলে সারা বছরই ভালো ভালো খাওয়া যাবে। এজন্য মুসলমানরা সামর্থ্য না থাকলেও ধার-দেনা করে হলেও এদিন একটু ভালো বাজার-সদাই করে থাকেন। বাজারে এর প্রভাব পড়ে স্বাভাবিকভাবেই। মাংস, মুরগি, মাছ, পোলাওর চাল, চিনি, গুড়, দুধ, সেমাই, বুট ডাল, সুজি প্রভৃতির দাম বৃদ্ধি পেয়ে দ্বিগুণ-তিনগুণে পৌঁছে যায়। তারপরও মানুষ একটু ভালো-মন্দ খাবার প্রত্যাশায় এই অত্যধিক দাম বৃদ্ধিকেও মেনে নেয়। পরবর্তী একটি বছর আর একটু ভালোভাবে কাটবে, অভাব-অনটন দূর হবে, এই প্রত্যাশায় অতি দরিদ্র ঘরেও, এই রাতে সামান্যতম হলেও আনন্দের ঢেউ বয়ে যায়।

৩. দুর্গোৎসব

সনাতন ধর্মানুসারীদের সর্ববৃহৎ ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজা। স্বামীগৃহ কৈলাস থেকে দেবী দুর্গার পিতৃগৃহে আগমন উপলক্ষে অন্যান্য এলাকার মতো চরফ্যাশনেও এ উৎসব অত্যন্ত ধুমধামের সাথে পালিত হয়ে থাকে। সব ধর্ম ও বর্ণের মানুষই এতে অংশগ্রহণ করে থাকে। পূজামণ্ডপ তৈরি ও প্রতিমা নির্মাণের কাজ শুরু হয় বেশ কয়েকদিন আগে থেকেই। কালীবাড়ি মন্দির, হরিবাড়ি মন্দির, পালদের মন্দির, দাসকান্দির মন্দির, বৈরাগী বাড়ি মন্দির ও স্বর্ণকার পট্টির মন্দিরে পূজামণ্ডপ তৈরি ও প্রতিমা নির্মাণের কাজ

www.pathagar.com

ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে চলতে থাকে। প্রতিমা নির্মাণশিল্পীরা দিনরাত পরিশ্রম করে এই নির্মাণকাজ সম্পাদন করেন। প্রাথমিক পর্যায়ের কাজ, অর্থাৎ মাটির কাজ শেষ করতে চার-পাঁচদিন সময় লাগে। পরবর্তী পর্যায়ে রং-তুলির সাহায্যে বর্ণিল প্রলেপ দানে সময় লাগে আরো দুই-তিনদিন। দু'চোখে টানা টানা কাজল, ঠোঁটে লাল লিপস্টিক ও কপোলে ব্লাসনের পরশে দেবী দুর্গা হয়ে ওঠেন অনিন্দ্যসুন্দর, প্রতিমা নির্মাণশিল্পীর শিল্পসৃষ্টির প্রয়াস হয় সার্থক। শুক্লপক্ষের ষষ্ঠীতে দেবীর আগমন ঘটে মর্তে। ঢাকের শব্দ, শঙ্খধ্বনি, উপাসনা আর উলুধ্বনিতে সরব হয়ে ওঠে মন্দিরের পর মন্দির, দেবীকে বরণ করে নেয় সনাতন ধর্মাবলম্বীরা।

সনাতন ধর্মাবলম্বীরা পূজা উদ্‌যাপনের জন্য নিজেদের আগে থেকেই প্রস্তুত করে তুলতে থাকে। শিশু-যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সবার জন্য কেনা হয় নতুন পোশাক। পুজোর দিনে আজকাল ছেলেমেয়েরা জিন্স, ফতুয়া পরলেও এমন অনেকেই আছেন যারা সনাতন লালপেড়ে শাড়ি, কপালে লাল টিপ, হাত-পায়ে-আলতার বিচিত্র নকশা এঁকে এবং খোঁপায় ফুল বেঁধে পূজোর সাজ সেজে বেরোতে পছন্দ করেন। পছন্দের পোশাকটি পরে তারা ঘুরে বেড়ায় এক মণ্ডপ থেকে আরেক মণ্ডপে। তারা প্রতিটি মন্দিরে দেবী দর্শন করেন, আরতি নিবেদন করেন ও সবশেষে প্রসাদ গ্রহণ করেন। মুসলিম ধর্মাবলম্বীরাও তাদের সনাতন ধর্মানুসারী বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশীর আতিথ্য গ্রহণ করে থাকেন। ধীরে ধীরে ঘনিয়ে আসে বিজয়া দশমী—দেবীর বিসর্জনের দিন। খাল কিংবা নিকটস্থ পুকুরে দেবীকে দেওয়া হয় বিসর্জন। শেষ হয় সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সর্ববৃহৎ ধর্মীয় উৎসব দুর্গোৎসব।

৪. লক্ষ্মী পূজা

সারাদেশের অন্যান্য এলাকার মতো আমাদের উপজেলায়ও আশ্বিন মাসের কোজাগরী পূর্ণিমায় মহা ধুমধামের সাথে উদ্‌যাপন করা হয় সমৃদ্ধি, সৌভাগ্য, সৌন্দর্য ও সম্পদের দেবী লক্ষ্মীর বার্ষিক পূজা। দেবীর বিশেষ কৃপা লাভের আশায় এই রাতে হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা সারারাত জেগে থাকে, কারণ, তাঁরা বিশ্বাস করেন, দেবী এই রাতে সবার ঘরে ঘরে গিয়ে তাঁর আশীর্বাদ বিতরণ করে থাকেন। দেবী লক্ষ্মীকে নিবেদন করা হয় জল, আতপ চাল, দূর্বা, চন্দন, মধু, ফল, ফুল, দধি, ঘি, বিল্বপত্র, বস্ত্র, স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত অলঙ্কারসহ নানাবিধ সামগ্রী। এ রাতে সনাতন ধর্মাবলম্বীরা চিড়া ও ডাবের পানি দিয়ে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশীদের আপ্যায়ন করে থাকেন। এই পূজা উপলক্ষে আতপ চালের গুঁড়ার সাথে পানি মিশিয়ে ঘরের দরজা, মেঝে, উঠান, বিশেষকরে ঘরের দরজা থেকে লক্ষ্মীর আসন পর্যন্ত আলপনা আঁকা হয়।

৫. সরস্বতী পূজা

জ্ঞান, সংগীত, চিত্রকলা ও বিজ্ঞানের দেবী সরস্বতীর পূজা অত্যন্ত আড়ম্বরের সাথে অনুষ্ঠিত হয় এখানকার প্রায় প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই। এছাড়াও কোনো কোনো মন্দিরেও এ পূজার আয়োজন করা হয়ে থাকে। স্বরস্বতী পূজায়ও সনাতন ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীরা তাদের মুসলিম বন্ধু-বান্ধবদের আমন্ত্রণ জানিয়ে আপ্যায়ন করে থাকেন।

www.pathagar.com

৬. নবান্ন

প্রাণের ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ নবান্ন উৎসবের সেই দিনগুলি আজ আর নেই। ক্ষেত থেকে নতুন ধান কেটে আনার পর আয়োজন করে পাড়া-প্রতিবেশীকে আমন্ত্রণ করে পিঠা-পায়েস তৈরি করে যে খাওয়াবে, সেই দিনগুলো কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। এখন কার্তিক-অগ্রহায়ণে ক্ষেতের ধান পাকলে কৃষকের হৃদয় আনন্দে ভরে ওঠে আগের মতোই, একটা শুভদিন দেখে ধান কাটায় হাতও দেয়। আগ-কাটা ধান বাড়ি বয়ে এনে এক গোছা ধান ঘরের কোণে একটি খুঁটির সাথে বেঁধে রাখে ঠিকই, কিন্তু প্রতিবেশী আর আত্মীয়-স্বজনের সাথে সেই আনন্দ ভাগাভাগি করে নেওয়ার বিষয়টি যেন এখন আর নেই।

রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে, শরীরের ঘাম ঝরানো শ্রমে উৎপাদিত ফসল যখন পরিপূর্ণভাবে পেকে ওঠে, তখন স্বাভাবিকভাবেই কৃষকের মন খুশিতে ভরে ওঠে। বাড়িতে ধান এলে কৃষক পরিবারের বধূরা উঠানে ধান শুকিয়ে চাউল করার জন্য বাজারের রাইসমিলে পাঠায়। সেখান থেকে চাউল আর গুঁড়ি আসে বাড়িতে। ঢেঁকির প্রচলন তো উঠে গেছে সেই কবে। সারা গ্রাম, পুরো ইউনিয়ন চষে বেড়ালেও একটি ঢেঁকি পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। যাই হোক, মেশিনে নতুন ধান ভাঙানো চাউলে রান্না করা হয় নতুন চালের ভাত আর কৃষক-বধূরা নতুন ধানের চালের গুঁড়া দিয়ে তৈরি করে নানান ধরনের পিঠা, পায়েস বা আলবান। পাক্কন পিঠা, পুলি পিঠা, পুয়া পিঠা, ছিট রুটি, চই পিঠা, দুই পিঠা (ভাঁপা পিঠা), চিতই পিঠা, ইত্যাদি কত রকমের পিঠা। ঘরের মেঝেতে হোগলা বা চিউনি বিছিয়ে পরিবারের সদস্য সবাই মিলে সেই পিঠার স্বাদ গ্রহণ করে। মেয়ে থাকলে এবং তাকে বিয়ে দিয়ে থাকলে এসব পিঠা তৈরি করে পাতিলে ভরে মেয়ের বাড়িতে পাঠানো হয়। মায়ের হাতের তৈরি করা পিঠা দেখে মেয়ের চোখ থেকে হয়তো গড়িয়ে পড়ে দু'ফোটা অশ্রু—এই পিঠার প্রতিটি ভাঁজে ভাঁজে যে লেগে আছে তার মায়ের মধুমাখা হাতের স্নেহময় স্পর্শ!

এ সময়ে ধান ক্ষেতে ইঁদুরের গর্ত খুঁজে খুঁজে কিশোর-কিশোরীরা বের করে নিয়ে আসে মুঠোয় মুঠোয় ধান। বাড়িতে ফেরিওয়ালা, মুড়িওয়ালা, মোয়াওয়ালা, চুড়ি-ফিতা এলে সেই ধান দিয়ে রাখে মুড়ি-মোয়া-চিড়া, চুলের ফিতা, চুলের কাটা, নেল পলিশ, লিপস্টিক থেকে শুরু করে অ্যালুমিনিয়ামের হাড়ি, পাতিল, ডেকচি ইত্যাদি।

৭. নববর্ষ

নতুন বছর বা নববর্ষ বাংলাদেশের সব শ্রেণি-পেশার মানুষের কাছেই একটি নতুন বার্তা বয়ে নিয়ে আসে। এই বার্তা মানুষকে নতুন চিন্তা-চেতনায় উজ্জীবিত করে পুরনো বছরের ময়লা-আবর্জনা সব ঝেড়ে-মুছে ফেলে দিয়ে সবকিছু নতুনভাবে গড়ে তুলতে প্রেরণা যোগায়। বাড়ির পাশের পরিষ্কার জায়গার নতুন মাটি সংগ্রহ করে তা দিয়ে কাঁচাঘরের মেঝে-পিড়া লেপ দেওয়া হয়, রান্নাঘরের চুলাগুলোর ভাঙাচোরা অংশ নতুন মাটি দিয়ে সংস্কার করে লেপ দেওয়া হয়। খাট-চৌকির নীচে, ঘরের আশেপাশে, ঘরের ভেতরের বেড়ায়, কোণে কোণে জমে থাকা ময়লা পরিষ্কার করে গৃহিণীরা ঘরের সর্বত্র একটা ছিমছাম পরিবেশ তৈরি করেন। অনেক পাকা বাড়িতে নতুন করে চুনকাম করা

www.pathagar.com

হয়। বাজারের দোকানপাটে বেশি ব্যস্ততা বেড়ে যায়। একদিকে নতুন বছরকে গ্রহণ করে নেওয়ার জন্য পুরাতন জঞ্জাল পরিষ্কার করা, হিসেব-নিকেশ, দেনা-পাওনার চূড়ান্ত তালিকা তৈরি করা ইত্যাদি। এখানে অন্যান্য জায়গার মতো হালখাতা ব্যাপকভাবে না হলেও সনাতনধর্মাবলম্বী ব্যবসায়ীরা পুরনো হিসেবের খাতা পাল্টিয়ে নতুন হিসেবের খাতা খোলেন। হালখাতার যে মূল উদ্দেশ্য পুরনো পাওনা আদায়, সেটা খুব কমই সাধিত হয়। তবুও বছরের শুরুতেই পুরনো ঐতিহ্য তো বজায় রাখতেই হয়।

নতুন বছরের আগমন উপলক্ষে বাড়িতে বাড়িতে তৈরি করা হয়—পিঠা-পায়েস, একটু উন্নতমানের খাবার তৈরি করে থাকেন গৃহিণীরা। সামর্থ্য অনুযায়ী সব শ্রেণির মানুষই এদিন একটু ভালো খাবারের আয়োজন করেন। এদিন একটু ভালো খাওয়া গেলে বছরের পুরো সময়টা না হোক, বেশির-ভাগ দিনগুলোতে হয়তো ভালো খাবার-দাবারের ব্যবস্থা হবে—এমনই প্রত্যাশা অসচ্ছল মানুষের।

হাওলাদার বাড়ির দরজা ও তৎসংলগ্ন খালি জমিতে বিশাল মেলা অনুষ্ঠিত হয়। ছোট ছোট দোকানপাট বসে যায়, গরুর লড়াইয়ের আয়োজন করা হয়। লোকসংগীত ও বিভিন্ন ধরনের গান পরিবেশন করে থাকেন স্থানীয় ও অন্যান্য এলাকা থেকে আগত সংগীতশিল্পীরা। স্থানীয় স্টেডিয়ামে ৭দিন ব্যাপী মেলা চলে, পরিবেশন করা হয় গান, নাটক। মেলায় মাটির পুতুল, খেলনা, প্লাস্টিক ও কাঠের বিভিন্ন দ্রব্যসহ সংসারের দৈনন্দিন প্রয়োজনে ব্যবহৃত বিভিন্ন দ্রব্যের দোকানপাট বসে। মিষ্টান্নসহ বিভিন্নরকম খাবার-দাবারের ছোট ছোট দোকান বসে যায় মেলার বিভিন্ন স্থানে।

৮. হালখাতা

বাঙালিদের, বিশেষকরে সকল ধরনের বাঙালি ব্যবসায়ীদের জীবনে 'হালখাতা' একটি গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য বহন করে। আমাদের নাগরিক জীবনে আমরা ইংরেজি বছরের দিন-তারিখ মনে রাখা এবং তা প্রয়োজনে ব্যবহার করতে ব্যস্ত থাকলেও গ্রাম-বাংলার সাধারণ মানুষ তাদের ধার-দেনা, চাষাবাদ, বিয়ে, মুসলমানি বা খতনা ইত্যাদি ব্যাপারে বাংলা বছরকেই বিশেষ প্রাধান্য দিয়ে থাকেন।

'হালখাতা' এমন একটি উৎসবের দিন, যে দিনটির কথা মনে হলেই মনে হবে যে আজ 'পয়লা বৈশাখ'। হালখাতা ও পয়লা বৈশাখ যেন আমাদের জীবনে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। হালখাতা মানেই পুরনো ধার-দেনা, লেনদেন চুকিয়ে দিয়ে নতুন করে জীবন শুরু করার দিন, আগের পাতায় লেখা খরচের সমষ্টি পরের পাতায় নতুন করে না লেখার অঙ্গীকার।

এ উপজেলায় হালখাতার সময়টি কিন্তু পয়লা বৈশাখ নয়। পয়লা বৈশাখকেও এখানে বরণ করে নেওয়া হয়। ঘরদোর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হয়, মাটির মেঝে নতুন মাটি দিয়ে 'লেপা' হয়, পাকা ঘরে চুনকাম করা হয় বা দোকানের কোণে কোণে জমে থাকা মাকড়সার জাল ও কালো কালো ঝুলগুলোও পরিষ্কার করা হয়। কিন্তু হালখাতা বলতে যা বোঝায়, পুরনো দিনের হিসেব-নিকেশ চুকিয়ে ফেলা, সেই ঘটনাটি আমাদের এখানে ঘটে জ্যৈষ্ঠ মাসে। এ মাসের ১ থেকে ১৫ তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয় হালখাতা। পয়লা বৈশাখে কিছু কিছু সনাতন ধর্মানুসারী ব্যবসায়ী হালখাতার আয়োজন করলেও

www.pathagar.com

লেনদেন হয় খুবই নগণ্য পরিমাণে। কারণ, এ সময়টাতে মানুষের হাতে, বিশেষকরে কৃষির ওপর নির্ভরশীল মানুষের হাতে টাকা-পয়সার খুবই টানাটানি থাকে। যেহেতু আর্থিক লেনদেন, পুরাতন বছরের বাকির বা লেনদেনের হিসাবটি পুরোপুরি চুকিয়ে ফেলাই হালখাতার প্রধানতম উদ্দেশ্য, সেহেতু, এই আর্থিক মন্দার সময়ে হালখাতা অনুষ্ঠানের আয়োজন করাকে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা শুভবুদ্ধির পরিচায়ক বলে মনে করেননি। তারা এজন্য বেছে নিয়েছেন জ্যৈষ্ঠ মাসের ১ থেকে ১৫ তারিখ সময়কাল। কারণ এ সময়ে ক্ষেত থেকে মরিচ ও বাদাম ঘরে তোলে কৃষক। হাতে কিছু টাকা-পয়সা থাকে।

ব্যবসায়ীরাও পর্যবেক্ষণ করে দেখেছেন যে, চৈত্র মাস পার হলেই তো বৈশাখ মাস। আর চৈত্র বলতেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে এক চিরচেনা দৃশ্য—মাঠ-ঘাট, খাল-বিল, পুকুর জলাশয় সব খাঁ খাঁ করে। সাথে খাঁ খাঁ করে মানুষের পকেটও। এ অবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই পুরনো দিনের ধার-দেনা মিটিয়ে দেওয়ার জন্য কৃষির ওপর নির্ভরশীল শতকরা পঁচাশি ভাগ মানুষ উৎসাহ বা তাগিদ অনুভব করে না। এ কারণেই হালখাতার জন্য ব্যবসায়ীরা বেছে নিয়েছেন জ্যৈষ্ঠ মাসকে। টানা পনেরো দিন—১ থেকে ১৫ তারিখ পর্যন্ত চলে 'শুভ হালখাতা'। এ সময়ে 'শুভ হালখাতা'য় অংশগ্রহণের জন্য চিঠি বা কার্ড পাঠানো হয় সম্মানিত গ্রাহক ও শুভার্থীদের কাছে। পয়লা বৈশাখের হালখাতার মতোই এ সময়ে দোকানদার বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কর্ণধারগণ আমন্ত্রিত অতিথিদের স্বাগতম জানান, শুভেচ্ছা ও সালাম বিনিময় করেন। গত বছরের বকেয়া পাওনার সম্পূর্ণ বা আংশিক গ্রহণ করে খাতায় লিপিবদ্ধ করেন ও মিষ্টিমুখ করান এবং বছরের সামনের দিনগুলোতে আন্তরিক সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করে বিদায় দেন।

৯. জন্মাষ্টমী

শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টম দিনে শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিন বা জন্মাষ্টমী। দিনটি উপলক্ষে সনাতন ধর্মাবলম্বীরা ঘরোয়াভাবে আনন্দানুষ্ঠানের আয়োজন করে। এ দিন সনাতন ধর্মাবলম্বীরা যার যার ঘরে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যকালের ছবি বাঁধাই করে টানিয়ে দেয়, আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু-বান্ধবকে বাসায় নিমন্ত্রণ করে নারিকেলের নাড়ু, মাখন ও দুধ দিয়ে আপ্যায়ন করে এবং একে অপরকে উপহার প্রদান করে।

১০. বরণকুলা-বরণডালা

বিয়ের কথা-বার্তা পাকাপাকি হওয়ার পর দিনক্ষণ চূড়ান্ত হয়ে গেলে একটি নির্দিষ্ট দিনে প্রথমে বরের পক্ষ থেকে কনের বাড়িতে গায়ে হলুদের জন্য বিভিন্ন সামগ্রী পাঠানো হয় বাঁশ-বেতের কুলায়, আবার কনে পক্ষ থেকে ডালায় করে হলুদের অনুরূপ সামগ্রী পাঠানো হয়ে থাকে। এসব কুলা-ডালায় বিভিন্ন আলপনা আঁকা হয়। কনের বাড়িতে হলুদের জন্য যে-সব সামগ্রী পাঠানো হয়, তার মধ্যে থাকে বাঁটা হলুদ, সাতটি গোটা হলুদ, সাতটি দুলপা (দূর্বা), সাতটি পান, সাতটি ধান, বাটা মেহেদি, সোন্দা, মেথি, গিলা, পারফিউম, সাবান, তেল টুথপেস্ট, ব্রাস ইত্যাদি। বরের বাড়িতে পাঠানো এসব সামগ্রীর সাথে আরো থাকে সেভিং ক্রীম, রেজার, আফটার সেভ, ইত্যাদি।

www.pathagar.com

এছাড়া দু-পক্ষই আর্থিক ক্ষমতা অনুযায়ী হলুদের পোশাক-পরিচ্ছদ ও রাখী পাঠিয়ে থাকে। বরপক্ষ থেকে কনের জন্য কিছু হাল্কা অলংকারাদিও পাঠানো হয়ে থাকে।

এসব কিছুর সাথে থাকে রসগোল্লা, সন্দেশ, নিমকি ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের মিষ্টান্ন এবং বড় আকারের একটি বা দুটি রুই বা কাতলা মাছ। মাছের মুখের ভিতরে সামর্থ্য অনুযায়ী কিছু টাকা, যেমন ৫০০, ১০০০/-বা ২০০০/-টাকা পুরে দেওয়া হয়। আর পান সুপারিও এর সাথে একটি আবশ্যিক জিনিস হিসেবে বিবেচিত হয়, না হলে বাড়ির বয়োজ্যেষ্ঠরা ভীষণ রাগ করেন এবং বউ বা জামাইকে রসিকতা করে খোটা দিয়ে থাকেন।

১১. তেলাই দেওয়া

ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বর ও কনেকে বিয়ের একদিন বা দুদিন আগে তেলাই দেওয়া হয়। ধনী-নির্ধন, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সব পরিবারে এটা হয়ে থাকে। বর বা কনের বাড়ি থেকে পাঠানো হলুদসামগ্রী দিয়ে এই তেলাই দেওয়ার অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয়। গ্রামাঞ্চলের অনেক পরিবারের বিয়েতে এখনও আগের দিনের মতো সোন্দা-মেথি বেঁটে বর-কনের গায়ে-মাথায় মাখানো হয়। প্রথমে বরের পক্ষ থেকে কনেকে হলুদ দেওয়া হয়। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের ক্ষেত্রে বরের গায়ে ছোঁয়ানো হলুদ কনের গায়ে মাখাতে হয়। হলুদ দেওয়ার পর কনের ভাবী, বোন, কুফাতো বোন বা খালাতো বোনরা কনেকে গোসল করিয়ে থাকে। এজন্য সম্মানী বাবদ জামাইকে কিছু অর্থ গুণতে হয়। হলুদের পর বিয়ে না পড়ানো পর্যন্ত বর বা কনের কেউই ঘরের গণ্ডির বাইরে যেতে পারে না। লোকবিশ্বাস এই যে, ঘরের বাইরে গেলে হলুদের মোহনীয় গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে ভুত-প্রেত ইত্যাদি অশুভ শক্তি বর বা কনের ওপর 'ভর' করতে পারে।

১২. বধূবরণ

নববধূকে নিয়ে সবাই বাড়ি ফিরে এলে তাকে বরণ করে নেওয়ার রীতি ধনী-নির্ধন, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সব পরিবারেই আছে। নববধূ ও বর ঘরের দরজায় এসে পৌঁছলে তাদের মিষ্টি খাইয়ে কোলে করে নামানো হয়। একটি দুধ বা পানিভর্তি হাঁড়ির ভেতরে ভিজিয়ে রাখা আমপাতা দিয়ে কনের গায়ে ছিটিয়ে দেওয়া হয়। এরপর কনে তার হাতের কনিষ্ঠাঙুলি ঐ দুধ বা পানিভর্তি হাঁড়ির ভেতরে ভিজিয়ে আনে।

তারপর একটা নতুন শাড়ির ওপর দিয়ে হাঁটিয়ে অথবা কোলে করে নববধূকে ঘরের অভ্যন্তরে নিয়ে যাওয়া হয়। বরের মা নতুন বউ ও ছেলেকে দুই উরুর ওপর বসিয়ে দুধের সরবত পান করান। তারপর প্রথমে বাড়ির বয়োজ্যেষ্ঠ ও পরে অপেক্ষাকৃত কম বয়স্করা নববধূকে মিষ্টি খাইয়ে বরণ করে নেয়। বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় অনেক পরিবারের কনের মা শাড়ির আঁচলে কিছু টাকা বেঁধে দেন। শ্বশুর বাড়িতে প্রবেশের পর কনে ঐ টাকা ঘরের যে কোনো একটি কোণে রেখে দেয়।

www.pathagar.com

মনপুরা উপজেলা

১. ঈদ উৎসব

ঈদুল ফিতর বা রোজার ঈদ এবং ঈদুল আজহা বা কোরবানির ঈদ হচ্ছে মুসলমানদের প্রধান দুটি ধর্মীয় উৎসব। এই দুই ঈদ উৎসব উদ্‌যাপন করার জন্য এ অঞ্চলের মুসলমানরা যার যার সামর্থ্য অনুযায়ী প্রস্তুতি গ্রহণ করেন বেশ কদিন আগে থেকেই। প্রথমেই ধরা যাক ঈদুল ফেতরের কথা। এই ঈদকে কেউ কেউ আবার 'বড় ঈদ'ও বলে থাকেন। এ কারণেই বোধ হয় এর গুরুত্বটাও একটু আলাদা।

রোজা শুরু হলেই শিশু, কিশোর-কিশোরী ও তরুণ-তরুণীদের মধ্যে একটা আলাদা অনুভূতির সঞ্চার হতে থাকে। কোনোমতে রোজাটা পার করতে পারলেই তো ঈদ। নতুন নতুন ড্রেস, নতুন শাড়ি, সালোয়ার কামিজ, ওড়না, জুতো সবই তো নতুন কেনা হবে। এই আনন্দেই যেন তাদের দিন আর যেতে চায় না। পরিবারের যিনি প্রধান উপার্জনকারী থাকেন, তিনি অন্য সদস্যদের প্রয়োজন, পছন্দ ও রুচি জেনে নিতে থাকেন ধীরে ধীরে। আজকাল তো আবার মিডিয়ার কল্যাণে এসব নিত্য-নতুন ডিজাইনের সংবাদ তাদের কানে পৌঁছে যায় বিদ্যুৎ বেগে। আর তারই বায়না থাকে বড় ভাই, পিতা বা মায়ের কাছে। পরিবার-প্রধান বা প্রধান উপার্জনকারী সবার পছন্দ, রুচি ও চাহিদার সাথে নিজের সামর্থ্যের একটা হিসেব-নিকেশ করে নেন। তারপর ধীরে ধীরে পা বাড়াতে থাকেন বাজারের দিকে।

ঈদের বাজারের জন্য সব ধরনের ব্যবসায়ীই একটা বড় প্রত্যাশা নিয়ে অপেক্ষা করে। থান কাপড় বা তৈরি পোশাকের বাজারে ক্রেতাদের আগমনের আগে থেকেই দোকান-মালিকরা দোকানে বিভিন্ন রং ও ডিজাইনের নতুন নতুন সালোয়ার-কামিজ, ফ্রক ও প্যান্ট-সার্টের কাপড়ের মজুদ গড়ে তুলতে থাকেন। অনেক দরজিই দোকানের ভেতরে সামনের দিকেই এক পাশে জায়গা করে সেলাই মেশিন নিয়ে বসেন। আবার কারো আলাদা টেইলরিং শপ থাকে। যারা আগেভাগে পছন্দের কাপড়টা কিনে নিতে পারেন তারা দরজির কাছে সেটা হস্তান্তর করে দিন গুনতে থাকেন—কবে সেই নতুন ড্রেসটি হাতে নিয়ে পুত্র-কন্যা বা বোন-ভাইয়ের হাতে তুলে দিতে পারবেন। সাধারণত বাড়ির গৃহিণীদের শাড়িটা কেনা হয় আর একটু পরে। তাদেরও আবার কাপড় সেলাই-ফোঁড়াইয়ের ব্যাপার আছে। শাড়ির রঙের সাথে ম্যাচিং করেই ব্লাউজটা বানাতে হয়। এজন্য অবশ্য অনেককেই দরজির দোকান পর্যন্ত দৌড়াতে হয় না। আশেপাশে এমন অনেক গৃহিণীকে পাওয়া যায় যারা খুবই অল্প পারিশ্রমিকের বিনিময়ে এ ধরনের ব্লাউজ, পেটিকোট ইত্যাদি সেলাই করে একটু বাড়তি আয়ের চেষ্টা করেন। ঈদের সময় তাদের অনেকেই বেশ ব্যস্ত থাকেন। ঈদের দিন যত ঘনিয়ে আসে দোকানে থান কাপড়ের বিক্রিও ততই কমতে থাকে, বাড়তে থাকে তৈরি পোশাকের চাহিদা। কারণ, তখন দরজিরা নতুন কাপড়ের অর্ডার নেওয়া বন্ধ করে দেন, আবার দোকানেও রঙ-বেরঙের ও আধুনিক ডিজাইনের তৈরি পোশাকের আমদানি বেড়ে যায়। এর আগে যারা নানা কারণে পছন্দমত কাপড় কিনে দরজির নিকট দিতে পারেননি, কিংবা আবার নতুন ডিজাইন বাজারে কী আসে, তা দেখার জন্য অপেক্ষা করেন, তারা ভিড় জমান তৈরি

www.pathagar.com

পোশাকের দোকানে। অনেকে শিশু-কিশোরদের পোশাকটা সাধারণত তৈরি পোশাকের মজুদ থেকেই সংগ্রহ করে নেন।

এসময়ে শাড়ি, পায়জামা-পাঞ্জাবি ও লুঙ্গির দোকানেও ভিড় জমে ওঠে। ভিড় জমে যায় টুপি, আতর, জায়নামাযসহ মেয়েদের চুড়ি, ফিতা, চুলের কাটা, ইমিটেশন জুয়েলারি এবং প্রসাধনীর দোকানগুলোতেও। বাড়ির গৃহিণী, যারা বাড়ি থেকে বের হন না বা দোকানে যান না, তারা স্কুল-পড়ুয়া ছোট বোন, ভাই বা স্বামীকে দিয়ে তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসটি আনিয়ে নেন। এমন কিছু কিছু জিনিস আছে যেগুলি অনেক মহিলা দোকানে গিয়ে নিজেরা কিনতে লজ্জাবোধ করেন, সেগুলি সাধারণত স্বামী বা দোকানে যান এমন মহিলাদের দিয়ে আনিয়ে নেন।

ঈদের আগের বিকাল থেকে রাত পর্যন্ত চলে মেহেদি দেওয়ার উৎসব। পরিবারের বা পাশের ঘরের শিশু-কিশোরী-তরুণীরা মেহেদি বাঁটা দিয়ে চিত্রিত করে নেন নখ, আঙুল ও হাতের বিভিন্ন অংশ। টিউবজাত মেহেদি বাজারে পাওয়া গেলেও পাটায় মেহেদি বাঁটা এবং ঐ বাঁটা মেহেদি হাতে লাগানোর আনন্দটাই আলাদা। অনেকে আবার মাথার চুলের রঙে একটু উজ্জ্বল ও লালচে আভা-আনার জন্য চুলের কিছু কিছু অংশেও মেহেদি লাগিয়ে থাকে। মেহেদি লাগানোর ব্যাপারে শিশুদের আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কে কার আগে লাগাবে, এ নিয়ে মোটামুটি ঝগড়াও লেগে যায় অনেক সময়। যিনি মেহেদি লাগাতে থাকেন তিনি তখন সবাইকে লাইন ধরে বসিয়ে এক এক করে ডেকে মেহেদি দিয়ে হাত রঙিন ও চিত্রিত করার কাজটি সম্পন্ন করেন। যারা সারাক্ষণ ঘরের নানাবিধ কাজ, ধোয়া ইত্যাদিতে ব্যস্ততম সময় কাটান, তাদের কি মেহেদি লাগানোর সখ নেই, কিংবা তারা কি মেহেদি দেন না? অবশ্যই, তবে তা ঘরের সব কাজ বিশেষকরে হাতে পানি লাগানোর মত কাজগুলি শেষ করার পর।

মেহেদি লাগানোর সময় শিশু-কিশোর-কিশোরী এবং যারা শিশুদের হাতে মেহেদি দিয়ে থাকেন, তাদের মধ্যে অনেক কথা হয়, অনেক হাস্যরসাত্মক বাক্য বিনিময় হয়। যেমন, চার-পাঁচ বছর বয়সের শিশুর হাতে মেহেদি লাগানোর সময় হয়তো বললো, এই যে হাতে এতো সুন্দর করে মেহেদি লাগাচ্ছি, তোর তো জামাই নেই, দেখাবি কাকে ? শিশুটি হয়তো জবাবে বলল, এটা কি কাউকে দেখানোর জন্য দিচ্ছি নাকি, অথবা একেবারেই সরলভাবে বলল,· আমার জামাই যখন আসবে তখন দেখবে ইত্যাদি।

সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই কিশোর-যুবক-বৃদ্ধ সবাই ঈদগাহ কিংবা মসজিদে গিয়ে ঈদের নামাজ পড়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে। শিশুরাও বড়দের সাথে নামাজে যাবার জন্য আবদার করে এবং যথারীতি ঈদের পোশাক পরে প্রস্তুতও হয়ে যায় এবং ঈদগাহে যায়। উপজেলা সদরের ঈদগাহ্, চার নং দক্ষিণ সাকুচিয়া ইউনিয়ন জামে মসজিদ, রামনেওয়াজ বাজার জামে মসজিদ, হাজীরহাট মার্কাজ মসজিদ, বাংলাবাজার জামে মসজিদসহ বিভিন্ন মসজিদে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়। নামাজ আদায়ের পর অনেকেই তাদের মা-বাবা শ্বশুর-শাশুড়ি, নানা-নানী, দাদী-দাদী যারা কবরে শায়িত আছেন, তাদের কবরের পাশে গিয়ে দোওয়া করেন। কবর আজাব মাফ চেয়ে আল্লাহতাআলার কাছে প্রার্থনা করেন।

www.pathagar.com

ঈদের দিনে অনেক পরিবারেই উপজেলার বাইরে অবস্থানরত বাবা, ভাই-বোনদের আগমন ঘটে। যারা বাইরে থেকে আসেন এবং যাদের নিবিড় সান্নিধ্যে এসে উপস্থিত হন—তাদের সবার জীবনে যে ঈদ কী এক আনন্দ ও সুখানুভূতির সৃষ্টি করে, তা কেবল তারাই অনুভব করতে পারেন। চাকরি বা ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে যারা রাজধানী ঢাকায় কিংবা দেশের অন্যান্য স্থানে অবস্থান করেন, ঈদের আগের দিন অথবা আরো একদিন-দুদিন আগে যখন যানবাহনের প্রচণ্ড ভোগান্তি পেরিয়ে পরিবারের সবার মাঝে এসে উপস্থিত হন ঈদ উদ্‌যাপনের জন্য, তখন পুরো পরিবারের সব সদস্যের মধ্যে যে আনন্দানুভূতির সঞ্চার হয়, তা কোনো ভাষায় লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয়। এ সময়ে ঈদ উপলক্ষে আগত পরিবারের সদস্যরা বাড়িতে অবস্থানরত মা-বাবা, শ্বশুর-শাশুড়ি, ভাই-বোন, স্ত্রী—সবার জন্যই কিছু না কিছু নিয়ে আসেন।

ঈদের দিন সাধারণত দুপুরেই সবাই মিলে খেতে বসেন। যার যার সামর্থ্য অনুযায়ী একটু উন্নতমানের খাবার-দাবারের আয়োজন করা হয়। আর এর সঙ্গে অবশ্যই মইষা কাঁচা দই আর খেজুরগুড়ের ব্যবস্থাটুকু থাকবেই।

কিছু কথা থেকে যায়। ঈদের আনন্দ কি সবার জীবনে একইভাবে আসে ? না, আসে না। সমাজের হতদরিদ্র মানুষের নতুন পোশাক কেনার ক্ষমতাও থাকে না, বাড়িতে একদিনের একটি বেলার জন্য ভালো খাবার-দাবারের ব্যবস্থা তো দূরে থাক, ক্ষুধা মেটানোর সামান্যতম সামর্থ্যটুকুও অনেকের হয় না। এর চেয়ে একটু সচ্ছল পরিবারের অবস্থা এমন যে, কোনোরকমে একটু ডাল-ভাতের ব্যবস্থা তাদের হলেও নতুন পোশাক কিনে দিয়ে স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের ঈদের আনন্দে সামিল করা সম্ভব হয় না। পুরনোটাকেই সাবান-সোডা দিয়ে সিদ্ধ করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে ঈদের জামাতে বা আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হয়।

ঈদের দিনে কিশোর-কিশোরী ও তরুণ-তরুণীদের বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে একটু আড্ডা দেওয়া, পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন কিংবা ঘনিষ্ঠ দু'চারজন বন্ধু-বান্ধবের বাসায় যাওয়া ছাড়া এমন কোনো বিনোদনের ব্যবস্থা নেই। আর আছে সারাদিন সারারাত ধরে টেলিভিশনের বিভিন্ন চ্যানেলগুলোতে ঈদের নাটক, গান, ছায়াছবি ইত্যাদি দেখা। ঈদ উপলক্ষে অনেকেই সিনেমা হলে গিয়ে সিনেমা দেখতে খুবই পছন্দ করেন। 'রোজার ঈদ বা ঈদুল ফেতর বা 'বড় ঈদ' যাই বলিনা কেন, এই হচ্ছে আমাদের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব ঈদুল ফেতর বা রোজার ঈদ।

২. ঈদুল আজহা বা কোরবানির ঈদ

অমলিন আত্মত্যাগের মহান আদর্শে ভাস্বর এই কোরবানির ঈদ বা ঈদুল আজহা। 'কোরবানির ঈদ' নামটি মনে করলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে গরু-মহিষ, ছাগল-ভেড়ার চিত্র। এই ঈদে অনেক পরিবারেই নতুন কাপড় কেনার তাগিদ না থাকলেও কিছু কিছু পরিবারের শিশু-কিশোররা নতুন পোশাক নিয়ে থাকে। তবে ঈদের আনন্দ তাই বলে রোজার ঈদের চেয়ে কোনো অংশেই কম নয়। যে পরিবারে শুধু গরু কেনা হয়, সে পরিবারের শিশু-কিশোররা আনন্দে অতোটা উদ্বেলিত হয় না, যতোটা হয় ছাগল কিনলে। কারণ ছাগলকে বেশ কাছে থেকেই কাঁঠালপাতা খাওয়ানো যায়, মুখের কাছে ধরলেই আগ বাড়িয়ে পাতাটি দাঁত দিয়ে চেপে ধরে ধীরে ধীরে চিবুতে চিবুতে মুখের

www.pathagar.com

ভেতরে নিয়ে যায়। এতে শিশু-কিশোররা খুব আনন্দ পায়। তারা বারবার বড়দের কাছে কাঁঠালপাতা এনে দেওয়ার আবদার ধরে। আর গরুর ত্রিসীমানায়ও তারা ভিড়তে ভয় পায়, কখন পা দিয়ে ল্যাঙ মারে বা সূচালো শিং দিয়ে গুঁতো মেরে দেয়।

এই ঈদের জামাতগুলো ছাড়িয়ে ছিটিয়ে স্থানীয় মসজিদগুলোতেই হয়ে থাকে। আর নামাজ শেষে কোরবানি দেওয়া, পশুর চামড়া ছাড়ানো, মাংস কাটা, বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা, অংশীদারদের পৃথক পৃথক অংশ বুঝে নেওয়া, মাংস বাড়িতে বহন করে নিয়ে যাওয়া ইত্যাদিতে প্রচুর সময় লেগে যায়। এই ঈদের কোরবানির সাথে অনেকেই আবার তাদের সন্তান-সন্ততির 'আকিকা'র কাজটিও সেরে ফেলেন। আবার এই ঈদের মাংসের সুবাদে কেউ কেউ নানাবিধ প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠান, যেমন, মেয়ের শ্বশুরবাড়ি বা ছেলের শ্বশুরবাড়ির বা নিজের শ্বশুরবাড়ির কিছু ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনকে দাওয়াত দিয়ে খাওয়ানো ইত্যাদি সামাজিকতার কাজগুলো সম্পন্ন করে থাকেন।

এ সময় প্রায় বাড়ির সামনে গাছের ডালের সাথে গরুর বা ছাগলের মাথার খুলি বা হাড় টানিয়ে দেওয়া হয়। লোকবিশ্বাস এই যে, এতে বাড়িতে ভূত-প্রেত বা এ জাতীয় কোনো অশরীরী ও অশুভ আত্মার অনুপ্রবেশ ঘটে না। ফলে, এদের উপদ্রব থেকে বাড়ির লোকজন বিশেষকরে সদ্যপ্রসূত শিশু ও মহিলারা নিরাপদ থাকে।

৩. শবেবরাত

আমরা মুসলমানরা শবেবরাতের রাত সম্পর্কে যা বিশ্বাস করি, তা মূলত এই যে, এই রাতে আল্লাহতাআলা তাঁর বান্দাদের তওবা কবুল ও গোনাহ মাফ করে দেন এবং মানুষসহ পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীর রেজেক, ধন-দৌলত, জন্ম-মৃত্যু, ভালো-মন্দ ইত্যাদি নির্ধারণ করেন। এ কারণেই অন্যান্য এলাকার মতো এ এলাকার মুসলমানরাও এ রাতে যার যার সামর্থ্য অনুযায়ী একটু ভালো-মন্দ খেতে চেষ্টা করেন, এ দিনের জন্য একটু অতিরিক্ত বাজার করেন। বিশ্বাস এই যে, এ রাতে একটু ভালো খাবার খাওয়া সম্ভব হলে বছরের অবশিষ্ট দিনগুলোও একইভাবে যাবে অর্থাৎ উন্নতমানের খাবারই কপালে জুটবে। এ রাতে বুটডাল ও সুজির হালুয়াসহ অন্যান্য উপাদেয় খাবার তৈরি একটি দীর্ঘদিনের প্রচলিত রেওয়াজ। সন্ধ্যায় এসব হালকা নাশতার পর অনেকে রাতে একটু পোলাও-কোর্মা-জর্দার আয়োজন করেন। গরিব এবং দুস্থরাও এই রাতটির প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে একটু অপেক্ষাকৃত উন্নতমানের খাবারের আয়োজনের প্রয়াস পান। গ্রামাঞ্চলের অনেক মসজিদে এ রাতে মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয় এবং কেউ কেউ মুসল্লিদের মধ্যে বিতরণের জন্য চালের গুঁড়ার রুটি ও ফিরনি তৈরি করে মসজিদে নিয়ে আসেন। অসচ্ছল মানুষ বাড়িতে একটু কম খরচে 'আলবান' রান্না করে থাকেন। কোনো কোনো পরিবার বুটডালের হালুয়া, গাজরের হালুয়া বা ডিমের হালুয়া ইত্যাদি তৈরি করে প্রতিবেশী ও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনের বাসায় পাঠিয়ে থাকেন।

শবেবরাতের দিনেও পয়লা বৈশাখের মতই কেউ দোকানে বাকিতে জিনিস আনার জন্য যান না বা দোকান-মালিকরাও বাকিতে বিক্রি করেন না। বাড়ির গৃহিণীরাও এদিন তাদের কোনো সন্তানকে গালাগালি, রাগারাগি করেন না বা গায়ে হাত তোলেন না। এখানেও ঐ একই বিশ্বাস কাজ করে যে, এদিন এসব করলে সারাবছর ধরেই তার পুনরাবৃত্তি ঘটতে হবে।

www.pathagar.com

৪. দুর্গোৎসব

মুসলমানদের যেমন ঈদোৎসব, সনাতন ধর্মাবলম্বীদের তেমনি প্রধান ধর্মীয় উৎসব দুর্গোৎসব। দেবীদুর্গার পিতৃগৃহে আগমন উপলক্ষে এই উৎসব। এখানকার রামনেওয়াজ বাজার মন্দির, মাছুয়াখালী বাজার মন্দির, কলাতলির চর মন্দির, সীতাকুণ্ডু মন্দির ও সোনারচর মন্দিরে অনেক আড়ম্বরের সাথে এই দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এছাড়াও এআর পল্লী ও ডাবলির চরেও পূজার আয়োজন করা হয়ে থাকে। মাটির কাজ ও রংতুলির কাজ মিলিয়ে প্রতিমা নির্মাণের কাজ পুরোপুরি শেষ হতে সময় লেগে যায় প্রায় সাত-আটদিন। প্রতিমা নির্মাণের জন্য জেলা শহর ভোলা থেকেও প্রতিমা নির্মাণশিল্পী আনা হয়।

পুজোর কয়েকদিন সনাতন ধর্মাবলম্বী শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত সবাই এ উপলক্ষে নতুন নতুন পোশাক পরে থাকেন। হিন্দু রমণীরা এ দিনগুলোতে লালপেড়ে শাড়ি এবং তরুণীরা সালোয়ার-কামিজ পরে পূজামণ্ডপগুলোতে গিয়ে পূজা দেয় ও প্রসাদ গ্রহণ করে। প্রবীণরা তো বটেই, অনেক যুবকও এদিনে বিভিন্ন রঙের ধুতি পরে পূজামণ্ডপগুলোতে গিয়ে দেবীদর্শন করে। তবে বয়স্করা সাধারণত সাদা ধুতিই পরে থাকেন। সনাতন ধর্মাবলম্বীরা এইদিনে তাদের মুসলিম বন্ধু ও প্রতিবেশীদেরও তাদের ঘরে আমন্ত্রণ জানায় এবং নারিকেলের নাড়ু, সন্দেশ, লুচি ইত্যাদি দিয়ে আপ্যায়ন করে।

দুর্গোৎসবের সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, বিশেষকরে ক্ষমতাসীন দলের নেতা-কর্মীরা পূজামণ্ডপগুলো পরিদর্শন করে পূজা চলাকালীন সার্বিক নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা বিধানে সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেন এবং বিরাজমান সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য অক্ষুণ্ন রাখার জন্য সব সম্প্রদায়ের সহযোগিতা কামনা করে থাকেন।

৫. লক্ষ্মীপূজা

সম্পদ, সমৃদ্ধি, সৌভাগ্য ও সৌন্দর্যের দেবী লক্ষ্মীর বার্ষিক পূজা অত্যন্ত আড়ম্বর ও জাঁকজমকের সাথে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে আশ্বিন মাসের কোজাগরী পূর্ণিমায়। সনাতন ধর্মাবলম্বী প্রতিটি মানুষের ঘরে এইদিনে দেবী লক্ষীকে চন্দন, দূর্বা, মধু, ফল, ফল, আতপ চাল, দধি, বিল্বপত্র, বস্ত্র ও সোনারূপার গহনা নিবেদন করা হয়ে থাকে। এ রাতে সনাতন ধর্মাবলম্বীরা সারারাত জেগে থেকে দেবী লক্ষ্মীর আরাধনা করে থাকেন এই বিশ্বাসে যে, দেবী লক্ষ্মী এই রাতে তাদের ঘরে ঘরে গিয়ে আশীর্বাদ করেন। এই পূজাতেও সনাতন ধর্মাবলম্বীরা তাদের মুসলমান প্রতিবেশী বন্ধুদের আমন্ত্রণ জানিয়ে চিড়া ও ডাবের পানি দিয়ে আপ্যায়ন করে থাকে। রমণীরা পূজা উপলক্ষে আতপ চালের গুঁড়া দিয়ে ঘরের দুয়ার থেকে লক্ষ্মীর আসন পর্যন্ত আলপনা আঁকেন।

৬. সরস্বতী পূজা

অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সংগীত, শিল্পকলা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের দেবী সরস্বতীর পূজা উদ্‌যাপন করা হয়। পূজা উপলক্ষে হিন্দু ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীরা তাদের মুসলিম সতীর্থ বন্ধুদেরও বাড়িতে বা পূজামণ্ডপে আমন্ত্রণ জানায় ও আপ্যায়ন করে।

www.pathagar.com

৭. নবান্ন

একটা সময় ছিল যখন হেমন্তে ঘরে ঘরে নবান্ন উৎসবের আনন্দ বয়ে যেতো। অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে যখন গ্রাম-বাংলার মাঠে মাঠে ধান পেকে একটা সুগন্ধ ছড়াতো তখন কৃষকেরা একটা ভালো দিন দেখে ধান কাটা শুরু করতো। সেই শুভদিন এখনো আসে, কিন্তু নবান্নের উৎসবের আনন্দটা আর আসে না। এখনও কৃষক-পরিবারগুলো নতুন ধানের চাউলের ভাত পরিবারের সবাই মিলে খায়, গৃহিণীরা ঐ চালের গুঁড়ি দিয়ে পাটিসাপ্টা, ছিট রুটি, চিতই পিঠা, দুই (ভাপা) পিঠা ইত্যাদি পিঠা তৈরি করে এবং নিজেরা খায় ও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনকে ছোট পরিসরে দাওয়াত দিয়ে খাওয়ায়। কিন্তু সে খাওয়া-দাওয়ার মধ্যে আনন্দ-উল্লাসের ছোঁয়া খুব কমই খুঁজে পাওয়া যায়। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের কেউ কেউ এ উপলক্ষে আতপ চালের গুঁড়ি দিয়ে বাড়ির উঠানে এবং ঘরের দুয়ার থেকে লক্ষ্মীর আসন পর্যন্ত আলপনা আঁকে।

৮. নববর্ষ

গ্রামপ্রধান বাংলাদেশের মানুষের জীবন-জীবিকা, পেশা, ব্যবসা-বাণিজ্য, লেনদেন প্রভৃতি বিষয়ের সঙ্গে নববর্ষ বিভিন্নভাবে জড়িয়ে আছে। কিন্তু এই নববর্ষকে আনুষ্ঠানিকভাবে বরণ করার জন্য এখানে তেমন কোনো আয়োজন বা কর্মতৎপরতা দেখা যায় না। তবে বছর শুরুর দিনটিতে শুধু নয়, তার বেশ কদিন আগে থেকেই গ্রামাঞ্চলের মানুষের কর্মতৎপরতায় একটা বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। পল্লী রমণীরা তো নতুন বছরকে স্বাগত জানানোর জন্য ঘরের মেঝে, পিড়া, সিঁড়ি, এমনকি উঠান পর্যন্ত নতুন মাটি দিয়ে লেপে ঝকঝকে তকতকে করে তোলেন। মেঝের কোনো স্থানে ইঁদুর গর্ত খুঁড়ে থাকলে কিংবা অন্য কোনো কারণে মেঝে, পিড়া বা সিঁড়ির কোনো স্থানে ছোট-খাটো ভাঙাচোরা থাকলে সেগুলো সুনিপুণভাবে মাটি দিয়ে লেপে প্রায় নতুন করে তোলেন গৃহিণীরা। নতুন মাটির স্পর্শ থেকে রান্নাঘরের চুলা, পানির কলস রাখার মাটির 'পইডা' কোনোটাই বাদ যায় না।

নতুন বছরের শুরুর দিনটিতে অনেক পরিবারেই কিছু পিঠা-পায়েস তৈরি করা হয়, সম্ভব হলে একটা মোরগ জবাই করা হয় বা গরুর মাংস এনে ভুনাখিচুড়ি পাকানো হয়। দিনটিতে সবাই একটু ভালো খাবারই খেতে চান। আর যদি তা না হয় তাহলে হয়তো সারাটি বছরই খারাপ যাবে—এমন বিশ্বাস লোকসমাজের।

এদিন ছাত্র-ছাত্রীরা ভোরে উঠেই পড়াশোনায় মন দেয়। বছরের প্রথম দিন যে, যতক্ষণই হোক, পড়াশোনা করতেই হবে। গৃহিণীরাও এদিনে তাদের সন্তানদের কোনোরকম গাল-মন্দ বা বকাঝকা করেন না। সবার সঙ্গেই সংযত আচরণ করে থাকেন। এজন্য অবশ্য ছেলেপুলেরাও একটু অতিরিক্ত আবদার করে কখনো কখনো। সুবিধা এই যে, বছরের প্রথম দিনতো, বাবা-মা, বড় ভাইবোন কেউ কিছু বলবেন না, গায়ে হাত তুলবেন না। এই একটি দিনের বাড়তি সুযোগটুকু ছাড়ে কে।

বাজারের বড় বড় দোকানে হালখাতার আয়োজন করে পুরনো বছরের পাওনা আদায়ের চেষ্টা করা হয়।

www.pathagar.com

৯. হালখাতা

পয়লা বৈশাখ ছোট-খাটো থেকে বড় সব ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। ব্যবসায়ীরা তাদের সারা বছরের পাওনা আদায়ের জন্য নিয়মিত গ্রাহকদের কার্ড কিংবা চিঠির মাধ্যমে পয়লা বৈশাখের শুভ হালখাতা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে থাকেন। চৈত্র মাসের শেষ দিকেই এই আমন্ত্রণপত্র পাঠানো হয়ে থাকে। কিছু কিছু দোকানে তিনদিনও চলে এই হালখাতা। এ উপলক্ষে দোকান বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে একটু ঘষামাজা করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে তোলা হয় এবং বিভিন্নভাবে সাজানো হয়। আমন্ত্রিত গ্রাহকরা যথারীতি তাদের বকেয়া পরিশোধের জন্য দোকান বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোতে উপস্থিত হন। দোকান-মালিক তাদের সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন এবং রসগোল্লা, নিমকি, সন্দেশ, চা, পান ইত্যাদি দিয়ে আপ্যায়ন করেন। মুসলিম দোকান-মালিকরা তাদের দোকানে বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে মিলাদ মাহফিলেরও আয়োজন করে থাকেন। সনাতনধর্মী ব্যবসায়ীরা গণেশ পূজার আয়োজন করেন। একটি পিতলের থালায় করে পদ্মফুল, তুলসিপাতা, হরিতকি, দূর্বা, তিল, চন্দন, সিঁদুর ও সরিষার তেল সিন্দুকের সামনে রাখা হয়।

পয়লা বৈশাখে হিসেবের যে নতুন খাতা খোলা হয়, তাতে মুসলিম ব্যবসায়ীরা প্রথম পৃষ্ঠার ওপরের দিকে আরবিতে বা বাংলায় 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' লিখে শুরু করেন। সনাতন ধর্মানুসারী ব্যবসায়ীরা একটি রূপার টাকায় সরিষার তেল ও সিঁদুর মাখিয়ে নতুন খাতাটির চারকোণে চারটি ও মাঝখানে একটি ছাপ দিয়ে দেন। এরপর স্বধর্মের একজন প্রবীণ ব্যক্তিকে দিয়ে খাতাটির 'শুভ উদ্বোধন' করা হয়। তাঁকে একখানা বা দুখানা নতুন ধুতি এবং সামর্থ্য অনুযায়ী কিছু নগদ অর্থ দিয়ে সম্মানিত করা হয়।

১০. বরণকুলা ও বরণডালা

বর-কনের গায়ে হলুদের জন্য উভয়-পক্ষ বাঁশ-বেতের তৈরি ও তাতে আলপনা আঁকা কুলা-ডালায় করে বিভিন্ন দ্রব্য পাঠিয়ে থাকে। সাধারণত বর পক্ষই আগে কুলায় করে হলুদসামগ্রী পাঠিয়ে থাকে। পরে কনে পক্ষ ডালায় করে পাঠায়। হলুদসামগ্রীর মধ্যে থাকে বাঁটা হলুদ, গোটা বা আস্ত হলুদ সাতটি, সাতটি দুলপা বা দূর্বা, সাতটি পান, সাতটি ধান, মেহেদি বাঁটা, সোন্দা-মেথি, পারফিউম, রাখী, তেল, সাবান, সামর্থ্য অনুযায়ী হলুদের কাপড় ও হাল্কা কিছু অলংকার। দুদিকেই অতিরিক্ত আরো কিছু জিনিস যেমন জুতা, কনের বাড়িতে চুলের কাটা ও ফিতা, চুড়ি, স্যাণ্ডেল বা জুতা এবং বরের বাড়িতে সেভিং ব্রাস, সেভিং ক্রীম ও আফটার শেভ পাঠানো হয়ে থাকে। এছাড়া পাঠানো হয় রসগোল্লা, নিমকি, সন্দেশসহ নানাবিধ মিষ্টান্ন এবং পান-সুপারি। কনের বাড়িতে দুটি ভালো সাইজের রুইমাছ এবং রুই মাছের মুখের মধ্যে কিছু টাকা গুঁজে দেওয়ার আচারও পালন করা হয়। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই কুলা-ডালা পাঠানোর প্রচলন রয়েছে।

১১. তেলাই দেওয়া

হলুদসামগ্রী পাওয়ার পর দু'বাড়িতেই পৃথক পৃথকভাবে বর-কনেকে হলুদ দিয়ে থাকে। শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-গরিব সব পরিবারেই এটি মানা হয়। গায়ে হলুদ দেওয়া হয়

www.pathagar.com

সাধারণত বিয়ের দুদিন বা একদিন আগে। প্রথমে বরপক্ষের লোকজন গিয়ে কনেকে হলুদ দিয়ে থাকে। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের ক্ষেত্রে বরের স্পর্শ করা হলুদ কনের গায়ে মাখাতে হয়। গায়ে হলুদের পর বর বা কনে ঘরের বাইরে যেতে পারে না। এ ব্যাপারে লোকসমাজের বিশ্বাস এই যে, ঘরের বাইরে গেলে ভূত-প্রেত জাতীয় অশুভ শক্তি হলুদসামগ্রীর গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে বর বা কনের ওপর ভর করতে পারে।

১২. বধূবরণ

বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হওয়ার পর বর-বধূ যখন বাড়ি ফিরে আসে, তখন নতুন বউকে বরণ করে নেওয়ার একটা বাধ্যবাধকতা আছে। বয়োজ্যেষ্ঠদের কেউ নববধূর মুখে একটু চিনি বা মিষ্টি দিয়ে যানবাহন থেকে নামিয়ে আনেন। একটি দুধ বা পানিভর্তি হাঁড়ি বা কলসিতে আমপাতা ভিজিয়ে নতুন বউয়ের গায়ে সাতবার বা তিনবার ছিটিয়ে দেওয়া হয় এবং তার ডান হাতের কনিষ্ঠাঙুলি ঐ দুধ বা পানিভর্তি হাঁড়ির মধ্যে ভিজিয়ে আনা হয়। অতঃপর বউয়ের মাথায় ধান-দূর্বা ছিটাতে ছিটাতে একটি নতুন শাড়ির ওপর দিয়ে হাঁটিয়ে অথবা কোলে করে ঘরের ভেতরে নিয়ে যাওয়া হয়। এখানে ছেলের মা তার ছেলে ও নববধূকে দুই উরুর ওপর বসিয়ে দুধের শরবত পান করান। এরপর তারা উরুর ওপর থেকে নেমে গেলে উপস্থিত আত্মীয়-স্বজন সবাই এক এক করে নতুন বউকে চিনি অথবা মিষ্টি খাইয়ে দেন। তাই বলে বরের মুখ কিন্তু বন্ধ থাকে না। কনের মুখে দেওয়ার পর ঐ একই চামচ দিয়ে বরের মুখেও মিষ্টি বা চিনি দেওয়া হয়।

১৩. মুখ দেখা

গ্রামাঞ্চলে এমনকি শহরাঞ্চলেও এখনও নতুন বউয়ের মুখ দেখানোর বিষয়টির প্রচলন রয়েছে। পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন নতুন বউয়ের মুখ দেখতে আসে। এ সময় নববধূ ঘোমটা দিয়ে একটি খাটের ওপর বা অন্য কোথাও বসে থাকে। ননদ বা ভাবী স্থানীয় কেউ নতুন বউয়ের ঘোমটাটি একটু টেনে তুলে ধরে বলেন, 'এই দ্যাখো আমাদের নতুন বউ।' এ সময় নতুন বউকে দেখার জন্য সবাই এক এক করে এগিয়ে আসে। এ সময়েও নতুন বউয়ের মুখে মিষ্টি বা একটু চিনি দেওয়া হয়ে থাকে।

তথ্যসূত্র

১. কার্তিক দেবনাথ, পিতা : ননীগোপাল দেবনাথ, মাতা : শান্তি দেবনাথ, বয়স : ৬১ বছর, শিক্ষা : ডি.ইউ.এম.এস., পেশা : ব্যবসা, ঠিকানা : ডাকঘর : মৃজাকালু, উপজেলা : বোরহানউদ্দিন

২. দিলওয়ারা বেগম, পিতা : প্রয়াত দেলওয়ার হোসেন, মাতা : প্রয়াত উম্মে কুলসুম, বয়স : ৪৮ বছর, পেশা : গৃহিণী, ঠিকানা : সদর রোড, ভোলা, ডাকঘর ও উপজেলা : ভোলা

৩. মাহমুদা খাতুন, পিতা : প্রয়াত আবদুল লতিফ, মাতা : প্রয়াত জরিনা খাতুন, বয়স : ৭২ বছর, পেশা : গৃহিণী, ঠিকানা : গ্রাম ও ডাকঘর : বাপ্তা, উপজেলা : ভোলা

৪. মাওলানা এনায়েত হোসাইন, পিতা : প্রয়াত দেলওয়ার হোসেন, মাতা : প্রয়াত উম্মে কুলসুম, শিক্ষা : এম.এ., এম.এম (মোমতাজুল মোহাদ্দেসীন), বয়স : ৪২ বছর, পেশা : শিক্ষকতা, ঠিকানা : সদর রোড, ডাকঘর ও উপজেলা : ভোলা

www.pathagar.com

৫. গৌরাঙ্গচন্দ্র দে, পিতা : প্রয়াত পাঁচুলাল দে, মাতা : প্রয়াত দীপালি রানী দে, শিক্ষা : এস.এস.সি., বয়স : ৪৮ বছর, পেশা : ব্যবসা, ঠিকানা : গ্রাম : পৌরবাপ্তা, ১নং ওয়ার্ড, উপজেলা : ভোলা সদর

৬. হোসেন আহমদ, পিতা : প্রয়াত রফিকুল হক, মাতা : প্রয়াত সিদ্দিকা খাতুন, বয়স : ৫২ বছর, পেশা : চাকরি, ঠিকানা : গ্রাম : বাপ্তা, ডাকঘর ও উপজেলা : ভোলা

৭. প্রশান্তকুমার রায়, পিতা : প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, মাতা : নির্মলা রায়, বয়স : ৪৭ বছর, শিক্ষা : এইচ.এস.সি., পেশা : ব্যবসা, ঠিকানা : গ্রাম : ছদুর চর, ইলিশা, ডাকঘর : ইলিশার হাট, উপজেলা : ভোলা

৮. ফারজানা শরমিন, স্বামী : রুহুল আমিন রুশদ, মাতা : বিলকিস জাহান, শিক্ষা : এম.এ. (ইংরেজি), বয়স : ৩৬ বছর, পেশা : শিক্ষকতা, সদর রোড ভোলা, ডাকঘর ও উপজেলা : ভোলা .

৯. এমএ তাহের, পিতা : প্রয়াত আলহাজ গোলাম রহমান, মাতা : প্রয়াত সাহেরা খাতুন, শিক্ষা : বি.এ., বয়স : ৮০ বছর, পেশা : সাংবাদিকতা, ঠিকানা : গ্রাম : দক্ষিণ সৈয়দপুর, ডাকঘর : সাবেক হাজীপুর মাদ্রাসা, উপজেলা : দৌলতখান

১০. মোহাম্মদ আবদুল্লাহ, পিতা : মোহাম্মদ ইছহাক, মাতা : প্রয়াত সুফিয়া বেগম, শিক্ষা : ফাজিল, বয়স : ৪০ বছর, পেশা : ব্যবসা, ঠিকানা : গ্রাম : ৭ নং ওয়ার্ড দৌলতখান পৌরসভা, ডাকঘর : দৌলতখান, উপজেলা : দৌলতখান

১১. প্রাণগোপাল দেবনাথ, পিতা : ব্রজবাসী দেবনাথ, মাতা : কুঞ্জরানী দেবনাথ, শিক্ষা : বিএ, বয়স : ৯০ বছর, পেশা : শিক্ষকতা (অবসরপ্রাপ্ত), গ্রাম ও ডাকঘর : বাংলাবাজার, উপজেলা : দৌলতখান

১২. শফিকুল মাওলা ফারুক (শ.ম. ফারুক), পিতা : প্রয়াত সিকান্দার আহমদ, মাতা : ফিরোজা বেগম, শিক্ষা : বিএ (অনার্স), এম.এ, বয়স : ৫১ বছর, পেশা : অধ্যাপনা, সাংবাদিকতা, ঠিকানা : গ্রাম : চরখলিফা, ডাকঘর : দিদারুল্লা

১৩. বাসেতুন নাহার, স্বামী : শফিকুল মাওলা ফারুক (শ.ম. ফারুক), শিক্ষা : এমএ, বয়স : ৪০ বছর, পেশা : অধ্যাপনা, সাংবাদিকতা, ঠিকানা : গ্রাম : চরখলিফা, ডাকঘর : দিদারুল্লা, উপজেলা : দৌলতখান

১৪. সুরাইয়া বেগম, স্বামী : এমএ তাহের, বয়স : ৫৫ বছর, পেশা : গৃহিণী, ঠিকানা : গ্রাম : দক্ষিণ সৈয়দপুর, ডাকঘর : সাবেক হাজীপুর মাদ্রাস, উপজেলা : দৌলতখান

১৫. আজিমউদ্দিন লিটন, পিতা : প্রয়াত সালাহ্উদ্দিন খান, মাতা : প্রয়াত অহিদা বেগম, শিক্ষা : বিএ, বয়স : ৩৫ বছর, পেশা : সাংবাদিকতা, চাকুরি, ঠিকানা : গ্রাম : দড়িচাঁদপুর, ডাকঘর : হাট শশীগঞ্জ, উপজেলা : তজুমুদ্দিন

১৬. ছায়া রানী দে, স্বামী : অমৃতলাল দে, শিক্ষা : চতুর্থ শ্রেণি, বয়স : ৬৫ বছর, পেশা : গৃহিণী, ঠিকানা : গ্রাম : ডিমাডুবি, ডাকঘর : দেবীপুর মাদ্রাসা, উপজেলা : তজুমুদ্দিন

১৭. মোশারেফ হোসেন হাওলাদার, পিতা : প্রয়াত আবদুর রাজ্জাক হাওলাদার, মাতা : প্রয়াত সবুরা খাতুন, বয়স : ৬৭ বছর, পেশা : অবসরপ্রাপ্ত কর্মকতা, ঠিকানা : গ্রাম : পক্ষীয়া, ডাকঘর : বোরহানগঞ্জ, উপজেলা : বোরহানউদ্দিন

১৮. শ্রীমতী শান্তি দেবনাথ, স্বামী : মৃত ননীগোপাল দেবনাথ, বয়স : ৮২ বছর, পেশা : গৃহিণী, গ্রাম : হাসাননগর, ডাকঘর : মৃজাকালু, উপজেলা : বোরহানউদ্দিন

www.pathagar.com

১৯. কানাই দেবনাথ, পিতা : ননীগোপাল দেবনাথ, মাতা : শান্তি দেবনাথ, বয়স : ৫৮ বছর, পেশা : চাকরি, ঠিকানা : গ্রাম : হাসাননগর, ডাকঘর : মৃজাকালু, উপজেলা : বোরহানউদ্দিন

২০. রোকসানা বেগম, পিতা : মোশারেফ হোসেন হাওলাদার, মাতা : আখতার জাহান, শিক্ষা : বিএ, পেশা : গৃহিণী, বয়স : ২৩ বছর, ঠিকানা : গ্রাম : পক্ষীয়া, ডাকঘর : বোরহানগঞ্জ, উপজেলা : বোরহানউদ্দিন

২১. মোঃ অজিউল্লাহ মিয়া, পিতা : প্রয়াত আবদুর রহমান মিয়া, মাতা : প্রয়াত তহুরা খাতুন, বয়স : ৭১ বছর, পেশা : ব্যবসা, ঠিকানা : গ্রাম : ধলিগৌরনগর, ডাকঘর : সিরাজিয়া মাদ্রাসা, উপজেলা : লালমোহন

২২. নাম : সালেহা খাতুন (পারুল), স্বামী : মোঃ অজিউল্লাহ মিয়া, শিক্ষা : বি. এ., বয়স : ৫৭ বছর, পেশা : গৃহিণী, ঠিকানা : গ্রাম : ধলিগৌরনগর, ডাকঘর : সিরাজিয়া মাদ্রাসা, উপজেলা : লালমোহন

২৩ জোৎস্না রাণী দে, স্বামী : মনোরঞ্জন দে, শিক্ষা : এইচএসসি, বয়স : ৫২ বছর, পেশা : গৃহিণী, ঠিকানা : গ্রাম : ধলিগৌরনগর, ডাকঘর : সিরাজিয়া মাদ্রাসা, উপজেলা : লালমোহন

২৪. কাজী মোহাম্মদ রাশেদ, পিতা : প্রয়াত মোহাম্মদ আলী, মাতা : জাকিয়া বেগম, বয়স : ৪০ বছর, পেশা : ব্যবসা, ঠিকানা : দক্ষিণ ফ্যাশন, ডাকঘর ও উপজেলা : চরফ্যাশন

২৫. মোঃ আলমগীর হোসেন, পিতা : মোহাম্মদ নূর হাফেজ মিয়া, মাতা : হাসিনা বেগম, শিক্ষা : বিএ (অনার্স) এমএ, পেশা : শিক্ষকতা, বয়স : ৩৩ বছর, ঠিকানা : গ্রাম : চর ফৈজুদ্দিন, ডাকঘর : হাজীরহাট, উপজেলা : মনপুরা

২৬. ইয়ানুর নাহার রুমা, স্বামী : মোঃ আলমগীর হোসেন, শিক্ষা : বিএ, বয়স : ২৭ বছর, পেশা : গৃহিণী, ঠিকানা : গ্রাম : চরফৈজুদ্দিন, ডাকঘর : হাজীরহাট, উপজেলা : মনপুরা

২৭. অধ্যাপক বিধানকৃষ্ণ দাস, পিতা : হরিহর দাস, মাতা : কল্পনা রানী, শিক্ষা : এমএসসি, পেশা : অধ্যাপনা, বয়স : ৪০ বছর, ঠিকানা : গ্রাম : সোনারচর, ডাকঘর : হাজীরহাট, উপজেলা : মনপুরা

২৮. অধ্যাপক প্রতিমা রানী দাস, স্বামী : অধ্যাপক বিধানকৃষ্ণ দাস, শিক্ষা : বিএ (অনার্স), এম.এ, বয়স : ৩৩ বছর, পেশা : অধ্যাপনা, ঠিকানা : গ্রাম : সোনারচর, ডাকঘর : হাজীরহাট, উপজেলা : মনপুরা

www.pathagar.com

লোকাচার

ভোলা সদর উপজেলা

১. মানত ও সিন্নি

এ অঞ্চলের মানুষ খুবই ধর্মভীরু। হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ স্বীয় ধর্মীয় বিধি-বিধান, রীতি-নীতি মেনে চলেন। মুসলিম সম্প্রদায় এক আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল এবং হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ তাদের দেব-দেবীর প্রতি অগাধ বিশ্বাস পোষণ করেন। এরপরও তারা নানা কারণে নানা ধরনের মানত করে থাকেন। মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত মানতকারীদের কেউ কেউ নামাজ, রোজা, দরুদ পাঠ, কোরান ইত্যাদি মানত করে থাকেন।

মুসলিম ও হিন্দু এই উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যেই 'মানত' একটি অতি-প্রচলিত সংস্কার। বিভিন্ন উদ্দেশ্যে মানত করা হয়ে থাকে। সন্তানের কিংবা নিজেদের অসুখ-বিসুখ, বিপদ বা কোনো জটিল সমস্যা থেকে মুক্তি, পরীক্ষায় কৃতকার্য হওয়া, মামলা-মোকদ্দমায় জয়লাভ, বিয়ে, সন্তান লাভ ইত্যাদি বহু জীবনসম্পৃক্ত ব্যাপারেই মানত করা হয়ে থাকে। কাঙ্ক্ষিত বিষয়ে সফলতা লাভ বা প্রাপ্তির পর এই মানত পূরণ করা হবে বলে একজন মানতকারী মনে ইচ্ছা পোষণ বা অঙ্গীকার করে থাকেন। একজন কৃষক মানত করে তার ক্ষেতে ভালো ফসল হলে, কিংবা একটি মুরগি তাড়াতাড়ি ডিম দিলে সে ঐ গাছের প্রথম ফলটি বা প্রথম উৎপন্ন ফসলের অংশ কিংবা প্রথম দেওয়া চারটি মুরগির ডিম সে তার পীরকে বা মাজারে দান করবে। এ অঞ্চলে ভারতের জৌনপুরের পীর প্রতিবছরই আসেন। তাদের প্রতি সব সম্প্রদায়ের মানুষের অগাধ শ্রদ্ধা ও ভক্তি রয়েছে। জৌনপুরের পীরের নামেই এ অঞ্চলে বেশি মানত করা হয়। অন্যান্য পীরের ভক্ত যারা, যেমন শর্ষিনার পীর, চরমোনাইর পীর, আটরশির পীর সাহেবসহ অন্যান্য পীরের মুরিদ ও ভক্তরা তাদের পীরের নামে মানত করে থাকেন।

এছাড়া যারা একটু সচ্ছল ও ধনবান তারা দূরবর্তী কোনো পীর-দরবেশের মাজার, যেমন, হযরত শাহ্ জালালের (র.) মাজার, চট্টগ্রামের বার আউলিয়ার মাজার, আজমীর শরিফ, বাগেরহাটের হযরত খান জাহান আলীর (র.) মাজার, হাইকোর্টের মাজার, মিরপুরের হযরত শাহ্ আলীর (র.) মাজার ইত্যাদি মাজারের জন্য মানত করে থাকেন। আবার এভাবেও মানত করা হয়ে থাকে যে, আল্লাহ, আমার কিংবা আমার সন্তানের এই সমস্যা দূর হলে কিংবা আমার এই চরম বিপদ থেকে মুক্তি ঘটলে কিংবা আমি এই মামলায় জয়লাভ করলে আমি একটা গরু বা খাসি (আর্থিক সামর্থ্য অনুসারে) 'লুটাইয়া' দেব (জবাই করে তার মাংস গরিব-দুঃখীর মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া)। মানতের মধ্যে আরো থাকে নগদ অর্থ, শিরনি, গরু, খাসি, মুরগি, কবুতর, চাল, ডাল, তেল, আগরবাতি, মোমবাতি, গোলাপ জল ইত্যাদি। হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত অনেক মানুষও এসব মাজারসহ বিভিন্ন কালীমন্দির ও অন্যান্য মন্দির ইত্যাদিতে দানের জন্য মানত করে

www.pathagar.com

থাকেন। এদের সবারই বিশ্বাস, পীর বা দেব-দেবীকে সন্তুষ্ট করতে পারলে তাদের মনোবাসনা পূর্ণ হবে।

'বাকেরগঞ্জ জেলার ইতিহাস' গ্রন্থের লেখক তৎকালীন (১৮৭০-৭৫) জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বেভারেজ লিখেছেন, 'সাগরে কতো জাহাজ-নৌকা বিপাকে পড়ে। এ সময় খোয়াজ-খিজির, গাজীকালু আর জলদেবতাদের একটু করুণার প্রত্যাশায় মানত করা হয়' (মোহাম্মদ হোসেন চৌধুরী, ভোলা জেলার ইতিহাস, পৃ. ১১)।

মানত আদায় হয়ে গেলে ভক্ত ও মুরিদরা সন্তুষ্টচিত্তে বাড়ি ফিরে যায়। কারণ, তারা বিশ্বাস করেন যে, পীররা অনেক আধ্যাত্মিক শক্তি ও অতিমানবিক ক্ষমতার অধিকারী, একমাত্র তাদের দয়া ও অনুগ্রহেই তাদের জীবনের নানাবিধ মনোবাসনা পূর্ণ হতে পারে। তাদের একটু পানি পড়া, কালিজিরা পড়া, ডিম পড়া কিংবা মুখের একটু ফুঁ বা তাবিজ ঘটিয়ে দিতে পারে তাদের জীবনে আমূল পরিবর্তন, হতে পারে নিঃসন্তানের সন্তান লাভ, হতে পারে মামলায় জয়লাভ, ফল ধরতে পারে বন্ধ্যা বৃক্ষে কিংবা মুক্তি ঘটতে পারে কোনো দুরারোগ্য ও মরণব্যাধি থেকে।

অনেক সময়ই 'ইচ্ছা বা উদ্দেশ্য' পূরণ হলে তারপর মানত আদায় করা হয়। মনোভাবটা এমন যে, আগেই যদি মানত আদায় করে ফেলি, তারপর যদি উদ্দেশ্য সফল না হয়। তাহলে তো টাকাটা জলে যাবে। অনেকে আবার উদ্দেশ্য সাধিত হয়ে গেলেও 'মানত' আদায় করেন না, বা করতে গড়িমসি করেন। এই শ্রেণির মানতকারীর মানত আদায়ের মনোভাবকে অবলম্বন করে স্থানীয় হিন্দু সমাজে একটি আকর্ষণীয় গল্প প্রচলিত আছে। গল্পটি এরূপ :

জনৈক ব্যক্তি দেবী কালীর নামে এভাবে একটি মানত করেন যে, 'কালী মা, আমার এই কাজটি সুচারুভাবে সম্পন্ন হয়ে গেলে আমি তোমার নামে দুটি 'পোকা' (পাঁঠাকে পোকা বলতে হয়) উৎসর্গ করবো।'

কিছুদিনের মধ্যেই ভদ্রলোকের কাজটি দেবী কালীর কৃপায় ভালোভাবেই সম্পন্ন হয়ে গেল। কিন্তু তিনি পাঁঠা দুটি উৎসর্গ করতে গড়িমসি করতে থাকেন। একদিন মা কালী তাকে স্বপ্নে দেখালেন, 'দুটি পাঁঠা উৎসর্গ করবে বলে শপথ করেছিলে, কই সেটা কই? ভদ্রলোক নিদ্রার মধ্যেই কাচুমাচু করে বললেন, মা, পশুর মূল্য তো খুব বেড়ে গেছে, আর্থিক অবস্থাও খারাপ। পাঁঠার পরিবর্তে দুটি মুরগি দিলে হয় না, মা?'

দেবী মহৎ হৃদয়ের অধিকারিণী, ভক্তের প্রতি অনেক দয়াপরবশ। তিনি বললেন, 'ঠিক আছে তাই দিস।'

দিন যায়, মাস আসে। দেবীর মানত আদায়ে গড়িমসি চলতে থাকে। ভদ্রলোককে আবার দেবী স্বপ্নে দেখালেন, 'কিহে আমার মুরগি কই?'

ভদ্রলোক জবাব দিলেন, 'ওহ্ হো মা, ভুলেই গিয়েছিলাম। তারপর আবার দেশে মুরগির খামারে মড়ক লেগেছে তো। মুরগিই পাওয়া যাচ্ছে না। কী যে করি। আচ্ছা মা, দুটো কবুতর দিলে হয় না?'

দেবী প্রসন্নচিত্তে জবাব দিলেন, 'তাহলে আর কী করবি, কবুতরই দিয়ে দিস।'

www.pathagar.com

আবার দিন যায়, মাস যায়। দেবীর মানত আদায় করা হয় না। বিরক্ত হয়ে দেবী আবার স্বপ্নে আবির্ভূত হলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিহে, আমার কবুতর তো পেলাম না।' ভদ্রলোক এবার একটু কাতরস্বরে বললেন, 'মা, তুমি তো সবই জান। সংসারে খরচ বেড়ে গেছে। বাচ্চা-কাচ্চার অসুখ-বিসুখ লেগেই আছে। মা, আরেকটু দয়া করো। তুমি কি অনুগ্রহ করে দুটি ফড়িং নেবে?' দেব-দেবীরা তো আর লোভী নন। ভক্তের সুবিধা-অসুবিধার বিষয় অবশ্যই বিবেচনা করেন। তিনি জবাব দিলেন, 'ঠিক আছে, তোর যখন এতোই অসুবিধা, তাই দিস।'

দেবী আবারও অনেকদিন অপেক্ষা করলেন। ভদ্রলোক সুবিধা পেয়ে গেলেন। ভাবলেন, 'দেবীকে তো একটা না হয় আরেকটা ছুতা দিয়ে বুঝিয়ে যেতে পারছি। দেবীও তা মেনে নিচ্ছেন। না দিলে কী আর এমন হবে।'

পুনরায় স্বপ্নে আবির্ভূত হলেন দেবী কালী। জিজ্ঞাসা করলেন, 'এবার কী খবর রে?' ভদ্রলোক বললেন, 'মা, তুমি আসলে আমার জন্য অনেক করেছো, অনেক স্বার্থ ত্যাগ করেছো। এতোই যখন করলে মা, তোমার তো অনেক ক্ষমতা। এবার আর একটু কষ্ট করো না মা। তুমি না হয় একটু উড়ে উড়ে ফড়িংগুলো ধরে ধরে খেয়ে নাও!'

২. সাতশা

বুড়া-বুড়ি এবং গ্রামের অভিজ্ঞ ও প্রবীণ দাইয়েরা বলে থাকেন—গর্ভ ধারণের সপ্তম মাসে গর্ভস্থ শিশু পরিপূর্ণতা লাভের সর্বশেষ স্তরে উপনীত হয়। এ সময়ে গর্ভবতী নারীকে তার আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী নানা খাদ্যদ্রব্য খেতে দেওয়া হয়। এটাকে আঞ্চলিক ভাষায় বলা হয় 'সাধ খাওন' বা 'সাধভক্ষণ'। কেউ কেউ বলে থাকেন সাতশা। এ উপলক্ষে গর্ভবতী নারীর বাড়িতে তার আত্মীয়-স্বজন নানা উপহারসামগ্রী নিয়ে সমবেত হন। এসব উপহারসামগ্রীর বেশির-ভাগই আনা হয় অনাগত অতিথির জন্য। হিন্দুসমাজে পাঁচ মাসে, সাত মাসে অথবা নয় মাসেও সাতশা অনুষ্ঠান করা হয়।

লোকসমাজে এই বিশ্বাস প্রচলিত যে, গর্ভবতী নারীকে 'সাধ' খাওয়ানো হলে তার সন্তান বড় হয়ে কখনো পরের দ্রব্য আত্মসাৎ করার ইচ্ছা পোষণ করবে না। তাছাড়া গর্ভাবস্থায় পোয়াতিকে তার পছন্দমতো খাবার না খাওয়াতে পারলে প্রসবের সময় তার কষ্ট হবে।

'সাধ খাওন' বা 'সাতশা' প্রধানত হিন্দুসমাজের আচার হলেও আজকাল মুসলমান সমাজের অনেক মেয়ে বা তাদের পরিবারও এই সাতশা উদ্‌যাপন করে থাকেন। মুসলিম সমাজের অনুষ্ঠানে গর্ভবতীর নতুন শাড়ি পরা, আত্মীয়-স্বজনকে দাওয়াত করে নানা উপাদেয় খাবারে আপ্যায়িত করা এবং উপহার গ্রহণ ছাড়া বিশেষ কোনো আচার পালন করতে দেখা যায় না। তবে উভয় সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠানেই গর্ভবতীকে নতুন লাল শাড়ি, লাল ব্লাউজ, লাল পেটিকোট পরিয়ে পিঁড়িতে বসানো হয়। সমবয়সী বোন থাকলে ওদের দু'পাশে বসানো হয় এবং তার স্বামী খাবারগুলো স্ত্রীর সামনে পরিবেশন করে থাকে।

www.pathagar.com

৩. জামাই ষষ্ঠী

সনাতন ধর্মাবলম্বীরা এই দিন খুব আনন্দ-উল্লাস এবং মহা ধুমধামের সঙ্গে পালন করে থাকে। এটি জামাইয়ের জন্য এক মহোৎসবের দিন। জ্যৈষ্ঠ মাসের এই দিনটির জন্য 'জামাইরা' সারা বছর অধীর আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করে। শ্বশুর-শাশুড়ি, শ্যালক-শালিকাসহ অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে জামাইরা খুব আনন্দের মধ্য দিয়েই দিনটি অতিবাহিত করে। শ্বশুর-শাশুড়ি এই দিনে জামাইদের জন্য মন-প্রাণ উজাড় করে দেন। কী ধরনের পোশাক জামাইদের পছন্দ, কী রকম খাবার পছন্দ—সব এনে হাজির করা হয় তাদের সামনে। যত্নে যাতে সামান্যতম ত্রুটি না হয়, সেদিকে শ্বশুর-শাশুড়ির সতর্ক দৃষ্টি থাকে। বছরের অবশিষ্ট দিনগুলো তাদের মেয়ে যেন অনাবিল সুখ-শান্তি ও মান-সম্মানের সাথে অতিবাহিত করতে পারে—সেজন্যই এসব আয়োজন।

জামাই বলে কথা! এদিনে তাদের প্রকৃতপক্ষেই 'জামাই আদর' করা হয়। বধূসহ শ্বশুর বাড়িতে আসার পরই ধান-দূর্বা দিয়ে জামাইকে আশীর্বাদ করা হয়। পাঁচ রকমের ফল খেতে দেওয়া হয়। জামাইয়ের কপালে 'দই' দিয়ে একটি ফোঁটা দেওয়া হয়, হাতের কব্জিতে বাঁধা হয় হলুদ সুতো।

এরপর মধ্যাহ্ন ভোজ। এটি রীতিমতো একটি রাজকীয় ব্যাপার। অবশ্য যার যার সামর্থ্য অনুযায়ী আয়োজন করা হয়ে থাকে। জামাইয়ের সামনে প্রায় পনেরো-ষোল রকমের খাবার তৈরি করে পরিবেশন করা হয়। 'গরম ভাতের সঙ্গে ঘি' থেকে শুরু করে পান-মশলা পর্যন্ত কোনো কিছুই বাদ যায় না। এ উপলক্ষে তো বাজারে মাছের মূল্য বেড়ে যায় অস্বাভাবিকভাবে। যার যার সামর্থ্য অনুপাতে বড় মাছটিই যে জামাইয়ের জন্য রাঁধতে হয়। বিভিন্ন জাতের মাছ, বিশেষকরে চিংড়ির মালাইকারি, সর্ষে ইলিশ, নারিকেল-ইলিশ, জামাই ষষ্ঠী সন্দেশ ইত্যাদি পরিবেশন করা হয়। রসগোল্লা আর সন্দেশের তো ঘটে ব্যাপক সমাবেশ।

বিপুল পরিমাণে খাবার-দাবারের আয়োজনই শুধু নয়, জামাইকে দেওয়া হয় অনেক পোশাক-পরিচ্ছদও। বিনিময়ে জামাইও তাঁর শাশুড়িকে বিশেষ উপহার দিয়ে থাকেন।

প্রকৃতপক্ষে জামাই ষষ্ঠী অন্যান্য এলাকার মতো আমাদের এই অঞ্চলেও এমন একটি দিন হিসেবে উদ্‌যাপিত হয়, যেদিন শ্বশুর বাড়ির সব মানুষ জামাইকে বরণের জন্য, তাকে সম্ভব সর্বোচ্চ আদর-আপ্যায়নের জন্য ব্যস্ততম দিন অতিবাহিত করে।

দৌলতখান উপজেলা

১. মানত, শিন্নি

বিভিন্ন পারিবারিক ও ব্যক্তিগত সমস্যা, সংকট, বিপদ ইত্যাদি থেকে উত্তরণে মুসলিম সম্প্রদায় আল্লাহতাআলার সন্তুষ্টি বিধানে এবং পীর-আউলিয়াদের রূহানি দোয়া প্রাপ্তির আশায় এবং হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা তাদের দেব-দেবীর কৃপা লাভের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রকমের মানত করে থাকেন। এই মানতের ব্যাপারে উভয় সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষেরই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং মানত আদায়ের প্রক্রিয়া ও ধরন প্রায় এক রকম।

www.pathagar.com

মুসলমানরা সাধারণত কাঙ্ক্ষিত বিষয়ে শুভফল প্রাপ্তির জন্য নফল নামাজ পড়া, কোরআন খতম দেওয়া, বিভিন্ন সুরা পড়া, রোজা রাখা, দরুদ পড়া, ইত্যাদি মানত করে থাকেন। অনেকে পীরের দরগায় বা কোনো মাজারে সিন্নি, গরু, ছাগল, মুরগি, কবুতর, মোমবাতি, আগরবাতি, ডাল, চাল ইত্যাদি বা ফকিরকে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে কিছু দানের মানত করে থাকেন।

এখানকার অধিকাংশ মুসলমানই জৌনপুরের পীরের দরবারে দেওয়ার জন্য খাসি, গরু, কবুতর, ধান, ফলমূল, মাছ ইত্যাদি মানত করে থাকেন। এছাড়া বোরহানউদ্দিনের তকবির পীর, চরমোনাই ও শর্ষিনার পীরের জন্যও মানত করে থাকেন।

সনাতন ধর্মাবলম্বীরা কালী মন্দিরে পাঁঠা বলি দেওয়াসহ বিভিন্ন মন্দিরে দিবামঙ্গল বা অষ্টপ্রহর কীর্তনের আয়োজনের মানত করে থাকেন। মানতকারীরা এটা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, পীর ফকির বা দেব-দেবীদের সন্তুষ্ট করতে পারলেই যাবতীয় মনোবাসনা পূর্ণ হবে।

২. আঁতুড় ঘরের নিরাপত্তা

সন্তান প্রসবের সময় ঘনিয়ে হলেই আঁতুর ঘর 'বন্ধ' করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়। কারণ, এসময় জ্বীন-পরী, ভূত-প্রেত, 'ছুঁইত লাগা' (ছোঁয়াছুঁয়ি জনিতকুসংস্কার) ইত্যাদি নানা ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। এ কারণে আঁতুর ঘর 'বন্ধ' করা অর্থাৎ সমস্ত অশুভ শক্তির দৃষ্টি বা স্পর্শ থেকে গর্ভজাত সন্তান ও গর্ভবতী মা-কে নিরাপদ রাখার ব্যাপার নিশ্চিত করাই হচ্ছে আতুড় ঘর 'বন্ধ' করার মূল বিষয়। এজন্য দোয়া-দরুদ,পাঠ করে আঁতুড় ঘরের তিন কোণায় আজান দিয়ে তিনবার করে হাততালি দেওয়া হয় এবং অবশিষ্ট কোণে দোওয়া পড়া লোহার গজাল পুঁতে রাখা হয়। ঘরের সামনে গরুর মাথার খুলি বা হাড়, ছেঁড়া জুতা, ঝাড়ু ইত্যাদি ঝুলিয়ে রাখা হয়। এতে করে কোনো অশুভ শক্তি আঁতুড় ঘরের কাছাকাছি ভিড়তে পারে না বলে বিশ্বাস। এছাড়া সদ্যোজাত শিশুর মাথার কাছে সুপারি কাটার সরতা বা লৌহজাত কোনো বস্তু রেখে দেওয়া হয়।

৩. সাতশা বা সাধ খাওয়ানো

প্রধানত হিন্দুসমাজের আচার হলেও আজকাল মুসলিমসমাজের মধ্যেও অনেকে এটি পালন করে থাকেন। গর্ভধারণের সপ্তম মাসে গর্ভবতী মহিলাকে তার সাধ অনুযায়ী বিভিন্ন রকম খাদ্যদ্রব্য খাওয়ানো হয়ে থাকে। সনাতন ধর্মাবলম্বী গর্ভবতী রমণীকে মাংস খেতে দেওয়া হয় না। ৫/৭ প্রকারের মাছ ও ব্যঞ্জন এবং পোলাও-ফিরনি খেতে দেওয়া হয়। মুরুব্বিরা বলে থাকেন, এই সময়ে গর্ভবতীর পেটের সন্তানের পরিপূর্ণতা ঘটে।

গর্ভবতী রমণীকে একটি পিঁড়ি বা মাটিতে বিছানা পেতে বসিয়ে নতুন সাজে সাজানো হয়। তাঁকে পরানো হয় লাল শাড়ি, লাল ব্লাউজ। বিভিন্ন রকমের খাবার তার সামনে পরিবেশন করেন তার স্বামী। দু'পাশে বসানো হয় সমবয়সী বোনদের।

সাতশা'র দিনে গর্ভবতী নারীর পক্ষ থেকে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন ও তার বান্ধবীদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। তারা প্রত্যেকেই নানান উপহারসামগ্রী নিয়ে উপস্থিত হন এবং এ উপলক্ষে আয়োজিত ভোজ-অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

www.pathagar.com

৪. জামাই ষষ্ঠী

জ্যৈষ্ঠ মাসের এই দিনে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের বাড়ির জামাইরা তাদের শ্বশুর-শাশুড়ি ও শ্যালক-শ্যালিকাদের নিয়ে মহা আনন্দে মেতে ওঠেন। 'জামাই আদর' বলে বাংলার সমাজে যে প্রবাদটি প্রচলিত, এদিনে তার মর্ম জামাইদের বুঝিয়ে দেওয়া হয়। জামাইরা বাড়িতে এলে, তাদের ধান-দূর্বা দিয়ে বরণ করা হয়, কপালে 'দই' দিয়ে দেওয়া হয় একটি ফোঁটা, হাতের কব্জিতে বেঁধে দেওয়া হয় হলুদ সুতো। শ্বশুর-শাশুড়ি এই দিনটিতে জামাইদের জন্য তাদের সাধ্যমত সবকিছু দিয়ে থাকেন। জামাইয়ের পছন্দমত পোশাক-পরিচ্ছদ কিনে দেওয়া হয়, তাদের রুচি অনুযায়ী যাবতীয় সব খাবার-দাবারের আয়োজন করা হয়। আর্থিক সামর্থ্যের মধ্যে থেকেই জামাইয়ের জন্য পনেরো-ষোল পদের খাবার তৈরি করে তাদের সামনে পরিবেশন করা হয়। বিভিন্ন জাতের বড় বড় মাছ, নারিকেল-ইলিশ, সর্ষে-ইলিশ, চিংড়ির মালাইকারি, চিতল মাছের কোপ্তা ইত্যাদি খাবার প্রস্তুত করা হয়, সাথে থাকে প্রচুর পরিমাণে জামাই ষষ্ঠী সন্দেশ, আর রসগোল্লা।

অন্যদিকে, জামাইও শ্বশুর-শাশুড়িকে বিশেষ উপহার প্রদানের মাধ্যমে সম্মানিত করে থাকেন।

তজুমদ্দিন উপজেলা

১. মানত ও শিন্নি

মানত এ-অঞ্চলের একটি অতি প্রচলিত সংস্কার। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের অনেক মানুষই বিভিন্ন রকম বিপদ-আপদ, সংকট থেকে পরিত্রাণ এবং বিশেষ কোনো ইপ্সিত বিষয়ে শুভফল লাভ করার প্রত্যাশায় মানত করে থাকেন। এ দুটো বিষয়েই মানুষ প্রথমত নিজের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে এবং সাথে সাথে নিশ্চিত ফললাভের প্রত্যাশায় আল্লাহতাআলাকে সন্তুষ্ট করার জন্য নামাজ পড়া, রোজা রাখা, কোরান তেলাওয়াত, দরুদ পড়া, বাড়িতে বা মসজিদে মিলাদ পড়ানো, মসজিদে বা মাজারে সিন্নি দেওয়া, গরিবদের দান, পীরের দরবারে কিছু উপঢৌকন প্রদান ইত্যাদি মানত করে থাকেন। সনাতন ধর্মাবলম্বীরাও কালীমন্দিরে মহিষ বা পাঁঠা বলি দেওয়া, দিবামঙ্গল বা অষ্টপ্রহর কীর্তনের আয়োজন করা ইত্যাদি মানত করে থাকেন। তবে সাম্প্রতিককালে মহিষ ও পাঁঠা বলি দেওয়ার প্রচলন অনেকটা উঠে গেছে এবং কীর্তনাদির ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আধ্যাত্মিক কিংবা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী কোনো ব্যক্তি যদি ভিন্ন ধর্মাবলম্বীও হয়ে থাকেন, তাতেও মানতকারীরা কোনো ভেদাভেদ করেন না। দেখা গেছে, ভোলার সর্বজনশ্রদ্ধেয় জৌনপুরের পীরের জন্যে অনেক ভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষও তাদের বাঞ্ছিত কাজে শুভফল লাভের প্রত্যাশায় মানত করে থাকেন এবং রোগমুক্তি বা বিপদ-আপদ থেকে মুক্তিলাভের আশায় তাদের দেওয়া পানিপড়াও নিয়ে থাকেন। অন্যদিকে, শুভফল লাভের প্রত্যাশায় তজুমুদ্দিনের খ্যাতনামা আধ্যাত্মিক সাধক শ্রীশ্রী অচ্যুতানন্দ ব্রহ্মচারীর (অনিল বাবাজী) আশ্রমেও কোনো কোনো মুসলমান ধর্মাবলম্বী

www.pathagar.com

দান করে থাকেন। অনেক সময় বিপদ ও সংকট এমনই কঠিন ও ঘনীভূত হয় যে, তখন আর শুধু নিজ নিজ ধর্মীয় বিশ্বাসের ওপর আস্থা রাখাটা যেন বড় হয় না, রোগ কিংবা বিপদ থেকে পরিত্রাণ লাভই বড় হয়ে ওঠে। এছাড়াও অনেকে ভোলার বাইরের কোনো পীর বা বড় কোনো মাজার যেমন, চরমোনাইর পীর, শর্ষিনার পীর, আটরশির পীর প্রমুখ পীর সাহেবদের নামে এবং হাইকোর্ট মাজার, মিরপুরের হযরত শাহ আলীর মাজার, সিলেটের হযরত শাহজালালের মাজার, বাগেরহাটের খানজাহান আলী সাহেবের মাজার প্রভৃতিতে শিন্নি ও দান সদকাহ দেওয়ার জন্য মানত করে থাকেন।

২. আঁতুড় ঘর বন্ধ করা

এ অঞ্চলের অনেক পরিবারেই মহিলাদের সন্তান প্রসবের সময় উপস্থিত হলে জ্বীন-পরী, ভূত-প্রেত ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের অশুভ শক্তির হাত থেকে প্রসূতি ও তার শিশু-সন্তানকে নিরাপদ রাখার স্বার্থে এবং তাদের যাতে কোনো রকম 'ছুঁইত' না লাগে, সেজন্য আঁতুড়ঘর 'বন্ধ' করা হয়। এজন্য তিনজন আলেম আঁতুড় ঘরের তিন কোণায় গিয়ে আজান দেন এবং আজানের পরে জোরে জোরে তিনটা হাততালি দেন। পরে একজন আলেম বাকি কোণটিতে দোওয়া পড়া একটি লোহার গজাল মাটিতে পুঁতে রাখেন। এটাই হচ্ছে আঁতুড় ঘর বন্ধ করা।

৩. সদ্যোজাত শিশুর নিরাপত্তা

আঁতুড় ঘর বন্ধ করা ছাড়াও আঁতুড় ঘরের সামনে কিংবা শিশু ও প্রসূতি যে ঘরে থাকবে, সে ঘরের সামনের ঘরে একটা গাছের গুঁড়ি এনে তাতে আগুন দেওয়া হয়। গুঁড়িটি তুষের মতো ধীরে ধীরে জ্বলে এবং ধোঁয়া উদগীরণ করতে থাকে। লোকসমাজের বিশ্বাস এই যে, আগুন এবং ধোঁয়াকে ভূত-প্রেত চিরদিনই ভয় করে। এছাড়া ঘরের দরজার পাশে বড়ই বা বেত কাঁটা এবং শিশুর মাথার পাশে সুপারি কাটার 'সরতা' বা এ-জাতীয় কোনো লৌহনির্মিত দ্রব্য রেখে দেওয়া হয়। কারণ, লোহাকেও ভূত-প্রেতের ভীষণ ভয়।

৪. সাধ খাওয়ানো অথবা সাতশা

এটি প্রধানত হিন্দু সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠান। কোনো কোনো মুসলিম পরিবারেও গর্ভবতী নারীকে একটু আনন্দ-ফূর্তিতে রাখার জন্য অনুষ্ঠানটি পালন করা হয়ে থাকে। গর্ভধারণের সপ্তম মাসে গর্ভবতী নারীকে তার সাধ অনুযায়ী বিভিন্ন খাবার খাওয়ানো হয়ে থাকে বলে এটি সাতশা নামেও পরিচিত। এ সময়ে গর্ভস্থ সন্তানের পরিপূর্ণতা ঘটে বলে প্রবীণরা বলে থাকেন। আরো প্রচলিত আছে যে, এ সময়ে গর্ভবতীকে সাধ খাওয়ানো না হলে তার গর্ভস্থ সন্তান পরবর্তীকালে অন্যের দ্রব্য আত্মসাৎ করে।

এদিনে গর্ভবতী নারীকে লাল শাড়ি, লাল ব্লাউজ, লাল পেটিকোট পরিয়ে বিছানায় বসিয়ে বিভিন্ন রকমের উপাদেয় খাবার তার সামনে পরিবেশন করা হয়। আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবরা তাকে ও অনাগত অতিথির উদ্দেশ্যে নানা রকমের উপহার প্রদান করে এবং এ উপলক্ষে আয়োজিত মধ্যাহ্ন ভোজ বা নৈশভোজে অংশগ্রহণ করে।

www.pathagar.com

৫. জামাই ষষ্ঠী

জ্যৈষ্ঠ মাসের এইদিনটি সনাতন ধর্মাবলম্বীরা তাদের জামাইদের নিয়ে প্রচুর আমোদ-প্রমোদ, আনন্দ-উল্লাস করে থাকেন। এদিন জামাইরা তাদের শ্বশুরবাড়িতে এক মহাভোজে আপ্যায়িত হন। বাড়িতে জামাই এলে শ্বশুর-শাশুড়ি তাদের ধান-দূর্বা দিয়ে বরণ করেন, কপালে দই দিয়ে একটি ফোঁটা এঁকে দেন এবং হাতে বেঁধে দেন হলুদ সুতো। আর্থিক সামর্থ্যের মধ্যে জামাইদের পছন্দ অনুযায়ী পনেরো-ষোল পদের খাবার তৈরি করে তাদের সামনে পরিবেশন করা হয়। বড় বড় সাইজের রুই-কাতলার রেজালা, নারিকেল-ইলিশ, সর্ষে-ইলিশ, চিংড়ি মাছের মালাইকারি আরো কত কি। সাথে থাকে প্রচুর সন্দেশ ও রসগোল্লা।

শুধু খাবার-দাবার-ই নয়, জামাইদের উপহার দেওয়া হয় অনেক পোশাক-পরিচ্ছদও। জামাইরাও শুধু খেয়ে আর নিয়েই যান না, তারাও শ্বশুর-শাশুড়িকে মূল্যবান উপহার দিয়ে থাকেন।

বোরহানউদ্দিন উপজেলা

১. মানত

বোরহানউদ্দিন উপজেলার ধর্মভীরু মুসলিম ও সনাতন ধর্মাবলম্বীরা স্বীয় ধর্মীয় বিধি-বিধান যথারীতি মেনে চলেন। মুসলিম সম্প্রদায় এক আল্লাহ ও তাঁর রসুলের ওপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস রেখেই জীবনযাপন করেন। হিন্দু ধর্মাবলম্বীরাও তাদের দেব-দেবীর প্রতি অনুগত। এরপরও বিভিন্ন পারিবারিক ও ব্যক্তিগত সমস্যা, সংকট, বিপদ ইত্যাদি উত্তরণে মুসলিম সম্প্রদায় আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি বিধানে এবং পীর-আউলিয়াদের রূহানি দোয়ার উছিলায় সংকট থেকে মুক্তিলাভের আশায় এবং হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা তাদের দেব-দেবীর কৃপালাভের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রকমের মানত করে থাকেন। এই মানতের ব্যাপারে উভয় সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষেরই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং মানত আদায়ের প্রক্রিয়া ও ধরন প্রায় এক রকম। মানতকারীরা সবাই তাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হাসিলের পর মানত আদায়ের জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়ে থাকেন। তবে কেউ কেউ মানত করার পরপরই তা আদায়ে সচেষ্ট হন, ফলাফল প্রাপ্তির অপেক্ষা না করেই।

মুসলমানরা সাধারণত কাঙ্ক্ষিত বিষয়ে শুভফল প্রাপ্তির জন্য নফল নামাজ পড়া, কোরআন খতম দেওয়া, বিশেষ কোনো সুরা ৩ বার, ৭ বার, ১১ বার বা ৪১ বার পড়া, রোজা রাখা, দরুদ পড়া, ইত্যাদি মানত করে থাকেন। আবার কেউ কেউ পীরের দরগায় বা কোনো মাজারে সিন্নি, গরু, ছাগল, মুরগি, কবুতর, মোমবাতি, আগরবাতি, ডাল, চাল ইত্যাদি মানত করে থাকেন।

সন্তান-প্রত্যাশী অনেক নিঃসন্তান মহিলা গাজীপীরের দরগাহ্য় সিন্নি মানত করেন। সনাতন ধর্মাবলম্বীরা কালী মন্দিরে জোড়া পাঁঠা বলি দেওয়া, বিভিন্ন মন্দিরে দিবামঙ্গল বা অষ্ট প্রহর কীর্তন কিংবা দুদিন বা তিনদিন কীর্তনের আয়োজন করাসহ নগদ অর্থ দান করার জন্য মানত করে থাকেন। তবে ইদানীং বলি প্রথা প্রায় অনেকটা উঠে গেছে। তবে কোথাও পাঁঠা বা মহিষ বলি দেওয়া হলে মানত আদায়কারী মাংস খেতে অভ্যস্ত হলে প্রসাদ হিসেবে তা গ্রহণ করে থাকেন।

www.pathagar.com

হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানতকারীরা মানত করার আগে ও মানত আদায়ের পরে এটা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, এসব পীর ফকির তা জীবিতই হোক আর মৃতই হোক, তাদের সন্তুষ্ট করতে পারলেই যাবতীয় মনোবাসনা পূর্ণ হওয়ার পথ উন্মুক্ত হয়।

২. আঁতুড় ঘর বন্ধ করা

সন্তান প্রসবের সময় নিকটবর্তী হলেই আঁতুর ঘর 'বন্ধ' করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়। কারণ, এই সময় জ্বীন-পরী, ভূত-প্রেত, 'ছুঁইত লাগা' (ছোঁয়াছুঁয়ি জনিতকুসংস্কার) ইত্যাদি নানা ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে, যা থেকে গর্ভজাত সন্তান ও মায়ের সমূহ ক্ষতি হওয়ায় সম্ভাবনা থাকে বলে লোকসমাজের বিশ্বাস।

আঁতুড় ঘর 'বন্ধ' করা অর্থাৎ সমস্ত অশুভ শক্তির দৃষ্টি বা স্পর্শ থেকে গর্ভজাত সন্তান ও গর্ভবতী মা-কে নিরাপদ রাখার ব্যাপারটি নিশ্চিত করাই হচ্ছে আঁতুড় ঘর 'বন্ধ' করার মূল বিষয়। এজন্য দোয়া-দরুদ, মন্ত্রাদি পাঠ করে আঁতুড় ঘরের বাইরে দিয়ে ঘরের তিন কোণায় আজান দিয়ে তিনবার করে হাত তালি দেওয়া, আরেক কোণে লোহার গজাল পুঁতে দেওয়া, ঘরের সামনে গরুর মাথার খুলি বা হাড়, ছেঁড়া জুতা, ঠুঁণ্ডা কাইছা (যা শুধু বাড়ির পেছনের নোংরা ও আবর্জনাময় স্থানগুলি ঝাড়ু দেওয়ার জন্যই ব্যবহার করা হয়। এই ঝাড়ু ঘরের পেছনেই রেখে দেওয়া হয়, ঘরের সামনে কখনো আনা হয় না) ইত্যাদি ঝুলিয়ে রাখা হয়, ঘরের মধ্যে যাতায়াতের পথে গাছের গুঁড়িতে আগুন দিয়ে রাখা হয় (যা খুব ধীরে ধীরে জ্বলে বা যা থেকে ক্রমাগত ধোঁয়া নির্গত হয়)। এতে কোনো অশুভ শক্তি আঁতুড় ঘরের কাছাকাছি ভিড়তে পারে না বলে বিশ্বাস। এছাড়া সদ্যোজাত শিশুর মাথার কাছে সুপারি কাটার সরতা বা লৌহজাত কোনো যন্ত্র রেখে দেওয়া হয়। কারণ ভূত প্রেত ইত্যাদি লোহাকে ভয় পায় বলে লোকসমাজের বিশ্বাস রয়েছে।

৩. সাতশা বা সাধ খাওয়ানো

এই আচারটি প্রধানত হিন্দুসমাজের হলেও আজকাল মুসলিম সমাজের মধ্যে অনেকে এটি পালন করে থাকেন। অনুষ্ঠানটি মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। গর্ভধারণের সপ্তম মাসে গর্ভবতী মহিলাকে তার সাধ অনুযায়ী বিভিন্ন রকম খাদ্যদ্রব্য খাওয়ানো হয়ে থাকে। মুরুব্বিরা বলে থাকেন, এ সময়ে গর্ভবতীর পেটের সন্তানের পরিপূর্ণতা ঘটে।

সাতশা'র দিনে গর্ভবতী নারীর পক্ষ থেকে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন ও গর্ভবতীর বান্ধবীদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। তারা প্রত্যেকেই নানা উপহারসামগ্রী নিয়ে উপস্থিত হয় এবং এ উপলক্ষে আয়োজিত ভোজ-অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে।

এদিন গর্ভবতীকে লাল শাড়ি, লাল ব্লাউজ, লাল পেটিকোট, লাল ফিতা ও লাল চুড়ি পরিয়ে সাজানো হয়। মেয়ের শাশুড়ি মেয়েকে হলুদ দিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। এরপর চই পিঠা রান্না করে মেয়ের সামনে কলা পাতায় রাখা হয়। সাতজন সধবা সাতবার তাকে এই পিঠা খাওয়ায়।

www.pathagar.com

৪. জামাই ষষ্ঠী

জ্যৈষ্ঠ মাসের এই দিনে বাড়ির জামাইরা তাদের শ্বশুর-শাশুড়ি ও শ্যালক-শ্যালিকাদের নিয়ে মহা আনন্দে মেতে ওঠেন। 'জামাই আদর' বলে আমাদের সমাজে যে প্রবাদটি প্রচলিত, এদিনে তার মর্ম বোঝা যায়। শ্বশুর-শাশুড়ি এই দিনটিতে জামাইদের জন্য তাদের সাধ্যমত সবকিছু করে থাকেন। জামাইয়ের পছন্দমত পোশাক-পরিচ্ছদ কিনে দেওয়া হয়, তাদের রুচি অনুযায়ী যাবতীয় সব খাবার-দাবারের আয়োজন করা হয়। আর্থিক সামর্থ্যের মধ্যে থেকেই জামাইয়ের জন্য পনেরো-ষোল পদের খাবার তৈরি করে তাদের সামনে পরিবেশন করা হয়। বিভিন্ন জাতের বড় বড় মাছ, নারিকেল-ইলিশ, সর্ষে-ইলিশ, চিংড়ির মালাইকারি, রুইয়ের রেজালা ইত্যাদি খাবার প্রস্তুত করা হয়। সাথে থাকে প্রচুর পরিমাণে জামাই ষষ্ঠী সন্দেশ, রসগোল্লা আর অন্যান্য মিষ্টান্ন।

অন্যদিকে, জামাইও শ্বশুর-শাশুড়িকে বিশেষ উপহার প্রদানের মাধ্যমে সম্মানিত করে থাকেন।

লালমোহন উপজেলা

১. মানত ও সিন্নি

সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর পরিপূর্ণ আস্থা ও নির্ভরতা থাকলেও কোনো কোনো বিষয়ে সফলতা অর্জন বা সঙ্কট থেকে পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে তাঁর সন্তুষ্টি সাধন ও বিশেষ অনুগ্রহ লাভের আশায় এ অঞ্চলের হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের অনেক মানুষ অতিরিক্ত এবাদত, পূজা, সদকা ও বলিদানের জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়ে থাকেন। এটাই মানত করা। মা-বাবা, ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি বা ঘনিষ্ঠ কোনো আত্মীয়-স্বজনের বিশেষ অভিপ্রায় সিদ্ধি ও রোগমুক্তিসহ নিজের সার্বিক কল্যাণ, সুপাত্রে কন্যা দান, মেয়ের বিয়ে ত্বরান্বিত হওয়া, বিশেষ কোনো বৈষয়িক কাজে সাফল্যলাভ, মামলায় জয়লাভ করা, কোনো সংকট থেকে মুক্তি ইত্যাদি কারণে মুসলমানদের মধ্যে অনেকে রোজা রাখা, নফল নামাজ পড়া, কোরআন খতম, নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ে সুফল দিতে পারে এমন কোনো খতম পড়ানো এবং সনাতন ধর্মাবলম্বীরা কালীমন্দিরে মহিষ বা পাঁঠা বলি দেওয়া, বিশেষ কোনো মন্দিরে অষ্টপ্রহর কিংবা দিবামঙ্গল কীর্তনের আয়োজন করা ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের মানত করে থাকেন। সরাসরি সৃষ্টিকর্তা বা দেব-দেবীর অনুগ্রহ লাভ ছাড়াও মৃত ও জীবিত অনেক খ্যাতিমান পীর বা সাধু পুরুষের মাজার, দরগাহ, খানকাহ্, আশ্রম, মন্দিরে নগদ অর্থ দান, শিন্নি দেওয়া ইত্যাদি মানত করা হয়ে থাকে।

এ অঞ্চলে সর্বাধিক শ্রদ্ধাভাজন জৌনপুরের পীরের জন্য এখানকার মুসলিম সম্প্রদায়ের অনেক মুরিদ বা ভক্ত নগদ অর্থ, গরু, খাসি, মুরগি, ক্ষেতের ফসল, গাছের ফল, পুকুরের মাছ ইত্যাদি মানত করে থাকেন। এরপরে চরমোনাইর পীর, শর্ষিনার পীর, আটরশির পীর ও টাঙ্গাইলের পীরের জন্যও মানত করা হয়ে থাকে। এছাড়া বোরহানউদ্দিনের গাজীপীরের দরগাহ, সুফি হাবিবুর রহমান-এর খানকাহ্ ও স্থানীয় অন্যান্য পীর-দরবেশের মাজার ও খানকায় সদকাহ্ প্রদানেরও মানত করা হয়। সনাতন ধর্মানুসারীরা বিভিন্ন কালীমন্দিরে মহিষ ও পাঁঠা বলি এবং বিভিন্ন মন্দিরে কীর্তনের

www.pathagar.com

আয়োজনের জন্য মানত করে থাকেন। মানতকারীরা এটা দৃঢ়ভাবেই বিশ্বাস করেন যে, এসব মানত আদায় করলে তাদের মনোবাসনা পূর্ণ হবে।

২. সদ্যোজাত শিশু ও প্রসূতির নিরাপত্তা

অশুভ শক্তির হাত থেকে সদ্যোজাত সন্তান ও প্রসূতির নিরাপত্তা বিধানের জন্য আঁতুড় ঘর 'বন্ধ' করার একটি আচার কেউ কেউ মেনে চলেন। এজন্য তিনজন খোনকার বা আলেম ঘরের তিন কোণায় দোয়া-দরুদ পড়ে ও আজান দিয়ে তিনটি করে হাততালি দেন এবং অবশিষ্ট কোণটিতে দোয়া পড়ে ফুঁ দেওয়া একটি লোহার গজাল মাটিতে পুঁতে দিয়ে আঁতুড় ঘর বন্ধ করে দেন। লোকসমাজের বিশ্বাস যে, এরপর আর কোনো অশুভ শক্তি যেমন, ভূত, প্রেত ইত্যাদি প্রসূতি ও তার সন্তানের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

এছাড়া সদ্যভূমিষ্ঠ শিশু ও তার মায়ের নিরাপত্তা বিধানের স্বার্থে ঘরের প্রবেশপথে দরজার ওপরে ভেলকির সাথে বেতকাঁটা, বড়ই কাঁটা ঝুলিয়ে রাখা, শিশুর মাথার কাছে লৌহজাত কোনো দ্রব্য রেখে দেওয়া কিংবা ঘরের সামনে গরু বা ছাগলের মাথার খুলি বা হাড় ঝুলিয়ে রাখা হয়।

৩. জামাই ষষ্ঠী

সনাতন ধর্মাবলম্বীরা জ্যৈষ্ঠ মাসের এদিনে তাদের জামাইদের নিয়ে এক মহা আনন্দ-অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। জামাইরাও তাদের শ্যালক-শ্যালিকাদের নিয়ে-আনন্দ উল্লাসের মধ্য দিয়ে দিনটি অতিবাহিত করেন। এদিনে শ্বশুর-শাশুড়িরা বাড়ির জামাইদের এক মহাভোজে আপ্যায়িত ও বিভিন্ন প্রকার উপঢৌকন প্রদান করেন। ভোজন-পর্বে জামাইদের রুচি ও পছন্দ অনুযায়ী সব খাবার পরিবেশন করা হয়। চিতল মাছের কোপ্তা, চিংড়ি মাছের মালাইকারি, সর্ষে ইলিশ, নারিকেল-ইলিশ, ইলিশ মাছ ভাজা, কই মাছের দো-পেঁয়াজা, বড় বড় বাইন মাছ ভুনা ইত্যাদি রান্না করা হয়। এছাড়া ভোজনের শেষ পর্বে থাকে সন্দেশ, রসগোল্লা, ফিরনি, ইত্যাদি। তবে জামাইরা শুধু খেয়েই যান না, তারা তাদের শ্বশুর-শাশুড়িকে যথাযথ সম্মানজনক উপঢৌকনও প্রদান করে থাকেন।

চরফ্যাশন উপজেলা

১. মানত ও শিন্নি

চলমান জীবনের বিভিন্ন রকম বিপদ, সংকট, রোগ-ব্যাধি থেকে পরিত্রাণ লাভ এবং ভবিষ্যতের কোনো বিশেষ বিষয়ে সুফল লাভের উদ্দেশ্যে এখানকার হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের অনেক মানুষই কম বেশি মানত করে থাকেন। মুসলিম সম্প্রদায় আলাহর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য নামাজ, রোজা, কোরআন তেলাওয়াত, দরুদ পাঠ, মসজিদে দান-খয়রাত, শিন্নি ইত্যাদি মানত করে থাকেন অথবা এভাবে মানত করেন যে, আমি এই বিপদ বা এই ব্যাধি থেকে মুক্তি লাভ করলে কিংবা আমার এই চাকরিটা হলে বা আমি এই জমিটা বরাদ্দ পেলে আমি ৩জন, ৫জন, বা ৭জন আলেমকে

www.pathagar.com

খাওয়াবো, এতিমখানায় কয়েকজন এতিমকে খাওয়াবো ইত্যাদি। আবার এমনও মানত করা হয় যে, আমি অমুক পীরকে এই জিনিস দেবো, তার দরবারে শিন্নি দেবো বা অমুক মাজারে ডাল-চাল, আগরবাতি, মোমবাতি দেবো ইত্যাদি। আমাদের অঞ্চলে অধিকাংশ মুসলমান মানতের ক্ষেত্রে জৈনপুরী পীরের প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। অন্যান্য পীর যেমন চরমোনাই, শর্ষিনা ও আটরশির পীরের দরবারের জন্যও মানত করা হয়। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মানতের উদ্দেশ্যও একই রকম। তারা কালীমন্দিরে পূজা দেওয়া, পাঁঠা বা মহিষ বলি দেওয়ারও মানত করে থাকেন। বলি দেওয়ার পর যারা মাংস খেতে অভ্যস্ত তারা প্রসাদ হিসেবে তা গ্রহণ করেন। তবে, আজকাল পাঁঠা বা মহিষ বলি দেওয়ার প্রথা অনেকটাই উঠে গেছে। অনেকে আবার বিভিন্ন মন্দিরে পূজা দেওয়া, দিবামঙ্গল কীর্তন বা অষ্টপ্রহর কীর্তনের মানত করে থাকেন। কীর্তন করার বিভিন্ন দল রয়েছে। প্রয়োজনবোধে তাদের দিয়েই কীর্তন কারানো হয় বা তাতে নিজেরাও অংশগ্রহণ করে থাকেন।

যে যে জিনিস মানত করা হয়ে থাকে, মানতকারীরা সাধারণত উদ্দেশ্য হাসিলের পরই তা আদায় করে থাকেন। অনেকে আবার মানতের সঙ্গে সঙ্গেই আদায়ের প্রক্রিয়া শুরু করে দেন।

মানতকারীরা এটা সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করেন যে, পীর ফকির, দেব-দেবীদের সন্তুষ্ট করতে পারলে তাদের মনোবাসনা অবশ্যই পূর্ণ হবে।

২. আঁতুড় ঘর 'বন্ধ' করা

এ অঞ্চলের ঘর-বাড়ি, এমনকি শরীর 'বন্ধ' করারও রেওয়াজ প্রচলিত। ঘর-বাড়ি 'বন্ধ' করার সাথে আঁতুড় ঘর বন্ধ করার যথেষ্ট সামঞ্জস্য রয়েছে। মহিলাদের সন্তানবতী হওয়ার পর প্রসবের নির্দিষ্ট সীমা ঘনিয়ে এলে আঁতুড় ঘরের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি সম্পন্ন করা হয়। তবে অনেকেই সন্তান প্রসবের আগে আঁতুড়ঘর 'বন্ধ' করার ব্যবস্থা নিয়ে থাকেন। কারণ এ সময় জ্বীন-পরী, ভূত-প্রেতের আনাগোনা হতে থাকে এবং আঞ্চলিক ভাষায় 'ছুঁইত লাগা' (ছোঁয়াছুঁয়িজনিত কুসংস্কার) ইত্যাদি ব্যাপার ঘটতে পারে, যা প্রসূতি ও নবজাতকের জন্য খুবই ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। এজন্যই প্রাথমিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা হিসেবে 'আঁতুড় ঘরটি' অনেকে 'বন্ধ' করিয়ে নেন।

আঁতুড় ঘর 'বন্ধ' করা এবং বাড়ি-ঘর 'বন্ধ' করার পদ্ধতি একই রকম। তিনজন আলেম বা খোনকার আঁতুড় ঘরের তিন কোণায় গিয়ে উচ্চস্বরে আজান দেবেন এবং তিনটি করে হাততালি দেবেন। ঘরের অবশিষ্ট কোণে দোওয়া পড়ে দেওয়া একটি গজাল (বড় পেরেক) মাটির নীচে পুঁতে দেওয়া হয়। এছাড়া আঁতুড় ঘরের সামনে ঘরের বেড়ার ভেলকিতে বেতকাঁটা বা বড়ই গাছের ডাল-পালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয় এবং সদ্যোজাত শিশুর মাথার কাছে সুপারি কাটার 'সরতা' বা লৌহজাত কোনো দ্রব্য রেখে দেওয়া হয়।

৩. সাধ খাওয়ানো বা সাতশা

এটি প্রধানত সনাতন ধর্মাবলম্বীদের আচার। তবে ইদানীং কিছু মুসলমান পরিবারেও এই আচার পালন করা হচ্ছে। অনুষ্ঠানটি মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

প্রথা অনুযায়ী গর্ভধারণের সপ্তম মাসে গর্ভবতীকে এই সাধ খাওয়ানো হয়। এদিন মেয়ের সাধ অনুযায়ী বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য তাকে খাওয়ানো হয়ে থাকে। মুরুব্বিদের মতে সাত মাসে গর্ভস্থ সন্তান পরিপূর্ণতা লাভ করে।

সাতশার দিনে গর্ভবতীকে লাল শাড়ি, লাল বাউজ, লাল পেটিকোট, মাথায় লাল ফিতা ও হাতে লাল চুড়ি পরিয়ে সুন্দর করে সাজানো হয়। চই পিঠা রান্না করে কলাপাতায় সাজিয়ে মেয়ের সামনে রাখা হয়। তারপর সাতজন সধবা নারী সাতবার তাকে এই চই পিঠা খাইয়ে থাকে।

সাতশা উপলক্ষে গর্ভবতীর বাড়ির লোকজন ও তার বান্ধবীসহ উভয় পরিবারের খুবই ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনকে আমন্ত্রণ জানানো হয়ে থাকে। আমন্ত্রিত অতিথিরা উপহারসামগ্রী নিয়ে উপস্থিত হয়ে থাকেন এবং এ উপলক্ষে আয়োজিত ভোজ-অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

৪. জামাই ষষ্ঠী

এদিনে পরিবারের সব জামাইকে আমন্ত্রণ জানিয়ে তাদের পছন্দমত সব খাবার-দাবার তাদের সামনে পরিবেশন করা হয়। এ যেন রীতিমত এক রাজকীয় ভোজ। যার যার সামর্থ্য অনুযায়ীই এ আয়োজন শ্বশুর-শাশুড়িরা করে থাকেন। গরম ভাতের সঙ্গে ঘি, পনেরো-ষোল পদের ব্যঞ্জন, বিভিন্ন জাতের মাছের তরকারি, বিশেষকরে চিংড়ি মাছের মালাইকারি, সর্ষেবাটা ইলিশ, নারিকেল-ইলিশ এবং জামাই ষষ্ঠী সন্দেশসহ বিভিন্ন রকমের খাবার জামাইদের সামনে পরিবেশন করা হয়। শুধু খাইয়ে সন্তুষ্ট হন না, শ্বশুর-শাশুড়িরা, জামাইদেরকে দেওয়া হয় সামর্থ্য অনুযায়ী নানা পোশাক-পরিচ্ছদ। জামাইরাও আবার শ্বশুর-শাশুড়িকে বিশেষ উপহার দিয়ে থাকেন।

মনপুরা উপজেলা

১. মানত, শিন্নি

একজন মানুষ কখন, কার জন্য এবং কিজন্য মানত করেন ? যখন সহজপথে বা স্বাভাবিক উপায়ে কোনো কিছু লাভ বা করার কোনো পথ আর খোলা থাকে না, তখনই একজন মানুষ তার সমস্যাটি কাটিয়ে ওঠার প্রত্যাশায় মানত করে থাকেন। তার মনে এই প্রতীতি যখন বদ্ধমূল হয় যে, তিনি যার জন্য মানত করলেন, তাঁর অপরিসীম দয়া, করুণা বা দোয়ার বরকতে তিনি অবশ্যই সংকট উত্তরণে সক্ষম হবেন। দয়া বা করুণা একমাত্র পরম সৃষ্টিকর্তাই করতে পারেন আর পীর, ফকির বা কোনো বুজুর্গ ব্যক্তি করতে পারেন শুধু দোয়া। এ কারণেই মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ, যারা বিভিন্ন বিপদ-আপদ ও সংকট উত্তরণে একমাত্র আল্লাহতাআলার সাহায্যপ্রার্থী হন, সেক্ষেত্রে তারা নফল নামাজ, নফল রোজা, কোরআন তেলাওয়াত, দরুদ পাঠ ইত্যাদি আদায়ের জন্য মানত করে থাকেন অর্থাৎ আল্লাহতাআলার নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। আর যারা আল্লাহতাআলার অসীম অনুগ্রহের ওপর বিশ্বাস রেখেও আল্লাহতাআলারই প্রিয় ও জীবিত কামেল ও বুজুর্গ ব্যক্তিদের দোয়া প্রার্থী হন, সেক্ষেত্রে তারা তাদের জন্য গরু, ছাগল, মুরগি, কবুতর, বাগানের ফল, ক্ষেতের ফসল, নগদ অর্থ ইত্যাদি মানত করে

www.pathagar.com

থাকেন। আবার কবরে শায়িত আল্লাহতাআলার প্রিয় ও খাস মানুষ, যেমন, হযরত শাহজালাল (র.), হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি, হযরত আবদুল কাদের জিলানী প্রমুখের পবিত্র আত্মার সন্তুষ্টিলাভের অভিপ্রায়ে তাদের মাজারে দান করার জন্যও গরু, ছাগল, মুরগি, কবুতর, চাউল, ডাল, আগরবাতি, মোমবাতি, গোলাপজল ইত্যাদি মানত করা হয়ে থাকে। এটাই হচ্ছে আমাদের এলাকার মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের মানত করার প্রচলিত ধারা। মানত করার প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্যই হচ্ছে, এর ফলে তার বা তাদের যাবতীয় মনোবাসনা পূর্ণ হবে। সেটা হতে পারে বন্ধ্যা দম্পতির সন্তান লাভ, রোগ থেকে মুক্তি, মামলায় জয়লাভ, ছেলেমেয়েদের পরীক্ষা ভাল ফললাভ, কোনো হারানো মানুষ বা দ্রব্য ফিরে পাওয়া, চাকরি প্রাপ্তি, চাষের জন্য বৃষ্টি, কিংবা নদীভাঙন রোধ ইত্যাদি।

অনেক সময় যে ফললাভের জন্য মানত করা হয়ে থাকে, তা পরিপূর্ণ হওয়ার আগেও মানত আদায় করা হয়ে যায়, আবার কখনো ফলাফল প্রাপ্তির পরও আদায় করা হয়। সনাতন ধর্মাবলম্বীরাও একই উদ্দেশ্যে মানত করে থাকেন। তারা এক সময় কালীমন্দিরে জোড়া পাঁঠা বা মহিষ বলি দান মানত করতেন। কিন্তু সাম্প্রতিককালে এই প্রবণতা অনেকটাই হ্রাস পেয়েছে। এখন বলিদানের পরিবর্তে কোনো কোনো মন্দিরে বা বিশেষ কোনো মন্দিরে দিবা মঙ্গল কীর্তন বা অষ্ট প্রহর কীর্তনের জন্য মানত করেন। মুসলমানদের যেমন কোরআন খতম দেওয়ার জন্য মসজিদে বা মসজিদ সংলগ্ন মাদ্রাসায় অনেককে পাওয়া যায়, তেমনি কীর্তন করার জন্যও আছে কীর্তনের দল। উভয় স্থানেই মানত আদায়ের সহায়ক কিছু সম্মানী দেওয়া হয়ে থাকে। মানত আদায়ে অনেক সময় খিচুড়ি কিংবা পায়েস তৈরি করে মাজারে দেওয়া হয়। এসব শিন্নি মাজার তদারককারী ব্যক্তি এবং মাজারের আশেপাশে অবস্থানরত গরিব-দুঃখীদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া হয়।

এ অঞ্চলে প্রধানত জৌনপুরী পীর-এর জন্যই মানত করা হয়ে থাকে। এছাড়াও অন্যান্য পীর, যেমন, শর্ষিনার পীর, চরমোনাইর পীর, আটরশির পীর ও টাঙ্গাইলের পীরসহ অন্যান্য পীর সাহেবদের জন্যও মানত করা হয়ে থাকে।

২. ঘরবাড়ি ও আঁতুড়ঘর বন্ধ করা

সম্পূর্ণ ঘরবাড়ি অথবা শুধু আঁতুড় ঘর অনেকে এ কারণে 'বন্ধ' করার উদ্যোগ নেন যে, বাড়ির বা ঘরের সদস্যরা যাতে কোনো রকম অশুভ আত্মার 'দৃষ্টি' বা 'আসর' অথবা কোনো মহামারির কবলে না পড়ে। এজন্য একজন 'খোনকার' ডেকে তাকে এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়। খোনকার সাহেব সঙ্গে আরো দু'জন সহযোগী নিয়ে নেন এবং তারা তিনজন আঁতুড় ঘর বা বাড়ির তিন কোণায় উচ্চস্বরে আজান দেন এবং তিনটি করে হাততালি দেন। এরপর খোনকার অবশিষ্ট যে কোনটি খালি ছিল সে কোণে গিয়ে একটি দোওয়া পড়ে ফুঁ দেওয়া লোহার বড় গজাল মাটিতে পুঁতে রাখেন অর্থাৎ বাড়ির তিন কোণায় দোওয়া পড়ে ও আজান দিয়ে এবং আরেক কোণে লোহার গজাল পুঁতে অশুভ আত্মার প্রবেশের পথ বন্ধ করে দেওয়া হলো।

www.pathagar.com

লোকসমাজের বিশ্বাস এই যে, এরপর থেকে আঁতুড় ঘর, গর্ভবতী রমণী ও তার গর্ভস্থ সন্তান এবং বাড়ির সব সদস্য-সদস্যা জ্বীন-ভূত-প্রেতের 'কু-দৃষ্টি' বা 'আসর' বা 'ভর' করার হাত থেকে মুক্ত থাকবে।

৩. সাধ খাওয়ানো বা সাতশা

এই আচারটি এখানে প্রধানত সনাতন ধর্মাবলম্বীরাই পালন করে থাকেন। গর্ভের সন্তানের বয়স যখন সাতমাস পূর্ণ হয় তখন গর্ভবতী রমণীর জন্য তার সাধ ও পছন্দ অনুযায়ী খাবার-দাবারের আয়োজন করা হয়। এদিনে তাকে লাল শাড়ি, লাল ব্লাউজ, লাল পেটিকোট, লাল চুলের ফিতা ও লাল চুড়ি পরিয়ে সাজানো হয়। শাশুড়ি তার বউকে অর্থাৎ গর্ভবতী রমণীকে একটু হলুদ দিয়ে এই অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। এরপর চই পিঠা রান্না করে কলাপাতায় করে গর্ভবতীর সামনে রাখা হয়। সাতজন সধবা নারী তাকে এই চইপিঠা সাতবার খাওয়ায়। এরপর শুরু হয় আনুষ্ঠানিক ভোজন-পর্ব। গর্ভবতীর পছন্দ অনুযায়ী রান্না করা সব খাবার একে একে তার সামনে পরিবেশন করা হয়। এই অনুষ্ঠানটি প্রধানত মেয়ের শ্বশুরবাড়িতেই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

৪. জামাই ষষ্ঠী

সনাতন ধর্মাবলম্বীদের একটি আনন্দময় ও স্মরণীয় চমৎকার অনুষ্ঠান। এ দিন অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লাষষ্ঠীতে বাড়ির সব জামাইরা শ্বশুরবাড়িতে আমন্ত্রিত হন এবং তাদের জন্য সাধ্যমত সব খাবারের আয়োজন করা হয়। জামাইদের জন্য রান্না করা হয় পনেরো-ষোল পদের খাবার। বিভিন্ন জাতের বড় বড় মাছ, সর্ষেবাঁটা ইলিশ, নারিকেল-বাটা ইলিশ, রুই-এর রেজালা, চিংড়ির মালাইকারি, চিতল মাছের কোপ্তা— কোনোটাই বাদ যায় না। আর এর সাথে থাকে বিভিন্ন প্রকারের সন্দেশ ও মিষ্টি।

জামাইদের শুধু খাবার খাইয়ে তৃপ্ত হন না শ্বশুর-শাশুড়ি, তারা তাদের অনেক পোশাক-পরিচ্ছদও উপঢৌকন দিয়ে থাকেন। তবে জামাইরাও আবার একতরফা শুধু খেয়েই যান না, তারাও শ্বশুর-শ্বাশুড়িকে নানা উপহার দিয়ে থাকেন।

৫. লৌকিক পূজা—বৃক্ষ পূজা

ভোলা সদর উপজেলা

সত্যনারায়ণের পূজা

সনাতনধর্মে সত্যনারায়ণের কোনো মূর্তিপূজা নেই। এটি একটি প্রতীক পূজা। সনাতন ধর্মাবলম্বীরা মানুষের মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের নিয়ামক দৈবশক্তি হিসেবে সত্যনারায়ণকে পূজা করে থাকে।

ভোলায় ইলিশা কোর্ট-কাছারি বাজারের কাছেই রয়েছে সত্যনারায়ণের মন্দির এবং এখানে সত্যনারায়ণের পূজা করা হয়। ভোলার লক্ষ্মী গোবিন্দের আখড়ায়ও সত্যনারায়ণের পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। নিঃসন্তানের সন্তান লাভসহ বিভিন্ন মনোবাসনা পূরণের জন্য সত্যনরায়ণের পূজা দেওয়া হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

বৃক্ষপূজা : দৌলতখান উপজেলা

উপজেলার চরপাতায় 'সৃষ্টিতলা' সনাতন ধর্মাবলম্বীদের একটি পুণ্যস্থান। এখানে অনেক প্রাচীন একটি সিরিষটি (রেইন ট্রি) বৃক্ষ রয়েছে যার বয়স প্রায় ১৫০ বছর। বহুদূর পর্যন্ত এর ডালপালা বিস্তৃত। জন্মলগ্ন থেকে নাকি এই বৃক্ষের কোনো ডালপালা কাটা হয়নি। সনাতন ধর্মাবলম্বীরা এই বৃক্ষকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করে এবং প্রতি শনি ও মঙ্গলবারে হিন্দু রমণীরা বৃক্ষদেহে সিঁদুর পরিয়ে দেয়। এই 'সৃষ্টিতলায়' সাম্প্রতিককালে কালীমন্দির, হরিমন্দির এবং সরস্বতী মন্দির স্থাপন করা হয়েছে। এখানে দুর্গাপূজা ও সরস্বতী পূজারও আয়োজন করা হয়। হিন্দু নর-নারীরা এখানে অনেক মানত আদায় করে।

এই প্রাচীন বৃক্ষটিকে কেটে ফেলার জন্য ১৯৭১-এ পাকিস্তানবাহিনী ও অন্যান্য সময়ে অনেকে চেষ্টা করে। কিন্তু গ্রামবাসীদের আবেদন-নিবেদন ও প্রতিরোধের মুখে তা সম্ভব হয়নি। পূজা উপলক্ষে এই বৃক্ষতলায় বিশাল মেলাও অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

বৃক্ষপূজা : তজুমুদ্দিন উপজেলা

তজুমুদ্দিন উপজেলার মলংচরা ইউনিয়নের রামরামপুর গ্রামে একটি বিশালাকার কালীবৃক্ষ ছিল। বটবৃক্ষ ও অশ্বত্থ বৃক্ষ মিলিয়ে এই বৃক্ষের জন্ম হয়। গাছের গায়ের বিভিন্ন অংশে কালীদেবীর মুখাকৃতির অনুরূপ অনেকগুলো নকশা দেখা যেত বলে সনাতন ধর্মের লোকজন এই বৃক্ষের নামকরণ করেছিল 'কালীবৃক্ষ'। প্রতিদিন দুপুরবেলা এই বৃক্ষের পূজা করা হতো ও মানত আদায় করা হতো। হিন্দুধর্মের অনুসারী, এমনকি অন্য ধর্মের অনুসারীরাও বিভিন্ন বিপদ, রোগ, মামলা-মোকদ্দমা ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে এই কালী বৃক্ষের কাছে মানত আদায় করতো। চৈত্র সংক্রান্তির দিনে এখানে বিশাল কালীপূজা অনুষ্ঠিত হতো। কিছুদিন পূর্বে তজুমুদ্দিনের অন্যান্য ভাঙন কবলিত এলাকার মতো এই এলাকাও নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে।

তথ্যসূত্র

১. কার্তিক দেবনাথ, পিতা : ননীগোপাল দেবনাথ, মাতা : শান্তি দেবনাথ, বয়স : ৬১ বছর, শিক্ষা : ডি.ইউ.এম.এস., পেশা : ব্যবসা, ঠিকানা : ডাকঘর : মৃজাকালু, উপজেলা : বোরহানউদ্দিন

২. দিলওয়ারা বেগম, পিতা : প্রয়াত দেলওয়ার হোসেন, মাতা : প্রয়াত উম্মে কুলসুম, বয়স : ৪৮ বছর, পেশা : গৃহিণী, ঠিকানা : সদর রোড, ভোলা, ডাকঘর ও উপজেলা : ভোলা

৩. মাহমুদা খাতুন, পিতা : প্রয়াত আবদুল লতিফ, মাতা : প্রয়াত জরিনা খাতুন, বয়স : ৭২ বছর, পেশা : গৃহিণী, ঠিকানা : গ্রাম ও ডাকঘর : বাপ্তা, উপজেলা : ভোলা

৪. মাওলানা এনায়েত হোসাইন, পিতা : প্রয়াত দেলওয়ার হোসেন, মাতা : প্রয়াত উম্মে কুলসুম, শিক্ষা : এম.এ., এম.এম (মোমতাজুল মোহাদ্দেসীন), বয়স : ৪২ বছর, পেশা : শিক্ষকতা, ঠিকানা : সদর রোড, ভোলা, ডাকঘর ও উপজেলা : ভোলা

৫. গৌরাঙ্গচন্দ্র দে, পিতা : প্রয়াত পাঁচুলাল দে, মাতা : প্রয়াত দীপালি রানী দে, শিক্ষা : এস.এস.সি., বয়স : ৪৮ বছর, পেশা : ব্যবসা, ঠিকানা : গ্রাম : পৌরবাপ্তা, ১নং ওয়ার্ড, উপজেলা : ভোলা সদর

www.pathagar.com

৬. হোসেন আহমদ, পিতা : প্রয়াত রফিকুল হক, মাতা : প্রয়াত সিদ্দিকা খাতুন, বয়স : ৫২ বছর, পেশা : চাকরি, ঠিকানা : গ্রাম : বাপ্তা, ডাকঘর ও উপজেলা : ভোলা

৭. প্রশান্তকুমার রায়, পিতা : প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, মাতা : নির্মলা রায়, বয়স : ৪৭ বছর, শিক্ষা : এইচ.এস.সি., পেশা : ব্যবসা, ঠিকানা : গ্রাম : ছদুর চর, ইলিশা, ডাকঘর : ইলিশার হাট, উপজেলা : ভোলা

৮. ফারজানা শরমিন, স্বামী : রুহুল আমিন রুশদ, মাতা : বিলকিস জাহান, শিক্ষা : এম.এ. (ইংরেজি), বয়স : ৩৬ বছর, পেশা : শিক্ষকতা, সদর রোড ভোলা, ডাকঘর ও . উপজেলা : ভোলা

৯. এমএ তাহের, পিতা : প্রয়াত আলহাজ গোলাম রহমান, মাতা : প্রয়াত সাহেরা খাতুন, শিক্ষা : বি.এ., বয়স : ৮০ বছর, পেশা : সাংবাদিকতা, ঠিকানা : গ্রাম : দক্ষিণ সৈয়দপুর, ডাকঘর : সাবেক হাজীপুর মাদ্রাসা, উপজেলা : দৌলতখান

১০. মোহাম্মদ আবদুল্লাহ, পিতা : মোহাম্মদ ইছহাক, মাতা : প্রয়াত সুফিয়া বেগম, শিক্ষা : ফাজিল, বয়স : ৪০ বছর, পেশা : ব্যবসা, ঠিকানা : গ্রাম : ৭ নং ওয়ার্ড দৌলতখান পৌরসভা, ডাকঘর : দৌলতখান, উপজেলা : দৌলতখান

১১. প্রাণগোপাল দেবনাথ, পিতা : ব্রজবাসী দেবনাথ, মাতা : কুঞ্জরানী দেবনাথ, শিক্ষা : বিএ, বয়স : ৯০ বছর, পেশা : শিক্ষকতা (অবসরপ্রাপ্ত), গ্রাম ও ডাকঘর : বাংলাবাজার, উপজেলা : দৌলতখান

১২. শফিকুল মাওলা ফারুক (শ.ম. ফারুক), পিতা : প্রয়াত সিকান্দার আহমদ, মাতা : ফিরোজা বেগম, শিক্ষা : বিএ (অনার্স), এম.এ, বয়স : ৫১ বছর, পেশা : অধ্যাপনা, সাংবাদিকতা, ঠিকানা : গ্রাম : চরখলিফা, ডাকঘর : দিদারুল্লা

১৩. বাসেতুন নাহার, স্বামী : শফিকুল মাওলা ফারুক (শ.ম. ফারুক), শিক্ষা : এমএ, বয়স : ৪০ বছর, পেশা : অধ্যাপনা, সাংবাদিকতা, ঠিকানা : গ্রাম : চরখলিফা, ডাকঘর : দিদারুল্লা, উপজেলা : দৌলতখান

১৪. সুরাইয়া বেগম, স্বামী : এমএ তাহের, বয়স : ৫৫ বছর, পেশা : গৃহিণী, ঠিকানা : গ্রাম : দক্ষিণ সৈয়দপুর, ডাকঘর : সাবেক হাজীপুর মাদ্রাস, উপজেলা : দৌলতখান

১৫. আজিমউদ্দিন লিটন, পিতা : প্রয়াত সালাহ্উদ্দিন খান, মাতা : প্রয়াত অহিদা বেগম, শিক্ষা : বিএ, বয়স : ৩৫ বছর, পেশা : সাংবাদিকতা, চাকুরি, ঠিকানা : গ্রাম : দড়িচাঁদপুর, ডাকঘর : হাট শশীগঞ্জ, উপজেলা : তজুমুদ্দিন

১৬. ছায়া রানী দে, স্বামী : অমৃতলাল দে, শিক্ষা : চতুর্থ শ্রেণি, বয়স : ৬৫ বছর, পেশা : গৃহিণী, ঠিকানা : গ্রাম : ডিমাডুবি, ডাকঘর : দেবীপুর মাদ্রাসা, উপজেলা : তজুমুদ্দিন

১৭. মোশারেফ হোসেন হাওলাদার, পিতা : প্রয়াত আবদুর রাজ্জাক হাওলাদার, মাতা : প্রয়াত সবুরা খাতুন, বয়স : ৬৭ বছর, পেশা : অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ঠিকানা : গ্রাম : পক্ষীয়া, ডাকঘর : বোরহানগঞ্জ, উপজেলা : বোরহানউদ্দিন

১৮. শ্রীমতী শান্তি দেবনাথ, স্বামী : মৃত ননীগোপাল দেবনাথ, বয়স : ৮২ বছর, পেশা : গৃহিণী, গ্রাম : হাসাননগর, ডাকঘর : মৃজাকালু, উপজেলা : বোরহানউদ্দিন

১৯. কানাই দেবনাথ, পিতা : ননীগোপাল দেবনাথ, মাতা : শান্তি দেবনাথ, বয়স : ৫৮ বছর, পেশা : চাকরি, ঠিকানা : গ্রাম : হাসাননগর, ডাকঘর : মৃজাকালু, উপজেলা : বোরহানউদ্দিন

www.pathagar.com

২০. রোকসানা বেগম, পিতা : মোশারেফ হোসেন হাওলাদার, মাতা : আখতার জাহান, শিক্ষা : বিএ, পেশা : গৃহিণী, বয়স : ২৩ বছর, ঠিকানা : গ্রাম : পক্ষীয়া, ডাকঘর : বোরহানগঞ্জ, উপজেলা : বোরহানউদ্দিন

২১. মোঃ অজিউল্লাহ মিয়া, পিতা : প্রয়াত আবদুর রহমান মিয়া, মাতা : প্রয়াত তহুরা খাতুন, বয়স : ৭১ বছর, পেশা : ব্যবসা, ঠিকানা : গ্রাম : ধলিগৌরনগর, ডাকঘর : সিরাজিয়া মাদ্রাসা, উপজেলা : লালমোহন

২২. নাম : সালেহা খাতুন (পারুল), স্বামী : মোঃ অজিউল্লাহ মিয়া, শিক্ষা : বি. এ., বয়স : ৫৭ বছর, পেশা : গৃহিণী, ঠিকানা : গ্রাম : ধলিগৌরনগর, ডাকঘর : সিরাজিয়া মাদ্রাসা, উপজেলা : লালমোহন

২৩ জোৎস্না রাণী দে, স্বামী : মনোরঞ্জন দে, শিক্ষা : এইচএসসি, বয়স : ৫২ বছর, পেশা : গৃহিণী, ঠিকানা : গ্রাম : ধলিগৌরনগর, ডাকঘর : সিরাজিয়া মাদ্রাসা, উপজেলা : লালমোহন

২৪. কাজী মোহাম্মদ রাশেদ, পিতা : প্রয়াত মোহাম্মদ আলী, মাতা : জাকিয়া বেগম, বয়স : ৪০ বছর, পেশা : ব্যবসা, ঠিকানা : দক্ষিণ ফ্যাশন, ডাকঘর ও উপজেলা : চরফ্যাশন

২৫. মোঃ আলমগীর হোসেন, পিতা : মোহাম্মদ নূর হাফেজ মিয়া, মাতা : হাসিনা বেগম, শিক্ষা : বিএ (অনার্স) এমএ, পেশা : শিক্ষকতা, বয়স : ৩৩ বছর, ঠিকানা : গ্রাম : চর ফৈজুদ্দিন, ডাকঘর : হাজীরহাট, উপজেলা : মনপুরা

২৬. ইয়ানুর নাহার রুমা, স্বামী : মোঃ আলমগীর হোসেন, শিক্ষা : বিএ, বয়স : ২৭ বছর, পেশা : গৃহিণী, ঠিকানা : গ্রাম : চরফৈজুদ্দিন, ডাকঘর : হাজীরহাট, উপজেলা : মনপুরা

২৭. অধ্যাপক বিধানকৃষ্ণ দাস, পিতা : হরিহর দাস, মাতা : কল্পনা রানী, শিক্ষা : এমএসসি, পেশা : অধ্যাপনা, বয়স : ৪০ বছর, ঠিকানা : গ্রাম : সোনারচর, ডাকঘর : হাজীরহাট, উপজেলা : মনপুরা

২৮. অধ্যাপক প্রতিমা রানী দাস, স্বামী : অধ্যাপক বিধানকৃষ্ণ দাস, শিক্ষা : বিএ (অনার্স), এম.এ, বয়স : ৩৩ বছর, পেশা : অধ্যাপনা, ঠিকানা : গ্রাম : সোনারচর, ডাকঘর : হাজীরহাট, উপজেলা : মনপুরা

২৯. কার্তিক দেবনাথ, পিতা : প্রয়াত বাবু ননীগোপাল দেবনাথ, মাতা : শান্তি দেবনাথ, শিক্ষা : ডি.ইউএম.এম., বয়স : ৬১ বছর, পেশা : ব্যবসা, ঠিকানা : গ্রাম : হাসাননগর, ডাকঘর : মৃজাকালু, উপজেলা : বোরহানউদ্দিন

৩০. প্রাণগোপাল দেবনাথ, পিতা : ব্রজবাসী দেবনাথ, মাতা : কুঞ্জরানী দেবনাথ, শিক্ষা : বি.এ., বয়স : ৯০ বছর, পেশা : শিক্ষকতা (অবসরপ্রাপ্ত), ঠিকানা : গ্রাম ও ডাকঘর : বাংলাবাজার, উপজেলা : দৌলতখান

৩১. শফিকুল মাওলা ফারুক (শ.ম.ফারুক), পিতা : প্রয়াত সিকান্দার আহমদ, মাতা : ফিরোজা বেগম, শিক্ষা : বি.এ (অনার্স), এম.এ., বয়স : ৫১ বছর, পেশা : অধ্যাপনা, সাংবাদিকতা, ঠিকানা : গ্রাম : চরখলিফা, ডাকঘর : দিদারুল্লা, জেলা : দৌলতখান

৩২. বিপ্লবকুমার পাল, পিতা : সুকুমার পাল, মাতা : নন্দরানী পাল, বয়স : ৩৭ বছর, শিক্ষা : এম.কম. (ব্যবস্থাপনা), পেশা : অধ্যাপনা, ঠিকানা : এসএস পাল প্লাজা, কুমার পট্টি, ভোলা, ডাকঘর : ভোলা, উপজেলা : ভোলা সদর

www.pathagar.com

লোকখাদ্য

ভোলা সদর উপজেলা

লোকখাদ্য

ভোজনবিলাসী হিসেবে এ অঞ্চলের মানুষের যথেষ্ট খ্যাতি রয়েছে। নিজেরাই যে শুধু খেতে ভালবাসেন তা নয়, অন্যকেও খাওয়াতে ভালবাসেন, খাইয়ে তৃপ্তিবোধ করেন। যেন-তেন ভাবেই খাইয়ে নয়, সেরা আপ্যায়নের দিকে রয়েছে তাদের সবিশেষ ও সযত্ন দৃষ্টি। এজন্যই শুধু ভোজনবিলাসীই নয়, অতিথিপরায়ণ হিসেবেও এ অঞ্চলের মানুষের সুখ্যাতি অনেক আগে থেকেই।

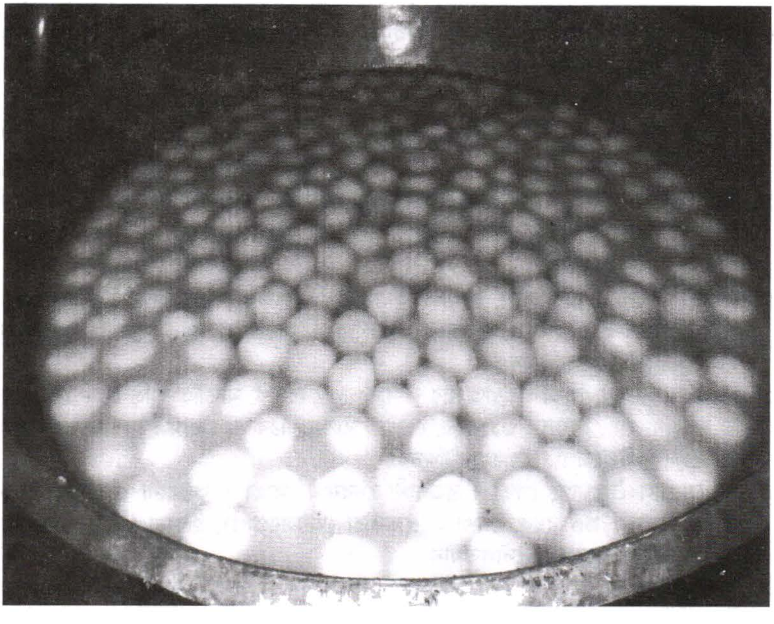

অতিথিদের প্রধানতম উপাদান রসগোল্লা। ভোলার লোক-প্রসিদ্ধ আদি দত্ত মিষ্টান্নভান্ডারের রসগোল্লা।

এ দ্বীপাঞ্চলটির উৎপত্তির শুরু থেকেই দেখা যায়, এখানে প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন জাতের মাছ পাওয়া যেতো। এজন্য নোয়াখালী, সন্দ্বীপ, বরিশাল প্রভৃতি এলাকার কৈবর্ত-দাসেরা এখানে মাছ শিকার করার জন্য আসতো, যারা পরে এখানকার স্থায়ী অধিবাসীতে পরিণত হয়।

www.pathagar.com

পলিমাটির কারণে এখানে উৎপন্ন হতো প্রচুর পরিমাণে ধান, তরি-তরকারি, নারিকেল, সুপারি ও মরিচ ইত্যাদি। এসব সংবাদ ধীরে ধীরে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়লে নিকটবর্তী জেলা নোয়াখালী, পটুয়াখালী, ফরিদপুর, এমনকি ঢাকার মুন্সিগঞ্জ থেকেও অনেকে এখানে এসে বসতি স্থাপন শুরু করেন। বিভিন্ন ধরনের টাটকা মাছ, মুরগি, তরি-তরকারি ইত্যাদির প্রাচুর্য এবং দামেও অত্যন্ত সস্তা হওয়ার কারণে এখানকার সরকারি অফিসগুলিতে যেসব কর্মকর্তা-কর্মচারী বদলি হয়ে আসতেন, তারা সহজে এখান থেকে যেতে চাইতেন না, আরো অধিক দিন থাকার জন্য উচ্চ পর্যায়ে দেন-দরবারও করতেন।

এ উপজেলার প্রায় সত্তর-আশিভাগ মানুষই তিন বেলা ভাত খেয়ে থাকেন। গ্রামাঞ্চলের কৃষিজীবী ও অন্যান্য শ্রমজীবী মানুষের দিন শুরু হয় পান্তা কিংবা গরম ভাত দিয়ে। এই ভাতের সাথে থাকতে পারে খেসারি ডাল, শাক, ভর্তা, কাঁচা মরিচ বা পোড়া মরিচ আর পেঁয়াজ। সাথে আরো থাকতে পারে নারিকেল আর খেজুরের ঝোলাগুড়, যা এখানকার সব মানুষেরই একটি অতি প্রিয় খাবার। শতকরা ২০ থেকে ৩০ ভাগ মানুষ চা-মুড়ি, চা-মোয়া, আটার রুটি-সুজির হালুয়া, পরোটা-ভাজি বা সবজি, খিচুড়ি, পাউরুটি-মাখন ইত্যাদি দিয়ে তাদের প্রাতঃকালীন নাস্তা সেরে থাকেন।

ভর্তা এ এলাকার মানুষের খুবই প্রিয়। চুলার আগুনে পোড়া মরিচ দিয়ে আলুর ভর্তা, ছাইত্যান (টাকি) মাছের ভর্তা, ডাল ভর্তা, উশসি (সিম) ভর্তা, বেগুন ভর্তা, মলা মাছের মাথার ভর্তা, ইচা (চিংড়ি) মাছের ভর্তা, আরকি'র (কাঁকরোল) ভর্তা, আনাজি (কাঁচা) কলার ভর্তা, সরিষার ভর্তা, নারিকেলের ভর্তা, কাঁঠালের বীচির ভর্তা ও কাঁচা মরিচের ভর্তা অনেকেরই প্রিয়। এ অঞ্চলে নারিকেলের উৎপাদন প্রচুর বলেই সম্ভবত এর ব্যবহারও বহুবিধ। ছোটো-বড় চিংড়ি থেকে বাইলা ও ইলিশ মাছ এবং কই (চিচিঙ্গা), মাইরা (ডাটা), শাপলা ইত্যাদিতে নারিকেলের ব্যবহারের ফলে এসব তরকারির ঝোল খুবই সুস্বাদু হয়। পোড়া মরিচ দিয়ে কাঁঠালের বীচির ভর্তা ও নারিকেলের ভর্তার তো তুলনা হয় না। আর নারিকেলের পোলাও! এর নাম শুনলে তো এ অঞ্চলের অধিকাংশ ভোজনরসিকের জিভ ভিজে আসে।

নারিকেল পোলাও তৈরির প্রথমেই প্রয়োজনমতো নারিকেল (ঝুনা) আঁচা (মালা) থেকে কোড়ানি দিয়ে কোড়ায়ে (ছাড়িয়ে নিয়ে) পাটায় খুব মিহি করে বেঁটে নিতে হয়। এরপর অল্প করে পানি মিশিয়ে ভালো করে কচলায়ে কচলায়ে রস বের করে নিতে হয়। এটাই নারিকেলের দুধ। এই দুধ চুলায় উঠিয়ে ভাতের চাউল দিয়ে ফুটিয়ে নিতে হয়। এ সময়ে এর সাথে আলাদা কোনো পানি ব্যবহার করা যায় না। প্রস্তুতকৃত এই নারিকেলের দুধের পোলাওর সাথে হাঁসের মাংস তো অমৃত সমান, রসনার পরম তৃপ্তিদায়ক।

শাকের মধ্যে এ অঞ্চলে ঢেঁকির শাক, পাটের শাক (লাল), কলুই শাক, লাউ শাক, পুঁই শাক এলইনচার (হেলেঞ্চা) শাক, গিমা শাক, মূলা শাক, লালশাক খুবই প্রিয়। খেসারি ডাল দিয়ে পাটের শাক রান্না কিংবা ছোট চিংড়ি দিয়ে লাল শাক রান্না এ অঞ্চলের মানুষ বড় তৃপ্তির সাথে খেয়ে থাকে। ভাতের সাথে ডালের বড়া, আদামুনকুনি

www.pathagar.com

(থানকুনি) পাতার বড়া, ছোট চিংড়ির (মাথা ফেলে দিয়ে) বড়া ও গন্ধবাঁদালি পাতার বড়া প্রায় সব শ্রেণির মানুষ পছন্দ করে। ছোট চিংড়ির মাথা ফেলে দিয়ে পরিমাণ মতো মশুরি ডাল ও জিরা একত্রে পাটায় পিষতে হয়। তারপর পেঁয়াজ কুচি ও কাঁচা মরিচ কেটে গোল গোল করে তেলে ভাজলে চিংড়ির বড়া প্রস্তুত হয়ে যায়। গন্ধবাঁদালী ও আদামুনকুনি (থানকুনি) পাতার বড়াও ডাল বাটা ও পেঁয়াজ কুচি দিয়ে মাখিয়ে তেলে ভেজে তৈরি করতে হয়। লোকচিকিৎসকদের অভিমত হচ্ছে, গন্ধবাঁদালির পাতার বড়া জন্ডিস আক্রান্ত রোগীর জন্য খুবই উপকারী।

ভোলাবাসীর মাছের তালিকায় ইলিশ এখনও সর্বাধিক প্রিয়। ভাজা ইলিশ, সর্ষে ইলিশ, নারিকেল ইলিশ, ইলিশের কোর্মা, লবণ ইলিশ, বিভিন্ন ধরনের তরকারির সাথে ঝোল ইলিশ—ইত্যাদি বিভিন্ন পদ্ধতিতে রান্না করা এই মাছ এ এলাকার মানুষের অত্যধিক প্রিয়। এখানে এখনও প্রচুর তাজা ইলিশ পাওয়া গেলেও কচুর শাক ও সিমের বীচি অথবা পুঁই শাক দিয়ে রান্না করা নোনা ইলিশ স্থানীয় মানুষের খুবই উপাদেয় খাবার হিসেবে বিবেচিত। মাছের তালিকায় এরপরে আছে শিং-মাগুর, হৈল (শোল) খোসরোল (স্থানীয় ভাষায় কেউ কেউ 'খোরল'ও বলে থাকেন), হোয়াইল্যা (ফলি), নদীর পাঙ্গাস, বোয়াল, বাডা (বাটা), বোল পোয়া, চেউয়া, নদীর পোয়া, রিটা, কাইক্কা, হাইড্ডারা, বাইন, ছাইত্যান (টাকি) ছুর্‌রা (তপসে) কোড়াল ও রুই-কাতলা। শিং-মাগুরের সাথে নতুন আলু কিংবা সিম হলে তা খুবই সুস্বাদু। প্রসূতিদের জন্য শিং-মাগুর ও হোয়াইল্যা (ফলি) মাছের ঝোল খুবই উপকারী। এতে সদ্যোজাত শিশু মায়ের বুক থেকে প্রচুর দুধ পায়। অন্যদিকে, হৈল (শোল), বোয়াল, মিরকা (মৃগেল), পুঁটি মাছ খেতে পোয়াতিকে নিষেধ করা হয়। লোকবিশ্বাস আছে যে, এতে আবার মাতৃদুগ্ধ কমে যায় এবং প্রসূতিদের বায়ুচড়া (মাথায় সবসময় তাপ অনুভূত হওয়া ও মাথা ঘোরা) রোগ হয়। এছাড়া অন্যান্য মাছও কম-বেশি এ অঞ্চলের মানুষের প্রিয়। চিতল ও হোয়াইল্যা (ফলি) মাছের কোপ্তা, চিংড়ির দো-পেঁয়াজা ও রুই বা কাতলা মাছের রেজালাও ভোজনরসিক ভোলার মানুষের কাছে সমান প্রিয়।

তাজা মাছ সহজলভ্য হলেও শুঁটকিও এ-অঞ্চলের মানুষের খুব প্রিয়। অনেকে বাড়িতেই শুঁটকি তৈরি করেন। এই শুঁটকির মধ্যে গইন্যা মাছের শুঁটকি, চ্যাপা শুঁটকি, লইট্যা শুঁটকিতে তারা অধিক তৃপ্তি বোধ করেন।

এ অঞ্চলের রান্না-বান্নায় মরিচের ব্যবহার স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বেশি। শহুরে ও শিক্ষিত, স্বাস্থ্যসচেতন সমাজে মরিচের ব্যবহার অতোটা বেশি না হলেও শ্রমজীবী মানুষ একটু ঝালই পছন্দ করে থাকেন। ঝালটা একটু কড়া না হলে তাদের কাছে তরকারি, বিশেষকরে মাংসের তরকারি বিশেষ সুস্বাদু লাগে না। একসময় গ্রামের শ্রমজীবী, বিশেষকরে স্বল্প আয়ের মানুষ খেসারি ডালে ভীষণ অভ্যস্ত ছিল, তবে এর ক্ষতিকর প্রভাবের কারণে এই ডালের ব্যবহার বর্তমানে কমে গেছে।

মোটামুটি একটু সচ্ছল পরিবারের যারা ভোজনবিলাসী তারা মেঝেতে পাটি পেতে বসে সামান্য লবণ ও ঘি মেখে গরম ভাত খেতে খুবই পছন্দ করেন। তারা এই ধরনের খাদ্য দিয়েই খাবারের সূচনা করেন। আহারের শেষ পর্যায়ে থাকে খেজুরের ঝোলাগুড়

www.pathagar.com

দিয়ে নারিকেল-ভাত, দুধ-ভাত, কলা দিয়ে দুধ-ভাত, আম-কাঁঠালের রস দিয়ে দুধ-ভাত ইত্যাদির যে-কোনো একটি। আর বিয়ে, জন্মদিন, আকিকা, মুসলমানি বা খতনা প্রভৃতি উৎসব-অনুষ্ঠানে খাবার-দাবারের আয়োজন করা হলে 'মইষা দই' (মহিষের কাঁচাদুধের তৈরি দই) তো খাবারের একটি আবশ্যিক ধরন। কোনো বড় ধরনের খাবার-দাবারের আয়োজন করা হবে কিন্তু তালিকায় 'মইষা কাঁচা দই' থাকবে না এটা অকল্পনীয়। পোলাও-কোর্মা-বিরিয়ানি যা দিয়েই আপ্যায়ন করা হোক না কেন, দই না হলে সব আয়োজন পণ্ড হয়ে যায়, চরম অতৃপ্তি নিয়ে মেহমানরা বাড়ি ফেরেন, মেজবানের প্রতি অসন্তুষ্ট হন, বিষোদগারও করে থাকেন কখনো কখনো।

এখানে আরো কয়েকটি জনপ্রিয় ও ঐতিহ্যবাহী খাবার ও পিঠা-পুলির উল্লেখ করা হলো :

কাজীর শিন্নি (শিরনি)

এই শিরনি তৈরিতে প্রথমে রান্নাঘরের মাটির চুলার পেছনে কাছাকাছি দূরত্বে গর্ত করে সেখানে একটি মাঝারি আকারের বা ছোট হাঁড়ি গলা পর্যন্ত ঢুকিয়ে রাখা হয়। প্রতিদিন ভাত রান্নার সময় ধোয়া চাউল থেকে ২০০ থেকে ২৫০ গ্রাম চাউল মাটির হাঁড়িতে রাখতে হয়। এভাবে ক্রমাগত ৬দিন রাখতে হয়। ৭ম দিনে ঐ চাউল একটু হলুদ, রসুন এবং পেঁয়াজ দিয়ে রান্না করতে হবে। এটা খেতে একটু টক লাগলেও খুবই সুস্বাদু ও ব্যতিক্রমধর্মী শিরনি হিসেবে অনেকের কাছেই প্রিয়।

আলবা চাউল বা আতপ চাউলের শিন্নি

এই শিরনি আতপ চাল ও পরিমাণ মতো পানি, নারিকেল ও প্রয়োজন মতো লবণ মিশিয়ে রান্না করা হয়। চাউল ফোটা শেষ হয়ে গেলে ঘুঁটনি দিয়ে ভালো করে ঘুঁটে দিতে হয়।

আলবান

বাংলার গ্রামাঞ্চলে এটি একটি খুবই উপাদেয় শিন্নি বা শিরনি। যাদের উন্নতমানের ফিরনি-পায়েস খাওয়ার বা খাওয়ানোর সামর্থ্য কম, তাঁরা এটি তৈরি করে থাকে। আবার সামর্থ্যবানরাও এটি সখ করে রান্না করেন। চালের গুঁড়া, আটা বা ময়দার সাথে পানি ও গুড় মিশিয়ে এই 'আলবান' রান্না করা হয়। নারিকেল দিলে আরো সুস্বাদু হয়। এটা আটা বা চালের রুটি দিয়েও খাওয়া যেতে পারে।

হোগলের গুঁড়ির পায়েস

এর প্রধান উপকরণ হোগলা গাছের (যা দিয়ে হোগলার বিছানা তৈরি করা হয়) ফুলের রেণু, যাকে আঞ্চলিক ভাষায় বলা হয় 'গুঁড়ি'। বর্ষাকালে এই গাছে ফুল ফোটে। এই ফুলের রেণু সংগ্রহ করে (বর্ষাকালে স্থানীয় হাটে কিনতে পাওয়া যায়) প্রথমে রোদে শুকিয়ে নিতে হয়। এরপর পরিমাণ মতো দুধ, চিনি ও নারিকেল মিশিয়ে লাকড়ির তপ্ত কয়লার ওপর পাত্রটি রেখে দেওয়া হয়। কয়লার তাপে মিশ্রিত উপকরণগুলো যখন শুকিয়ে আসে তখনই এটি খাওয়ার উপযোগী হয়।

www.pathagar.com

রসের সিন্নি

এ অঞ্চলের একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় খাবার। শীতকালে খেজুর গাছের এই রস সংগ্রহ করে ভাত রান্নার চাউল দিয়ে চুলায় জ্বাল দিয়ে এই শিরনি তৈরি করা হয়। এর সাথে প্রয়োজনমতো নারিকেল দিলে খুবই সুস্বাদু হয়। কিন্তু ইটের ভাটায় খেঁজুর গাছ পোড়ানোর ফলে এই ঐতিহ্যবাহী ও সুস্বাদু শিন্নি প্রায় বিলুপ্তির পথে।

কাটা মোয়া

খেজুরের গরম ও তরল গুড়ের সাথে মুড়ি ও সামান্য কালিজিরা মিশিয়ে বাঁশের তৈরি 'টুকরি'তে চেপে চেপে রাখতে হয়। ধীরে ধীরে তা জমে শক্ত হয়ে যায়। এরপর ছুরি বা বটি দিয়ে কেটে কেটে পরিবেশন করা হয়। শীতের সকালে-বিকালে চায়ের সাথে এই মোয়া খুবই উপাদেয়।

পচা পিঠা

এই পিঠা তৈরির প্রথম পর্যায়ে কিছু অসিদ্ধ ধান তিন থেকে চারদিন পানিতে ভিজিয়ে রাখা হয়। এই সময়ে এই ধানগুলো থেকে কাণ্ড বের হয়। এরপর ধানগুলো রোদে শুকিয়ে ঢেঁকিতে বা মেশিনে চাউল বের করে গুঁড়ি করা হয়। চাউলের এই গুঁড়ির সাথে গুড় ও নারিকেল মিশিয়ে সারারাত রেখে দেওয়া হয়। সকালে কলাপাতা একটু চওড়া করে ছিঁড়ে ছিঁড়ে এর মধ্যে ঐ গুড় ও নারিকেল মেশানো গুঁড়ি বসিয়ে দিয়ে ভাঁজ করে ছোট 'তাওয়া' বা কড়াইতে দিয়ে চুলায় সিদ্ধ করতে হয়। আগুনের তাপে সিদ্ধ হয়ে গেলে খাওয়ার উপযোগী হয়।

কলার পিঠা

যে কোনো পাকা কলা, বিশেষত 'আইট্যা কলা' (বীচি কলা) চটকিয়ে বীচি ফেলে দিয়ে চালের গুঁড়া, নারিকেল ও খেজুরের গুড় মিশিয়ে গোলাকৃতির ছোটো ছোটো গোল্লা করে বড়ার মতো তৈরি করে তেলে ভাজা হয়।

ছিট রুটি

আতপ চাল ভিজিয়ে রাখার পর একটু নরম হলে পাটায় মিহি করে বেঁটে পাতলা কাপড়ে ছেঁকে নেওয়া হয়। নীচে যে মিহি গুঁড়ি জমা হবে, তার সাথে পরিমাণ মতো পানি মিশিয়ে নেওয়া হয়। এরপর কলাগাছের এক হাত পরিমাণ ডাটা কেটে নিয়ে ঐ ডাটার মাথায় সামান্য তেল লাগিয়ে সেটা দিয়ে কড়াইয়ের ভেতরটা ভালো করে মুছে নেওয়া হয়। তারপর পানি মিশ্রিত গুঁড়ির ভেতর হাতের আঙুলগুলোর অর্ধেকটা ডুবিয়ে নিয়ে পুরো কড়াইয়ে ছিটিয়ে দেওয়া হয়। এ সময়ে পুরো কড়াই জুড়ে বহু ছিদ্র বিশিষ্ট একটি রুটির মতো তৈরি হয়। তখন চামচ বা খুন্তি দিয়ে ভাঁজ করে নামিয়ে আনা হয়। এরপর চিনি মিশ্রিত দুধের মধ্যে কিছুক্ষণ ডুবিয়ে রেখে পরিবেশন করা হয়।

এছাড়া পুলি পিঠা, মুগ-পাক্কন, পাডি (পাটি) পিঠা, দুই (ভাঁপা) পিঠা, তালের পিঠা, চই পিঠা, চাল ভাজা গুঁড়ার নাড়ু, রসবড়া, পুয়া পিঠা ও চিতই পিঠা (দুধ দিয়ে রান্না করা) ইত্যাদি পিঠাপুলি এ-অঞ্চলের গৃহিণীদের মমতাময়ী হাতের স্পর্শে পিঠাপ্রিয় মানুষের রসনেন্দ্রিয়কে পরিতৃপ্ত করবে।

www.pathagar.com

লোকখাদ্য : দৌলতখান উপজেলা

অতিথিপরায়ণ জাতি হিসেবে বাঙালির সুখ্যাতি বিশ্বের সর্বত্র। আর এই উপজেলার সুখ্যাতি ভোলা জেলা ছাড়িয়ে দেশের অন্যান্য অঞ্চলেও। দৌলতখানের নামকরণের ইতিহাস আমরা ইতোপূর্বে জেনেছি। আর এখানকার মানুষের হৃদয়ের দৌলতখানার বা ঐশ্বর্যভাণ্ডারের সাথে পরিচিত হতে হলে তাদের আতিথ্য গ্রহণ করতে হবে। এ অঞ্চলের মানুষ নিজেরা ভূরিভোজনে যেমন অভ্যস্ত, অপরকেও তেমনি।

এ উপজেলার অধিকাংশ বাসিন্দা মোটামুটি তিন বেলা ভাত খেতে অভ্যস্ত। এক-চতুর্থাংশ মানুষ সকালের নাশতা করেন রুটি-হালুয়া, রুটি-ভাজি, রুটি-রসগোল্লা বা রুটি-মাংস দিয়ে। অনেকে রুটির পরিবর্তে পরোটা খেয়ে থাকেন। শ্রমজীবী মানুষ তো ভাত দিয়েই শুরু করেন তাদের দিনের আহার। পান্তা ভাত অনেকেই গ্রহণ করে থাকেন। অনেকে আবার গরম ভাত খেতে অভ্যস্ত।

পান্তা ভাত হোক আর গরম ভাত হোক, এর সাথে থাকবে যে-কোনো ধরনের ভর্তা। এই ভর্তা, কচি লাউয়ের খোসার ভর্তা বা ভাজি, আলু, সিম, ছাইত্যান (টাকি মাছ), মলা মাছের মাথা, ছোট চিংড়ির মাথা, বেগুন, অথবা হতে পারে কলার থোড়ের ভর্তা, বা কলুই শাকের ভর্তা, নারিকেলের ভর্তা। তবে নারিকেলের ভর্তা খুবই প্রিয় এদের। স্থানীয় গৃহিণীরা একটি ব্যতিক্রমধর্মী ভর্তা তৈরি করে থাকেন। এটি বিলাতি গাবের ভর্তা। প্রথমে পুরো গাবটি আগুনে পুড়িয়ে নিতে হয়। একটু নরম নরম হলে ছালটাকে তুলে গাবের মাংসল অংশটুকু পাটায় বেঁটে নিয়ে ধনিয়া পাতা ও মরিচ মেশালে চমৎকার ও সুস্বাদু ভর্তা হয়। এখানকার গৃহিণীরা রান্না-বান্নায় নারিকেলের ব্যবহারটা একটু বেশি করে থাকেন সম্ভবত। কিছু কিছু মাছ, যেমন, ইলিশ মাছ ও বাইলা মাছ ভুনায় তারা এর সাথে নারিকেল ব্যবহার করে মাছটিকে আরো সুস্বাদু করে তোলেন। গৃহিণীরা নানারকম তরকারির সাথেও নারিকেল মিশিয়ে রান্না করে থাকেন, যেমন, শাপলা, ডাটা, রেখা বা চিচিঙ্গা ইত্যাদি।

পাটের শাক, লাল শাক, মূলা শাক, কলুই শাক, ঢেঁকির শাক ও হেলেঞ্চার শাক এখানে খুবই প্রিয়। তবে আজকাল লাল ঢেঁকির শাক পাওয়া যায় না। এই শাক নারিকেল, আম, সুপারি গাছের গোড়ায় একসময় বেশি পাওয়া যেতো।

মাছের মধ্যে প্রায় সব ধরনের মাছই কম-বেশি এখানকার মানুষের প্রিয়। তবে তালিকায় অগ্রাধিকার পায় ইলিশ, রুই, কই, কাতলা, শিং, মাগুর, নদীর পাঙ্গাশ, লইট্যা শুঁটকি, বোয়াল, পোয়া, বাটা, কই, চুইঙ্গা, মলন্দা, সাদা চেউয়া, মধু পোয়াইয়া ইত্যাদি। গরম ভাতের সঙ্গে ঘি ও সামান্য লবণ মিশিয়ে খেতে এ-অঞ্চলের সচ্ছল মানুষেরা খুবই পছন্দ করেন।

নতুন আউশ চালের ভাতের গরম ফ্যান (মাড়)-এর সাথে একটু ভাত ও সামান্য লবণ মিশিয়ে যে না খেয়েছে তাকে এর অমৃততুল্য স্বাদ বোঝানো যাবে না। শুধু দৌলতখানবাসী কেন, সম্ভবত সারা ভোলাবাসীর কাছেই এটি একটি অতি প্রিয় খাদ্য। ঢাকায় দুষ্প্রাপ্য বলে অনেকে অনেক পয়সা খরচ করে আউসের মৌসুমে এখান থেকে দু-এক সের আউশ চাউল নেওয়ার ব্যবস্থা করে থাকেন। তবে ইদানীং আউশ চালের উৎপাদন একেবারেই কমে গেছে।

www.pathagar.com

ডিম-পোলাও ও নারিকেল-পোলাও এ অঞ্চলের মানুষের অতি প্রিয়। বিশেষকরে ডিম পোলাও দিয়ে আপ্যায়ন করলে অতিথিরা খুবই প্রীত হন। আমের দিনে কাঁচা আম-ডাল-চালের খিচুড়ি এ-এলাকার মানুষের আর একটি অতি প্রিয় খাবার। শীতের দিনে হাঁসের মাংস রান্নার তো বিকল্প হয় না। এই মৌসুমে দু-একদিন অন্তত হাঁসের মাংস রান্না তো চাই-ই।

খাবারের শেষ ধরনটি যদি থাকে নারিকেল-খেজুর গুড় তাহলে খুবই চমৎকার। এছাড়া সর্বশেষ আইটেম হিসেবে দুধ-কলা-ভাতও খুব পছন্দের। জ্যৈষ্ঠ মাসে আম-কাঁঠালের রস দিয়ে দুধ-ভাত খাওয়া তো একটা মহামূল্যবান খাবার হিসেবে বিবেচিত। আর যদি বিশেষ কোনো উপলক্ষে খাবারের আয়োজন করা হয়, যেমন, বিয়ে, জন্মদিন, বিয়েবার্ষিকী ইত্যাদি তাহলে তো মহিষের 'কাঁচা দই' থাকতেই হবে।

আজকাল শিক্ষিত ও স্বাস্থ্যসচেতন মানুষ খুব একটা ঝাল খান না। তবে যারা বিভিন্ন ধরনের কায়িক পরিশ্রম বেশি করে থাকেন, যেমন, মাটি কাটা, ঘর তোলা, সুপারি পারা ইত্যাদি অধিকতর কায়িক শ্রমে নিয়োজিত শ্রমজীবীরা ঝাল একটু বেশিই খেয়ে থাকেন। এরা কাঁচা মরিচ ও পোড়া মরিচ দুটোই ভালবাসেন। তরকারিতেও ঝালের পরিমাণটা এরা একটু বেশিই চান। স্বাস্থ্যসচেতন মানুষ এখন ঝাল হিসেবে শুকনো মরিচের বদলে কাঁচা মরিচকেই বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকেন।

পিঠা-পুলি তৈরিতেও দৌলতখান অঞ্চলের গৃহিণীরা তাদের অতীত ঐতিহ্য বজায় রেখে চলেছেন। এ উপজেলার অধিবাসীদের প্রিয় পিঠাপুলির পছন্দের শীর্ষে রয়েছে, পাটিসাপ্টা, দুই পিটা (ভাপা পিঠা), ছিট রুটি, কলার পিঠা, পুয়া পিঠা ও পুলি পিঠা। এছাড়া পাক্কন পিঠা, চন্দ্রপুলি, রসবড়া, চই পিঠা, সেমাই পিঠা, চিতই পিঠা ও তালের পিঠা তো রয়েছেই। চই পিঠা সম্পর্কে এখানে একটি চমৎকার লোকবিশ্বাস প্রচলিত। সেটি এই যে, শবেবরাতের রাতে যে চই পিঠা না খাবে, মৃত্যুর পরে তাকে কেচ্ছা (কেঁচো) খাওয়ানো হবে।

লোকখাদ্য : তজুমুদ্দিন উপজেলা

এ উপজেলার প্রায় আশিভাগ মানুষই তিন বেলা ভাত খেয়ে থাকেন। শ্রমজীবী মানুষ, যারা ক্ষেতে-খামারে কাজ করেন, তারা পান্তা কিংবা গরম দু'ধরনের ভাত খেয়েই কর্মস্থলে যাত্রা করেন। আর এই ভাতের সাথে খুব বেশি তরি-তরকারি বা মাছের ব্যবস্থা থাকে না। একটি ভর্তা, একটি তরকারি আর ডাল হলেই পেট পুরে ভাত খাওয়া যায়।

সাধারণত শ্রমজীবী বা কৃষিশ্রমিক ছাড়া অন্যান্য যারা সকালে গরম ভাত খেয়ে থাকেন, তাদেরও ভর্তা, ভাজি, মাছ কিংবা মাংসের তরকারি আর শেষে একটু নারিকেল-গুড় বা নারিকেল-কলা খুবই পছন্দ। ভর্তা বিভিন্ন ধরনের হতে পারে; যেমন, কাঁচা মরিচ বা পোড়া মরিচ আর ধনিয়া পাতা দিয়ে আলুর ভর্তা, বরবটির ভর্তা, শুঁটকির ভর্তা, বেগুন ভর্তা, মাসকলাই ডালের ভর্তা, নারিকেলের ভর্তা, সিম ভর্তা, মলন্দা (মলা) মাছের মাথার ভর্তা এ উপজেলার মানুষের খুবই প্রিয়। পান্তা ভাত হোক আর গরম ভাত হোক, তার সাথে নারিকেল ভর্তা হলে খুবই ভালো হয়। তবে ইদানীং

www.pathagar.com

নারিকেল-এ অতিমাত্রায় কোলেস্টরলের উপাদান থাকায় স্বাস্থ্যসচেতন মানুষ একটু কম খেয়ে থাকেন। শাকের মধ্যে কলুই শাক, ঢেঁকির শাক, মুলা শাক, লাল শাক, পাট শাক, পুঁই শাক একই রকম প্রিয়। অনেকে পেট ভালো রাখার জন্য, বিশেষত আমাশয় হলে আদামুনকুনি (থানকুনি) পাতা কুচি কুচি করে কেটে সামান্য পেয়াজ-রসুন-সরিষার তেল মিশিয়ে অন্য কিছু পাতে নেওয়ার আগে প্রথমেই নিয়ে থাকেন। আবার কারো জণ্ডিস হলে গন্ধবাঁদালির পাতা দিয়ে বড়া বানিয়ে ভাতের সাথে খেয়ে থাকেন। কাঁচাকলার ভর্তা তারাই বেশি পছন্দ করেন যারা আমাশয় বা অল্পমাত্রার ডায়রিয়া রোগে সাময়িকভাকে আক্রান্ত হন।

নদীতীরবর্তী এলাকা বলে একসময় এখানে বিভিন্ন জাতের প্রচুর মাছ পাওয়া যেতো। এখনও নদীর তাজা মাছ পাওয়া যায়। এজন্য স্থানীয় অধিবাসীরা মাছের বিশেষকরে বড় মাছের খুবই ভক্ত। সামুদ্রিক কিছু কিছু মাছও রয়েছে যা এখানকার মানুষের খাবারের তালিকায় থাকবেই। তবে মাছের মধ্যে ইলিশের স্থান যে শীর্ষে, তা বলাই বাহুল্য। সর্ষে ইলিশ, নারিকেল-ইলিশ, কাঁচাকলা-ইলিশ এবং ইলিশ মাছ ভাজা এ অঞ্চলের মানুষের সমান প্রিয়। বাড়িতে জামাই, বেয়াই-বেয়াইন কিংবা গুরুত্বপূর্ণ কোনো মেহমান এলে মৌসুম থাকলে বাজার থেকে সামর্থ্য অনুযায়ী বড় দেখে ইলিশ আনা চাই। কচি লাউ দিয়ে চিংড়ি অথবা শোল মাছ রান্না তো তজুমুদ্দিনের কেন, প্রায় সব বাঙালিরই প্রিয়। লাউয়ের খোসার (চামড়ার) ভাজি বা ভর্তা দুটোই সমান জনপ্রিয়। এমনকি লাউয়ের বীচির ভর্তাও খুব মজার। ফলি মাছ বা স্থানীয়ভাবে পরিচিত হোয়াইল্যা মাছ একসময় শুধু প্রসূতিদের জন্যই বাজার থেকে আনা হতো। লোকচিকিৎসকদের অভিমত .এই যে, এই মাছ খেলে প্রসূতিরা তাদের সদ্যোজাত শিশুকে প্রচুর পরিমাণে বুকের দুধ খাওয়াতে সক্ষম হন। অন্যদিকে, এ সময়ে মৃগেল মাছ, শোল, বোয়াল, পুঁটি ইত্যাদি খেতে নিষেধ করা হয়ে থাকে।

ধনী-গরিব নির্বিশেষে 'মইষা' (মহিষ) দইয়ের সাথে একটু খেজুরের গুড় না মিশিয়ে খেলে তো খাওয়াই পরিপূর্ণ হয় না। তবে এটি নিত্যদিনের খাবার নয়। বিশেষ দিন বা উৎসব-অনুষ্ঠান উপলক্ষে খাওয়া হয়ে থাকে। কারণ, এতে যে বিপুল পরিমাণ মাখন থাকে, তা বয়স্ক মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য হিতকর নয়।

নারিকেল-পোলাও এবং ডিম-পোলাও এ-অঞ্চলের মানুষের আর একটি ঐতিহ্যবাহী প্রিয় খাবার। ডিম-পোলাও দিয়ে অতিথিকে আপ্যায়ন করা হলে তারা খুবই প্রীত হন। আর নারিকেলের পোলাও'র সাথে তো হাঁসের মাংস না হলে একেবারেই বিস্বাদে পরিণত হবে সব খাবার। কাঁচা আম-ডাল-চালের খিঁচুড়ি স্থানীয় মানুষের খুবই প্রিয়। জ্যৈষ্ঠ মাসে আম-কাঁঠালের রসের সাথে মিশিয়ে দুধ-ভাত জামাইদের না খাঁওয়ালে চলে না।

সময় এবং বয়সের সাথে সাথে মানুষের খাদ্যাভ্যাসও পাল্টায়। এটা জেলায়, এমনকি সব দেশেই হয়ে থাকে। এখন মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্যসচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং খাদ্যদ্রব্যের দামও বৃদ্ধি পাওয়ায় মানুষের খাদ্যাভ্যাসেও পরিবর্তন এসেছে ব্যাপকভাবে। শিক্ষিত সম্প্রদায় এক্ষেত্রে কিছুটা সচেতন হলেও গ্রামের অনক্ষর, অশিক্ষিত ও অসচেতন শ্রেণি মোটেই সচেতন নন।

www.pathagar.com

এতো গেল তিনবেলা খাবার দাবারের কথা। এছাড়াও বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষে মেয়ে-জামাই, বেয়াই-বেয়াইন কিংবা বিশেষ কোনো অতিথির আগমনে কিংবা নতুন ধানের আগমন উপলক্ষে কিংবা একান্তই নিজেদের রসনা পরিতৃপ্ত করার জন্য নিপুণ হাতে নানান ধরনের পিঠা-পায়েস তৈরি করে থাকেন আমাদের শহর ও গ্রামাঞ্চলের গৃহবধূরা। এ এলাকার কয়েকটি জনপ্রিয় ও ঐতিহ্যবাহী পিঠা-পুলি-পায়েস : আলবান, হোগলের গুঁড়ির পিঠা, রসের শিন্নি, কলার পিঠা, রসবড়া, ছিটরুটি, দুই (ভাপা) পিঠা, পাক্কন পিঠা, চই পিঠা, পুলি পিঠা, পুয়া পিঠা, চিতই পিঠা (দুধ বা রস দিয়ে রান্না করা) ইত্যাদি।

লোকখাদ্য : বোরহানউদ্দিন উপজেলা

এ উপজেলার প্রায় আশি-পঁচাশি ভাগ মানুষ তিন বেলা ভাতে অভ্যস্ত। সকালবেলা সামান্য মুড়ি, মোয়া বা বিস্কুটের সাথে এক কাপ চা খেয়ে বেলা ৯টা সাড়ে ৯টা নাগাদ গরম ভাতের প্লেটে হাত দেন তারা। ছাইত্যান (টাকি) মাছের ভর্তা, কাঁচা কলার ভর্তা, শুঁটকি, নারিকেল বা খেসারির ডালের ভর্তা এ-এলাকার মানুষের খুবই প্রিয়। এছাড়া ধনিয়া পাতা সহযোগে সিম ভর্তা, সরিষার ভর্তা বা মলা মাছের মাথা হাল্কা ভেজে ভর্তা করলেও তাদের কম আগ্রহ থাকে না। শাক-সবজির মধ্যে লাল বা সবুজ ঢেঁকির শাক, লাউশাক, মূলা শাক, লাল শাক ভাজা অন্যান্য এলাকার মতো এ-অঞ্চলের মানুষের কম প্রিয় নয়।

এ উপজেলায় প্রচুর পরিমাণে নারিকেল উৎপন্ন হয়। কাজেই বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন তরকারির সাথে নারিকেলের মিশ্রণ করার সুযোগ গৃহিণীরা হাত ছাড়া করেন না। কই (রেখা) তরকারি, আরকি (কাঁকরোল) তরকারি ও শাপলার সাথে নারিকেল খুবই পছন্দনীয়।

নারিকেলের পোলাও অর্থাৎ নারিকেলের দুধ দিয়ে তৈরি পোলাও এ উপজেলার অধিকাংশ মানুষের অত্যন্ত প্রিয় একটি খাবার। নারিকেল কোড়ানি দিয়ে নারিকেল আঁচড়ায়ে নিয়ে শিল-পাটায় খুব ভাল করে পিষে চিপে চিপে দুধ নেওয়া হয়। এরপর ভাত রান্না করার চাউল দিয়ে পোলাও রান্না করা হয়। নারিকেলের পোলাও'র সাথে হাঁসের মাংস আবশ্যিক। এটা না হলে নারিকেলের পোলাওর স্বাদ পুরোপুরি মেটে না।

ইলিশ মাছ তো এ উপমহাদেশের প্রায় প্রতিটি মানুষেরই প্রিয়। বোরহানউদ্দিন-বাসীর কাছে এই মাছ বোধকরি আরো একটু বেশি। ইলিশের মৌসুমে দাম যতোই হোক, বড় হোক আর ছোট হোক, ইলিশ ভাজা অথবা রান্না করা হোক, পাতে পড়তেই হবে। মৌসুমের বাইরে নোনা ইলিশও ছাড়া যাবে না। কচুর শাক অথবা লতি বা পুঁই শাক দিয়ে নোনা ইলিশ ভুনা করে রান্না যারা না খেয়েছে, তাদের এর স্বাদ বোঝানো মুশকিল। ইলিশের মৌসুমের বাইরে অন্যান্য মাছ তো আছেই। দরিদ্র, অসচ্ছল মানুষ একটু কম দামে যা পায়, তাই কিনে দিন গুজরান করে। ছোট চিংড়ির তরকারি, লাউ-চিংড়ি, চিংড়ি-কুমড়া, ছোট আকারের পাঙ্গাস, বে-আইনিভাবে জেলেদের ধরা জাটকা, সামুদ্রিক কিছু মাছ এসব খেয়েই জীবনধারণ করতে হয়। শুঁটকির মধ্যে চিংড়ির শুঁটকি, রূপচান্দা শুঁটকি, লইট্যা শুঁটকি সবারই ভীষণ প্রিয়।

www.pathagar.com

সব ধরনের মাছ-মাংস দিয়ে খাইয়েও মেহমানদারি অসম্পূর্ণ থেকে যায়, যদি মেহমানের পাতে কাঁচা মইষা দই একটু চিনি অথবা খেজুরের ঝোলা গুড় সহকারে পরিবেশন করা না হয়।

নতুন ধান উঠলে, সেই ধানের চালের গুঁড়া বা শীতের আমেজ একটু অনুভূত হতে শুরু করলেই ঘরে ঘরে পড়ে যায় পিঠা বানানোর ধুম। মা-মেয়ে-বউ সবাই মিলে চালের গুঁড়ি দিয়ে বিভিন্ন রকমের পিঠা-পুলি তৈরিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। 'দুই' পিঠা, যাকে শহরের ভাষায় বলা হয় ভাঁপা পিঠা, এই পিঠা তিন রকমের তৈরি হয়ে থাকে। চালের গুঁড়ির সাথে খেজুরের পাতলা গুড় মিশিয়ে একরকম, চালের গুঁড়ির সাথে খেজুরের গুড় ও নারিকেল একত্র করে মিশিয়ে আর এক রকম, সবশেষে আরেক ধরনের 'দুই' পিঠা তৈরি হয়ে থাকে গুড়ির ঠিক মাঝামাঝি স্থানে একটু গুড় ও নারিকেল বসিয়ে দিয়ে। প্রথম দু ধরনের 'দুই' পিঠা রাতে বানিয়ে রেখে একটু শক্ত হলে সকালে খেজুরের রসে ভিজিয়ে রেখে খেতে ভীষণ সুস্বাদু।

অনেক আগে এবং এখনও রসগোল্লা না খাওয়ালে যেমন অতিথিকে সঠিক সম্মান দেখানো হলো না বলে মনে হয়, ঠিক তেমনি বাড়িতে মেহমান এলে যদি পিঠা খাওয়ানো হয় তাহলে রসবড়া পিঠার পরিবেশন রসগোল্লার মতোই অত্যাবশ্যক।

কাটা সন্দেশ অনেকটা পাক্কন পিঠার মতোই। নারিকেল ভালোভাবে পিষে ময়দার সাথে দুধ ও ডিমসহ মিশিয়ে প্রথমে কাই করতে হয়। পরে পুরু ও ভারী রুটির মতো তৈরি করে সুন্দর সুন্দর নকশা করে কেটে কেটে তেলে ভাজা হয়। এরপর চিনির শিরার মধ্যে কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রেখে খেতে হয়। মুগডাল অথবা খেসারির ডালের পাক্কন পিঠা এ-অঞ্চলের মানুষের আর একটি প্রিয় পিঠা। এছাড়া তাদের পছন্দের অগ্রাধিকারের তালিকায় রয়েছে চিনি মিশ্রিত দুধের মধ্যে ভিজিয়ে ছিট রুটি, পুলি পিঠা, হাতে তৈরি সেমাই (চই পিঠা খুবই সরু করে বানানো হলে তাকে হাতের সেমাই বলা হয়ে থাকে), নারিকেল বা গুড় দিয়ে অথবা খেজুরের রসের মধ্যে ভিজিয়ে চিতল পিঠা, ইত্যাদি।

লোকখাদ্য : লালমোহন উপজেলা

এ এলাকার শতকরা নব্বই ভাগ মানুষ তিন বেলা ভাত খেতেই অভ্যস্ত। অবশিষ্টরা সকালে ভাত না খেয়ে মোটামুটি একটু ভারী নাশতা করেন। আটার রুটি বা পরোটা—সাথে থাকবে সুজির হালুয়া, ডিম ভাজা, ডাল-সবজি অথবা মাংস। অনেকে আবার ভুনা খিচুড়ি দিয়েও শুরু করেন প্রাতঃকালীন আহার। ভোজনের শুরুতে শাক বা ভর্তা বা শাক-ভর্তা দুটোই থাকতে পারে। ডালের ভর্তা, নারিকেলের ভর্তা, চিংড়ি মাছের বড়া, গন্ধবাঁদালির বড়া, আলু ভর্তা, বরবটি ভর্তা, সিম-ধনিয়া পাতা ভর্তা, ধনিয়াপাতা-কাঁচা মরিচ ভর্তা, কাঁচাকলার ভর্তা এবং কলুই শাক, পাট শাক, মুলা শাক, ঢেঁকি শাক, লালশাক, গিমা শাক বেশ পছন্দ করেন লালমোহনের মানুষ। পছন্দনীয় মাছের মধ্যে ভোলা জেলার আর সব উপজেলার অধিবাসীদের মতোই ইলিশ মাছের যে অগ্রাধিকার রয়েছে তা বলাই বাহুল্য। তালিকায় এরপর আসে বোয়াল, বাটা, চেউয়া, নদীর পাঙ্গাশ, শিং, মাগুর, হৈল (শোল), চিতল, বাইন, ইত্যাদি। লবণ-ইলিশ এবং

www.pathagar.com

বিভিন্ন জাতের মাছের শুঁটকিও লালমোহনবাসী যথেষ্ট পছন্দ করেন। এ এলাকারও অনেক মানুষ মাঝে মাঝে বেশ আগ্রহের সাথে আউশ চালের ভাতের মাড় একটু সামান্য লবণ মিশিয়ে খেতে পছন্দ করেন। ইলিশের মাথা, কান, ইত্যাদি দিয়ে পুঁইশাক রান্না, ছোট ছোট চিংড়ি দিয়ে লালশাক রান্না কিংবা খেসারি ডাল-পাটশাক রান্না লালমোহনের গৃহিণীদের হাতে যারা খেয়েছেন তারা সত্যিই ভাগ্যবান।

পোলাওর সাথে ডিম বা মুরগির কোরমা রান্নার তুলনা তো দ্বিতীয়টি পাওয়া ভার। আর শীতকালে নারিকেলের দুধের পোলাও আর হাঁসের মাংস খাওয়ার লোভ সামলাবে এমন মানুষ শুধু রক্তে উচ্চমাত্রার কোলেস্টরেল বহনকারী মানুষ ছাড়া পাওয়া মুশকিল হবে। সব খাবারের শেষে খেজুরের ঝোলাগুড়ের সঙ্গে নারিকেল মিশিয়ে ভাত খাওয়ার স্বাদ তো জিহ্বায় লেগে থাকে অনেক দিন। বড় ধরনের কোনো মেজবান বা বিয়ে উপলক্ষে আয়োজিত খাবার-দাবারে 'মইষা দই' অর্থাৎ মহিষের কাঁচা দধি থাকবে না এমন সংবাদ আগে পেলে চেয়ার-টেবিল খালি পড়ে থাকবে না হয়তো, কিন্তু আমন্ত্রণকারীকে দুর্নামের ভাগীদার হতে হবে।

পিঠাপুলি তৈরিতেও লালমোহনের গৃহিণীরা সমান গুণী। বিভিন্ন রকমের ছাঁচে তৈরি করা পিঠা ছাড়াও মুগ-পাক্কন (ময়দা বা চালের গুঁড়ির সাথে মুগডাল বাঁটা মিশিয়ে), চালের গুঁড়ির সাথে খেজুর গুড় মিশিয়ে 'দুই' (ভাঁপা) পিঠা, পাডি (পাটি) পিঠা, চিতই পিঠা, পুলি পিঠা খেয়ে অনেকেই মুগ্ধ হবেন। শীতের মৌসুমে যদি রসের মধ্যে ভিজানো 'দুই' পিঠা বা খেজুর-গুড় আর আর দুধ দিয়ে চিতই পিঠা রান্না করে পরিবেশন করা যায়, তাহলে তো কোনো সমঝদার মানুষ হাত না লাগিয়ে উঠতে পারবেন না। মোটা চাল আর নারিকেল দিয়ে রসের শিন্নি রান্না করার কথা শুনলে মাঘ মাসের হিমশীতল পানিতে পূর্ণ নদী সাঁতরে আসতেও কেউ দ্বিধা করবেন বলে মনে করার কোনো কারণ নেই।

আলবান

এটি আবহমানকাল ধরে প্রচলিত ব্যতিক্রমধর্মী এক ধরনের ফিরনি বা পায়েস। এই আলবান রান্না করা হয় চালের গুঁড়া, আটা বা ময়দার সাথে পরিমাণ মতো পানি ও গুড় মিশিয়ে। এর সঙ্গে যদি নারিকেল কোড়ায়ে দেওয়া যায় তাহলে খুবই মজা হয়। আটার রুটি বা চালের রুটি দিয়েও এই আলবান খাওয়া যায়। এ অঞ্চলে অনেক সময় মিলাদ-মাহফিল বা কোনো অনুষ্ঠান উপলক্ষে অপেক্ষাকৃত কম সচ্ছল মানুষ রান্না আলবান পরিবেশন করে থাকেন।

লোকখাদ্য : চরফ্যাশন উপজেলা

উপজেলার শতকরা পনেরো থেকে বিশভাগ মানুষ সকালে হালকা নাশতা, যেমন, মুড়ি, মোয়া, বিস্কুট, রুটি ইত্যাদি দিয়ে দিনের প্রথম পর্বের প্রাতঃরাশটা সেরে নেন। কিন্তু গরম ভাত হোক আর পান্তা ভাত হোক—তিন বেলাই ভাত গ্রহণ করে থাকেন শতকরা আশিভাগ অধিবাসী। উপজেলার তিন পাশেই বিশাল জলভাগ দ্বারা বেষ্টিত থাকায় এখানে বিভিন্ন জাতের মাছ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। আর এ কারণেই সকালের

www.pathagar.com

ভাতের সঙ্গে একটু ইলিশ ভাজা বা অন্য মাছ ভাজা এলাকাবাসীর খুবই পছন্দ। অনেকেই ভর্তা দিয়েও শুরু করে থাকেন। অবশ্য সব বেলাতেই ভর্তা বা ভাজি একটি আবশ্যকীয় ধরন গৃহিণীরা তৈরি করে থাকেন। ভর্তার রকমের তো শেষ নেই। তবে যতদূর জানা যায়, চিংড়ি শুঁটকির ভর্তা, শোল-গজার গইন্যা শুঁটকির ভর্তা, বিভিন্ন জাতের সামুদ্রিক মাছের শুঁটকির ভর্তা, মাসকলাইর ডালের ভর্তা, কাঁচাকলা ভর্তা, আদামুনকুনি (থানকুনি) পাতার ভর্তা, বেগুন ভর্তা, আর নারিকেল ভর্তা-চরফ্যাশনবাসীর পছন্দের ভর্তার তালিকায় অগ্রাধিকার পায়।

শাকের তালিকায় রয়েছে ঢেঁকি শাক, গিমা শাক, কলুই শাক, পুঁই শাক, পাটশাক, মুলা শাক, লাল শাক ইত্যাদি। পুঁই শাক দিয়ে ইলিশ মাছের মাথা-কান-ইত্যাদি রান্না, পাটশাক-ডাল রান্না, ছোট চিংড়ি-লাল শাক রান্না তো গৃহিণীদের হাতের স্পর্শে অনন্য হয়ে ওঠে। গন্ধবাঁদালি পাতার বড়া, চিংড়ি-মসুরি ডালের বড়া, কাঁচাকলার বড়া, ইত্যাদি বিশেষ সময়ে প্রাধান্য পায়। ইলিশ তো অধিক প্রিয় মাছ হবেই চরফ্যাশনবাসীর। কারণ অল্প দূরত্বেই সমুদ্রের অবস্থান, যেখানে জেলেদের হাতে ধরা পড়ে প্রচুর ইলিশ। এছাড়া আরো অনেক মাছই আছে পছন্দের তালিকার প্রথম ভাগে—বোয়াল, বাটা, বোলপোয়া, নদী ও সাগরের পোয়া, রিটা, হাইড্ডারা, বাইন, কোড়াল, খোসরোল (কেউ কেউ 'খোরল' বলে থাকেন), নদীর পাঙ্গাস ইত্যাদি। মৌসুম পার হয়ে গেলে নোনা ইলিশও অনেকের প্রিয়। জিওল মাছের মধ্যে মাগুর, শৈল, পুকুরের কই বেশি পছন্দের। এছাড়া বিভিন্ন অনুষ্ঠান বা মেহমানদারিতে রুই, কাতলা তো রান্না করা হবেই।

আর আনুষ্ঠানিক খাবার-দাবার অর্থাৎ বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষে আমন্ত্রণ জানিয়ে খাবারের ব্যবস্থা করা হলে এখানকার ঐতিহ্যবাহী 'মইষা' (মহিষের) দইর উপস্থিতি তো অতি আবশ্যিক।

পিঠাপুলি

চরফ্যাশন অঞ্চলের গৃহিণীরা বিভিন্ন ধরনের সুস্বাদু পিঠা তৈরি করে থাকে। তন্মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পিঠার উল্লেখ করা হলো :

হোগলের গুঁড়ির পিঠা

হোগলা পাতার ফুলের রেনুর সাথে মিহি করে করে বাঁটা বুটডাল ও ডিম খুব ভালো করে মিশিয়ে চুলার আগুনের তাপে কেক-এর মতো তৈরি করে কেটে কেটে পরিবেশন করা হয়। এটি এ-এলাকার একটি বড় পছন্দনীয় পিঠা।

কাজীর শিরনি

চুলার পেছনে গর্ত করে হাঁড়ি বসানো হয়। তাতে প্রতিদিন ভাত খাওয়ার চাউল ধোয়ার পর কিছু পরিমাণ চাউল রেখে দেওয়া হয়। এরপর ৬/৭ দিন একাধারে রেখে দিয়ে শিরনির মতো রান্না করা হয়। এই শিরনি প্রমেহ রোগের ঔষধ হিসেবেও খেতে দেওয়া হয়। প্রতিদিন সকালে এক বাটি করে খেলে এই রোগের উপশম হয়।

www.pathagar.com

এছাড়া পাক্কন পিঠা, পুয়া পিঠা, পুলি পিঠা, চিতই পিঠা, পাড়ি পিঠা, ছিটরুটি, পাটি সাপটা, তালের পিঠা প্রভৃতি পিঠা এ-এলাকার মানুষের খুব প্রিয়।

রসের শিন্নি

শীতকালে খেজুর গাছ কাটার পর তা থেকে নিঃসৃত রস দিয়ে এই শিন্নি বা পায়েস রান্না করা হয়। সাধারণত ভাতের চাউল দিয়েই এটি রান্না করা হয়। চাউল ফোটার পর পরিমাণ মতো নারিকেল (কোরানি দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে) মিশিয়ে দিলে খুবই উপাদেয় শিরনি বা পায়েস প্রস্তুত হয়।

কলার পিঠা

পাকা বাংলা কলা বা বীচিকলার বীচি ছাড়িয়ে নিয়ে চটকিয়ে প্রথমে চালের গুঁড়া ও খেজুরের গুড়ের সাথে ভালো করে মিশিয়ে নিতে হয়। পরে নারিকেল কুড়িয়ে তা এই মিশ্রণের সাথে মিশিয়ে নিয়ে গোল বড়ার মতো করে তেলে ভাজতে হয়।

রস বড়া

দুধের মধ্যে সুজি সিদ্ধ করে নামিয়ে পরিমাণ মতো ডিম ফেটিয়ে সিদ্ধ করা সুজির সাথে ভালো করে মিশিয়ে রসগোল্লার মতো গোল গোল করে তৈরি করে তেলে ভেজে চিনির শিরার মধ্যে ডুবিয়ে রাখতে হয়। কিছুক্ষণ পর খাওয়ার উপযোগী হয়।

ছিট রুটি

মিহি করে চাল বেটে পরিমাণ মতো পানি মিশিয়ে গোলা তৈরি করা হয়। এরপর ঐ গোলার মধ্যে হাতের পাঁচটি আঙুলের অর্ধেক পরিমাণ ডুবিয়ে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে সেই আঙুলে লাগানো গোলা গরম কড়াইতে ছিটিয়ে দিতে হয়। এ রকম কয়েকবার করলে পুরো কড়াইটা যখন গোলায় পরিপূর্ণ হয়ে যায়, তখন এর মাঝে মাঝে ছোট ছোট ছিদ্রের মতো হয়। তারপর পানিটা শুকিয়ে একটু শুকনো শুকনো হয়ে গেলে সেটি ভাঁজ করে কড়াই থেকে নামিয়ে এনে দুধ ও চিনির শিরার মধ্যে কিছুক্ষণ ডুবিয়ে রাখলে খাওয়ার উপযোগী হয়।

চাউল ভাজার নাড়ু

সিদ্ধ চাউল কড়াইতে ভেজে শিলপাটায় গুঁড়ি করে তার সাথে নারিকেল ও গুড় মিশিয়ে জ্বাল দিলে একটু আঠালো হয়। তখন নামিয়ে এনে হাতের মুঠোয় চাপ দিয়ে তৈরি করতে হয়।

দুই পিঠা বা ভাঁপা পিঠা

এটি প্রধানত শীতকালীন পিঠা। নতুন ধানের চাউল ঢেঁকি বা মেশিনে গুঁড়ি করে তার সাথে পাতলা খেজুরের গুড় মিশিয়ে চালুনের ওপর রেখে ভালো করে চেলে নীচের গুঁড়াগুলিকে একটি আলাদা পাত্রে রাখতে হয়। এরপর শুকনো নারিকেলের আঁচার (মালা) অর্ধেকটা ঐ গুঁড়ি দিয়ে ভর্তি করে ছোট শুকনো পাতলা কাপড়ের টুকরার ওপর

www.pathagar.com

রেখে খুব সাবধানে নারিকেলের মালাটা তুলে ফেলতে হবে। এরপর কাপড়ের টুকরাটি দিয়ে আলতোভাবে পিঠাটি বেঁধে দিতে হবে।

অন্যদিকে, চুলার ওপরে মাটির পাতিলের মুখে উল্টো করে বসানো মাটির সরাটির মাঝখানের ছিদ্র দিয়ে যে ভাপ বা বাষ্প বের হয়, পিঠাটি কাপড়সহ আলতোভাবে তার ওপর রেখে দিতে হবে। এভাবে কিছুক্ষণ রেখে দিলে গুঁড়িগুলি যখন পরস্পরের সাথে একেবারে আটকে যাবে, তখন নামিয়ে আনতে হবে। অনেক সময় গুড় মেশানো গুঁড়ির সাথে নারিকেলও মেশানো হয়ে থাকে।

চই পিঠা

এটিও শীতকালীন পিঠা। এটি খুব সরু হলে এটাকে আবার হাতে বানানো সেমাই পিঠাও বলা হয়ে থাকে। এটি প্রথমে চালের গুঁড়ার রুটি তৈরি করার মতো 'কাই' করে নিতে হয়। 'কাই' করার পর একটু পুরু ধাঁচের রুটি তৈরি করে ধারালো ছুরি বা বাঁশের ধারালো ও পাতলা পাত দিয়ে চিকন ও লম্বা করে কেটে কেটে নিতে হয়। তারপর পাটা বা বড় পিঁড়ির ওপর একটি একটি করে চিকন লম্বা টুকরাগুলি রেখে ডান হাতের তালুর নীচের অংশ দিয়ে ঘষে ঘষে ফেলতে হয়। এ পিঠা ছোট হবে কী বড় হবে, চিকন হবে কী মোটা হবে, এটা নির্ভর করে হাতের ঘর্ষণ ও আন্দাজের ওপর। এভাবে খুব ছোট মিহি পিঠাও তৈরি করা যায়, আবার একটু বড় ও মোটাও তৈরি করা যায়। এই পিঠার একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এর দুটো মাথাই সূচালো হয়ে থাকে। এরপর এই পিঠাগুলিকে রোদে ভালো করে শুকোতে হয়। তারপর দুধ-গুড়-নারিকেলের মিশ্রণের মধ্যে পিঠাগুলিকে জ্বাল দিয়ে সিদ্ধ করলে খাওয়ার উপযোগী হয়। এই পিঠাকে 'দুধ-চই' পিঠাও বলা হয়ে থাকে।

আলবান

এটটু কম সচ্ছল বা দরিদ্র শ্রেণি দুধের পায়েস-এর পরিবর্তে আলবান রান্না করে থাকেন। এটি চালের গুঁড়া, ময়দা বা আটার সাথে পানি ও গুড় মিশিয়ে রান্না করা হয়। সাধারণত অসচ্ছল ব্যক্তিরা বিশেষ কোনো অনুষ্ঠান উপলক্ষে দুধ-চিনির পায়েসের পরিবর্তে আলবান দিয়ে অতিথি আপ্যায়ন করে থাকেন। এতে ব্যয় অনেক কম। আলবান আটা বা চালের গুঁড়ার রুটি দিয়েও খাওয়া হয়ে থাকে।

একসময় গ্রামের মসজিদে মিলাদ পরিবেশনের পর দরিদ্র শ্রেণি এই 'আলবান' দিয়ে উপস্থিত অতিথিদের আপ্যায়ন করতেন।

মনপুরা উপজেলা

এ দ্বীপাঞ্চলের সর্বস্তরের মানুষের শতকরা প্রায় নব্বই ভাগই তিনবেলা ভাত খেয়ে থাকেন। বাকি দশ শতাংশ রুটি-পরোটা, মুড়ি, পিঠা, চা ইত্যাদি দিয়ে সকালে নাশতা সেরে নেন। ভাতের সাথে কাঁচা মরিচ দিয়ে আলুভর্তা, বেগুন ভর্তা, শুঁটকি ভর্তা, বেগুন ভাজা, সরিষার ভর্তা, গুঁড়া চিংড়ির ভর্তা, কাঁঠালের বীচির ভর্তা আর নারিকেলের ভর্তা এ-এলাকার মানুষের খুবই প্রিয়। শাক-সবজির মধ্যে কলুই শাক, পাটশাক, মূলা শাক,

www.pathagar.com

ঢেঁকি শাক, হেলেঞ্চার শাক এ-অঞ্চলের মানুষের কাছে খুবই প্রিয়। পাটের শাক-ডাল রান্না অনেকেই তৃপ্তির সাথে খেয়ে থাকেন।

চারদিক জলবেষ্টিত বলে এখানে মাছ পাওয়া যায় প্রচুর। পছন্দের মাছের তালিকায় ইলিশ শীর্ষে থাকলেও চিরিং, লইট্যা, গইন্যা, পোয়া, রিটা, নদীর পাঙ্গাশ, বোয়াল, আইড় এবং শিং, মাগুর, শোল-কইসহ জিওল মাছের স্বাদ গ্রহণ করার লোভ একেবারেই কম নয়। বিশেষকরে শিং-মাগুরের সাথে নতুন ওঠা আলুর তরকারি বড়ই লোভনীয়। তবে শোল, বোয়াল, মিরকা (মৃগেল) ও পুঁটির ক্ষেত্রে পোয়াতি মহিলাদের কিছু বিধি-নিষেধ আছে। লোকচিকিৎসকদের মতে এ-জাতীয় মাছ মাতৃদুগ্ধ হ্রাস করে। এর পরিবর্তে শিং, মাগুর ও হোয়াইল্যা (ফলি) মাছ খেতে পরামর্শ দেওয়া হয়।

তাজা মাছ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গেলেও অনেকেই শুঁটকির প্রতি একটি বিশেষ আকর্ষণ বোধ করেন। লইট্যা শুঁটকি, চ্যাপা শুঁটকি, গইন্যা শুঁটকি, রূপচান্দা শুঁটকি ও নানান জাতের সামুদ্রিক মাছের শুঁটকি এ-জাতীয় মাছের পছন্দের তালিকায় শীর্ষে।

সচ্ছল পরিবারের অনেকেই একসময় গরম ভাতের সাথে সামান্য লবণ ও ঘি মিশিয়ে আহারের সূচনা করলেও এখন তারা স্বাস্থ্য সম্পর্কে আর উদাসীন নন। আহারের শুরুতে আর মাঝখানে যা-ই থাকুক না কেন, শেষের ধরনটা যদি হয় তৃপ্তিদায়ক, তাহলে শুরু আর মাঝখানেরটা ভোলা যায়। আর এজন্য প্রয়োজন খেজুরের ঝোলা গুড়ের সাথে নারিকেল দিয়ে ভাত, দুধ-কলা-ভাত অথবা মধুমাসে আম-কাঁঠালের রসের সাথে দুধ দিয়ে ভাত। বাড়ির জামাইদের তো আম-কাঁঠাল খাওয়ানোর জন্য দাওয়াতই দেওয়া হয়। আর কোনো বিশেষ অনুষ্ঠান যেমন, বিয়ে, বিয়েবার্ষিকী, আকিকা, খতনা ইত্যাদি উপলক্ষে আয়োজিত ভোজনপর্বে 'মইষা' (মহিষের) দই-এর অনুপস্থিতি তো কোনো অবস্থাতেই ক্ষমার যোগ্য নয়।

এ অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী পিঠা-পুলির মধ্যে পুলি পিঠা, মুইড্যা-পিঠা, কলার পিঠা, পচা পিঠা, দুই বা ভাঁপা পিঠা, খেজুরের রস আর দুধ দিয়ে রান্না করা চিতই পিঠা, পাক্কন পিঠা, ছিটরুটি, প্রভৃতি দীর্ঘদিন ধরে মানুষের রসনা তৃপ্ত করে আসছে।

তথ্যসূত্র

১. এমএ তাহের, পিতা : প্রয়াত আলহাজ গোলাম রহমান, মাতা : প্রয়াত সাহেরা খাতুন, শিক্ষা : বি.এ., বয়স : ৮০ বছর, পেশা : সাংবাদিকতা; জেলা প্রতিনিধি, বাংলাদেশ টেলিভিশন, ঠিকানা : খালপাড়, বাংলা স্কুলের পিছনে, ডাকঘর ও উপজেলা : ভোলা

২. হাসিনা বেগম, স্বামী : মীর মোহাম্মদ ইউসুফ, বয়স : ৫০ বছর, পেশা : গৃহিণী, ঠিকানা : গ্রাম : শিবপুর, ডাকঘর : রতনপুর, উপজেলা : ভোলা সদর, নাম : হোসনে আরা মিনু, স্বামী : আ.ফ.ম. মিজানুর রহমান, বয়স : ৪৭ বছর, পেশা : গৃহিণী, ঠিকানা : গ্রাম : বাপ্তা, ডাকঘর : ভোলা, উপজেলা : ভোলা সদর, জেলা : ভোলা

৪. বাসেতুন নাহার, স্বামী : শফিকুল মাওলা ফারুক (শ.ম. ফারুক), শিক্ষা : এমএ, বয়স : ৪০ বছর, পেশা : অধ্যাপনা, ঠিকানা : গ্রাম : চরখলিফা, ডাকঘর : দিদারুল্লা, উপজেলা : দৌলতখান

www.pathagar.com

৫. মোহাম্মদ আবদুল্লাহ, পিতা : মোহাম্মদ ইছহাক, মাতা : প্রয়াত সুফিয়া বেগম, শিক্ষা : ফাজিল, বয়স : ৪০ বছর, পেশা : ব্যবসা, ঠিকানা : গ্রাম : ৭ নং ওয়ার্ড, দৌলতখান পৌরসভা, ডাকঘর : দৌলতখান, উপজেলা : দৌলতখান
৬. শফিকুল মাওলা ফারুক (শ.ম.ফারুক), পিতা : প্রয়াত সিকান্দার আহমদ, মাতা : ফিরোজা বেগম, শিক্ষা : বি.এ. (অনার্স), এম.এ., বয়স : ৫১ বছর, পেশা : অধ্যাপনা, সাংবাদিকতা, গ্রাম : চরখলিফা, ডাকঘর : দিদারুল্লা, উপজেলা : দৌলতখান
৭. আজিমউদ্দিন লিটন, পিতা : প্রয়াত সালাহ্উদ্দিন খান, মাতা : প্রয়াত অহিদা বেগম, শিক্ষা : বিএ, বয়স : ৩৫ বছর, পেশা : সাংবাদিকতা, চাকরি, ঠিকানা : গ্রাম : দড়িচাঁদপুর, ডাকঘর : হাট শশীগঞ্জ, উপজেলা : তজুমুদ্দিন
৮. কার্তিক দেবনাথ, পিতা : ননীগোপাল দেবনাথ, মাতা : শান্তি দেবনাথ, শিক্ষা : ডি.ইউ.এমএস, বয়স : ৬১ বছর, পেশা : ব্যবসা, ঠিকানা : গ্রাম : হাসাননগর, ডাকঘর : মৃজাকালু, উপজেলা : বোরহানউদ্দিন
৯. মোশারেফ হোসেন হাওলাদার, পিতা : প্রয়াত আবদুর রাজ্জাক হাওলাদার, মাতা : প্রয়াত সবুরা খাতুন, পেশা : অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, গ্রাম : পক্ষীয়া, ডাকঘর : বোরহানগঞ্জ, উপজেলা : বোরহানউদ্দিন
১০. তানিয়া, পিতা : মোশারেফ হোসেন হাওলাদার, মাতা : আকতার জাহান, শিক্ষা : বিএ, বয়স : ২১ বছর, পেশা : ছাত্রী, ঠিকানা : গ্রাম : পক্ষীয়া, ডাকঘর : বোরহানগঞ্জ, উপজেলা : বোরহানউদ্দিন
১১. মোঃ অজিউল্লাহ মিয়া, পিতা : প্রয়াত আবদুর রহমান মিয়া মাতা : প্রয়াত তহুরা খাতুন, বয়স : ৭১ বছর, পেশা : ব্যবসা, ঠিকানা : গ্রাম : ধলিগৌরনগর, ডাকঘর : সিরাজিয়া, মাদ্রাসা, উপজেলা : লালমোহন
১২. সালেহা খাতুন (পারুল), স্বামী : মোঃ অজিউল্লাহ মিয়া, শিক্ষা : বি. এ., বয়স : ৫৭ বছর, পেশা : গৃহিণী, ঠিকানা : গ্রাম : ধলিগৌরনগর, ডাকঘর : সিরাজিয়া মাদ্রাসা, উপজেলা : লালমোহন
১৩. কাজী মোহাম্মদ রাশেদ, পিতা : প্রয়াত মোহাম্মদ আলী, মাতা : জাকিয়া বেগম, শিক্ষা : এসএসসি, বয়স : ৪০ বছর, পেশা : ব্যবসা, ঠিকানা : দক্ষিণ ফ্যাশন, ডাকঘর ও উপজেলা : চরফ্যাশন
১৪. মোঃ আলমগীর হোসেন, পিতা : মোহাম্মদ নূর হাফেজ মিয়া, মাতা : হাসিনা বেগম, শিক্ষা : বিএ (অনার্স) এমএ, পেশা : শিক্ষকতা, বয়স : ৩৩ বছর, গ্রাম : চর ফৈজুদ্দিন, ডাকঘর : হাজীরহাট, উপজেলা : মনপুরা
১৫. ইয়ানুর নাহার রুমা, স্বামী : মোঃ আলমগীর হোসেন, শিক্ষা : বিএ, বয়স : ২৭ বছর, পেশা : গৃহিণী, গ্রাম : চরফৈজুদ্দিন, ঠিকানা : ডাকঘর : হাজীরহাট, উপজেলা : মনপুরা
১৬. অধ্যাপক প্রতিমা রানী দাস
স্বামী : অধ্যাপক বিধানকৃষ্ণ দাস, শিক্ষা : বি.এ. (অনার্স), এম.এ., বয়স : ৩৩ বছর, পেশা : অধ্যাপনা, ঠিকানা : গ্রাম : সোনারচর, ডাকঘর : হাজীরহাট, উপজেলা : মনপুরা

www.pathagar.com

লোকনাট্য

ভোলা সদর উপজেলা

যাত্রা

মধ্য বাপ্তা গ্রাম। ভোলা সদর ডাকঘর থেকে প্রায় দুই মাইল দূরে উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। রিক্সায় যেতে সময় লাগে প্রায় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ মিনিট। এ গ্রামের মহাজন বাড়ি একটি অতিপরিচিত পুরনো বাড়ি। চারদিকে সুপারি-নারিকেল-আম-কাঁঠালের বাগানের ছায়ায় ঘেরা বাড়িটির অন্যতম বাসিন্দা রতন মহাজন গত হয়েছেন সে অনেক বছর আগে (জন্ম-মৃত্যুর তারিখ জানা যায়নি)। তিনি প্রধানত সুপারি ও মরিচের মহাজনি ব্যবসা করতেন। ব্যবসায়ী হিসেবে যতোটা নয়, যাত্রাপালার একজন দক্ষ অভিনয় শিল্পী ও পৃষ্ঠপোষকরূপে বাপ্তা গ্রাম ছাড়িয়ে এককালের এই মহকুমা শহরের সর্বত্র তাঁর সুনাম ও পরিচিতি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। মহাজন বাড়ির যাত্রাদল সম্ভবত ভোলা জেলার প্রথম যাত্রা দল। শুধু রতন মহাজনই নন, এ-বাড়িতে মহাদেব মহাজন, বিনোদ মহাজন, খোকনবিহারী মহাজন, ঠাকুরপদ মহাজন ও হরিপদ মহাজনসহ যে প্রায় পনেরো-বিশজন মহাজন ছিলেন, তাঁরা সবাই 'শ্রীগৌরাঙ্গ অপেরা' (ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গের নামানুসারে) দলের অভিনয় শিল্পী ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তবে এর মূল নেতৃত্বে ছিলেন রতন মহাজন। এই দলের সদস্য সংখ্যা ছিল অর্ধশতাধিক। রতন মহাজনের সমসাময়িক অভিনয় শিল্পীদের মধ্যে রাজকুমার, হরিনারায়ণ দে, দীনেশ চক্রবর্তী, সূর্যকান্ত চক্রবর্তী প্রমুখ বেশ খ্যাতিমান ছিলেন। রতন মহাজনের পরবর্তী সময়ে 'শ্রীগৌরাঙ্গ অপেরা' দলের সদস্যদের মধ্যে রমেশচন্দ্র চক্রবর্তী, মন্টুলাল দে ও নিঠুর বিবেকের গান পরিবেশনের মাধ্যমে শ্রোতা-দর্শকদের নির্মল আনন্দ দিতেন। নিঠুর ছিলেন মুক্তিযুদ্ধকালে সংগঠিত সংগীতদলের অন্যতম সক্রিয় সদস্য। স্বাধীনতা লাভর পর তার আর কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি।

'শ্রীগৌরাঙ্গ অপেরা'য় মহাজন বাড়ির সদস্য ছাড়াও ভোলার বিভিন্ন এলাকা থেকে যোগ দিয়েছিলেন আরো বেশ ক'জন যাত্রাভিনয় শিল্পী। এদের মধ্যে খ্যাতিমান ছিলেন দৌলতখানের জ্যোতিলাল দে (পরবর্তীকালে ভোলার আলীনগর হাইস্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক) ও বোরহানউদ্দিন উপজেলার বিলাস রক্ষিত ও কাজল রক্ষিত। মুকুল চন্দ্র দে (সহকারী কৃষি অফিসার পদে কর্মরত) ও মলয়চন্দ্র দে (পুলিশ বিভাগে কর্মরত; প্রধানত জমিদারের চরিত্রে অভিনয় করতেন)। খলনায়কের চরিত্রে রূপদানকারী অরুণচন্দ্র দে ও বীরেন মহাজন এ সময়ে বেশ খ্যাতি অর্জন করেন। ভাস্বরচন্দ্র ঘোষ মহিলার ভূমিকায় অভিনয় করে দর্শক-শ্রোতার প্রচুর হাততালি কুড়োতেন।

সত্তর ও আশির দশকে মহাজন বাড়ির যাত্রাদলের শিল্পীদের মধ্যে আশুতোষ দে মহাজন রাজা কিংবা জমিদারের চরিত্রে অভিনয় করতেন। মাধবচন্দ্র দেও জমিদারের ভূমিকায় অভিনয় করে দর্শকদের বিমোহিত রাখতেন।

www.pathagar.com

পরবর্তীকালে বাবুলচন্দ্র মহাজন, হরিপদ দে মহাজন, শ্রীকালীচরণ দে মহাজন, শ্রীমদনমোহন মহাজন, শ্রী কমলাকান্ত মহাজন, শ্রীকুঞ্জবিহারী মহাজন ও শ্রী মদনমোহন নায়েব শ্রীগৌরাঙ্গ অপেরার যশস্বী অভিনয়শিল্পী ছিলেন। শ্রীকুঞ্জবিহারী মহাজন ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে কমরেড নলিনীদাসের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন।

১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্যদিয়ে স্বাধীনতা অর্জনের পরে থেকেই 'শ্রীগৌরাঙ্গ অপেরা' দলে মহিলা শিল্পীদের আবির্ভাব ঘটে। এদের মধ্যে শ্রীমতী জ্যোৎস্না রানী দে, নিধুরানী দে, কমলারানী দে, সুচিত্রা রানী দে, অঞ্জু রানী দে, খুকু রানী দে, অঞ্জলি, রানী, বীনা, নীহারবালা দে, সাবিত্রী রানী ও রীনা রানী বিভিন্ন সময়ে নানা ব্যতিক্রমধর্মী চরিত্রে অভিনয় করে দর্শক-শ্রোতার হৃদয়ে স্থায়ী আসন করে নিতে সমর্থ হয়েছেন। ক্ষীরোদা সুন্দরী কুটিল রানীর ভূমিকায় অভিনয় করতেন। সম্প্রতি তিনি প্রয়াত হয়েছেন। শিল্পী পূর্ণিমাও প্রয়াত। 'শ্রীগৌরাঙ্গ অপেরা'র অন্যতম আকর্ষণ নৃত্যশিল্পী ইন্দিরা রানী।

অপেরা দলে যারা বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের মাধ্যমে সুরের মূর্ছনা তুলে একটি মোহময় ও আবেগঘন পরিবেশ সৃষ্টি করে থাকেন, তাদের মধ্যে মন্টুলাল দে (ঢোল), সুদর্শন দে (হারমোনিয়াম, সম্প্রতি প্রয়াত), জ্যোতিলাল দে (পিয়ানো), গোপাল দে (জুড়ি) ও মফিজ (বাঁশি)-এর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শ্রীগৌরাঙ্গ অপেরা প্রযোজিত যাত্রাপালাগুলোর মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে নৌকা বিলাস, নিমাই সন্ন্যাসী, মান ভঞ্জন, মহারাজা হরিশ্চন্দ্র, দাতা কর্ণ, ধ্রুব, সাগর ভাসা, সোনাই দিঘি, জোড়াদিঘির চৌধুরী পরিবার, মা যদি মন্দ হয়, সিঁদুর নিও না মুছে, বাবুগুণ্ডা ও সাধক রামপ্রসাদ। এর মধ্যে সর্বাধিক রজনী মঞ্চস্থ হয় 'সাগর ভাষা'। এটি প্রায় ১০০ রজনী অভিনীত হয়।

রতন মহাজনের দেহত্যাগের পর বহুবিধ সামাজিক ও আর্থিক প্রতিকূলতা অতিক্রম করে পরিবারের পরবর্তী সদস্যরা এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য নিজেদের নিয়োজিত রেখেছেন। এঁরা হলেন রতন মহাজনের দুই পুত্র জগতচন্দ্র ও রামরতন এবং এই ভ্রাতৃদ্বয়ের পরবর্তী উত্তরসূরী মদনমোহন নায়েব, হরকুমার, কমলাকান্ত, কালীচরণ, বিজয় গোপাল, মহাদেব দে, হরিপদ দে, আশুতোষ দে মহাজন, ঠাকুরপদ দে, খোকনবিহারী দে, কুঞ্জবিহারী দে, কানুলাল দে, হলধর, মৃণালকান্তি দে, প্রাণগোপাল, যজ্ঞেশ্বর দে, হরলাল দে, নারায়ণচন্দ্র দে, অনিলচন্দ্র দে, বিনোদচন্দ্র দে ও গৌরাঙ্গ।

প্রায় দেড়শত বছর আগে প্রতিষ্ঠিত মহাজন বাড়ির 'শ্রীগৌরাঙ্গ অপেরা' দলের ঐতিহ্যকে অদ্যাবধি যাঁরা শ্রম, নিষ্ঠা ও অভিনয়ের মাধ্যমে সমৃদ্ধ করে চলেছেন, তাঁরা এই মহাজন বাড়িরই কালীচরণ দে, পরীক্ষিত দে, মলয়চন্দ্র দে, নীরবচন্দ্র দে, উত্তমচন্দ্র দে, রিপনচন্দ্র দে, আশুতোষ দে, মনোরঞ্জন দে ওরফে রিন্টু মহাজন, হারাধন মহাজন প্রমুখ। সাথে অন্যান্য পুরুষ ও মহিলা অভিনয়শিল্পী, নৃত্যশিল্পী, বাদ্যযন্ত্রী এবং রূপসজ্জাকার খোকনবিহারী দে ও অরুণ চক্রবর্তী তো রয়েছেনই।

ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বিভিন্ন বয়সের দর্শক-শ্রোতার সর্বাত্মক ও স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন ও সহযোগিতা যাত্রানুষ্ঠানকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তুলতো। এ প্রসঙ্গে মহাজন বাড়ির শ্রীগৌরাঙ্গ অপেরা দলের অন্যতম সদস্য মনোরঞ্জন দে জানান, 'আমাদের শৈশবে

www.pathagar.com

আমরা দেখেছি, বিভিন্ন গ্রামের অনেক বিত্তবান ও সম্ভ্রান্ত মানুষ, কৃষি শ্রমিক, দিনমজুরসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের বিপুল সমাগম ঘটতো যাত্রাপালা দেখার জন্য, এমনকি, যে তিনদিন বা পাঁচদিন পালা চলতো, তাদের কেউ কেউ এ-কয়দিন ঘর-সংসার ত্যাগ করে আমাদের বাড়িতেই থেকে যেতেন, স্নান-আহারাদিও এখানেই সম্পন্ন করতেন। এজন্য অবশ্য বাড়িতে তাদের অনেক গঞ্জনা সইতে হতো। যাত্রাপালা শেষ হলে বাস্তব অর্থেই চোখের জল ফেলতে ফেলতে তারা বিদায় নিতেন।'

প্রতি বছর লক্ষ্মীপূজা ও কালীপূজার পরের দিন থেকে মহাজন বাড়ির বিশাল এলাকাজুড়ে তিনদিন বা পাঁচদিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হতো যাত্রাপালা ও কবিগান। এখন দিন বদলেছে। এ বাড়ির পরিবারের সংখ্যা বেড়েছে, পরিবারের সদস্য সংখ্যা বেড়েছে, গাছ-পালা কমেছে, কৃষিজমির আয়তন কমেছে, বৃদ্ধি পেয়েছে ঘরের সংখ্যা, ছোটো হয়ে এসেছে বাড়ির উঠানের আয়তন। মহাজন বাড়ির উত্তর ও পশ্চিম পাশে বিভিন্ন ফলজ, বনজ ও ফল-ফলাদির বাগান, দক্ষিণ পাশে পুকুর। উঠানের মাঝখানে, লক্ষ্মী মন্দিরের সামনে তৈরি করা হয় যাত্রামঞ্চ। বহু আগে, ঘর থেকে কয়েকটি চৌকি বের করে নিয়ে এসে তৈরি করা হতো মঞ্চের প্ল্যাটফরম। গ্রামের গণ্যমান্যদের বসার জন্য সীমিত সংখ্যক চেয়ার ও টুলের ব্যবস্থা করা হতো। এগুলো আনা হতো বাপ্তা স্কুল (শ্রীদামশীলের মাঠ সংলগ্ন) থেকে। সাধারণ দর্শকদের জন্য বিছিয়ে দেওয়া হতো হোগলা। এখন পরিবর্তন এসেছে। পরিবর্তন এসেছে মঞ্চ তৈরি ও দর্শকদের বসার ব্যবস্থায়। আগে যাত্রাশিল্পীরা নিজেরাই মঞ্চ তৈরি করতেন। এখন তা সম্পাদন করা হয় ডেকোরেটরের সাহায্যে। সেখান থেকেই ভাড়া নেওয়া হয় দর্শকদের বসার জন্য প্লাস্টিকের চেয়ার ইত্যাদি। যাত্রা শুরু হয় 'আসর গান' অর্থাৎ দেশাত্মবোধক গান দিয়ে—'এক নদী রক্ত পেরিয়ে, বাংলার স্বাধীনতা আনলে যাঁরা...।' মাঝে মাঝে দর্শকদের একঘেঁয়েমি কাটানো ও মনোরঞ্জনের জন্য বিভিন্ন ধরনের পাঁচমিশালি গান, চলচ্চিত্রের গান, নজরুলসংগীত, দেশাত্মবোধক গান ইত্যাদির সাথে পরিবেশন করা হয় নৃত্য।

তিন দিন, কখনো কখনো পাঁচ দিনব্যাপী আয়োজিত এই যাত্রানুষ্ঠানের সময় মেলাও অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বিভিন্ন গ্রামের পেশাদার ও অ-পেশাদার ব্যবসায়ীরা এ উপলক্ষে দোকানপাট সাজিয়ে বসে। এ মেলায় দোকানিরা বিভিন্ন ধরনের দেশীয় ঐতিহ্যবাহী খাবার যেমন, জিলিপি, রসগোল্লা, দানাদার, চিনির বাতাসা, গুড়ের বাতাসা, চিনির সন্দেশ, কাঁচাগোল্লা, শানপাপড়ি ইত্যাদি এবং বাচ্চাদের প্রিয় ও আকর্ষণীয় বিভিন্ন খেলনা, বাঁশি, বিভিন্ন আকারের বেলুন, মহিলাদের হাতের রঙ-বেরঙের কাঁচের চুড়ি, চুলের কাটা ও ফিতা, স্নো-পাউডার, নেলপলিশ, লিপস্টিক, কাঁকই (চিরুনি) সুগন্ধী তেল ('বাস তেল' নামে স্থানীয়ভাবে পরিচিত), ইমিটেশন জুয়েলারি, রান্নার কাজে ব্যবহারের জন্য কাঠের তৈরি নানা ধরনের জিনিসপত্র ইত্যাদি বেচা-কেনা হয়ে থাকে। ইদানীং বাচ্চা ও মহিলাদের কিছু কিছু তৈরি পোশাক, তাঁতের শাড়ি ইত্যাদিও বিক্রি হতে দেখা যায়। স্থানীয়ভাবে তৈরি খাদ্যদ্রব্য ছাড়া অন্যান্য দ্রব্যাদিও ঢাকা থেকে আনা হয়।

www.pathagar.com

বোরহানউদ্দিন উপজেলা

মৃজাকালু বাজারে ছিল 'সাউ'দের যাত্রাদল। দুর্গাপূজা উপলক্ষে বাজারের দুর্গা মন্দিরের সামনে বিশাল প্যান্ডেলে মঞ্চায়ন করা হতো বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক যাত্রাপালা।

পালাগান

মাইজা মিয়ার পালাগান

[এটি ভোলার একমাত্র ও নিজস্ব পালাগান। বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যে যতদূর জানা যায়, তাতে এটি সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে, মেঘনার ভাঙনে বিলুপ্ত তৎকালীন দক্ষিণ শাহবাজপুরের (বর্তমান ভোলা) গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসাকেন্দ্র গাজীপুরের একটি খ্যাতনামা ও ঐতিহ্যবাহী পরিবারে সংঘটিত একটি হৃদয়বিদারক ঘটনা অবলম্বনে এক লোককবি এই পালাটি রচনা করেছিলেন। এই লোককবির নাম-ঠিকানা-পরিচয় সম্পর্কেও কিছু জানা যায় না। ভোলার গ্রামে-গঞ্জে বিভিন্ন গায়েনের কণ্ঠে পালাটির কিছু কিছু গান এই কিছুদিন আগে পর্যন্তও গীত হয়ে আসছিল।]

গাজীপুর, কালুপুর, চরবৈরাগী, চর কাঁকড়া ও চরকৃষ্ণপুরসহ ২৭টি মৌজার জমিদার লোচন জমাদারের একমাত্র রূপসী কন্যা আলফেন নেওয়ার বিয়ে হয় বাগেরহাটের আধ্যাত্মিক সাধক হযরত খানজাহান আলীর (র.) বংশধর মৌলভী আজিজউদ্দিন আহমদের সাথে। এই আজিজউদ্দিনের ঘরে তিন পুত্র ও চার কন্যা জন্মগ্রহণ করে। পুত্র সন্তানদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ আজিজুল হক চৌধুরী পিতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ধর্ম-কর্মে বেশি সময় কাটাতেন বলে মেজো আলতাজের রহমান চৌধুরীর ওপর বিশাল জমিদারি দেখাশোনার দায়িত্ব অর্পণ করেন তাদের মা। এই আলতাজের রহমান চৌধুরীর জীবনের বিয়োগান্তক পরিণতি নিয়েই লোককবি রচনা করেন 'মাইজা মিয়ার পালা'। সর্বকনিষ্ঠ অহিদুল্লাহ্ ফজলুল হক চৌধুরী বয়সে 'মাইজা মিয়ার' চেয়ে দশ-বারো বছরের ছোট ছিলেন।

জমিদারি পরিচালনায় যথোপযুক্ত জ্ঞান ও মেধার অভাব এবং অভিভাবকত্বহীনতার কারণে একশ্রেণির গ্রাম্য টাউট ও মোসাহেবের খপ্পরে পড়ে মাইজা মিয়া আলতাজের রহমান চৌধুরী বিভিন্ন ধরনের অনৈতিক ও অসামাজিক কর্মকাণ্ডে আসক্ত হয়ে পড়েন। তবে মাইজা মিয়ার এসব কর্মকাণ্ডের জন্য অনেকে দায়ী করেছেন তার পারিবারিক জীবনে সংঘটিত অন্য কিছু ঘটনাকে। মাইজা মিয়া বেশ কয়েকটি পুত্র ও কন্যা সন্তানের জনক হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করলেও তারা কেউই বেশিদিন তার কোল ও হৃদয়কে জুড়ে রাখতে পারেনি। মায়া-মমতার জাল বিস্তার করার পরপরই তারা একে একে দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়। নিয়মিত বিরতিতে সন্তান হারানোর এ বেদনা মাইজা মিয়া কিছুতেই মন থেকে বিদায় করতে পারছিলেন না। এ সময়ে ক্ষণিকের জন্য হলেও মনোকষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তিনি বন্ধু-বান্ধব ও চাটুকারদের সাথে জুয়া ও মদ্যপানে বিভোর হয়ে থাকতেন যা পরবর্তীকালে বাইজীসহ অন্যান্য অনৈতিক কাজের প্রতিও তাকে আগ্রহী করে তোলে। তবে দুঃস্থ মানুষের বিন্দুমাত্র কল্যাণে সমর্থ হলে তিনি নিজেকে একজন দিগ্বিজয়ী বীর হিসেবে ভাবতেন। এছাড়া সে সময় গ্রামে গ্রামে

www.pathagar.com

যেসব যাত্রা, কবিগান, পালাগান, জারি-সারি গান ইত্যাদির আয়োজন করা হতো, মাইজা মিয়ার অকৃপণ ও উদার আর্থিক সহায়তায় সে-সব অনুষ্ঠানে পূর্ণমাত্রায় প্রাণ সঞ্চার হতো। অন্যদিকে মাইজা মিয়ার ছোটো ভাই অহিদুল হক চৌধুরীও বড় ভাইয়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করে মদ, জুয়া, নারী সম্ভোগ প্রভৃতি অনৈতিক কাজে আসক্ত হয়ে পড়ে। আর তাকে সমর্থন যোগাতে থাকে আরেক দল চাটুকার, যারা তার মোসাহেবি করে প্রচুর আর্থিক সুবিধা আদায় করে নিতো।

মাইজা মিয়া যখন বিয়ে করেন তখন তার বয়স মাত্র বারো-তেরো। বিয়ে করেন পটুয়াখালী জেলার বাউফলের দশমিনার একটি ঐতিহ্যবাহী পরিবারে। তিনি যখন শ্বশুরবাড়িতে চলন্ত যান তখন তার সাথে ছিল একপাল পানসি নৌকা, চার-পাঁচশত অতিথি, দু-সপ্তাহের খাবার-দাবারের জন্য প্রয়োজনীয় গরু, খাসি, মুরগি, চাল, ডাল ইত্যাদি। কিন্তু নদীতীরে পানসি ভেড়াতে গিয়ে নওশা'র দল বাধাপ্রাপ্ত হন। তেতুলিয়ার তীরে আগে থেকেই শ্বশুরবাড়ির লাঠিয়াল বাহিনী ঢাল, সুরকি নিয়ে প্রস্তুত হয়ে ছিল। গাজীপুরের চৌধুরী বাড়ির ছেলে দশমিনার জামাইকে তারা অতো সহজে দশমিনায় প্রবেশ করতে দেবে না। উভয় পক্ষের লাঠিয়াল বাহিনী উপর্যুপরি হুঙ্কার ছাড়ছে মাঝে মাঝে–হুঁশিয়ার, সাবধান! এক পক্ষ অপর পক্ষকে সম্মুখ যুদ্ধে আহ্বান জানাচ্ছে।

এদিকে দশমিনার লাঠিয়াল বাহিনীর প্রতিরোধের মুখে কোনোক্রমেই নদীতীরে না ভিড়তে পেরে মাইজা মিয়ার বরযাত্রী দল এক কৌশল অবলম্বন করলো। তাদের পানসিবহর দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে দু'দিকে চলে যেতে শুরু করলো। দশমিনার লাঠিয়াল বাহিনী এই ঘটনাকে তাদের বিজয় বলে ধারণা করে নদীতীর ত্যাগ করে নিজ নিজ বাড়ি চলে গেল।

ওদিকে মাইজা মিয়ার পানসিবহর একটু দূরে গিয়েই নদীতীরে পানসি ভিড়ায় এবং বরযাত্রীদল গোপন পথে অগ্রসর হয়ে একটি বিকল্প গেট ভেঙে মাইজা মিয়ার শ্বশুরবাড়িতে প্রবেশ করে। বাড়ির নারী সদস্যরা আর বাধা দেওয়ার সাহস না পেলেও তারা তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। মাঠে নামে উভয় পক্ষের কবিয়াল দল। একদল অপর দলকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করতে থাকে। অনবরত কয়েকদিন এভাবে তর্কযুদ্ধ চলার পরও কোনো পক্ষই পরাজয় স্বীকার না করলে একদিন গভীর রাতে সবার চোখকে ধুলো দিয়ে মাইজা মিয়াকে নববধূর কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। দৃষ্টি বিনিময় হয় দুজোড়া চোখের।

নববধূকে নিয়ে নিজ বাড়ি গাজীপুরে ফিরে এসে মাইজা মিয়া তার জমিদারির অন্তর্ভুক্ত সর্বস্তরের মানুষের জন্য যে মেজবানি করেন, তা-ও চলে বেশ কয়েকদিন ধরে। এই অঞ্চলে এতবড় মেজবানি এর আগে কিংবা পরে আর কখনও হয়নি বলে জনশ্রুতি রয়েছে।

দশমিনা থেকে মাইজা মিয়ার স্ত্রীর সাথে দেওয়া হয়েছিল বেশ ক'জন সাথি আর দাসী। এদের একেকজনকে একেক দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়েছিল। সাবান মাখিয়ে শরীরের ময়লা পরিষ্কার করে গোসল করিয়ে দেওয়া, কাপড়-চোপড় পরানো, পায়ে জুতা পরানো, চুল আঁচড়ানো, মুখমণ্ডলে স্নো-পাউডার দিয়ে সাজিয়ে দেওয়া ইত্যাদি

www.pathagar.com

দায়িত্ব পৃথক পৃথকভাবে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল। মাইজা মিয়া প্রতিদিনই এদের খোঁজ-খবর নিয়ে যথোপযুক্ত সম্মানী প্রদান করতেন।

মাইজা মিয়ার ছোট ভাই অহিদুল হক চৌধুরী বিয়ে করেন পাতারহাটের দাদপুরে। কিন্তু বিয়ের পরও তার চরিত্রে মদ, জুয়া, নারী প্রভৃতি অনৈতিক কাজ ক্রমশ প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। অনেক প্রজার সুন্দরী মেয়েদের জড়িয়ে অনেক মুখরোচক ঘটনা ধীরে ধীরে প্রকাশিত হতে থাকে। এদিক থেকে তিনি মেজো ভাইকেও ছাড়িয়ে যেতে থাকেন। মাইজা মিয়া বেশ কয়েকবার তাকে ডেকে তার অনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিলেও তিনি তা আমলে নেননি। এভাবে ধীরে ধীরে দু'ভাইয়ের সম্পর্কের মধ্যে একটা ব্যবধান দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হতে থাকে। এক পর্যায়ে দুজন দুজনের প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়ায়। আর দু'জনকে ঘিরে গড়ে ওঠে দু'দল চাটুকারের দল। চাটুকারদের পরামর্শে মাইজা মিয়ার অত্যন্ত বিশ্বস্ত অনুচরটিকেও ছোটো মিয়া অনেক প্রলোভন দিয়ে হাত করে ফেলে।

মাইজা মিয়াকে ঘায়েল করার সবরকম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর ছোট ভাই অহিদুল হক চৌধুরী মাইজা মিয়ার সবচেয়ে প্রিয় বাইজী সুন্দরী গোলাপজানকে অপহরণ করে এক গোপন ও নির্জন স্থানে বন্দি করে রাখে। যে গোলাপজানের সঙ্গ পাবার জন্য মাইজা মিয়া প্রতিদিন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হওয়ার সাথে সাথেই তার সান্নিধ্যে উপস্থিত হতেন, সমস্ত প্রেরণার উৎস সে গোলাপজানকে হারিয়ে মাইজা মিয়া প্রচণ্ডভাবে ভেঙে পড়েন, বিশাল জমিদারির সবকিছুই তার কাছে নিরর্থক মনে হয়। গোলাপজানকে উদ্ধারের সবরকম প্রচেষ্টা চলতে থাকে, তার সন্ধানদাতাকে উপযুক্ত পুরস্কার প্রদানের ঘোষণাও দেওয়া হয়। কিন্তু গোলাপজানের কোনোরকম সন্ধান পাওয়া যায় না।

একদিন মাইজা মিয়ার দীর্ঘদিনের বিশ্বস্ত বয়োজ্যেষ্ঠ অনুচর মিনাজউদ্দিন এসে তাকে সংবাদ দেয় যে, গোলাপজানের সন্ধান পাওয়া গেছে। ছোটো মিয়ার অনুচরেরা তাকে পাতারহাটের এক নির্জন চরে বন্দি করে রেখেছে। সে সুস্থ আছে কিন্তু তার ওপর দিয়ে অনেক ধকল যাচ্ছে।

সংবাদ পেয়ে মাইজা মিয়া বিচলিত হয়ে উঠলেন। যে করেই হোক গোলাপজানকে মুক্ত করে আনতেই হবে। পরিবারের দীর্ঘকালের বিশ্বস্ত মানুষ, অনেক সংকট-সমস্যার একমাত্র পরামর্শদাতা মিনাজউদ্দিন—তার সাথেই বসে শলা-পরামর্শ করা হলো, কিভাবে গোলাপজানকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা যায়।

মিনাজউদ্দিন মাইজা মিয়ার কাছে গোলাপজান-উদ্ধারের এক পরিকল্পনা পেশ করে। পরিকল্পনা অনুযায়ী ছোট মিয়ার শ্বশুরকুলের এক আত্মীয়কে প্রচুর অর্থের বিনিময়ে নিজেদের দলে ভিড়িয়ে গোলাপজানকে উদ্ধারে তার প্রত্যক্ষ সহায়তা নেওয়া হবে। রাতের অন্ধকারে সে গোলাপজানকে বের করে নিয়ে আসবে। তারপর নৌকায় করে পাতাবুনিয়া খালের এক নির্জন স্থানে অপেক্ষা করবে। সেখান থেকেই মাইজা মিয়া গোলাপজানকে নিজ পানসিতে তুলে বাড়ি প্রত্যাবর্তন করবে। সূর্যোদয়ের আগেই তারা বাড়িতে পৌঁছে যেতে সক্ষম হবে।

মাইজা মিয়া গোলাপজান-উদ্ধার অভিযানে রওনা করবেন। সব প্রস্তুতি প্রায় সম্পন্ন। এমন সময় বাড়ির উঠানে কয়েকটি পালিত মোরগ-মুরগি আর হাঁস পাখা

www.pathagar.com

ঝাপটাতে ঝাপটাতে ছটফট করে মারা গেল। বাড়ির বিড়ালগুলো বারবার তার পথ আগলে রাখার চেষ্টা করলো। আশেপাশের বউ তার এই যাত্রাকে মেনে নিতে পারে না। তারা আড়ালে-আবডালে দাঁড়িয়ে মাইজা মিয়ার এই যাত্রাকে অশুভ যাত্রা হিসেবে চিহ্নিত করে। স্ত্রীর করুণ কান্নাও মাইজা মিয়াকে তার যাত্রার প্রস্তুতি থেকে বিরত রাখতে পারেনি। সব বাধা-নিষেধ উপেক্ষা করে তিনি তার মায়ের কাছে গিয়ে তার প্রকৃত উদ্দেশ্যের কথা গোপন রেখে শিকারে যাবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করে অনুমতি প্রার্থনা করলেন। কিন্তু সে সময়টা শিকার করার জন্য কোনো অনুকূল সময় ছিলো না বলে মা তাকে অনুমতি দেননি। এত বাধা-নিষেধ, অমঙ্গল-সংকেত কিছুই তার যাত্রাপথে বিন্দুমাত্র প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে সক্ষম হলো না। মাইজা মিয়া রওনা হলেন, সঙ্গে নিলেন এই পরিবারের বহুদিনের পুরনো কর্মচারী ও সর্বাধিক বিশ্বস্ত মিনাজউদ্দিনকে। নৌকার মাঝির দায়িত্বও সেই পালন করবে।

ইলিশা নদীর মোহনায় পাতাবুনিয়ার খালের মুখে এক নির্জন স্থানে এসে ভিড়লো মাইজা মিয়ার পানসি। মাইজা মিয়ার ভেতরে চরম অস্থিরতা, চরম উত্তেজনা। একবার তিনি পানসির ভেতরে যান আবার গুলুইয়ের ওপরে এসে দাঁড়ান। এভাবে কতবার যে তিনি ভেতর-বাহির করছেন, তার ইয়ত্তা নেই। মিনাজউদ্দিনকে জিজ্ঞেস করলেন, আর কতদূর, আর কত সময় পরে আসবে গোলাপজানের পানসি? এখনও কি অনেক দূর? অনেক সময় লাগবে?

এক সময়ে মাইজা মিয়া দেখলেন, তার নৌকার কিছুদূর পরেই আরেকটি পানসি তীরে ভেড়ানো রয়েছে। কিন্তু নৌকার ভেতরে স্পষ্ট কিছু লক্ষ্য করা যায় না। শুধু লাল শাড়ি পরা একজন মহিলাকে অস্পষ্টভাবে দেখা যায়। সে একবার মাথায় ঘোমটা দিচ্ছে, বাতাসে ঐ ঘোমটা পড়ে গেলে আবার তুলে দিচ্ছে। ওই মহিলা মাইজা মিয়ার দিকে তাকিয়ে দ্রুত সেখানে যাবার জন্য হাতের ইশারায় ডাকছে। মাইজা মিয়া ভাবলেন, এই মহিলা কোনোমতেই তার গোলাপজান হতে পারে না। তিনি তার অনুচর মিনাজউদ্দিনকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, ওই নৌকায়-ই কি তার গোলাপজান আছে?

মিনাজউদ্দিনের কাছ থেকে যে ভাষায় ও যে কণ্ঠে যে জবাব পাওয়া গেল, তা শুনে মাইজা মিয়া ভীষণভাবে বিচলিত ও আতঙ্কিত হলেন। তিনি অনুভব করলেন, তিনি এক ভয়ানক ষড়যন্ত্রের শিকারে পরিণত হয়ে গেছেন। আর এ-থেকে পরিত্রাণের কোনো উপায় নেই। এই সমূহ বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার কোনো পথই তিনি খুঁজে পাচ্ছিলেন না। মাইজা মিয়া যখন এরূপ একটা ভয়ানক ষড়যন্ত্রের পরিণতির কথা ভেবে আতঙ্কিত হয়ে একবার পানসির পেছনের দিকে আরেকবার সামনের দিকে ছুটোছুটি করছিলেন, ঠিক তখনই পানসির গোপন স্থানে রাখা একটি কিরিচ দিয়ে তাকে উপর্যুপরি আঘাত করে ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত করে যাচ্ছিল দীর্ঘদিনের বিশ্বস্ত অনুচর মিনাজউদ্দিন।

ইতোমধ্যে একটু দূরে যে পানসিটি দেখা যাচ্ছিল সেটিও অনেক কাছে এসে পড়েছে। পানসির ভেতরে দেখা গেল মাইজা মিয়ার সহোদর ছোটো ভাইয়ের মুখ, যে ছোটোভাই অহিদুল হক চৌধুরীকে আদরে-স্নেহে, মায়া-মমতায় কোলে-পিঠে করে বড় করে তুলেছিলেন তিনি। কিছু চাটুকার আর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনের প্ররোচনায় মেজো

www.pathagar.com

ভাইকে সরিয়ে দিয়ে তিনি জমিদারির একচ্ছত্র অধিকারী হতে চেয়েছিলেন, কিন্তু নিজের চোখের সামনেই সহোদর বড় ভাইয়ের এমন করুণ ও মর্মান্তিক পরিণতি তিনি দেখবেন, এমনটা ভাবতেও পারেননি। কিরিচ দিয়ে আপন ভাইকে উপর্যুপরি আঘাত আর ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুনোর সেই ভয়াবহ দৃশ্য তাকে অপ্রকৃতিস্থ করে ফেলছিল। এক পর্যায়ে তিনি মূর্চ্ছা গিয়ে পানসির ওপর পড়ে যান। মিনাজউদ্দিন তখনও মাইজা মিয়াকে ক্রমাগত আঘাত করে তার প্রাণনাশের আপ্রাণ চেষ্টা করছে।

একসময়ে মিনাজউদ্দিন যখন দেখলো যে, মাইজা মিয়ার দেহটি নিস্তেজ-নিথর হয়ে গেছে, তখন সে ঐ ক্ষতবিক্ষত দেহটিকে নদীতীরের হোগলা পাতার বনে মাটি চাপা দিয়ে এলো।

মাইজা মিয়ার নিখোঁজ হয়ে যাওয়া আর মিনাজউদ্দিন ও ছোটমিয়ার এলোমেলো, অগোছালো কথাবার্তা ও সন্দেহজনক আচরণে মাইজা মিয়ার মা স্থানীয় থানায় একটি এজাহার দায়ের করেন। মামলার তদন্তকারী অফিসার ঘটনাস্থল পরিদর্শন, আলামত সংগ্রহ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান সেরে মিনাজউদ্দিন ও ছোট মিয়ার বিরুদ্ধে চার্জশীট দাখিল করে। মাইজা মিয়ার মা পরে ছোট ছেলেকেও হারানোর আশংকায় অনেক টাকা-পয়সা ব্যয় করে চার্জশীট থেকে ছোট মিয়ার নাম বাদ দিতে সমর্থ হন। বিচারে মিনাজউদ্দিনের ছয় বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

মাইজা মিয়ার কাহিনি সম্পর্কে অন্য একটি অসমর্থিত সূত্র থেকে জানা যায়, মাইজা মিয়াদের বাড়িতে একদিন আম পাড়া নিয়ে ঝগড়া-বিবাদ হয় এবং ছোটো মিয়ার স্ত্রীকে কিছু কটু কথা শুনতে হয়। রাগে-অপমানে তিনি তার পিতৃগৃহ পাতারহাটের দাদপুরে চলে যান। ছোটো মিয়া তাকে আনতে গেলে তিনি শ্বশুরবাড়ি ফিরে আসতে রাজী হন তবে এই শর্ত আরোপ করেন যে, যেহেতু তার ভাই (মাইজা মিয়া) তার সাথে দুর্ব্যবহার করেছে, সেহেতু তাকে চরম শাস্তি প্রদান করতে হবে। শাস্তির প্রকৃতি হবে এই যে, ছোট মিয়াকে তার সহোদর মাইজা মিয়ার মাথা কেটে এনে তার হাতে দিতে হবে। তবেই কেবল তিনি শ্বশুরবাড়ি ফিরে যেতে পারেন।

মাইজা মিয়া পাখি শিকার করতে খুবই পছন্দ করতেন। একদিন ছোট মিয়া তার ভাইকে সুন্দর সুন্দর পাখি শিকারের প্রলোভন দেখিয়ে নদীর পাড়ে নিয়ে যায় এবং সেখানে তাকে হত্যা করে মাথাটি আলাদা করে নিয়ে এসে স্ত্রীর হাতে তুলে দিতে উদ্যত হয়। ছোটো মিয়ার স্ত্রী স্বামীর এরূপ বর্বর ও অমানুষিক কর্মকাণ্ডে বিস্মিত হয়ে বলেন, যে মানুষ স্ত্রীর কথায় নিজের মায়ের পেটের ভাইকে হত্যা করতে পারে, দুনিয়ার যে-কোনো নিকৃষ্ট ও ঘৃণ্য কাজই তার দ্বারা সম্ভব। আর নিজের স্ত্রীকে হত্যা করা তো কোনো ব্যাপারই নয়। এই বলে তিনি তার স্বামী ছোট মিয়াকে প্রত্যাখ্যান করেন এবং তার সাথে শ্বশুরবাড়ি ফিরে যেতে অস্বীকৃতি জানান।

তথ্যসূত্র

১. মনোরঞ্জন দে ওরফে রিন্টু মহাজন (অভিনয় শিল্পী), পিতা : আশুতোষ দে মহাজন, মাতা : জ্যোৎস্না রানী দে, বয়স : ৪৬ বছর, পেশা : চাকরি, ঠিকানা : গ্রাম : মধ্যবাপ্তা, ডাকঘর : ভোলা, উপজেলা : ভোলা

www.pathagar.com

২. কার্তিক দেবনাথ, পিতা : ননীগোপাল দেবনাথ, মাতা : শান্তি দেবনাথ, শিক্ষা : ডি.ইউ.এম.এস., বয়স : ৬১ বছর, পেশা : ব্যবসা, ঠিকানা : গ্রাম : হাসাননগর, ডাকঘর : মৃজাকালু, উপজেলা : বোরহানউদ্দিন
৩. মোহাম্মদ হোসেন চৌধুরী, পিতা : আশেক আলী চৌধুরী, ঠিকানা : চৌধুরী ভবন, পৌর কাঠালী, উপজেলা : ভোলা সদর
৪. আবদুর রহমান, পিতা : প্রয়াত মৌলভী একেএম ইউসুফ, মাতা : প্রয়াত জোলেখা খাতুন, বয়স : ৬৮ বছর, পেশা : ব্যবসা, ঠিকানা : গ্রাম : বাপ্তা, ডাকঘর : উপজেলা : ভোলা
৫. নাম : মহিউদ্দিন চৌধুরী, পিতা : প্রয়াত শাহাবুদ্দিন মিয়া, মাতা : প্রয়াত মাছুমা খাতুন চৌধুরানী, বয়স : ৭০ বছর, পেশা : ব্যবসা, সংস্কৃতিকর্মী, ঠিকানা : ডাকঘর ও উপজেলা : ভোলা

www.pathagar.com

লোকক্রীড়া

ভোলা সদর উপজেলা

১. হাডুডু

বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো ভোলাতেও হাডুডু একটি অতি পুরনো জনপ্রিয় খেলা। এই খেলার জন্য যে উন্মুক্ত ও প্রশস্ত স্থান দরকার তা এখানে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। বিভিন্ন স্কুল-কলেজের মাঠ, গ্রামের পতিত জমি ইত্যাদি এই খেলার উপযুক্ত স্থান।

হাডুডু তরুণ ও যুবকদের খেলা। এ খেলায় শক্তির প্রয়োজন থাকলেও বুদ্ধি ও কৌশলেরও যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। কিশোর বালকরাও হাডুডুতে অংশ নিয়ে থাকে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন নিয়মে খেলা হলেও ভোলায় এই খেলা হয় কোটবন্দি পদ্ধতিতে, অর্থাৎ মাটির ওপর দাগ দিয়ে সীমানা নির্দিষ্ট করে। আগে কোটের মাপ নিয়ে গ্রামের লোকজন অতো ভাবনা-চিন্তা না করলেও সাম্প্রতিককালে এটি কড়াকড়িভাবেই মেনে চলা হয়। এখনকার হাডুডু কোটের মাপ হচ্ছে দৈর্ঘ্যে ১২ হাত ও প্রস্থে ৮ হাত। কোটের ঠিক মাঝখানে একটি দাগ টেনে দুটি পৃথক ঘর করা হয়। সমান সংখ্যক খেলোয়াড় নিয়ে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দল দুই ঘরে অবস্থান নেয়। খেলা শুরু হওয়ার পর এক দলের একজন খেলোয়াড় মাঝখানের দাগ থেকে দম বন্ধ করে 'ছি' বা 'বোল' দিতে দিতে অপর দলের এক বা একাধিক ব্যক্তিকে স্পর্শ করে নিজ ঘরে ফিরে আসতে পারলে ছুঁয়ে দেওয়া ঐ খেলোয়াড় বা খেলোয়াড়রা মারা পড়বে। 'ছি' দেওয়ার সময় ...হাই-ডু-ডু, ডুডু, ডুডু, ছি ছি ছি, টুকটুক ইত্যাদি শব্দ উচ্চারণ করবে। এ-শব্দগুলি সবার শ্রুতিগোচর হতে হবে। এ সময় এই খেলোয়াড় কোনো শ্বাস নিতে পারবে না। যদি সে দম ছেড়ে দেয়, তাহলে প্রতিপক্ষের কেউ তাকে ছুঁয়ে দিলে সে মারা পড়বে। দম থাকা অবস্থায়ও তাকে যদি তাদের ঘরের মধ্যে আটকে ফেলতে পারে তাহলেও সে মারা পড়বে। দ্বিতীয় বারে একইভাবে 'ছি' দিতে যায় অপর পক্ষের একজন খেলোয়াড়। আগের নিয়মেই একজনকে ছুঁয়ে আসা বা নিজে আটকা পড়লেও একটাই ফল হবে। আবার অপর পক্ষের খেলোয়াড় 'ছি' দেবে। এভাবে একই দলের সব খেলোয়াড় মারা যাওয়া অবধি খেলা চলতে থাকবে। এক দলের সব খেলোয়াড় মারা পড়লে একটা 'গেম' হয়। পুনরায় খেলা শুরু হয়। এভাবে যারা সর্বাধিক সংখ্যক 'গেম'-এ জয় লাভ করে তারাই বিজয়ী হয়। তবে একটি মজার বিষয় হচ্ছে, প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়কে 'মেরে' নিজ দলের খেলোয়াড়কে 'জীবিত' করা যায়, অর্থাৎ 'মারা পড়া' খেলোয়াড় তার খেলার অধিকার ফিরে পেয়ে পুনরায় নিজ দলের ঘরের মধ্যে অবস্থান নিতে পারে।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হাডুডু এখানকার একটি অতি পুরনো, জনপ্রিয় ও আকর্ষণীয় খেলা। একসময়ে এখানে ফুটবল ও হাডুডু সমান জনপ্রিয় খেলা ছিল।

www.pathagar.com

ইদানীং এই খেলার চর্চা অনেকটা হ্রাস পেয়েছে। তৎকালীন ভোলা মহকুমায় হাডুডু খেলায় যারা দক্ষতা ও কলা-কৌশলে প্রথম সারির খেলোয়াড়ের মর্যাদা লাভ করেছিলেন তাদের মধ্যে বোরহানউদ্দিনের দানু মিয়া, (দানু মিয়া ফুটবল খেলায়ও সমান দক্ষ ও জনপ্রিয় ছিলেন। ফুটবলআমোদী মানুষের কাছে তিনি 'দানব' নামে সর্বাধিক পরিচিত ছিলেন।) রামদাসপুরের সুলতান ও জয়নাল, দৌলতখানের সেরু মিয়া, কোড়ালিয়ার শাজাহান, মৃজাকালুর কাঞ্চন, নবীউল্লাহ ও কালু, ইলিশার তৈয়ব আলী, লালমোহনের অজিউল্লাহ মিয়া ও ভোলার মোতাসিম বিল্লাহর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। লালমোহনের এককালের সুদর্শন ও দুর্ধর্ষ হাডুডু খেলোয়াড় অজিউল্লাহ মিয়া জানান, সে সময়ে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, মেম্বার ও স্কুলের শিক্ষকেরা এই খেলার পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তখন স্কুল পর্যায়েও খেলা হতো। অজিউল্লাহ্ ভোলা জেলার বাইরে ঝালকাঠি, পটুয়াখালী, ভান্ডারিয়া, বরিশাল, খুলনা প্রভৃতি স্থানে সম্মানীর বিনিময়ে খেলতে যেতেন।

ভোলার বিশিষ্ট হাডুডু খেলোয়াড় মোতাসিম বিল্লাহ্ জানান, তিনি প্রায় ৩০ বছর হাডুডু খেলেছেন। জেলার বিভিন্ন উপজেলাসহ নোয়াখালীর বিবিরহাট, তারাগঞ্জ, রামগতি, আলেকজান্ডার প্রভৃতি স্থানে খেলেছেন। একসময় 'কালা মোতাসিম' (গায়ের রং কালো ছিল বলে) নামে তিনি হাডুডু খেলায় বিশেষভাবে পরিচিতি লাভ করেন।

২. গোল্লাছুট (বিলুপ্তপ্রায়)

এই খেলার জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত মাঠ, বাগান বা প্রশস্ত স্থান। এই খেলার সফলতা নির্ভর করে একটি নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে দৌড়ের ক্ষিপ্রতার ওপর। এজন্য খেলোয়াড় নির্বাচনের ক্ষেত্রে দ্রুতগতিসম্পন্ন খেলোয়াড় বাছাই করা প্রয়োজন হয়।

গোল্লাছুট খেলায় দুই দলে সমান সংখ্যক খেলোয়াড়ের প্রয়োজন হয়। এই সংখ্যা চার থেকে আট কিংবা দশও হতে পারে। এই খেলায় হাডুডু বা বউছি খেলার মতো ছুঁয়ে দেওয়ার বিষয় আছে।

এই খেলার কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে ছোট একটি গর্ত। এই গর্তে রাখা হয় কাঠ, বাঁশ বা গাছের ডালের ছোটো একটি টুকরা বা কাঠি। একেই বলা হয় 'গোল্লা'। আর খেলার কেন্দ্রীয় সীমানা গোল্লা থেকে ৪০, ৫০ বা ৬০ হাত দূরে কোনো একটি গাছ, ইট বা এ-জাতীয় কোনো বস্তুকে নির্ধারণ করা হয় খেলার বাইরের সীমানা হিসেবে। খেলার মূল লক্ষ্য হলো যে, কেন্দ্রীয় সীমানা গোল্লা থেকে ক্ষিপ্রতার সাথে দৌড়ে গিয়ে বাইরের সীমানার গাছ বা নির্ধারিত বস্তুটিকে ছুঁয়ে দেওয়া। সম্ভবত 'গোল্লা' থেকে ছুটে যাওয়া বিষয়টিকে প্রাধান্য দিতে গিয়েই খেলাটির নাম হয়েছে গোল্লাছুট।

খেলায় অংশগ্রহণকারী দল দুটিতে একজন করে প্রধান থাকে। যে দল প্রথম খেলা শুরু করবে অর্থাৎ 'দাইন' দেবে, তারা 'গোল্লা' স্পর্শ করে দাঁড়াবে আর অন্যান্য সদস্য একজন আরেকজনের হাত ধরে দলের প্রধানকে ধরে ঘুরতে থাকবে। এভাবে ঘুরতে ঘুরতে যার বা যাদের হাত ছুটে যাবে, তাদের তখন দ্রুতবেগে দৌড়ে গিয়ে বাইরের নির্ধারিত সীমানাকে ছুঁতে হবে। আর এ সময়ই খেলার মজা। প্রতিপক্ষের সুযোগসন্ধানী খেলোয়াড়রা এ সময়ে দ্রুতবেগে ছুটে গিয়ে ছুঁতে যাওয়া অপর দলের ঐ

www.pathagar.com

খেলোয়াড়কে বাধা দান করবে, যাতে সে কোনোক্রমেই বাইরের সীমানা স্পর্শ করতে না পারে। এই সময়ে যদি ছুঁতে যাওয়া পূর্বোক্ত খেলোয়াড়কে ছুঁয়ে দিতে পারে, তাহলে সে মারা পড়বে। একজন খেলোয়াড় যতক্ষণ পর্যন্ত গর্ত ছুঁয়ে থাকে, ততক্ষণ সে নিরাপদে থাকে। দলের প্রধান ব্যক্তিকেও একসময় গর্ত ছেড়ে বাইরের নির্ধারিত সীমানা স্পর্শ করার জন্য ছুটে যেতে হয়। যারা সফল হবে, তাদেরকে কেন্দ্রীয় সীমানা গোল্লা থেকে দুই পায়ে একত্রে অর্থাৎ জোর পায়ে একটা করে লাফ দিতে দিতে বাইরের সীমানার দিকে যেতে হবে। এভাবে সব লাফ মিলিয়ে যখন ঐ সীমানায় পৌছতে পারবে তখন এক 'পাইট' খেলা শেষ হবে। যদি ঐ সীমানায় পৌছতে ব্যর্থ হয়, অথবা যদি মারা পড়ে, তাহলে প্রতিপক্ষ 'দাইন' পাবে। পূর্বোক্ত দলের কোনো 'পাইট'কে হিসেবে আনা হবে না। এভাবেই চলতে থাকে 'গোল্লাছুট' খেলা।

৩. বউছি

এ খেলায় দুটি দল থাকে। প্রতিটি দলেই ছয়জন, আটজন বা দশজন করে খেলোয়াড় থাকে। একটা সমান জায়গায় দু'ধরনের দুটি ঘর কাটা হয় বা চুন দিয়ে আঁকা হয়। এই দুই ঘরের মধ্যে দূরত্ব থাকে কুড়ি থেকে চব্বিশ হাত। দুটি ঘরের মধ্যে অপেক্ষাকৃত ছোট ও গোলাকার ঘরটিকে 'বউঘর' এবং বড় ও চতুষ্কোণাকৃতির ঘরটিকে খেলোয়াড়দের ঘর হিসেবে গণ্য করা হয়। এই ঘরকে বলা হয় 'জুরি ঘর'। পুরো খেলাটিতে 'বউ' বা 'বুড়ি'র ভূমিকাই সর্বাধিক। এজন্য দ্রুতগতিসম্পন্ন ও চতুর খেলোয়াড়কেই 'বউ' বা 'বুড়ি' হিসেবে নির্বাচন করা হয়।

খেলার শুরুতে কোনো দল প্রথমে 'দাইন' দেবে বা খেলার সুযোগ পাবে, তা আলোচনার মাধ্যমে স্থির করে নেওয়া হয়। আলোচনায় মতৈক্য না হলে 'টসের' মাধ্যমে তা নির্ধারণ করা হয়। এরপর সব খেলোয়াড় তাদের নির্ধারিত স্থানে, অর্থাৎ 'বুড়ি' বা 'বউ' বউঘরে এবং জুরিঘরে একই দলের খেলোয়াড়রা অবস্থান নেবে। বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়রা উভয় ঘরকে ঘিরে তাদের কৌশলগত ও সুবিধাজনক স্থানে দাঁড়িয়ে যাবে। বউয়ের ওপর থাকে তাদের তীক্ষ্ণ ও সতর্ক দৃষ্টি। বউ যাতে কোনোমতেই জুরিঘরে আসতে না পারে সেজন্য তারা সতর্ক প্রতিরোধ গড়ে তোলে। কারণ বুড়িকে যদি ঘরের বাইরে ছোঁয়া যায়, তাহলে তারা 'দাইন' দেওয়ার অধিকার লাভ করবে। এজন্য 'বউ' এবং প্রতিপক্ষ দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে চলে চরম সাবধানতার খেলা। একদিকে বউ চায় দ্রুততা ও সতর্কতার সাথে দৌড়ে গিয়ে জুরিঘরে অবস্থান নিতে, অন্যদিকে, প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়রা চায় বউ যাতে কোনোমতেই জুরি ঘরে আসতে না পারে, কিংবা ঘরের বাইরে 'বউকে' ছুঁয়ে দিতে। বউকে ঘরের বাইরে ছুঁয়ে দিতে পারলে তারা 'দাইন' পাবে। অন্যদিকে, প্রতিপক্ষের 'ছোঁয়া' থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে 'জুরিঘরে' পৌছতে পারলে এক পয়েন্ট অর্জিত হবে। একই সময়ে প্রতিপক্ষ দলের খেলোয়াড়রা যাতে 'বউকে' জুরিঘরে আসতে বাধা দান করতে না পারে, সেজন্য স্বপক্ষ দলের যে কোনো একজন খেলোয়াড় জুরি ঘরের বাইরে এসে দম বন্ধ রেখে 'ছি' দিয়ে (দম বন্ধ রেখে বিশেষ কোনো শব্দ উচ্চারণ করতে করতে এগিয়ে যাওয়া) প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়দের তাড়ানো ও ছুঁয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে। যদি এটা সফল হয়, অর্থাৎ ছি দিতে দিতে প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়কে ছুঁয়ে দিয়ে দম বন্ধ রেখেই জুরিঘরে

www.pathagar.com

ফিরে আসতে পারে, তাহলে ঐ খেলোয়াড় মারা পড়বে অর্থাৎ তার খেলায় টিকে থাকার অধিকার হারাবে। অন্যদিকে, সে নিজেই যদি দম হারায় তবে সে-ই মারা পড়বে। তবে দমের কমতি ঘটলে অর্থাৎ দম শেষ হয়ে গেলে সে বুড়িঘরে গিয়ে নিজেকে বাঁচাতে পারে। এই খেলায় একবার একজন মারা পড়লে এক পাইট খেলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত পুনরায় সে আর খেলায় ফিরতে পারবে না। যখন এক পক্ষের একজন খেলোয়াড় ছি দিতে দিতে প্রতিপক্ষের অবরোধ ভেঙে ফেলার কাজে ব্যস্ত থাকে, তখনই সুযোগসন্ধানী বউ প্রতিপক্ষের অবস্থান বুঝে নিয়ে অত্যন্ত ক্ষিপ্রতা ও সতর্কতার সাথে দৌড়ে জুড়িঘরে চলে আসতে পারে। বিপক্ষের সব খেলোয়াড় যদি মারা যায়, তাহলে বউঘর থেকে জুড়িঘরে ফিরে আসতে পথে আর কোনো বাধা থাকে না। আবার স্বপক্ষের খেলোয়াড়দের সবাই যদি ছি দিতে গিয়ে মারা পড়ে, তাহলে প্রতিপক্ষের অবরোধ ও সতর্ক পাহারার প্রাচীর ভেদ করেই বউকে দৌড়ে জুরিঘরে আসতে হবে। আবার এই নিয়ম মেনেও খেলা হয় যে, স্বপক্ষের সব খেলোয়াড় যদি মারা পড়ে, সেক্ষেত্রে বউকে এক দমে বউঘর ও জুরিঘরের মধ্যকার দূরত্ব দুবার পার হয়ে আসতে হবে। বউ বা বুড়ি যদি এক্ষেত্রে সফলতা লাভ করে, তাহলে সে 'গোল্লা' পায়, আবার 'দাইন' দেওয়ারও অধিকার লাভ করে। এভাবে এখানে বউছি খেলা হয়।

৪. ডাণ্ডাবারি বা ডাংগুলি (বিলুপ্তপ্রায়)

এই খেলার জন্য প্রয়োজন প্রশস্ত স্থান বা মাঠ, এক হাত পরিমাণ একটি 'ডাণ্ডা' বা লাঠি ও এক বিঘত পরিমাণ একটি কাঠি বা 'গুলি'। দু'জন বা দু'দলের মধ্যে এ খেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এ খেলার পদ্ধতি এরূপ, একটি ছোট গর্ত বা দাগকাটা চারকোণবিশিষ্ট একটি ছোট ঘর প্রয়োজন। আর প্রয়োজন কাঠি বা গুলিটার দুই মাথায় পরস্পর বিপরীত দিকে এমনভাবে একটু ছেটে ফেলা যেন সমতলভূমিতে সেটাকে রাখলে একটি মাথা থেকে ভূমির একটু ফাঁক থাকে। এটি রাখা হয় এজন্য যে, ডাণ্ডার সাহায্যে ওই মাথায় আঘাত করলে কাঠিটি লাফ দিয়ে ওঠে। কাঠিটিকে কতোটা ওপরে তুলতে হবে সেটা নির্ভর করবে ডাণ্ডা দিয়ে 'বারি মারা' বা আঘাত করার শক্তির ওপর। হাল্কা আঘাত করলে কাঠিটি একটু ওপরে উঠলেই ওটা শূন্যে থাকতেই ডাণ্ডা দিয়ে 'বারি' মেরে যত দূরে সম্ভব পাঠিয়ে দিতে হবে। কাঠিটি কতো দূরে পাঠানো গেল তা মাপা হয় ডাণ্ডা দিয়ে। এই মাপের মধ্যেও আবার ব্যাপার আছে। এক, দুই, তিন চার—এভাবে কিন্তু গণনা করা হয় না। গণনা করা হয় এভাবে—এরি, দুরি, তেরি, ছুরি, চাম্পা, জোক, জান। এ পর্যন্তই গোনা যাবে। এভাবে যতোবার গোনা হবে, তার হিসেব রাখতে হবে আঙুলের কড়ে। প্রতিটি খেলোয়াড়কে নিজের হিসেব নিজেকেই রাখতে হবে।

৫. কানামাছি

এটি মূলত মেয়েদের খেলা। তবে ছেলেরাও এটি খেলে থাকে। খেলার শুরুতে একজন 'কানা' নির্ধারণ করা হয়। এ খেলার পদ্ধতি আছে। ১, ১০, ২০, ৩০, ৪০ এভাবে গুণতে গুণতে যার ওপর ১০০ সংখ্যাটি পড়বে, সে ছাড়া পাবে। এভাবে একে একে সবাই ছাড়া পায়। কিন্তু শেষ খেলোয়াড়কে 'কানা' বানানো হয় এবং একটা রুমাল বা

www.pathagar.com

কাপড়ের টুকরা দিয়ে তার চোখ বেঁধে দেওয়া হয়। এরপর অন্যান্য খেলোয়াড়রা তার গায়ে টোকা বা হাল্কা ধাক্কা দিয়ে চারপাশ থেকে মাছির মতো তাকে বিরক্ত করতে থাকে। তারা বলতে থাকে, 'কানা মাছি ভোঁ ভোঁ, যারে পাবি তারে ছোঁ'। কানা তখন অন্ধকারে হাতড়ানোর মতো যারা বিরক্ত করছে তাদের ধরার চেষ্টা করে আর বলে, 'আন্ধি গুন্ধি ভাই, আমার কোনো দোষ নাই'। অপর একজনকে না ধরা ও না চিনা পর্যন্ত কানার মুক্তি নেই। যাকে সে ধরতে পারবে ও চিনতে পারবে তাকেই আবার 'কানা' বানানো হবে। এভাবে আবার খেলা চলতে থাকে।

৬. চোউক পলানি বা চোখ পলানি বা পলাপলি

এটি সাধারণত শিশু-কিশোরদের খেলা। এ খেলায় একজন দলীয় প্রধান থাকেন যিনি 'রাজা' নামে অভিহিত হয়ে থাকেন। তারপর লটারির মাধ্যমে একজনকে 'চোর' বানানো হয় এবং রাজা তার চোখ বন্ধ করে রাখে। এই সুযোগে দলের অন্যান্য সদস্য যে যার সুবিধাজনক স্থানে গিয়ে নিজেকে আড়াল করে রাখে। এরপর রাজা 'চোরে'র চোখের বাঁধন খুলে দেয়। তখন চোরের দায়িত্ব হলো লুকিয়ে থাকা অন্যান্য সদস্যের যে কোনো একজনকে খুঁজে বের করা, অথবা তাদের যে কোনো একজনকে স্পর্শ করে এসে রাজাকে ছুঁয়ে দেওয়া। এখন যাকে স্পর্শ করে আসা হলো, সে-ই 'চোর' বলে গণ্য হবে। কিন্তু তাকে ছোঁয়ার আগেই সে যদি রাজাকে ছুঁয়ে দেয়, তাহলে আর সে 'চোর' হবে না। এভাবে সবাই নিজেকে বাঁচানোর জন্য সুযোগ বুঝে রাজাকে স্পর্শ করার চেষ্টা করে। এভাবে যতক্ষণ পর্যন্ত না চোর সফলতা লাভ করতে পারছে, অর্থাৎ আড়ালে লুকিয়ে থাকা একজনকে স্পর্শ করে এসে রাজাকে ছুঁয়ে দিতে না পারছে ততক্ষণ পর্যন্ত খেলা চলতে থাকবে।

৭. কুমির কুমির (বিলুপ্তপ্রায়)

এ খেলায় দশ-বারো জন বা ততোধিক বালক-বালিকা একসঙ্গে খেলতে পারে। এ খেলার স্থান হিসেবে সাধারণত বারান্দা ও উঠানকে নির্বাচন করা হয়। জলভাগ থেকে ঘাট যেহেতু একটু উঁচু হয় সেজন্যই এই ব্যবস্থা। কারণ উঠান থেকে বারান্দা একটু উঁচু স্থানে অবস্থিত। যে কুমিরের ভূমিকা নেয় সে উঠানে একটু দূরে অবস্থান করে এবং ঘাট অর্থাৎ বারান্দার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখে। অন্যান্য সদস্য গোসল করার উদ্দেশ্যে পানিতে নামে এবং সেরূপ অঙ্গভঙ্গি করে হাত-পা নাড়তে থাকে কিংবা সাঁতার দেওয়ার অভিনয় করে। এ সময় কুমির তাদের আক্রমণ করে। এর মধ্যে সবাই তীরে যেতে পারলেও যে কুমিরের থাবায় আটকা পড়ে তাকে কুমির হতে হয়, আর আগের কুমির মুক্তি পায়। এটাই কুমির কুমির খেলার নিয়ম।

দৌলতখান ও তজুমুদ্দিন উপজেলায় একসময়ে এ খেলাটির বেশ প্রচলন ছিল। কারণ তজুমুদ্দিন ও তার সন্নিহিত এলাকায় নদী ও খালে একসময় অনেক কুমির আসতো। এমনকি কোনো কোনো বাড়িতে কুমির ধরার জন্য বড়শিও রাখা হতো। তজুমুদ্দিন থানার মলঙ্গুরা ইউনিয়নের ননীবাবুদের বাড়িতে কুমির ধরার একটি বিশাল বড়শি ছিল।

www.pathagar.com

৮. গুটি খেলা

এই খেলার জন্য প্রয়োজন ছোট ছোট পাঁচটি গোল আকারের পাথরের অথবা এ-জাতীয় কোনো গুটি। গুটিগুলির আকার এমন হতে হবে যাতে পাঁচটি গুটিই একত্রে হাতের মুঠোয় রাখা যায়। একটি গুটি একটু ওপরের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে নীচে বিছানো অপর গুটিগুলি অত্যন্ত দক্ষতা ও ক্ষিপ্রতার সাথে একটি একটি করে অথবা একসঙ্গে যে কয়টা পারা যায় সে কয়টা মুঠোর মুধ্যে নিয়ে আবার ওপরের দিকে ছুঁড়ে মারা গুটিটি মাটিতে না পড়তেই সেটাকে মুঠোয় পুরে নিতে হবে। এরপর একটি গুটি ডান হাতে রেখে বাকি গুটিগুলি বাম হাতে রেখে দিতে হবে। ডান হাতের গুটিটি পুনরায় ওপরের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে নীচে বিছানো অবশিষ্ট গুটি বা গুটিগুলি আগের মতো হাতে পুরে নিয়ে ওপরের দিকে ছুঁড়ে মারা গুটিটি ধরে ফেলতে হবে। এভাবে সব গুটি তুলতে পারলে এক 'পাইট' খেলা শেষ হয় এবং পয়েন্ট পাওয়া যায়। আর যদি ওপরের দিকে গুটি ছুঁড়ে দিয়ে নীচের গুটি তুলতে গিয়ে ওপরের গুটিটি ধরতে না পারে, অর্থাৎ সেটি মাটিতে পড়ে যায়, তাহলে সে খেলার অধিকার হারায়। তখন অপেক্ষমাণ অপর খেলোয়াড় একই প্রক্রিয়ায় খেলা শুরু করে। যে সর্বাধিক পয়েন্ট লাভ করবে, সেই বিজয়ী বলে ঘোষিত হবে।

৯. ষোল গুটি

এই খেলায় মাটিতে চক দিয়ে বা অন্য কিছু দিয়ে দাগ কেটে নেওয়া হয়। দু'জন প্রতিযোগীর প্রত্যেকের ষোলটি করে গুটি থাকে। নিম্নে ছকটি দেখানো হলো :

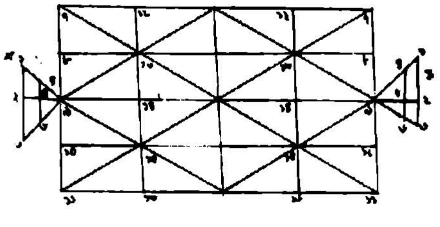

চিত্র-'A' ষোলগুটি খেলার ঘর

চিত্রে দু'পাশে মুখোমুখি দুজন খেলোয়াড় অর্থাৎ 'ক' ও 'খ'-এর অবস্থান দেখানো হয়েছে। 'ক' খেলোয়াড়ের গুটিগুলির অবস্থান ১ থেকে ১৬ পর্যন্ত দেখানো হয়েছে। একইভাবে 'খ' খেলোয়াড়ের গুটির স্থানও ১ থেকে ১৬ পর্যন্ত সংখ্যা দিয়ে দেখানো হয়েছে।

www.pathagar.com

খেলার শুরুতে যেকোনো একজন খেলোয়াড় গুটি একঘর সামনের দিকে ঠেলে দিয়ে 'চাল' শুরু করবে। অপর পক্ষের গুটির অবস্থান কিংবা অগ্রসর হওয়ার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে একপক্ষ তার সুযোগ মতো সামনে অথবা পেছনের দিকে চাল দিতে থাকবে। দু'খেলোয়াড়ই একজন আরেকজনের গুটি 'খেতে' পারবে। যখন কেবল লাফ দিয়ে গুটি চালার সুযোগ আসবে, তখনই কেবল গুটি খাওয়া যাবে। এভাবে গুটি খেতে খেতে প্রতিপক্ষের ঘর শূন্য করে দিতে পারলে কিংবা তার চালের সুযোগ বন্ধ করে দিতে পারলেই এক পক্ষ বিজয়ী হয়।

দাবা খেলার মতো এই খেলায়ও যথেষ্ট ধৈর্য, বুদ্ধি, কৌশল ও সময়ের প্রয়োজন হয়।

১০. রুমাল চোর

এই খেলায় ৪, ৬, ৮ বা ১০জন খেলোয়াড়ের প্রয়োজন। খেলার শুরুতে যে কোনো একজনকে 'চোর' নির্বাচন করা হয়। এরপর সবাই একে অপরের দিকে মুখ করে গোল হয়ে বসবে। এরপর চোর তার হাতে রুমাল নিয়ে চারদিক ঘুরে বেড়াবে। ঘুরতে ঘুরতে একসময় খুব সন্তর্পণে সে যে-কোনো একজনের পেছনে রুমালটি এমনভাবে রেখে যাবে যাতে সে টের না পায়। এরপর চোর এক পাক ঘুরে আসবে। এই সময়ের মধ্যে যার পেছনে রুমালটি রেখে দেওয়া হয়, সে যদি টের না করতে পারে যে, তার পেছনে রুমাল আছে, তাহলে চোর এসে তার পিঠে কিছু উত্তম-মধ্যম বসিয়ে দেবে। আর যদি সে আঁচ করতে পারে যে তার পেছনে রুমাল রয়েছে, তাহলে সে সেটি নিয়ে সটকে পড়বে এবং তার জায়গায় চোর বসে পড়বে। এরপর নতুন চোর একইভাবে ঘুরতে ঘুরতে অন্য একজনের পেছনে খুবই সাবধানে রুমাল রেখে দেবে। এভাবে পর্যায়ক্রমে খেলা চলতে থাকে।

১১. ব্যাঙ ব্যাঙ খেলা

এই খেলার জন্য প্রয়োজন ভাঙা হাড়ি, পাতিল বা কলসির পাতলা ছোট টুকরা। পানির সীমানার ওপরে অর্থাৎ স্থলভাগে দাঁড়িয়ে এই টুকরাগুলো একের পর এক একটা বিশেষ পদ্ধতিতে পানিতে ছুঁড়ে দেওয়া হয়। এগুলো তখন সুন্দর ছন্দোময় গতিতে ব্যাঙের মতো তরতর করে অনেকদূর পর্যন্ত গিয়ে পানিতে ডুবে যায়। কার টুকরো কতদূর পর্যন্ত যায়, এটাই খেলার মূল আনন্দ ও প্রতিযোগিতার বিষয়।

১২. রাম-শাম-যদু-মধু (বিলুপ্তপ্রায়)

এটি মূলত কিশোর-কিশোরীদের খেলা। এতে চারজন প্রতিযোগীর প্রয়োজন হয়। এই খেলায় প্রয়োজন ১৬টি ছোট ছোট কাগজের টুকরো। প্রতি চারটির প্রত্যেকটিতে লেখা থাকে রাম, চারটিতে শাম, চারটিতে যদু ও অবশিষ্ট চারটিতে মধু। কাগজগুলো তাস খেলার মতো এলোমেলো করে দিয়ে চারজন প্রতিযোগীর প্রত্যেককে চারটি করে লেখা কাগজের টুকরা বরাদ্দ করা হয়। এরপর প্রথমে যার চাল দেওয়ার পালা, সে তার কাছে রাখা অপ্রয়োজনীয় নামের কাগজের টুকরাটি তার ডান পাশের খেলোয়াড়কে ধরিয়ে দেবে। সেই খেলোয়াড় ইচ্ছে করলে সেটি নিজের প্রয়োজনে রেখে দিতে পারে, অথবা তার পরবর্তী খেলোয়াড়ের কাছে দিয়ে দিতে পারে। এভাবে চলতে চলতে যখন

www.pathagar.com

সর্বপ্রথমে একজন খেলোয়াড় চারটি রাম অথবা চারটি শাম অথবা চারটি যদু অথবা চারটি মধু লেখা কাগজের টুকরো মেলাতে পারবে, সেই এক 'পাইট' অর্থাৎ একবার জিতলো। এভাবে যে যতো বেশিসংখ্যক 'পাইটে' জেতে, সেই চূড়ান্তভাবে বিজয়ী হয়।

১৩. অ্যাক্কা দোক্কা

এই খেলা দুজনে বা দলবদ্ধভাবে খেলতে পারে। তবে এই খেলায় দলগতভাবে জয়ের কোনো নিয়ম নেই। এখানে ব্যক্তিগতভাবেই জিততে হয়। অর্থাৎ এ খেলায় ব্যক্তিই জেতে, দল জেতে না। এজন্য প্রত্যেক খেলোয়াড় নিজের স্বার্থের দিকে তাকিয়েই খেলে থাকে।

ঘরের মেঝেতে বা বাড়ির উঠানে এই খেলার জন্য একটি ছক কাটা হয়। ছকটি এরূপ :

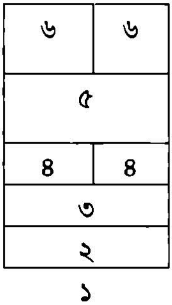

রেখাচিত্রটির ঘরগুলোর নাম হচ্ছে : ১. অ্যাক্কা, ২. দোক্কা, ৩. তেক্কা, ৪. চৌকা, ৫. পাঞ্জা ও ৬. ছক্কা।

মাটির ভাঙা হাঁড়ি-কলসি অথবা পাতিলের গোলাকার টুকরা এই খেলার একমাত্র উপকরণ। একে বলা হয় 'চাড়া।'

এই খেলা দু'জনে অথবা কয়েকজন মিলে দলগতভাবেও খেলতে পারে। তবে যত জনেই খেলুক, যার যার হারজিত তার তার কাছে, দলগত কোনো জয়-পরাজয় নেই। খেলাটি এভাবে শুরু হয়, রেখাচিত্রটির বাইরে চতুর্ভুজ অঙ্কিত স্থান থেকে এক এক ঘরে চাড়াটি ছুঁড়ে ফেলতে হবে। তারপর যে-কোনো এক পায়ের ওপর ভর করে ঘরের দাগগুলো লাফ দিয়ে অতিক্রম করতে হবে এবং আঙুলের আগা দিয়ে চাড়াটিকে ঠেলতে ঠেলতে বাইরে নিয়ে আসতে হবে।

খেলাটিতে যথেষ্ট সতর্কতার প্রয়োজন। কারণ বিশেষ ঘরটিতে যদি চাড়াটি না ছোঁড়া যায়, তাহলে সে 'দাইন' হারিয়ে ফেলবে, অর্থাৎ সে খেলার অধিকার হারাবে। একমাত্র বিশ্রামঘর ছাড়া অন্য ঘরে যদি দু'পা একত্রে পড়ে তাহলে, অথবা চাড়া বা পা দাগের ওপর থাকলে সে 'আউট' হয়ে যাবে।

প্রথমজন 'আউট হয়ে যাবার পর দ্বিতীয়জন একই নিয়মে খেলা খেলতে থাকবে। যে শেষে খেলবে সে যদি 'দাইন' হারায় তাহলে প্রথমে যে খেলেছে, সে তার আগের জায়গা থেকে খেলা শুরু করবে। এভাবে এক এক জন খেলার সুযোগ লাভ করে। একজন খেলোয়াড় যদি সবগুলো ঘরে চাড়া ফেলে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে পারে, তাহলে সে 'ছক্কা' অর্থাৎ ৬ নং ঘরের বাইরে সামনের দিকে ফিরে দাঁড়াবে এবং পেছনের দিকে না তাকিয়েই চাড়াটি ঘরের দিকে মারবে। লক্ষ্য অনুযায়ী যে ঘরে গিয়ে চাড়াটি ঠিকভাবে পড়বে, সে সে-ঘরের মালিক হবে। এভাবে যে সব ঘরের মালিক হয়, সে-ই খেলায় জেতে।

www.pathagar.com

১৪. চোর-ডাকাত-পুলিশ-সাধু (বিলুপ্তপ্রায়)

এই খেলাটি মূলত শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের খেলা। এই খেলায় মোট চারজন প্রতিযোগীর প্রয়োজন হয়। প্রথমে চারটি কাগজের ছোট ছোট টুকরার একটিতে 'চোর', একটিতে 'ডাকাত', একটিতে 'পুলিশ' ও অবশিষ্ট টুকরায় লিখবে 'সাধু'। প্রত্যেক পদবির জন্য আবার নম্বর নির্ধারণ করা হয়। চোর ৭০, ডাকাত ৮০, পুলিশ ৯০ ও সাধু ১০০। এই নম্বরও কাগজের টুকরাগুলিতে যার যার পদবির নীচে লেখা থাকবে। খেলার শুরুতে কাগজের টুকরো চারটি চার ভাঁজ করে এলোমেলো করে দিয়ে চার জনের মধ্যে বেটে দেওয়া হবে। যার হাতে 'সাধু' লিখিত কাগজটি পড়বে, সে ডাক দেবে—'পুলিশ!' পুলিশ লিখিত কাগজের টুকরাটি যার হাতে পড়বে, সে তখন বলবে—'আজ্ঞে!' সাধু পুনরায় বলবে— তুমি 'ডাকাত'কে পাকড়াও' করে নিয়ে আসো। পুলিশ তখন অবশিষ্ট দু'জনের মধ্যে যে-কোনো একজনকে সন্দেহ করবে। কিন্তু সে যদি প্রকৃতই 'ডাকাত' না হয়, তাহলে পুলিশ ০০ নম্বর পাবে। অন্যান্য নম্বর যথানিয়মে দেওয়া হবে এবং আলাদা একটি কাগজে লিপিবদ্ধ করা হবে। এরপর আবার কাগজগুলো ভাঁজ করে এলোমেলোভাবে বন্টন করা হবে এবং আগের নিয়মে খেলা চলতে থাকবে।

প্রত্যেকের প্রাপ্ত নম্বর আলাদা একটি কাগজে লিপিবদ্ধ করা হবে এবং খেলাশেষে যোগ করা হবে। যার নম্বর সবচেয়ে বেশি হবে, সে-ই খেলায় জিতবে। এরপর প্রাপ্ত নম্বর অনুযায়ী ২য়, ৩য় ও ৪র্থ স্থান নির্ধারণ করা হবে।

১৫. লাঠি খেলা

সাধারণত বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বিশেষ উৎসব উপলক্ষে কিংবা নির্বাচনী মিছিলে কিংবা কোনো বিশেষ উৎসবের র‍্যালির অগ্রভাগে লাল হাফ-প্যান্ট ও গেঞ্জি পরে এবং মাথায় লাল কাপড় বেঁধে লাঠির সাহায্যে চমৎকার নৈপুণ্য প্রদর্শনপূর্বক লাঠিয়ালরা প্রধান প্রধান রাস্তা প্রদক্ষিণ করে। এছাড়া লাঠিখেলার বিশেষ কোনো আয়োজন করা হয় না।

দৌলতখান উপজেলা

১. বউছি

খেলাটি মূলত মেয়েরাই খেলে থাকে। এই খেলায় প্রতিটি দলে ছয় থেকে দশজন করে খেলোয়াড় নিয়ে দুটি দল গঠিত হয়। প্রথমে দুই ধরনের দুটি ঘর আঁকা হয়। একটি ছোট ও গোলাকার, অন্যটি আর একটু বড় ও চার কোণাবিশিষ্ট। এই দুই ঘরের মধ্যে দূরত্ব থাকে কুড়ি থেকে চব্বিশ হাত। ছোট ও গোলাকার ঘরটিকে বউঘর এবং বড় ও চার কোণা ঘরটিকে খেলোয়াড়দের ঘর হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। বড় ও চারকোণা ঘরটিকে 'জুরি ঘর' বলা হয়। খেলার শুরুতে লটারি অথবা আলোচনার মাধ্যমে স্থির করা হয় যে, কোনো দল প্রথমে 'দাইন' দেবে। এরপর খেলোয়াড়রা তাদের জন্য নির্ধারিত স্থানসমূহে গিয়ে দাঁড়াবে, অর্থাৎ 'বউঘরে' 'বউ' বা 'বুড়ি' এবং অন্য ঘরে অর্থাৎ জুরিঘরে একই দলের সব খেলোয়াড় গিয়ে দাঁড়াবে। আর বিপক্ষ দলের

www.pathagar.com

খেলোয়াড়রা তাদের কৌশলগত ও সুবিধাজনক স্থান নির্ধারণ করে উভয় ঘরকে ঘিরে দাঁড়াবে। 'বউ' যাতে 'বউঘর' থেকে বেরিয়ে কোনো অবস্থাতেই জুরিঘরে আসতে না পারে, সেদিকে থাকে তাদের সতর্ক ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। কারণ বুড়িকে ঘরের বাইরে ছুঁয়ে দিতে পারলেই তারা খেলায় 'দাইন' দেওয়ার অধিকার লাভ করবে। একদিকে বুড়ি বা বউ চেষ্টা করে তার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসে জুরিঘরে ঢুকে পড়তে। এতে সে একটি পয়েন্ট লাভ করবে। অন্যদিকে, প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়রা চেষ্টা করে বউ তার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলেই তাকে ছুঁয়ে দিতে। তাতে তারা 'দাইন' পাবে। এ সময়ে দাইন দেওয়া দলের খেলোয়াড়রা দম বন্ধ করে 'ছি' দিতে দিতে প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়দের তাড়িয়ে নিয়ে যায় ও ছুঁয়ে দিয়ে দম বন্ধ রেখেই নিজ ঘরে ফিরে আসতে পারলে ঐ খেলোয়াড়টি মারা যাবে। কিন্তু সে যদি দম হারায় আর প্রতিপক্ষের কেউ তাকে ছুঁয়ে দেয় তাহলে সে নিজেই 'মারা' যাবে। এক্ষেত্রে তার নিজেকে বাঁচানোর উপায় হলো 'জুরিঘরে' গিয়ে আশ্রয় নেয়। যখন নিজ দলের খেলোয়াড়রা প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়দের তাড়িয়ে বেড়াবে, তখন বউ সুযোগের সদ্ব্যবহার করে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে জুরিঘরে ফিরে আসে। প্রতিপক্ষের সব খেলোয়াড় এক এক করে মারা পড়লে বউ তার ঘর থেকে জুরিঘরে ফিরে আসতে আর কোনো বাধার সম্মুখীন হয় না। কিন্তু এক্ষেত্রে যদি নিজ দলের খেলোয়াড়দের সবাই 'মারা' যায়, তাহলে বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়দের আক্রমণ থেকে নিজেকে বাঁচিয়েই বউকে জুরিঘরে আসতে হয়। সে ব্যর্থ হলে অর্থাৎ প্রতিপক্ষের কোনো খেলোয়াড় তাকে ছুঁয়ে দিলে প্রতিপক্ষ দাইন দেওয়ার অধিকার লাভ করবে। আর যদি সে প্রতিপক্ষের পাহারা ডিঙিয়ে জুরিঘরে ফিরে আসার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারে, তাহলে খেলায় আবারও 'দাইন' দেওয়ার অধিকার অর্জন করে।

২. হাডুডু (বিলুপ্তপ্রায়)

এক সময় ফুটবল ও হাডুডু খেলার সমান জনপ্রিয়তা থাকলেও এখন এই খেলার চর্চা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। তবে বিশেষ জাতীয় দিবসের অনুষ্ঠানে এই খেলার প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে।

এটি মূলত যুবকদের খেলা। তবে সমবয়সী কিশোররাও দল গঠন করে খেলে থাকে। একটি প্রশস্ত স্থানে ১২ × ৮ বিশিষ্ট হাত একটি কোট তৈরি করে ঠিক মাঝখানে আড়াআড়িভাবে একটি দাগ দেওয়া হয়। দুই পক্ষের সমান সংখ্যক খেলোয়াড় মাঝখানের দাগের দুই পাশে অবস্থান নেয়। তারপর প্রথমে যে কোনো এক দলের একজন খেলোয়াড় দম বন্ধ করে দুই পা একত্র করে সামান্য একটু লাফ দিয়ে মাঝখানের দাগটিকে অতিক্রম করে এবং 'ছি' বা 'ডু' দেয়। যতক্ষণ সে প্রতিপক্ষের কোটের ভিতরে থেকে 'ছি' দেবে, ততক্ষণ তাকে দম বন্ধ করে রাখতে হয়। সে 'ছি' দিতে দিতে অপর পক্ষের এক বা একাধিক খেলোয়াড়কে ছুঁয়ে দিয়ে নিজ ঘরে ফিরে আসার চেষ্টা করে। এ সময় যদি তার দম ছুটে যায় এবং অপর পক্ষের খেলোয়াড় তাকে ছুঁয়ে দেয় কিংবা অপর পক্ষের খেলোয়াড়রা তাকে জাপটে ধরে আটকে রাখে, তাহলে সে 'মারা' পড়বে অর্থাৎ এই 'পাইটে' খেলার অধিকার হারাবে। একই নিয়মে প্রতিপক্ষের খেলোয়াড় আবার তার প্রতিপক্ষের কোটে 'ছি' দিতে আসবে। এক সময়ে যে কোনো এক দলের সব খেলোয়াড় 'মারা' পড়লে এক 'পাইট' খেলা শেষ হয় এবং

www.pathagar.com

বিজয়ী দল পয়েন্ট লাভ করে। তবে এখানে উল্লেখ্য যে, প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়কে 'মারতে' পারলে পর্যায়ক্রমে নিজ দলের খেলোয়াড় পুনর্জীবিত হয়ে খেলায় ফিরে আসতে পারবে।

উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় এক সময় স্কুলগুলোতে হাডুডু খেলার প্রতিযোগিতা হতো। এছাড়া গ্রামের যুবকবয়সী ছেলেরাও টিম গঠন করে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতো। এখনও বিভিন্ন জাতীয় দিবসে কোথাও কোথাও হাডুডু খেলার প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে।

৩. গোল্লাছুট (বিলুপ্তপ্রায়)

এই খেলায় দুটি দলের প্রয়োজন হয়। প্রতিটি দলে চার থেকে দশজন খেলোয়াড় থাকে। একটি ছোট গর্ত হচ্ছে এই খেলার মূল বা কেন্দ্রীয় সীমানা। এই গর্তে ছোট কোনো পাথর, বাঁশ বা কাঠের টুকরা থাকে, যাকে 'গোল্লা' বলা হয়। আর এই গর্ত থেকে ৪০ থেকে ৬০ হাত দূরে কোনো গাছ বা বাঁশ বা ইটকে খেলার বাইরের সীমানা হিসেবে ধরা হয়। খেলার মূল বিষয় হচ্ছে, 'গোল্লা' থেকে দ্রুতগতিতে ছুটে গিয়ে বাইরের সীমানা হিসেবে নির্ধারিত বস্তুটিকে স্পর্শ করা।

প্রতিযোগী দুটি দলেই একজন করে প্রধান নির্বাচন করা হয়। যে দল প্রথম খেলা শুরু করে বা 'দাইন' দেয় তারা গোল্লা ছুঁয়ে দাঁড়ায় আর অন্য খেলোয়াড় সবাই হাত ধরাধরি করে দলীয় প্রধানকে ঘিরে ঘুরতে থাকে। এই ঘোরার সময় যদি কারো হাত ছুটে যায়, তাহলে তার বা তাদের তাড়াতাড়ি দৌড়ে গিয়ে বাইরের নির্ধারিত সীমানা ছুঁতে হয়। আর এ সময় প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়রা দৌড়ে গিয়ে ঐ খেলোয়াড়কে বাধা দেবে যাতে সে বাইরের সীমানাকে স্পর্শ করতে না পারে। এ সময়ে যদি বাধাদানকারী দলের কেউ পূর্বোক্ত দলের ঐ খেলোয়াড়টিকে সীমানা স্পর্শ করার আগেই ছুঁয়ে দিতে পারে, তাহলে সে 'মারা' যায়। একজন খেলোয়াড় ততক্ষণই নিরাপদ থাকে, যতক্ষণ সে গর্তটি ছুঁয়ে থাকে। দলীয়প্রধানকেও একসময় গোল্লা থেকে বেরিয়ে বাইরের সীমানা স্পর্শ করার জন্য ছুটতে হয়। যারা সফলতা লাভ করে তাদেরকে গোল্লা থেকে জোর পায়ে লাফ দিতে দিতে বাইরের সীমানাকে স্পর্শ করতে হয়। সীমানায় গিয়ে পৌছতে সক্ষম হলে এক 'পাইট' খেলা শেষ হয়। আর যদি পৌছতে না পারে, বা 'মারা' পড়ে তাহলে অপরপক্ষ 'দাইন' দেওয়ার অধিকার লাভ করবে। এক্ষেত্রে আগের দলের কোনো 'পাইট'কে হিসেবে ধরা হয় না। এভাবেই এ-খেলা চলতে থাকে।

৪. অ্যাক্কা দোক্কা

[ভোলা সদর উপজেলার অনুরূপ]

দাইড়্যাবান্দা (বিলুপ্তপ্রায়)

[ভোলা সদর উপজেলার অনুরূপ]

লাটিম খেলা (বিলুপ্তপ্রায়)

[ভোলা সদর উপজেলার অনুরূপ]

কানামাছি

[ভোলা সদর উপজেলার অনুরূপ]

www.pathagar.com

ডাণ্ডাবারি (বিলুপ্তপ্রায়)
[ভোলা সদর উপজেলার অনুরূপ]

ষোলগুটি
[ভোলা সদর উপজেলার অনুরূপ]

গুটি খেলা
[ভোলা সদর উপজেলার অনুরূপ]

চোর-ডাকাত-পুলিশ-সাধু (বিলুপ্তপ্রায়)
[ভোলা সদর উপজেলার অনুরূপ]

রুমাল চোর (বিলুপ্তপ্রায়)
[ভোলা সদর উপজেলার অনুরূপ]

মার্বেল খেলা (বিলুপ্ত)

ঘুড়ি ওড়ানো (বিলুপ্তপ্রায়)

মোরগ যুদ্ধ (বিলুপ্তপ্রায়)

দড়ি লাফ (বিলুপ্তপ্রায়)

তজুমুদ্দিন উপজেলা

১. **হাডুডু** (বিলুপ্তপ্রায়)

২. **গোল্লাছুট** (বিলুপ্তপ্রায়)

৩. **দাড়িয়াবান্দা** (বিলুপ্তপ্রায়)

৪. **বউছি**
[ভোলা সদর উপজেলার অনুরূপ]

৫. **কানামাছি**
[ভোলা সদর উপজেলার অনুরূপ]

৬. **চোখ পলানি বা পলাপলি**
[ভোলা সদর উপজেলার অনুরূপ]

৭. **গুটি খেলা** (বিলুপ্তপ্রায়)

৮. **ষোলগুটি**
[ভোলা সদর উপজেলার অনুরূপ]

৯. **অ্যাকা দোক্কা**
[ভোলা সদর উপজেলার অনুরূপ]

১০. **ডাণ্ডাবারি** (বিলুপ্তপ্রায়)
[ভোলা সদর উপজেলার অনুরূপ]

১১. **রাম-শাম-যদু-মধু** (বিলুপ্তপ্রায়)
[ভোলা সদর উপজেলার অনুরূপ]

১২. **চোর-ডাকাত-পুলিশ-সাধু** (বিলুপ্ত)
[ভোলা সদর উপজেলার অনুরূপ]

www.pathagar.com

১৩. **রুমাল চোর** (বিলুপ্তপ্রায়)
[ভোলা সদর উপজেলার অনুরূপ]

১৪. **মার্বেল খেলা** (বিলুপ্ত)
[ভোলা সদর উপজেলার অনুরূপ]

১৫. **ঘুড়ি ওড়ানো** (বিলুপ্তপ্রায়)
[ভোলা সদর উপজেলার অনুরূপ]

১৬. মোরগযুদ্ধ (বিলুপ্ত)

১৭. দড়ি লাফ (বিলুপ্তপ্রায়)

বোরহানউদ্দিন উপজেলা

হাডুডু
[ভোলা সদর উপজেলার অনুরূপ]

দাইড়্যাবান্দা বা দাড়িয়াবান্ধা
[ভোলা সদর উপজেলার অনুরূপ]

বউছি
[ভোলা সদর উপজেলার অনুরূপ]

গোল্লাছুট (বিলুপ্তপ্রায়)
[ভোলা সদর উপজেলার অনুরূপ]

কানামাছি
[ভোলা সদর উপজেলার অনুরূপ]

চোখ পলানি
[ভোলা সদর উপজেলার অনুরূপ]

গুটি খেলা
[ভোলা সদর উপজেলার অনুরূপ]

অ্যাক্কা দোক্কা
[ভোলা সদর উপজেলার অনুরূপ]

ডাণ্ডাবাড়ি (বিলুপ্তপ্রায়)
[ভোলা সদর উপজেলার অনুরূপ]

(বিলুপ্তপ্রায়)
[ভোলা সদর উপজেলার অনুরূপ]

চোর-ডাকাত-পুলিশ-সাধু (বিলুপ্তপ্রায়)
[ভোলা সদর উপজেলার অনুরূপ]

রুমাল চোর (বিলুপ্তপ্রায়)
[ভোলা সদর উপজেলার অনুরূপ]

মার্বেল খেলা (বিলুপ্ত)

www.pathagar.com

মোরগ যুদ্ধ (বিলুপ্ত)
ঘুড়ি ওড়ানো (বিলুপ্তপ্রায়)

লালমোহন উপজেলা

১. হাডুডু [বিলুপ্তপ্রায়]
[ভোলা সদর উপজেলার অনুরূপ]

২. দাইড়্যাবান্দা বা দাড়িয়াবান্দা (বিলুপ্তপ্রায়)
[ভোলা সদর উপজেলার অনুরূপ]

৩. বউছি
[ভোলা সদর উপজেলার অনুরূপ]

৪. গোল্লাছুট (বিলুপ্তপ্রায়)
[ভোলা সদর উপজেলার অনুরূপ]

৫. কানামাছি
[ভোলা সদর উপজেলার অনুরূপ]

৬. চোউক পলানি বা পলাপলি
[ভোলা সদর উপজেলার অনুরূপ]

৭. গুটি খেলা (বিলুপ্তপ্রায়)
[ভোলা সদর উপজেলার অনুরূপ]

৮. ষোলগুটি
[ভোলা সদর উপজেলার অনুরূপ]

৯. অ্যাক্কা দোক্কা
[ভোলা সদর উপজেলার অনুরূপ]

১০. ডাণ্ডাবারি (বিলুপ্ত)
[ভোলা সদর উপজেলার অনুরূপ]

১১. রাম-শাম-যদু-মধু (বিলুপ্ত)
[ভোলা সদর উপজেলার অনুরূপ]

১২. চোর-ডাকাত-পুলিশ-সাধু (বিলুপ্ত)
[ভোলা সদর উপজেলার অনুরূপ]

১৩. রুমাল চোর (বিলুপ্ত)
[ভোলা সদর উপজেলার অনুরূপ]

১৪. মার্বেল (বিলুপ্ত)

১৫. ঘুড়ি ওড়ানো (বিলুপ্তপ্রায়)

চরফ্যাশন উপজেলা

হাডুডু
[ভোলা সদর উপজেলার অনুরূপ]

www.pathagar.com

গোল্লাছুট (বিলুপ্তপ্রায়)
[ভোলা সদর উপজেলার অনুরূপ]

বউছি
[ভোলা সদর উপজেলার অনুরূপ]

ডাণ্ডাবারি বা ডাঙ্গুলি (বিলুপ্তপ্রায়)
[ভোলা সদর উপজেলার অনুরূপ]

কানামাছি
[ভোলা সদর উপজেলার অনুরূপ]

পলাপলি বা চৌক পলানি
[ভোলা সদর উপজেলার অনুরূপ]

কুমির কুমির (বিলুপ্ত)
[ভোলা সদর উপজেলার অনুরূপ]

গুটি খেলা (বিলুপ্তপ্রায়)
[ভোলা সদর উপজেলার অনুরূপ]

ষোলগুটি
[ভোলা সদর উপজেলার অনুরূপ]

রুমাল চোর (বিলুপ্ত)
[ভোলা সদর উপজেলার অনুরূপ]

ব্যাঙ ব্যাঙ খেলা (বিলুপ্ত)
[ভোলা সদর উপজেলার অনুরূপ]

রাম-শাম-যদু-মধু (বিলুপ্ত)
[ভোলা সদর উপজেলার অনুরূপ]

অ্যাক্কা দোক্কা
[ভোলা সদর উপজেলার অনুরূপ]

চোর-ডাকাত-পুলিশ-সাধু (বিলুপ্তপ্রায়)
[ভোলা সদর উপজেলার অনুরূপ]

মোরগ যুদ্ধ (বিলুপ্ত)
মার্বেল খেলা (বিলুপ্ত)
ঘুড়ি ওড়ানো (বিলুপ্তপ্রায়)

মনপুরা উপজেলা

১. হাডুডু

এই অঞ্চলের এক সময়ের অত্যন্ত জনপ্রিয় খেলা। এখনো এর জনপ্রিয়তা আছে, তবে আগের মতো চর্চা বা প্রতিযোগিতামূলক খেলা এখন আর অনুষ্ঠিত হয় না।

www.pathagar.com

হাডুডু খেলার জন্য প্রয়োজন খোলামেলা ও প্রশস্ত জায়গা। বাজারের পাশে পরিত্যক্ত খোলা জায়গা, স্কুল-মাদ্রাসা বা কলেজের খোলা মাঠ, গ্রামের কোনো বড় বাড়ির প্রশস্ত দরজা প্রভৃতি এ-খেলার জন্য যথোপযুক্ত স্থান হিসেবে বিবেচিত হয়।

এই খেলা মোটামুটিভাবে স্বাস্থ্যবান ও শক্তিশালী তরুণ ও যুবকদের খেলা। সমবয়সী কিশোররাও এ খেলা খেলে থাকে। শুধু শক্তি থাকলেই হয় না, এ খেলায় কৌশল ও বুদ্ধিরও যথেষ্ট প্রয়োজন আছে।

হাডুডু খেলার কোটের মাপ হচ্ছে দৈর্ঘ্যে ১২ হাত ও প্রস্থে ৮ হাত। কোটের ঠিক মাঝখানে একটি রেখা বা দাগ টেনে কোর্টটিকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়। এরপর দুই দলের সমান সংখ্যক খেলোয়াড় দাগের দুই পাশে অবস্থান গ্রহণ করে। খেলা শুরু হওয়ার পর যে-কোনো একদলের একজন খেলোয়ার মাঝখানের রেখা থেকে 'ছি' বা 'ডু' বা বোল দিতে দিতে অপর পক্ষের সীমানায় প্রবেশ করে এবং ঐ দলের এক বা একাধিক খেলোয়াড়কে ছুঁয়ে দিয়ে নিজ ঘরে ফিরে আসার চেষ্টা করে। এই পুরো সময় তাকে দম বন্ধ করে রাখতে হয়। যদি সে ছুঁয়ে দিয়ে সফলতার সাথে নিজ ঘরে ফিরে আসতে পারে, তাহলে যে কয়জনকে সে ছুঁয়ে দিল তারা মারা পড়বে। আর যদি তার দম ছুটে যায় এবং এই সময় প্রতিপক্ষের কোনো খেলোয়াড় উল্টো তাকে ছুঁয়ে দেয়, তাহলে সে-ই মারা পড়বে। আর প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়রা তাকে তাদের কোটের মধ্যে আটকিয়ে রাখতে পারলে তো সে মারা পড়বেই। পরের বার একইভাবে প্রতিপক্ষের খেলোয়াড় আবার 'ছি' বা 'বোল' দেবে। একই নিয়মে সে-ও অপরপক্ষের খেলোয়াড়কে 'মেরে' আসবে বা নিজে 'মারা' পড়বে। প্রত্যেক খেলোয়াড় 'ছি' দেওয়ার সময় এমনভাবে দেবে যাতে অন্য সবাই শুনতে পায়। এভাবে 'ছি' দিতে দিতে এক দলের সব খেলোয়াড় মারা পড়া পর্যন্ত খেলা চলে, তবে এর মধ্যে আর একটি বিষয় আছে। সেটা হলো, প্রতিপক্ষের একজনকে মারতে পারলে নিজ পক্ষের একজন খেলোয়াড় জীবিত হয়ে পুনরায় খেলায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। খেলার জয়-পরাজয় নির্ধারণ হয় 'গেম'-এর মাধ্যমে। এক দলের সব খেলোয়াড় যদি মারা পড়ে, তাহলে একটা 'গেম' হয়। যারা সবচেয়ে বেশি সংখ্যক গেম দিতে পারে, তারাই চূড়ান্তভাবে বিজয়ী হয়।

২. বউছি

এই খেলায় অংশগ্রহণকারী দুটি দলের প্রতিটিতে ছয় থেকে দশজন করে খেলোয়াড় থাকে। একটি সমতল জায়গায় দু'ধরনের দুটি ঘর চুন দিয়ে বা দাগ কেটে এঁকে নিতে হয় প্রথমে। দুটি ঘরের দূরত্ব থাকে বিশ থেকে চব্বিশ হাত। ছোট ও গোলাকৃতির ঘরটি 'বউঘর' এবং বড় ও চারকোণাবিশিষ্ট ঘরটি 'জুরিঘর' বা খেলোয়াড়দের ঘর হিসেবে গণ্য। খেলাটিতে 'বুড়ি' বা 'বউ'-এর ভূমিকাই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য 'বুড়ি' নির্বাচনকালে চতুর ও দ্রুতগতিসম্পন্ন খেলোয়াড়কেই প্রাধান্য দেওয়া হয়।

খেলার শুরুতে কোনো দল আগে 'দাইন' (দান) দেবে তা লটারি বা আলোচনার মাধ্যমে ঠিক করে নেওয়া হয়। এরপর একই দলের সব খেলোয়াড় তাদের নির্ধারিত

www.pathagar.com

স্থানে অবস্থান নিয়ে দাঁড়াবে। প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়রা উভয় ঘরকে ঘিরে দাঁড়াবে এমনভাবে যে, যাতে তারা তাদের কৌশল সঠিক ও নিখুঁতভাবে প্রয়োগ করতে পারবে। 'বউ'-এর ওপর থেকে তাদের দৃষ্টি মুহূর্তের জন্যও সরায় না। তাদের লক্ষ্য থাকে, বউ যাতে কোনোভাবেই জুরি ঘরে প্রবেশ করতে না পারে। কারণ, 'বুড়িকে' যদি ঘরের বাইরে ছুঁয়ে দিতে পারে তাহলে তারা খেলায় দাইন দেওয়ার অধিকার লাভ করবে। এ কারণে দুই দলের খেলোয়াড়ই সর্বোচ্চ সতর্কাবস্থায় থাকে। একদিকে বউয়ের লক্ষ্য থাকে যত দ্রুত সম্ভব দৌড়ে গিয়ে জুরি ঘরে আশ্রয় নিতে। অন্যদিকে, প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়দের সতর্ক পাহারা থাকে—বউ যাতে কোনো মতেই সফল হতে না পারে অর্থাৎ জুরিঘরে আসতে না পারে। তারা চেষ্টা করে বউকে ছুঁয়ে দিতে। প্রতিপক্ষ যদি তাদের উদ্দেশ্য সফল করতে পারে অর্থাৎ 'বউকে' যদি জুরিঘরের বাইরে ছুঁয়ে দিতে পারে, তাহলে তারা দাইন পাবে। অন্যদিকে, তাদের আক্রমণ থেকে অর্থাৎ ছোঁয়া থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে জুরিঘরে আশ্রয় নিতে পারলে একটি পয়েন্ট লাভ হবে। অন্যদিকে, প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়রা যাতে 'বুড়ির' বা 'বউয়ের' জুরিঘরে আসার সময় কোনোরূপ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে না পারে, সে-জন্য স্বপক্ষ দলের যে-কোনো একজন খেলোয়াড় জুরি ঘরের বাইরে এসে নিঃশ্বাস বন্ধ রেখে 'ছি' দিয়ে প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়দের তাড়িয়ে বেড়ায় ও ছুঁয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। এ সময়ে যদি নিঃশ্বাস বন্ধ রেখে 'ছি' দিতে দিতে প্রতিপক্ষের কোনো খেলোয়াড়কে স্পর্শ করে জুরিঘরে ফিরে আসতে পারে, তাহলে ঐ খেলোয়াড় মারা পড়বে। একইসঙ্গে সে নিজেই যদি দম হারিয়ে ফেলে, তাহলে উল্টো সে-ই মারা পড়বে। তবে দম হারিয়ে ফেললে সে 'বুড়িঘরে' আশ্রয় নিয়ে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে। এই খেলার একটি নিয়ম হচ্ছে এই যে, দলের একজন খেলোয়াড় যদি মারা পড়ে, তাহলে 'দাইন' শেষ না হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ এক পাইট (পাটি) খেলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে আর খেলায় ফিরতে পারবে না। এখানে সুযোগসন্ধানী ও কৌশলী বউকে তখনই জুরিঘরে চলে আসতে হবে, যখন নিজ দলের একজন খেলোয়াড় 'ছি' দিতে দিতে প্রতিপক্ষের গড়ে তোলা অবরোধ ভেঙে দেওয়ার চেষ্টায় ব্যস্ত থাকে। আবার বিপক্ষের সব খেলোয়াড়কে 'মেরে' ফেলেতে পারলে তো বউকে আর জুরিঘরে ফিরে আসতে কোনো বাধার সম্মুখীন হতে হয় না। কিন্তু স্বপক্ষের খেলোয়াড়দের সবাই যদি 'ছি' দিতে গিয়ে মারা পড়ে, তাহলে প্রতিপক্ষের দুর্ভেদ্য অবরোধ ও পাহারার মধ্যেই তাকে বুদ্ধিমত্তা ও কৌশল প্রয়োগ করে ক্ষিপ্রবেগে জুরিঘরে এসে আশ্রয় নিতে হবে। এই নিয়মেই এখানে বউছি খেলা হয়ে থাকে।

৩. দাইড়্যাবান্দা বা দাড়িয়াবান্দা (বিলুপ্তপ্রায়)

এটি ভোলা অঞ্চলে, বিশেষকরে গ্রামাঞ্চলের অতিপরিচিত ও জনপ্রিয় খেলা। কিশোর-কিশোরী কিংবা বয়স্করা এ-খেলায় অংশগ্রহণ করতে পারে। খেলায় অংশগ্রহণকারী দুটি দলে সমান সংখ্যক খেলোয়াড় থাকে। খেলোয়াড়ের সংখ্যা চার-পাঁচজন থেকে আট-নয় জন হতে পারে। খেলাটিতে দৌড়ের গতির গুরুত্ব আছে, তবে গতির চেয়ে কৌশল প্রয়োগের সামর্থ্য বেশি কার্যকর।

www.pathagar.com

দাড়িয়াবান্দা খেলায় খোলামেলা জায়গায় মাটির ওপর নির্দিষ্ট দাগ কেটে ঘর তৈরি করা হয়। নিম্নে একটি ঘর এঁকে দেখানো হলো :

১	০	২
৩		৪
৫		৬
৭		৮

এই কোটের ১নং ঘরের নাম 'রেডি ঘর' ও ২নং ঘরের নাম 'পাকা ঘর'। এই পাকা ঘরকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে সতর্ক পাহারার ব্যবস্থা করা হয়।

দুটি ঘরের সমান মাঝ বরাবর ওপরে-নীচে আঁকা রেখাটি 'খাড়াকোট' আর ডান পাশ-বাম পাশে অর্থাৎ প্রস্থের দিকে আঁকা রেখাটি 'পাথাল কোট' নামে অভিহিত। '০' চিহ্নিত স্থানে দাঁড়িয়ে এক পক্ষ তার বিরোধী দলের কাছে 'দাইড়া' চায়। সম্মতি পাওয়া গেলে খেলোয়াড়রা অন্য ঘরগুলো ঘুরে আসার জন্য বেরিয়ে পড়ে। 'খাড়া কোট' ও পাথাল কোটে প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়রা বাধা প্রদান করার চেষ্টা করে। তাদের ছোঁয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করে যদি 'রেডি ঘরে' ফিরে আসা যায়, তাহলে এক পয়েন্ট হয় এবং দাইন তাদেরই আয়ত্তে থাকে। তবে প্রতিপক্ষের যে কেউ তাদের দলের একজনকে ছুঁয়ে দিতে পারলেই দাইন দেওয়ার অধিকার হারাতে হয়।

৪. গোল্লাছুট

এটি একটি ক্ষিপ্রগতির দৌড়ের খেলা। এ কারণে সফলতা লাভের জন্য দ্রুতগতির অধিকারী খেলোয়াড়কে নির্বাচন করা হয়। খেলায় দুই দলে সমান সংখ্যক খেলোয়াড় থাকতে হয়। এর সংখ্যা চার, ছয় কিংবা আটও হতে পারে।

ছোট একটি গর্ত হচ্ছে খেলার মূল কেন্দ্র। এই গর্তে থাকে ছোট একটি কাঠ বা বাঁশের টুকরা, যাকে বলা হয় 'গোল্লা'। খেলার বাইরের সীমানা হিসেবে ধরা হয় 'গোল্লা থেকে ৪০-৫০ হাত দূরের কোনো একটি গাছ, ইট বা এ-জাতীয় কোনো বস্তুকে। মূল কেন্দ্র গোল্লা থেকে অত্যন্ত দ্রুতবেগে দৌড়ে গিয়ে বাইরের সীমানার গাছ বা ইট বা পূর্ব-নির্ধারিত ঐ জাতীয় কোনো বস্তুকে ছুঁয়ে দিতে পারাই খেলার মূল লক্ষ্য।

খেলায় অংশগ্রহণকারী যে দল প্রথমে 'দাইন' দেয় তারা প্রথমে 'গোল্লা' স্পর্শ করে দাঁড়ায় আর বাকিরা একজন আরেকজনের হাত ধরে দলীয় প্রধানকে ধরে ঘুরতে থাকে। এভাবে ঘুরতে ঘুরতে কারো হাত ছুটে গেলে তাকে তখন দৌড়ে গিয়ে বাইরের সীমানার গাছ বা কাঠিটিকে ছুঁতে হয়। ঠিক তখনই প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়রা তৎপর হয়ে ওঠে। তারা সর্বাত্মকভাবে চেষ্টা করে ঐ খেলোয়াড় যাতে বাইরের সীমানাকে স্পর্শ করতে না পারে। তারা যদি বাইরের সীমানা ছোঁয়ার জন্য দ্রুতবেগে ছুটে যাওয়া খেলোয়াড়টিকে ছুঁয়ে দিতে পারে, তাহলে সে মারা পড়বে। একজন খেলোয়াড় ততক্ষণ

www.pathagar.com

পর্যন্তই নিরাপদে থাকে, যতক্ষণ সে গর্ত ছুঁয়ে থাকে। একসময় দলীয় প্রধানকেও গর্ত ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসতে হয় এবং বাইরের সীমানাটিকে ছোঁয়ার জন্য ছুটতে হয়। যারা সফলতা লাভ করে, গোল্লা থেকে তাদেরকে দুই পায়ে একসঙ্গে লাফ দিতে দিতে বাইরের সীমানার দিকে যেতে হয়। এভাবে ওখানে পৌছার পর এক পাইট খেলা শেষ হয়। কিন্তু যদি বাইরের সীমানায় পৌছতে ব্যর্থ হয় কিংবা প্রতিপক্ষের কেউ ছুঁয়ে দেওয়ার ফলে 'মারা' পড়ে, তাহলে প্রতিপক্ষ 'দাইন' পাবে। এই নিয়মে খেলা চলতে থাকে।

৫. লাটিম খেলা (বিলুপ্তপ্রায়)

খেলার জন্য প্রয়োজন একটি মোটামুটি প্রশস্ত জায়গা। এটা হতে পারে রাস্তার পাশে কিংবা বাড়ির উঠানে। এ খেলায় কোনো জটিল কিংবা কঠিন নিয়ম নেই। খেলার শুরুতে মাটিতে একটি গোলাকৃতির বৃত্ত আঁকা হয়। এরপর যে ক'জন খেলবে (দু জন বা ততোধিক) তাদের প্রত্যেকের লাটিম একত্র করে সামান্য একটু ওপর থেকে ওই বৃত্তিটির ওপর ছেড়ে দেবে। এর ফলে লাটিমগুলো একটার সাথে আরেকটির ধাক্কা লেগে ছিটকে বৃত্তের বাইরে চলে আসবে। কখনো কখনো একটি লাটিম বৃত্তের ভেতরেই থেকে যায়। এরপর লাটিমটি বাকি সব লাটিমের আক্রমণের শিকারে পরিণত হয়। প্রত্যেকেই যার যার লাটিম দিয়ে ওই লাটিমটিকে আঘাত করতে থাকবে। এভাবে ক্রমাগত আঘাতে যখন লাটিমটি বৃত্তের বাইরে বেরিয়ে আসবে, তখন যে লাটিমটির আঘাতে সেটি বাইরে বেরিয়ে আসলো, সে লাটিমটিই আবার একই ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় অর্থাৎ বৃত্তের ভেতরে তার স্থান হয় এবং আগের মতো অন্য প্রতিযোগীদের লাটিমের আঘাতে জর্জরিত হতে হয়।

৬. কানামাছি

[ভোলা সদর উপজেলার অনুরূপ]

চোউক পলানি বা পলাপলি

[ভোলা সদর উপজেলার অনুরূপ]

গুটি খেলা (বিলুপ্তপ্রায়)

[ভোলা সদর উপজেলার অনুরূপ]

ষোলগুটি

[ভোলা সদর উপজেলার অনুরূপ]

ব্যাঙ ব্যাঙ খেলা

[ভোলা সদর উপজেলার অনুরূপ]

অ্যাক্কা দোক্কা

[ভোলা সদর উপজেলার অনুরূপ]

ডাগুাবারি (বিলুপ্তপ্রায়)

[ভোলা সদর উপজেলার অনুরূপ]

www.pathagar.com

তথ্যসূত্র

১. শফিকুল মাওলা ফারুক (শ.ম.ফারুক), পিতা : প্রয়াত সিকান্দার আহমদ, মাতা : ফিরোজা বেগম, শিক্ষা : বি.এ. (অনার্স), এম.এ., বয়স : ৫১ বছর, পেশা : অধ্যাপনা, সাংবাদিকতা, ঠিকানা : গ্রাম : চরখলিফা, ডাকঘর : দিদারুল্লা, জেলা : দৌলতখান

২. সুরাইয়া বেগম, স্বামী : এম. এ. তাহের, বয়স : ৫৫ বছর, পেশা : গৃহিণী, ঠিকানা : গ্রাম : দক্ষিণ সৈয়দপুর, ডাকঘর : সাবেক হাজীপুর মাদ্রাসা, উপজেলা : দৌলতখান

৩. আজিমউদ্দিন লিটন, পিতা : প্রয়াত সালাহ্উদ্দিন খান, মাতা : প্রয়াত অহিদা বেগম, শিক্ষা : বিএ, বয়স : ৩৫ বছর, পেশা : সাংবাদিকতা, চাকরি, ঠিকানা : গ্রাম : দড়িচাঁদপুর, ডাকঘর : হাট শশীগঞ্জ, উপজেলা : তজুমুদ্দিন

৪. তানিয়া, পিতা : মোশারেফ হোসেন হাওলাদার, মাতা : আখতার জাহান, শিক্ষা : বিএ, বয়স : ২১ বছর, পেশা : ছাত্রী, ঠিকানা : গ্রাম : পক্ষীয়া, ডাকঘর : বোরহানগঞ্জ, উপজেলা : বোরহানগঞ্জ

৫. রোকসানা বেগম, পিতা : মোশারেফ হোসেন হাওলাদার, মাতা : আখতার জাহান, শিক্ষা : বিএ, বয়স : ২৩ বছর, পেশা : গৃহিণী, ঠিকানা : গ্রাম : পক্ষীয়া, ডাকঘর : বোরহানগঞ্জ, উপজেলা : বোরহানউদ্দিন.

৬. 'তনুজা জাহান, স্বামী : নজরুল ইসলাম, শিক্ষা : এসএসসি, বয়স : ২৭ বছর, পেশা : গৃহিণী, ঠিকানা : সদর রোড, ভোলা

৭. মোঃ অজিউল্লাহ মিয়া, পিতা : প্রয়াত আবদুর রহমান মিয়া, মাতা : প্রয়াত তহুরা খাতুন, বয়স : ৭১ বছর, পেশা : ব্যবসা, ঠিকানা : গ্রাম : ধলিগৌরনগর,ডাকঘর : সিরাজিয়া মাদ্রাসা, উপজেলা : লালমোহন

৮. সালেহা খাতুন (পারুল), স্বামী : মোঃ অজিউল্লাহ মিয়া, শিক্ষা : বি. এ., বয়স : ৫৭, পেশা : গৃহিণী, ঠিকানা : গ্রাম : ধলিগৌরনগর, ডাকঘর : সিরাজিয়া মাদ্রাসা, উপজেলা : লালমোহন

৯. কাজী মোহাম্মদ রাশেদ, পিতা : প্রয়াত মোহাম্মদ আলী, মাতা : জাকিয়া বেগম শিক্ষা : এসএসসি, বয়স : ৪০ বছর, পেশা : ব্যবসা, ঠিকানা : দক্ষিণ ফ্যাশন, ডাকঘর ও উপজেলা : চরফ্যাশন

১০. মো: আলমগীর হোসেন, পিতা : মোহাম্মদ নূর হাফেজ মিয়া, মাতা : হাসিনা বেগম, শিক্ষা : বিএ (অনার্স) এম.এ, পেশা : শিক্ষকতা, বয়স : ৩৩ বছর, ঠিকানা : গ্রাম : চর ফৈজুদ্দিন, ডাকঘর : হাজীরহাট, উপজেলা : মনপুরা

১১. ইয়ানুর নাহার রুমা, স্বামী : মোঃ আলমগীর হোসেন, শিক্ষা : বিএ, বয়স : ২৭ বছর, পেশা : গৃহিণী, ঠিকানা : গ্রাম : চরফৈজুদ্দিন, ডাকঘর : হাজীরহাট, উপজেলা : মনপুরা

১২. মোহাম্মদ মোতাসিম বিল্লাহ, বাবা : প্রয়াত জাফর আলী, বয়স : ৬৩ বছর, শিক্ষা : বিএ, পেশা : ব্যবসা, ঠিকানা : ডাকঘর : চরনোয়াবাদ, উপজেলা : ভোলা

www.pathagar.com

লোকপেশাজীবী গ্রুপ

ভোলা সদর উপজেলা

১. ধোপা

একসময় এখানে অনেক ধোপা ছিল। এরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে শাড়ি, সালোয়ার, কামিজ, সার্ট, প্যান্ট, পায়জামা, পাঞ্জাবি, বিছানাচাদর ইত্যাদি সংগ্রহ করে পুটুলি বেঁধে নিয়ে যেত। তারপর নিকটস্থ পুকুরে পরিষ্কার ও ধুয়ে ইস্ত্রি করে দু'তিনদিন পর যথাসময়ে আবার বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসতো। এটিই ছিল তাদের একমাত্র বংশানুক্রমিক পেশা। এর পাশাপাশি অন্য কোনো পেশায় এরা যুক্ত ছিল না। কিন্তু নানা কারণে ধোপারা এই বংশানুক্রমিক পেশা থেকে ক্রমশ সরে গেছে। এছাড়া এখানে আর একটি বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে। বাংলার সামাজিক ব্যবস্থাসমূহ গড়ে উঠে উন্নয়নের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সঙ্গে, সময়ের চাহিদা ও দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে। পেশার বেলাতেও এর কোনো অন্যথা হয় না। এ কারণেই পুরনো পদ্ধতিতে, অর্থাৎ হাত দিয়ে কাপড় ধোয়ার যে ব্যবস্থা যুগযুগ ধরে চলে আসছিল তা আধুনিক যন্ত্রাদির দ্বারা সম্পন্ন হওয়ার প্রেক্ষিতে ধোপারা সময় ও ব্যয়ের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করতে পারছিল না। এছাড়া সাবান, সোডা, নীল ইত্যাদির মূল্য পর্যায়ক্রমে বেড়ে যাওয়ায় তাদের ব্যয়ও বেড়ে যায়। আরো রয়েছে ঝড়, বৃষ্টি, মেঘলা আকাশ ইত্যাদি বৈরী প্রাকৃতিক অবস্থা, সন্তানদের শিক্ষা লাভ করে উন্নততর জীবনে প্রবেশ ইত্যাদি নানা কারণেই ধোপারা তাদের বংশানুক্রমিক পেশা ত্যাগ করে অন্য পেশায় চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে। এখন এই শহরে হাতে গোনা দুএকটি পরিবার মাত্র আছে, যারা বংশানুক্রমিক ধারাটি অব্যাহত রেখেছে।

সামাজিক জীবনে ধোপী সম্প্রদায়ের প্রয়োজন শুধু জামাকাপড় ধোয়াতে সীমাবদ্ধ নয়, সনাতন ধর্মাবলম্বীদের জন্ম থেকে শুরু করে মৃত্যুর পরেও এদের প্রয়োজন থেকে যায়। সন্তান প্রসবের পর শুদ্ধ বা পবিত্র হওয়ার জন্য ধোপাকে কাপড় কাচার 'সোডা' স্পর্শ করে দিতে হয়। ঐ সোডা দিয়ে ঘরের সমস্ত কাপড়-চোপড় পরিষ্কার করলেই কেবল শুদ্ধ হওয়া যায়। গুরুজনের মৃত্যুর পর গোত্র ভেদে ১১ দিন, ১৫ দিন বা ৩০ দিন অশৌচ পালনের পর শুদ্ধ হতে কাপড়-চোপড় ধোয়ার জন্যও ধোপাকে সোডা ছুঁয়ে দিতে হয়। বিয়ের আগে গায়ে হলুদের অনুষ্ঠানে বর ও কনের বাড়িতে বাটা হলুদ স্পর্শ করে দিলেই কেবলমাত্র তাদের গায়ে হলুদ দেওয়া যায়।

এই সম্প্রদায়ের মানুষের বিশেষ দিক হলো, বিয়ের জন্য পাত্রী নির্বাচনে এরা কোনো বাছ-বিচার করে না।

২. কর্মকার বা কামার

আমাদের অঞ্চল কৃষিপ্রধান অঞ্চল। এখানকার কোনো কোনো হাট-বাজারে কামার পট্টি অর্থাৎ লোহার বিভিন্ন জিনিস তৈরির জন্য আলাদা স্থান নির্ধারণ করে দেওয়া থাকলেও

www.pathagar.com

কোথাও কোথাও এরা বিচ্ছিন্নভাবেও কাজ করে থাকে। কামারদের পেশাও বংশগত পেশা। যুগ যুগ ধরে তারা বংশানুক্রমিকভাবে এই পেশায় নিয়োজিত রেখেছে। এরা কৃষিকাজে ব্যবহারের জন্য লোহার ও লোহার সাথে সংযুক্ত কাঠের তৈরি যন্ত্রপাতি যেমন, লাঙল, কোদাল, খন্তা, কুড়াল, কাঁচি, ছেনি, মাটি নিড়ানি, কাটালি, কাস্তে থেকে শুরু করে গৃহস্থালির দৈনন্দিন কাজে ব্যবহৃত দা, বটি, ছুরি, নারিকেল কোড়ানি, ইত্যাদি তৈরি করে বাজারের দোকানসমূহে কিংবা ক্রেতার কাছে সরাসরি সরবরাহ করে কিংবা এরা নিজেদের দোকানের সামনে সাজিয়ে রাখে। অনেক সময় ক্রেতারা বাজারের দোকানসমূহের ওপর নির্ভর না করতে পেরে মানসম্মত খাঁটি জিনিসটি পাওয়ার জন্য কর্মকারদের দোকানে সরাসরি অর্ডার দিয়ে প্রয়োজনীয় জিনিসটি তৈরি করিয়ে নেন। এছাড়া দা, বটি, ছুরি, কাঁচি ইত্যাদি ভোতা হয়ে গেলে এগুলিকে 'ধার' বা 'শান' দেওয়ার জন্যও তাদের শরণাপন্ন হতে হয়। এটাকে 'নুন পানি' দেওয়া বলা হয়ে থাকে। এই নুন-পানি দেওয়ার পদ্ধতি হলো, দা বা বটি প্রথমে আগুনে পোড়াতে হয়। পোড়ানোর পরে দা-বটির 'ভোগে' অর্থাৎ ধারালো স্থানে লবণ লাগাতে হয়। তারপর আবার পুড়িয়ে ঠাণ্ডা করতে হয়। এরপর রেত দিয়ে ঘষে 'ধার' করে পুনরায় আগুনে 'টেম্পার' দেওয়া হয়।

কর্মরত কর্মকার বা কামার মহাজনপট্টি, ভোলা

নতুন কোনো জিনিস তৈরির প্রথম পর্যায়ে চাহিদা ও মাপ অনুযায়ী একটি লৌহখণ্ড কয়লার আগুনের তাপে পোড়ানো হয়। আগুনে তাপ দেওয়া হয় হাপড়ের সাহায্যে।

www.pathagar.com

চামড়ার তৈরি হাপড়ের তিনটি অংশ। এর ভেতরে বালিশের মতো একটি জিনিস দেওয়া থাকে। সামনে থাকে একটি মাথা। পাশে বেত দিয়ে আটকানো থাকে। শিকল দিয়ে যখন টানা হয় তখন ভেতরে একটা হাওয়া তৈরি হয় এবং এই বাতাস আগুনের ওপর রাখা কয়লাকে উত্তপ্ত করে তোলে। শিকল টানার গতির ওপর আগুনের তাপ হ্রাস-বৃদ্ধি পায়। লৌহখণ্ড যখন আগুনের তাপে লালবর্ণ ধারণ করে নরম হয়ে যায় তখন তাকে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন জিনিস তৈরি করা হয়। গৃহস্থালি ও কৃষিকাজে যেসব জিনিস ব্যবহার করা হয় সেগুলো তৈরি করতে কর্মকারদের যা যা যন্ত্রপাতি ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো হাপড়, যুগাল, হামার, সাঁড়াশি, ছেনি, শাবল, সাজ ইত্যাদি। বর্তমানে এই পেশাজীবী শ্রেণির সংখ্যা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। যদি শুধু ভোলা পৌর এলাকার কামার পট্টির কথা ধরা হয়, তাহলে বলা যায়, আগে ভোলা পৌর এলাকায় প্রায় ৩০/৩২ ঘর কর্মকার ছিল। বর্তমানে এই সংখ্যা ১০/১২। পরিশ্রমের তুলনায় লাভ অতি সামান্য। জনবলের সংকট, কয়লার দাম বৃদ্ধি, স্থায়ী আবাসনের অভাব, দোকানের ভাড়া বৃদ্ধি, এ-জাতীয় কাজে ব্যবহারের জন্য দোকান ভাড়া দিতে মালিকের অনীহা, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, প্রতিটি মুহূর্তে জীবনের ঝুঁকি ইত্যাদি বহুবিধ কারণে এই শিল্প আজ অনেকটাই বিলুপ্তির পথে।

৩. নাপিত

ক্ষৌরকার, নাপিত বা শীল এ অঞ্চলে মোটামুটি একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। তবে গ্রামাঞ্চলে বেশির-ভাগ ক্ষেত্রেই যারা ক্ষৌরকর্ম করেন তাদের 'নাপিত' না বলে 'শীল' বলা হয়। এই শ্রেণিভুক্ত পেশাজীবীরাও বংশানুক্রমিকভাবেই স্বীয় পেশায় নিয়োজিত রয়েছেন। একসময় এই পেশাজীবীরা সপ্তাহের কোনো একটি নির্দিষ্ট দিনে বয়স্কদের দাড়ি-গোফ কাটার জন্য এবং প্রতি মাসের যে-কোনো ছুটির দিনে বাড়ির শিশু-কিশোর-যুবকদের চুল কাটার জন্য উপস্থিত হতেন। সঙ্গে নিতেন ক্ষুদ্রাকার একটি কাঠের বাক্স, যার মধ্যে থাকতো কাঁচি, ক্ষুর, নরুন, ক্ষুদ্র একখানা আয়না, ক্ষুর ধার করার জন্য ক্ষুদ্র একটি পাথর ও ফিটকিরির টুকরা। তখনতো আর ডেটল ইত্যাদির এত বহুল ব্যবহার ছিল না। কোনো স্থানে সামান্য একটু কেটে গেলে, চামড়া উঠে গেলে বা রক্ত বের হলে সঙ্গে সঙ্গে সেখানটায় ফিটকিরি ঘষে দেওয়া হতো বা চাপ দিয়ে ধরা হতো। অবশ্য ফিটকিরির ব্যবহার এখনও শহরাঞ্চলে রয়েছে।

একজন নাপিত একসঙ্গে এক বাড়ির অনেকজনকে একত্রে বসতেন। তারপর একজন একজন করে ডেকে ক্ষৌরকর্ম সম্পাদন করতেন। অনেক বয়স্ক মানুষ এসে জানতে চাইতেন 'পাশ ক্ষুর' আছে কি-না। এটা সবার কাছে থাকতো না। যার কাছে এই ক্ষুর থাকতো, গ্রাহক সেটা হাতে নিয়ে পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে চলে গিয়ে লজ্জাস্থানের লোম কেটে ফিরে আসতেন।

পরবর্তীকালে তিন রাস্তা বা চার রাস্তার মোড়ে বা কোনো জনবহুল স্থানে বা হাটে-বাজারে ক্ষৌরকারদের গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় ধীরে ধীরে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ক্ষৌরকর্ম করার প্রবণতা হ্রাস পায়। আরো পরে শহরে-বন্দরে সদ্যনির্মিত মার্কেটগুলোতে এবং অফিস-আদালতের কাছে সুসজ্জিত সেলুন গড়ে ওঠে এবং এসব

www.pathagar.com

সেলুনগুলোতে অনেক আধুনিক, রুচিসম্মত ও আরামদায়ক ব্যবস্থা সংযোজনের ফলে সনাতন ক্ষৌরকারদের পেশায় নেতিবাচক প্রভাব পড়ে এবং তাদের পৈতৃক পেশার প্রতি আগ্রহ হ্রাস পায়। এদের অনেকে অন্যান্য পেশার সাথে সংযুক্ত হয়। কেউ কেউ নতুন ব্যবস্থাপনায় গড়ে ওঠা উন্নতমানের সেলুনগুলোতে চাকরি নেয়। এছাড়া এদের সন্তান-সন্ততিরাও লেখা পড়ার প্রতি ক্রমান্বয়ে আগ্রহী হয়ে ওঠে।

নাপিত বা শীল বা ক্ষৌরকারের প্রয়োজন শুধু চুল-দাড়ি-গোঁফ কাটার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় ও সামাজিক প্রয়োজনের সময় তাদের উপস্থিতি একান্তভাবেই আবশ্যকীয় হয়ে পড়ে। মা-বাবার মৃত্যুতে অশৌচ পালনের পর চুল-দাড়ি কেটে নাপিত ওই বিশেষ ব্যক্তিকে পবিত্র করে তোলেন। বিয়ের প্রাক্কালে অধিবাসের আগে বর-কনের নখ কেটে দেওয়া থেকে শুরু করে বিয়ের সময় ব্রাহ্মণের আগে নাপিতকে গৌরবচন বলতে হয়। তারপর পুরোহিত তার কাজ শুরু করতে পারেন।

৪. মুচি

মুচিদের পেশাগত কাজে নতুন কোনো প্রযুক্তির সংযোজন ঘটেনি। এই শ্রেণির পেশাজীবীরা কখনো কখনো কোনো একটি স্থানে সংঘবদ্ধভাবে অর্থাৎ কয়েকজন মিলে একসঙ্গে বসেন, আবার বিচ্ছিন্নভাবেও বসে কাজ করেন। সাধারণত অফিস, আদালত, স্কুল, কলেজ, সিনেমা হলের সামনে, বাজারে, অধিক জনসমাগমপূর্ণ স্থানে তারা বসে কাজ করেন।

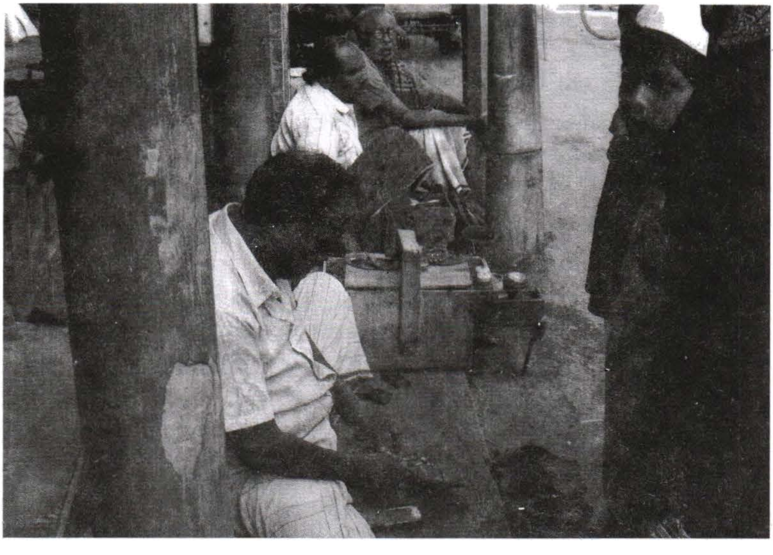

কর্মরত কর্মকার বরিশাল দালানের সামনে, ভোলা

www.pathagar.com

তারা শুধু জুতা সেলাই, মেরামত ও রং পলিশ করার কাজই করেন না, মাঝে মাঝে বাচ্চাদের স্কুলের ব্যাগ কিংবা মহিলাদের ভ্যানিটি ব্যাগের চেইন ছিঁড়ে গেলে বা নষ্ট হয়ে গেলে তা পুনঃস্থাপন করে থাকেন। ট্রাভেল ব্যাগের মেরামত ইত্যাদি কাজও নিপুণভাবেই করে থাকেন। একটি মাঝারি আকারের কাঠের বাক্সে রাখা লোহার হ্যান্ডেল, বাটাল, সারাইশ, হাতুড়, জাম্বুরা, শলা, বোমাকাটা, কালি, রং, ব্রাস, ও জুতার বিভিন্ন ধরনের সোল ও ছোট ছোট চামড়ার টুকরা তাদের পেশাগত কর্মসম্পাদনে প্রয়োজন হয়।

৫. জাইল্যা বা জেলে

ভোলা জেলা পত্তনের সময় থেকেই এখানে জেলে বা জাইল্যা সম্প্রদায়ের বসবাস শুরু হয়। পার্শ্ববর্তী নোয়াখালী, সন্দ্বীপ ও বরিশাল জেলা থেকে এদের আগমন ঘটে। প্রথমদিকে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন এই পেশায় যুক্ত হলেও পরবর্তী সময়ে মুসলমানরাও এতে যোগ দেয়। বর্তমানে নদী-নালা, খাল-বিলে মাছের উৎপাদন ও সরবরাহ কমে যাওয়ায় ক্রমশ এই পেশার প্রতি অনেকের আগ্রহ হ্রাস পেলেও সমগ্র ভোলা জেলায় এই পেশাজীবী সম্প্রদায় মাছ ধরার কাজে নিয়োজিত রয়েছে। ভোলা জেলার ইলিশ মাছের অন্যতম প্রধান ব্যবসা কেন্দ্র হচ্ছে দৌলতখান। এই উপজেলায় ইলিশের শতাধিক আড়ত রয়েছে, যেখানে প্রায় ২০ হাজার মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। উল্লেখযোগ্য আড়তগুলো হচ্ছে, মেদুয়ার মুন্সির হাট, চরপাতা ক্লোজড্যাম, চকিঘাট, দৌলতখান থানার পেছনে বটতলা, পাতারখাল, গুপ্তেরবন্দর, মাঝির হাট, সাতবাড়িয়া, ও হাজীরহাট মাছ ঘাট।

৬. বারুই বা পানচাষি

পান বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আমাদের পারিবারিক জীবনে খাওয়া-দাওয়ার পর কিংবা অতিথি আপ্যায়ন থেকে শুরু করে কনে দেখা, বিয়ে, পূজা-পার্বণ, উৎসব, আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদিতে পানের ব্যবহার অতি প্রাচীনকাল থেকেই। বিয়ের সূচনাই তো হয় পান-চিনি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। বিয়ে 'পানখিলি', শুভদৃষ্টি, 'পান ভাঙ্গানি', 'ঝাড়পান' প্রভৃতি আচার-অনুষ্ঠানে পানের ব্যবহার অত্যাবশ্যক। বাড়ির দরজায়, বৈঠকখানায় বা কাচারি ঘরে কোনো সালিশ-বিচারে আর কিছু না হলেও প্লেট ভর্তি পান দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়।

এ উপজেলায় একসময় প্রচুর পান উৎপন্ন হতো। এখন ততোটা না হলেও উৎপাদন একেবারে মন্দ নয়। যারা পান চাষে নিয়োজিত তাদেরকে 'বারুই' বলা হয়। ওপরে ছাউনি ও পাশে বেড়া দেওয়া পান উৎপাদনের ক্ষেতকে 'বরজ' বলা হয়। পানক্ষেতের এক একটি সারিকে এক একটি বরজ বলা হয়। এভাবে একটি ক্ষেতে ৫০০, ৭০০, ১০০০ বা ততোধিক বরজ থাকে। দুটি সারির মধ্য দিয়ে হাঁটাচলা করা যায়। একটি সারিতে ৭টি লতা থাকলে তাকে সাত গাইছ্যা, দশ লতা থাকলে দশ গাইছ্যা, পনেরো লতা থাকলে পনেরো গাইছ্যা, এভাবে সারির নামকরণ করা হয়ে থাকে। পানের লতা বেয়ে ওপরের দিকে উঠার জন্য অর্থাৎ লতা 'বাওয়ানোর' জন্য

www.pathagar.com

একটু পর পর নলি বাঁশ বা সুপারি গাছের 'চেড়া' (চিকন ও লম্বা খণ্ড) মাটিতে পুঁতে দেওয়া হয়। পানের লতাগুলো রোদ ও কুয়াশা থেকে রক্ষা করার জন্য ওপরে খেজুর পাতার ছাউনি দেওয়া হয়। আগে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজনই কেবল পান চাষ করতো, এখন মুসলমানরাও পান চাষ করে থাকে। পানক্ষেতের ভেতরে মরিচ ও বেগুনও চাষ করা যায়।

৭. চুনারু

চুন পানের সাথে খাওয়ার অন্যতম উপকরণ। একসময় গ্রামের ধোপারা শামুক থেকে চুন তৈরি করতো। পরবর্তীকালে অনেকে এটাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে। ঝিনুক থেকেও চুনারুরা চুন তৈরি করতো। বর্তমানে ঝিনুক দুস্প্রাপ্য হওয়ায় শামুক থেকে চুন তৈরি করা হয়।

ভোলার শামুক, চুন শিল্প

একসঙ্গে অনেক শামুক সংগ্রহ করে পেট কেটে নাড়ি-ভুড়ি পরিষ্কার করে খোসাটাকে পোড়ানো হয়। তারপর এগুলোকে গুঁড়া করে পরিমাণ মতো পানি মিশিয়ে চুন তৈরি করা হয়। আগে এ অঞ্চলে যথেষ্ট পরিমাণে চুন উৎপাদন হলেও বর্তমানে যশোরের নওয়াপাড়া থেকে শামুকের পাউডার আমদানি করে এখানে এনে চুন তৈরি করা হয়।

www.pathagar.com

৮. 'ওস্তা' বা হাজাম

মুসলমান বালকদের খৎনা করার কাজে নিয়োজিত পেশাজীবীরা হাজাম নামে পরিচিত। আঞ্চলিক ভাষায় 'ওস্তা' নামেও সম্বোধন করা হয়। একসময়ে এরা বাঁশের খুব পাতলা ও মসৃণ 'চেরা' দিয়ে মুসলমানি করতেন। বেশ কিছুদিন আগে থেকে তারা ব্লেড ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন। শুধু মুসলমানি নয়, পশু ও মুরগিকে খাসি করার কাজেও হাজামরা সিদ্ধহস্ত। গ্রামে মহিলারাই মুরগিকে খাসি করে থাকেন।

যে পরিবারের বালকের মুসলমানি করা হয়, সেই পরিবারের পক্ষ থেকে নতুন লুঙ্গি ও পাঞ্জাবি উপঢৌকন দেওয়া হয় ওস্তাকে। এছাড়া ওস্তার সম্মানার্থে ভুরিভোজন তো রয়েছেই।

৯. রাজমিস্ত্রি

ইট-সুরকি সিমেন্ট, বালি দিয়ে বিভিন্ন ধরনের আবাসগৃহ, দোকানপাট, মসজিদ-মন্দির ইত্যাদি নির্মাণে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা রাজমিস্ত্রি নামে অভিহিত। এ অঞ্চলের শহর ও গ্রামাঞ্চলে প্রতিদিন নিত্য নতুন স্থাপনা অব্যাহতভাবে গড়ে উঠতে থাকায় রাজমিস্ত্রিদের চাহিদা ও সংখ্যাও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। রাজধানী ঢাকায় রাজমিস্ত্রিদের বিপুল চাহিদা থাকায় এ-এলাকা থেকে অনেক রাজমিস্ত্রি সেখানে গিয়ে কাজে যোগদান করছে।

১০. দরজি

এ শ্রেণির পেশাজীবীদের এ অঞ্চলে 'খলিফা'ও বলা হয়ে থাকে। অনেক আগে ঢাকার বিক্রমপুর ও ফরিদপুর এলাকা থেকে এ-পেশায় পারদর্শীরা এখানে এসে বসতি স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে, স্থানীয় অধিবাসীরাও এ-পেশায় আগ্রহী হয়ে ওঠে এবং বর্তমানে পর্যাপ্ত সংখ্যক দরজি এ-পেশায় নিয়োজিত রয়েছেন।

১১. ছৈয়াল

বাঁশ, খড়, ছন, গোলপাতা, ইত্যাদি দ্বারা যারা ঘর তৈরিতে পারদর্শী, তাদের ছৈয়াল বলা হয়। এখন মোরগের খাঁচা, ওড়া, ডোলা, চাই, আনতা, গরা, কুলা, ডালা, সাজি, চালনি ইত্যাদি দ্রব্যাদির প্রস্তুতকারকদেরও এ এলাকায় ছৈয়াল বলা হয়ে থাকে। বর্তমানে ভোলায় ছন, খড় ও গোলপাতার ঘরের কোনো অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। এখানে এখন 'ছনও' উৎপাদন হয় না। গোলাপাতাও আমদানি হয় না। কাজেই ছৈয়ালদের অস্তিত্বও হুমকির মুখে পড়ে। যারা একেবারেই দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করে, তারা নিজেরাই খেজুর পাতা, নারিকেল পাতা, পলিথিন ইত্যাদি দিয়ে নিজেদের ঘর নিজেরাই তৈরি করে নেয়। আজকাল প্লাস্টিকের তৈরি দ্রব্যসামগ্রীর বিপুল উৎপাদন ও সরবরাহের ফলে বাঁশ-বেতের তৈরি দ্রব্যাদির চাহিদাও ধীরে ধীরে কমে যাওয়ায় ছৈয়ালদের পেশা সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে এবং তারা পেশা পরিবর্তনে বাধ্য হচ্ছে।

১২. কাঠমিস্ত্রি বা সুতার

কাঠের বিভিন্ন আসবাবপত্র, বিচিত্র নকশাযুক্ত দরজা-জানালা ইত্যাদি তৈরিতে যারা নিয়োজিত তারাই কাঠমিস্ত্রি বা সুতার নামে পরিচিত। এই শ্রেণির পেশাজীবীদের

www.pathagar.com

অনেকের নিজস্ব দোকান আছে। দোকানে বসেই তারা আসবাবপত্র সরবরাহের অর্ডার নিয়ে থাকেন। অনেকে আবার সেসব দোকানে আসবাবপত্র তৈরির চাকরি করেন। আবার অনেক কাঠমিস্ত্রি আছেন যারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে আসবাবপত্র তৈরির কাজ করে থাকেন। আর এক শ্রেণির কাঠমিস্ত্রি আছেন যারা টিনের ঘর তৈরিতে বিশেষভাবে পারদর্শী। এরা আবার ফার্নিচারের কাজে অতটা অভিজ্ঞ নন।

১৩. ডোম

সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মৃতদেহের সৎকার এবং কোনো মৃতদেহের ময়নাতদন্তে এই সম্প্রদায়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শুকর পালনও এদের অন্যতম পেশা।

১৪. ধাঙ্গড়

একসময় নিম্নবর্ণের হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ এই পেশায় নিয়োজিত ছিল। জীবিকার প্রয়োজনে এখন মুসলমানরাও এই পেশাকে গ্রহণ করেছে। রাস্তা ঝাড়ু দেওয়া ছাড়াও এরা বাসা-বাড়ির পানির ট্যাঙ্কও পরিষ্কার করে থাকে। তবে এদের সংখ্যা তেমন উল্লেখযোগ্য নয়।

১৫. গোয়ালা

গরু-মহিষের মালিকরাই একসময় দু বয়ে এনে বাজারে বিক্রি করতো। এখন দুধের ব্যবসায়ের সাথে আরো দুটি মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণির সৃষ্টি হয়েছে। এক শ্রেণি গরু-মহিষের মালিককে দাদন দিয়ে তাদের কাছ থেকে দুধ সংগ্রহ করে বাজারে আরেক শ্রেণির বেপারীর কাছে বিক্রি করে। এই বেপারিদের কাছ থেকেই ভোক্তারা দুধ কিনে থাকে। মোটকথা, এখন দুধের ব্যবসায়ের সাথে তিনটি শ্রেণি যুক্ত রয়েছে।

১৬. ওজা (ওঝা) বা খোনকার

প্রধানত সাপে কাটা রোগীকে ঝাড়ফুঁক করে সুস্থ করে তোলা অর্থাৎ ঝাড়-ফুঁক করে সাপের বিষ নামানোর কাজে নিয়োজিতদের 'ওঝা' হিসেবে আখ্যায়িত করা হলেও এরা অন্যান্য কিছু রোগের নিরাময়েও ঝাড়-ফুঁক করে থাকেন। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই এই পেশার সাথে জড়িত।

'খোনকার' হিসেবে পরিচিত মুসলিম সম্প্রদায়ের কিছু মানুষ বিভিন্ন ধরনের ঝাড়-ফুঁক যেমন, জন্ডিসের ঝাড়া, 'বাতাস লাগা', 'উপরির দোষ' কাটানো, নজর লাগা, মেয়েদের বিয়ে-শাদী বন্ধ করা কাটানো, ভূত-পেত্নী ও জীনের 'আসর' ছাড়ানো, বন্ধ্যা রমণীদের সন্তান লাভ, ইত্যাদি থেকে শুরু করে দীর্ঘদিন ধরে রোগে ভুগছে এমন রোগীদের নিরাময়ের জন্য ঝাড়-ফুঁক করেন ও তাবিজ-তুমার, পানি পড়া, তেল পড়া, প্লেট বা বাসন পড়া, গুড় পড়া, চিনি পড়া ইত্যাদি দিয়ে থাকেন।

১৭. ময়রা

মিষ্টি জাতীয় খাদ্য তৈরি ও বিক্রয়ের সাথে জড়িতরাই ময়রা নামে পরিচিত। আগে সনাতন ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিরা এই পেশার সাথে জড়িত থাকলেও বর্তমানে মুসলিম সম্প্রদায়ের অনেক পেশাজীবী এই ব্যবসায়ের সাথে জড়িত। জেলা ও উপজেলা

www.pathagar.com

শহরের মান বৃদ্ধি, বিভিন্ন অফিস-আদালত, নতুন নতুন ব্যাংক, বীমা, এনজিও অফিস স্থাপন এবং উন্নয়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় মিষ্টিজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন ও বিক্রয়ের পরিমাণও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। মিষ্টির দোকানসমূহে সাধারণত রসগোল্লা, রসমালাই, কালোজাম, লালমোহন, আমিত্তি, ছানার সন্দেশ, ছানার বরফি সন্দেশ, কাঁচাগোল্লা ইত্যাদি প্রস্তুত ও বিক্রয় করা হয়ে থাকে। এছাড়া এসব দোকানে কাঁচা মইষা দধি তৈরি ও বিক্রয় করা হয়ে থাকে।

১৮. কসাই

এই সম্প্রদায়ের লোকেরা গরু-মহিষ, ছাগল জবাই করে মাংস ও চামড়া বিক্রি করে তাদের দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহ করে। এই পেশার সাথে জড়িত সবাই মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত।

১৯. ধুনকর

ধুনাচি, ধুনচি বা ধুনুচির সাহায্যে তুলা বা তুলাজাতীয় দ্রব্যাদির আঁশ ধুনে বা টেনে আলাদা করে লেপ, তোষক, জাজিম, বালিশ ইত্যাদি তৈরিতে নিয়োজিত পেশাজীবীরা ধুনকর বা ধুনকার নামে অভিহিত। সাম্প্রতিককলে তুলা ও নারিকেলের ছোবড়ার সাথে পোশাকশিল্পে ব্যবহৃত ঝুট ও অন্যান্য উপকরণাদিও বালিশ ও জাজিম তৈরিতে ব্যবহৃত হচ্ছে।

একসময়ে এই সম্প্রদায়ের মানুষ শ্রাবণ মাসে ধনু পূজা করতো বিধায় মুসলমানরা এদের একই সম্প্রদায়ভুক্ত বলে মেনে নিতে দ্বিধান্বিত ছিল।

দৌলতখান উপজেলা

১. জেলে বা জাইল্যা

নদীতীরবর্তী দৌলতখানের জেলে সম্প্রদায় নদীতে ও খালে-বিলে মাছ ধরে ও বাজারে বিক্রয়ের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে। একসময় শুধু হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষই মৎস্য শিকার ও বিক্রির ব্যবসার সাথে জড়িত ছিল। মুসলমানরা এই পেশাকে খুব অবজ্ঞার চোখে দেখতো। অনেকদিন হয়, তারা নিজেরাও জীবিকার প্রয়োজনে এই পেশা বেছে নিয়েছে।

২. নাপিত

শিশু-কিশোর-যুবক-বৃদ্ধদের ক্ষৌরকর্ম করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন উপজেলা শহর দৌলতখান ও এর বিভিন্ন গ্রামে-গঞ্জে বসবাসকারী ক্ষৌরকার বা নাপিত সম্প্রদায়। তবে শুধু চুল ও দাড়ি-গোঁফ কাটার মধ্যেই তাদের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের বিয়ের গায়ে হলুদের অনুষ্ঠানে বর ও কনের বাড়িতে গিয়ে তারা বাটা হলুদ ছুঁয়ে দেন, মা-বাবার মৃত্যুতে অশৌচ পালনের পর মৃত ব্যক্তির সন্তানদের চুল-দাড়ি কেটে পবিত্র করে তোলেন, বিয়ের অনুষ্ঠানে অধিবাসের আগে বর ও কনের নখ কেটে দেন।

www.pathagar.com

৩. ধোপা

আধুনিক লন্ড্রি ব্যবসা চালু হওয়ার পর সনাতন ধোপা সম্প্রদায়ের উপার্জনের পরিমাণ অনেকাংশে হ্রাস পায়। তবে লন্ড্রি মালিকদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে অনেকে জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন।

নাপিত বা ক্ষৌরকারদের মতো ধোপা সম্প্রদায়েরও মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সেবাদান করে যেতে হয়। হিন্দু নারীর সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পর তাকে শুদ্ধ বা পবিত্র হতে হয়। এজন্য ধোপা, নাপিতের স্পর্শ করা সোডা দিয়ে তার কাপড়-চোপড় ধুয়ে নিতে হয়। বাবা-মায়ের মৃত্যুর পর অশৌচ পালন শেষে মৃতের সন্তানদের পবিত্র হতে হয়। এজন্যও ধোপার স্পর্শ করা সোডা দিয়ে পোশাক-পরিচ্ছদ ধুয়ে নিতে হয়।

৪. সুতার বা কাঠমিস্ত্রি

এই শ্রেণির পেশাজীবীরা খাট, টেবিল, চেয়ার, সোফা, আলমিরা প্রভৃতি আসবাবপত্রসহ টিন ও কাঠের তৈরি ঘর নির্মাণেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকেন। তবে যারা কেবল ঘর তৈরির কাজেই পারদর্শী তারা খুব কমই উন্নতমানের আসবাবপত্র তৈরি করতে পারেন।

৫. বারই

পান এই এলাকার একটি অন্যতম ফসল। সমগ্র ভোলা জেলায়ই পানচাষীদের বারই বলা হয়ে থাকে। এই 'বারই'রা দাস, কর, সেন, মিত্র, দত্ত ইত্যাদি পদবি ধারণ করে। আগে এখানে প্রচুর পান উৎপাদন হতো। কিন্তু ঘর-বাড়ি নির্মাণের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকায়, বিশেষকরে পান চাষের উপযোগী জমি হ্রাস পেতে থাকায় পানের চাষ আগের চেয়ে অনেকটা হ্রাস পেয়েছে। আরেকটি বিশেষ ব্যাপার এই যে, একই জমিতে দশ-বারো বছরের বেশি পান চাষ করা যায় না।

৬. কর্মকার

সংসারের নিত্যপ্রয়োজনীয় লৌহজাত দ্রব্যাদি নির্মাণে এরা পারদর্শী। এ পেশাজীবীরা স্থানীয়ভাবে 'কামার' নামেই পরিচিত। তারা একটি আস্ত লৌহখণ্ড আগুনে গলিয়ে প্রয়োজন অনুযায়ী দা, বটি, খন্তা, কুড়াল, ছেনি ইত্যাদি আকৃতি দিয়ে থাকেন। এছাড়া এসব লৌহজাত নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদিতে ধার দেওয়ার (শান দেওয়া) কাজও এরা করে থাকেন।

৭. কুমার

দৌলতখানের বাটামারায় ৩/৪টি পরিবার রয়েছে যারা মাটির তৈরি দধির টালি (দধি বসানোর পাত্র) ইত্যাদি তৈরির পেশায় নিয়োজিত রয়েছে।

৮. গোয়ালা

গরু-মহিষের দুধ বিক্রি করে এই সম্প্রদায় জীবনধারণ করে থাকে। তবে এরা অন্য পেশার পাশাপাশিও এই পেশা অবলম্বন করে, যা সংসারের বাড়তি উপার্জনে সহায়ক হয়। অনেক গোয়ালা আছেন যারা নিজেরাই গরু লালন-পালন করে এবং তা থেকে

www.pathagar.com

সংগৃহীত দুধ বাজারে বিক্রয় করে থাকেন। আবার কেউ কেউ আছেন যারা গরুর মালিকের কাছ থেকে দুধ সংগ্রহপূর্বক বাজারে সরবরাহ করে থাকেন।

৯. ময়রা

দুধ দিয়ে ছানা, ঘি, মিষ্টি ইত্যাদি তৈরি ও বিক্রয় করে এরা জীবিকা নির্বাহ করে। গোয়ালারা প্রয়োজন অনুযায়ী দোকানে দুধ সরবরাহ করে থাকে। যারা আদি ময়রা, তারা বিভিন্ন প্রকার মিষ্টান্ন তৈরিতে খুবই সিদ্ধহস্ত। সাম্প্রতিককালে এ উপজেলার 'ঘুইঙ্গার হাটের' মিষ্টি গুণে ও মানে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছে।

১০. ওঝা

সাপের বিষ নামানো, জন্ডিস হলে ঝাড়-ফুঁক করে কিংবা 'মালা' দিয়ে রোগের প্রকোপ কমানো ছাড়াও বিভিন্ন রোগ-ব্যাধিতে ঝাড়-ফুঁক প্রয়োগ করে এরা জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। আধুনিক চিকিৎসাব্যবস্থায় বিভিন্ন রোগের অনেক কার্যকরী ওষুধ বাজারে থাকলেও গ্রামাঞ্চলে ওঝা, বদ্যির প্রভাব খুব একটা হ্রাস পায়নি।

১১. হেকিম

চিকিৎসা পেশায় নিয়োজিত মুসলমানরা 'হেকিম' নামেই সমধিক পরিচিত। এক সময়ে এরা চিকিৎসা ক্ষেত্রে বেশ সুনাম অর্জন করেছিলেন। মূলত ইউনানি পদ্ধতিতেই তাঁরা চিকিৎসা করতেন। সারা দেশের মতোই এ উপজেলায়ও অ্যালোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ব্যবস্থার ব্যাপক বিস্তারের ফলে এবং প্রয়োজনীয় কাঁচামালের অভাবে হেকিমদের চিকিৎসা খ্যাতি এখানে প্রায় বিলুপ্তির পথে।

১২. দরজি

স্থানীয়ভাবে 'খলিফা' নামে পরিচিত। এরা মূলত কাটিং ও সেলাইয়ে অভিজ্ঞ হয়ে থাকেন। যিনি বিভিন্ন মানুষের দেহের মাপ ও পোশাকের ডিজাইন অনুযায়ী কাপড় কেটে থাকেন তিনি 'টেইলর মাস্টার' নামে পরিচিত। তার গলায় সব সময় গ্রাহকের চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী দেহের বিভিন্ন অঙ্গের মাপ নেওয়ার জন্য একটি ফিতা ঝুলানো থাকে। তার অন্য সহযোগীরা সেলাইয়ের কাজে ব্যস্ত থাকেন। তবে যিনি মাপ নিয়ে থাকেন, অর্থাৎ টেইলর মাস্টার নিজেও সেলাই সম্পর্কে অভিজ্ঞ হয়ে থাকেন।

১৩. রাজমিস্ত্রি বা রাজ

এই শ্রেণির পেশাজীবী ইট-সিমেন্ট-বালি রড দিয়ে গৃহনির্মাণে অভিজ্ঞ। ছোট-খাটো নির্মাণ কাজ ছাড়াও এরা একাধিক তলাবিশিষ্ট দালান তৈরিতেও পারদর্শী। তবে এদের অনেকেই এখান থেকে মোটামুটি কাজ শিখে নিয়ে বেশি উপার্জনের আশায় ঢাকা, চট্টগ্রামসহ বড় বড় শহরগুলোতে ভিড় জমায় এবং কাজের সন্ধানও পেয়ে যায়।

১৪. ধুনকর

শীতের আগমনে এই শ্রেণির পেশাজীবীর চাহিদা বৃদ্ধি পায়। তুলা ধুনে লেপ, তোষক, জাজিম, বালিশ ইত্যাদি তৈরি করাই এদের কাজ। তবে বছরের অন্য সময়েও এসব জিনিস তৈরি করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে।

www.pathagar.com

১৫. ওস্তা বা হাজাম

চিকিৎসা-পদ্ধতির প্রসার, বিশেষকরে আজকাল মানুষ অনেকটা স্বাস্থ্যসচেতন হওয়ায় বালকদের মুসলমানি বা খতনা করার কাজে প্রাচীনকাল থেকে পারদর্শী 'হাজাম'দের চাহিদা অনেকটাই কমে গেছে। স্থানীয়ভাবে এই পেশাজীবীরা 'ওস্তা' নামেই পরিচিত। এই কিছুদিন আগে পর্যন্ত তারা খুব পাতলা ও বাঁশের মসৃণ পাতের সাহায্যে মুসলিম বালকদের শিশ্নের অগ্রভাগের চামড়া কেটে ফেলে এবং ক্ষতস্থানটি চুলার পোড়ামাটির গুঁড়া দিয়ে ঢেকে দিয়ে ন্যাকড়ার সাহায্যে পেঁচিয়ে রেখে মুসলমানির পুরো কাজটি সম্পন্ন করতো। ইদানীং তারা বাঁশের মসৃণ পাতের পরিবর্তে ব্লেড ব্যবহার করে থাকেন। মুসলমানি করানোর পর ওস্তাকে ভুরিভোজন করানো হয়, নতুন লুঙ্গি ও পাঞ্জাবি দেওয়া হয় এবং তাকে সামর্থ্য অনুযায়ী সম্মানীও প্রদান করা হয়ে থাকে। তবে, সামর্থ্যবান পরিবারগুলো এই কাজটি বর্তমানে অভিজ্ঞ ডাক্তার দিয়েই করিয়ে থাকেন।

এছাড়া এখানে মুচি, কসাই, রং মিস্ত্রি, রড মিস্ত্রি, ঝাড়ুদার প্রভৃতি শ্রেণির পেশাজীবীও তাদের নিজ নিজ পেশায় নিয়োজিত থেকে জীবিকা নির্বাহ করেন।

লোকপেশাজীবী গ্রুপ : তজুমুদ্দিন উপজেলা

[ভোলা সদর উপজেলা ও দৌলতখান উপজেলার অনুরূপ]

১. জেলে বা জাইল্যা
২. নাপিত
৩. ধোপা
৪. মুচি
৫. সুতার বা কাঠমিস্ত্রি
৬. পলিশমিস্ত্রি
৭. কর্মকার বা কামার
৮. বারই
৯. গোয়ালা
১০. ময়রা
১১. গাছি
১২. দরজি
১৩. রাজমিস্ত্রি বা রাজ
১৪. রডমিস্ত্রি
১৫. রংমিস্ত্রি
১৬. ওয়েল্ডিংমিস্ত্রি
১৭. ধুনকর
১৮. ওঝা
১৯. ওস্তা বা হাজাম
২০. ছৈয়াল

www.pathagar.com

বোরহানউদ্দিন উপজেলা

[ভোলা সদর উপজেলা ও দৌলতখান উপজেলার অনুরূপ]

১. নাপিত
২. ধোপা
৩. মুচি
৪. জাইল্যা বা জেলে
৫. কাঠমিস্ত্রি বা সুতার
৬. পলিশমিস্ত্রি (কাঠের আসবাবপত্র)
৭. কর্মকার বা কামার
৮. রাজমিস্ত্রি বা রাজ
৯. রডমিস্ত্রি
১০. রংমিস্ত্রি
১১. ওয়েল্ডিংমিস্ত্রি
১২. দরজি
১৩. ধুনকর
১৪. ওঝা
১৫. ছৈয়াল
১৬. ওস্তা বা হাজাম
১৭. কুমার
১৮. বারই
১৯. গোয়ালা
২০. ময়রা
২১. গাছি
২২. ধাঙ্গড় বা ঝাড়ুদার

লালমোহন উপজেলা

[ভোলা সদর উপজেলা ও দৌলতখান উপজেলার অনুরূপ]

১. নাপিত
২. ধোপা
৩. মুচি
৪. জাইল্যা বা জেলে
৫. কাঠমিস্ত্রি বা সুতার
৬. পলিশমিস্ত্রি (কাঠের আসবাবপত্র)
৭. কর্মকার বা কামার
৮. রাজমিস্ত্রি বা রাজ
৯. রডমিস্ত্রি
১০. রংমিস্ত্রি
১১. ওয়েল্ডিংমিস্ত্রি

www.pathagar.com

১২. দরজি
১৩. ধুনকর
১৪. ওঝা
১৫. ছৈয়াল
১৬. ওস্তা বা হাজাম
১৭. বারই
১৮. গোয়ালা
১৯. ময়রা
২০. গাছি
২১. ধাঙ্গড় বা ঝাড়ুদার

চরফ্যাশন উপজেলা

[ভোলা সদর উপজেলা ও দৌলতখান উপজেলার অনুরূপ]

১. নাপিত
২. ধোপা
৩. মুচি
৪. জাইল্যা বা জেলে
৫. কাঠমিস্ত্রি বা সুতার
৬. পলিশমিস্ত্রি (কাঠের আসবাবপত্র)
৭. কর্মকার বা কামার
৮. রাজমিস্ত্রি বা রাজ
৯. রডমিস্ত্রি
১০. রংমিস্ত্রি
১১. ওয়েল্ডিংমিস্ত্রি
১২. দরজি
১৩. ধুনকর
১৪. ওঝা
১৫. ছৈয়াল
১৬. ওস্তা বা হাজাম
১৭. বারই
১৮. গোয়ালা
১৯. ময়রা
২০. গাছি
২১. ধাঙ্গড় বা ঝাড়ুদার

মনপুরা উপজেলা

[ভোলা সদর উপজেলা ও দৌলতখান উপজেলার অনুরূপ]

১. নাপিত
২. ধোপা

www.pathagar.com

৩. মুচি
৪. জাইল্যা বা জেলে
৫. কাঠমিস্ত্রি বা সুতার
৬. পলিশমিস্ত্রি (কাঠের আসবাবপত্র)
৭. কর্মকার বা কামার
৮. রাজমিস্ত্রি বা রাজ
৯. রডমিস্ত্রি
১০. রংমিস্ত্রি
১১. ওয়েল্ডিংমিস্ত্রি
১২. দরজি
১৩. ধুনকর
১৪. ওঝা
১৫. ছৈয়াল
১৬. ওস্তা বা হাজাম
১৭. বারই
১৮. গোয়ালা
১৯. ময়রা
২০. গাছি
২১. ধাঙড় বা ঝাড়ুদার

তথ্যসূত্র

১. আবদুর রহমান, পিতা : প্রয়াত মৌলভী একেএম ইউসুফ, মাতা : প্রয়াত জোলেখা খাতুন পেশা : ব্যবসা, বয়স : ৬৫ বছর, ঠিকানা : গ্রাম : চাঁচড়া বাপ্তা, ডাকঘর : বাপ্তা পাইলট উপজেলা : ভোলা সদর, ভোলা
২. এমএ তাহের, পিতা : প্রয়াত আলহাজ্ব গোলাম রহমান, মাতা : প্রয়াত সাহেরা খাতুন, বয়স : ৮০ বছর, শিক্ষা : বিএ, ঠিকানা : গ্রাম : দক্ষিণ সৈয়দপুর, ডাকঘর : সাবেক হাজীপুর মাদ্রাসা, উপজেলা : দৌলতখান, পেশা : সাংবাদিকতা
৩. খোকন কর্মকার, পিতা : জ্যোতিন্দ্রচন্দ্র কর্মকার, মাতা : চারুবালা কর্মকার, শিক্ষা : এইচএসসি, বয়স : ৪০ বছর, পেশা : লৌহজাত দ্রব্যাদি নির্মাণ, ঠিকানা : কালীনাথ রায়ের বাজার, ডাকঘর : ভোলা, উপজেলা : ভোলা সদর
৪. জ্যোতিন্দ্রচন্দ্র কর্মকার, পিতা : প্রয়াত মহেন্দ্রচন্দ্র কর্মকার, মাতা : প্রয়াত হরকুমারী কর্মকার, বয়স ৮৪ বছর, পেশা : লোহজাত দ্রব্যাদি নির্মাণ, ঠিকানা : কালীনাথ রায়ের বাজার, ডাকঘর : ভোলা, উপজেলা : ভোলা সদর
৫. দুলাল চন্দ্র দাস, পিতা : প্রয়াত মোঙ্গল চন্দ্র দাস, মাতা : পারুলচন্দ্র দাস, বয়স : ৪৯ বছর, শিক্ষা : এসএসসি, পেশা : ধোপাখানা (লন্ড্রি) ব্যবসা, ঠিকানা : আবহাওয়া অফিস সড়ক, ভোলা, ডাকঘর : ভোলা, উপজেলা : ভোলা সদর
৬. প্রিয়রঞ্জন সেন, পিতা : সুভাস সেন, মাতা : ছবি রানী সেন, শিক্ষা : এসএসসি, বয়স : ৩০ বছর, ঠিকানা : সেন প্লাজা, সদর রোড, ডাকঘর : ভোলা, উপজেলা : ভোলা সদর

www.pathagar.com

৭. মধুসূদন সাহা, পিতা : গোপীবল্লভ সাহা, মাতা : বীণাপানি সেন, বয়স : ৫৯ বছর, পেশা : ব্যবসা, ঠিকানা : সদর রোড, ভোলা, ডাকঘর : ভোলা, উপজেলা : ভোলা সদর
৮. মিয়া মোহাম্মদ ইউনুস, পিতা : প্রয়াত মাওলানা মমতাজুল করিম, মাতা : প্রয়াত সালেহা বেগম, বয়স : ৭০ বছর, গ্রাম : ইলিশা, ঠিকানা : ডাকঘর : মুরাদ সবুল্যা, উপজেলা : সদর উপজেলা, ভোলা
৯. শফিকুল মাওলা ফারুক (শ.ম.ফারুক), পিতা : প্রয়াত সিকান্দার আহমদ, মাতা : ফিরোজা বেগম, শিক্ষা : বি.এ. (অনার্স), এম.এ., বয়স : ৫১ বছর, পেশা : অধ্যাপনা, সাংবাদিকতা, ঠিকানা : ডাকঘর : দিদারুল্লাহ্, উপজেলা : দৌলতখান
১০. খোকনচন্দ্র দেবনাথ, পিতা : প্রয়াত মদনচন্দ্র দেবনাথ, মাতা : ছায়ারানী দেবনাথ, শিক্ষা : তৃতীয় শ্রেণি, বয়স : ৩৬ বছর, ঠিকানা : গ্রাম : আলীনগর, ডাকঘর : ভোলা, উপজেলা : ভোলা সদর
১১. সমর সেন, পিতা : মৃত প্রিয়নাথ সেন, মাতা : মৃত সরোজীবালা সেন, শিক্ষা : এসএসসি, বয়স : ৫০ বছর, পেশা : স্বর্ণকার, ঠিকানা : সেন প্লাজা, সদর রোড, ডাকঘর : ভোলা, উপজেলা : জেলা সদর উপজেলা
১২. সন্তোষ রবিদাস, পিতা : প্রয়াত জিতেন্দ্র রবিদাস, মাতা : লক্ষ্মীরানী রবিদাস, বয়স : ৪৮ বছর, পেশা : জুতা ও চামড়া জাতীয় জিনিস সেলাই, মেরামত ও পলিশ করা, ঠিকানা : গ্রাম : উত্তর চরনোয়াবাদ, ডাকঘর : ভোলা, উপজেলা : ভোলা সদর উপজেলা
১৩. এম. হাবিবুর রহমান, পিতা : প্রয়াত সিকান্দার আলী সিকদার, মাতা : প্রয়াত ছায়েদা খাতুন, শিক্ষা : এমএ, বয়স : ৬৯ বছর, পেশা : সাংবাদিকতা, সম্পাদক, দৈনিক বাংলার কণ্ঠ, সংবাদ প্রতিনিধি, বাংলাদেশ বেতার, ঠিকানা : স্টেডিয়াম রোড, ভোলা
১৪. কার্তিক দেবনাথ, পিতা : ননীগোপাল দেবনাথ, মাতা : শান্তি দেবনাথ, শিক্ষা : ডি ইউ এমএস, বয়স : ৬১ বছর, পেশা : ব্যবসা, ঠিকানা : গ্রাম : হাসাননগর, ডাকঘর : মৃজাকালু, উপজেলা : বোরহানউদ্দিন
১৫. বিনোদবিহারী দে, পিতা : প্রয়াত অরবিন্দু দে, মাতা : প্রয়াত কল্যাণী দে, শিক্ষা : বিএ, বয়স : ৫৮ বছর, পেশা : চাকরি, ঠিকানা : গ্রাম : আড়ালিয়া, উপজেলা : তজুমুদ্দিন
১৬. মোঃ আলমগীর হোসেন, পিতা : মোহাম্মদ নূর হাফেজ মিয়া, মাতা : হাসিনা বেগম, শিক্ষা : বিএ (অনার্স) এম.এ., পেশা : শিক্ষকতা, বয়স : ৩৩ বছর, ঠিকানা : গ্রাম : চর ফৈজুদ্দিন, ডাকঘর : হাজীরহাট, উপজেলা : মনপুরা
১৭. অধ্যাপক বিধানকৃষ্ণ দাস, পিতা : হরিহর দাস, মাতা : কল্পনা রানী, শিক্ষা : এমএসসি, পেশা : অধ্যাপনা, বয়স : ৪০ বছর, ঠিকানা : গ্রাম : সোনারচর, ডাকঘর : হাজীরহাট, উপজেলা : মনপুরা
১৮. মোঃ অজিউল্লাহ মিয়া, পিতা : প্রয়াত আবদুর রহমান মিয়া, মাতা : প্রয়াত তহুরা খাতুন, বয়স : ৭১ বছর, পেশা : ব্যবসা, ঠিকানা : গ্রাম : ধলিগৌরনগর, ডাকঘর : সিরাজিয়া মাদ্রাসা, পজেলা : লালমোহন

www.pathagar.com

লোকচিকিৎসা

ভোলা সদর উপজেলা

ক. জন্ডিসের ঝাড়া ও মালা

এটি দেশের সর্বত্রই বহুল প্রচলিত একটি লোকচিকিৎসা। কেউ হলুইদ্যা পালং বা মাইট্যা পালং (জন্ডিসের চরম অবস্থাকে স্থানীয় লোকচিকিৎসকরা 'মাইট্যা পালং' বলে থাকেন) রোগে আক্রান্ত হলে আক্রান্ত ব্যক্তিকে দু'ধরনের চিকিৎসা দেওয়া হয় : ঝাড়-ফুঁক ও 'মালা পরা'। 'মালা পরা'য় আক্রান্ত ব্যক্তির মাথার ওপরে একটি 'মন্ত্রপূত' (এক্ষেত্রে মুসলিম ওঝারা 'দোয়া' পড়ে থাকেন) মালা পরিয়ে দেওয়া হয়। সূর্যোদয়ের পর মালাটি পরিয়ে দিলে এটি বড় হতে হতে সন্ধ্যা নাগাদ সারা শরীর অতিক্রম করে পা বেয়ে পড়ে যায়। এতে জন্ডিস রোগ আরোগ্য হয় বলে লোকসমাজ বিশ্বাস করে। 'বিলাই হাচড়া' নামে একটি গাছের ডালপালা ছোট করে কেটে (এক কড় পরিমাণ) নিঃশ্বাস বন্ধ করে সুতা দিয়ে গিঁট দিয়ে এই মালা বানানো হয়। গাছটি অনেকটা মরিচ গাছের মতো। এর উচ্চতা ৩-৪ ফুট পর্যন্ত হতে পারে।

জন্ডিসের আরেকটি চিকিৎসা ঝাড়-ফুঁক। একটি চুন মেশানো পানিভর্তি থালায় রোগীর হাতের পাতা দুটো কব্জি পর্যন্ত ডুবিয়ে রাখা হয়। কবিরাজ 'দোয়া' বা 'মন্ত্র' পড়তে পড়তে মাথা থেকে ঝাড়তে ঝাড়তে হাত দিয়ে জন্ডিসের বিষ নামিয়ে দেন।

এ পদ্ধতিতে কবিরাজ তার বাম হাত দিয়ে রোগীর ডান হাতের কব্জি চেপে ধরে তালু থেকে কব্জি পর্যন্ত চুন মেশানো পানির ভেতরে ডুবিয়ে রাখেন এবং ডান হাত দিয়ে রোগী বা রোগিণীর মাথা থেকে ঝাড়তে ঝাড়তে চুনমিশ্রিত পানিতে জন্ডিসের বিষ নামিয়ে আনেন। থালার ভেতরে রাখা চুন মিশ্রিত পানি অল্প সময়ের মধ্যে হলুদ বর্ণ ধারণ করে। করিরাজের আশ্বাস, 'হলুইদ্যা পালং' নেমে গেছে। রোগীর বিশ্বাস হয় যে, সে আরোগ্য লাভ করছে। এভাবে পরপর তিনদিন ঝাড়তে হয়।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা অসঙ্গত হবে না। জন্ডিসে আক্রান্ত জনৈক রোগী জন্ডিসের ঝাড়-ফুঁকে সিদ্ধহস্ত এমন একজন লোকচিকিৎসকের শরণাপন্ন হলেন। তিনি লোকচিকিৎসককে বললেন, 'নানা, আপনার বয়স তো কম হয়নি। এই অত্যন্ত ফলপ্রসূ বিদ্যেটা কাউকে না শিখিয়ে দিয়ে গেলে তো আপনার চলে যাবার পর মানুষ অনেক কষ্ট পাবে।' অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে লোকচিকিৎসককে রাজি করানো হলো। তিনি বললেন, 'দ্যাখ নাতি, সবসময় ওষুধ দিয়ে শরীরের রোগের চিকিৎসা হয় না, এর সাথে রোগীর মনেরও চিকিৎসা দরকার। এতে সে মানসিক শক্তি ফিরে পায় এবং তার শরীরে রোগ প্রতিরোধের একটা শক্তি তৈরি হয়।'

লোকচিকিৎসক তাঁর চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে জানালেন, 'প্রথমে আমি যা পড়ে ফুঁ দিই, তা পবিত্র কোরআনের আয়াত... কুলিল্লা হুম্মা মালেকুল মুলকি তু-তিল মুল্‌কা মানতাশা...বেগায়রি হিছাব।' এই আয়াত পড়ে আমি ফুঁ দিতে থাকি। আল্লার অশেষ

www.pathagar.com

রহমতে তাতেই রোগ সেরে যায়। তবে রোগীর মানসিক চিকিৎসার জন্য অর্থাৎ ঝাড়-ফুঁকের কার্যকারিতার ওপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস আনার জন্য আমি অন্য একটি কাজ করে থাকি, এটা কাউকে বলবে না। প্রথমে আমি বাড়িতে একটি আমগাছের ছাল কেটে তাতে দুটো হাতই ভালোভাবে ঘষে নিই। এতে হাত দুটির বর্ণে কোনো পরিবর্তন হয় না, অর্থাৎ হাতের রং আগের মতোই থাকে। তারপর চুন মেশানো পানি যখন আমার হাতের স্পর্শ পায়, তখন তা সঙ্গে সঙ্গে হলুদ বর্ণ ধারণ করে। এতে রোগী বা রোগিণী প্রচণ্ডভাবে মানসিক শক্তি ফিরে পায় এবং একইসঙ্গে চিকিৎসকের ওপরও শতভাগ বিশ্বাস স্থাপন করে।

পূর্বোক্ত রোগী তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা নানা, হলুইদ্যা পালং তো জানি, কিন্তু মাইট্যা পালংটা আবার কী?' বৃদ্ধ হেসে দিয়ে বললেন, 'ওটা আসলে কিছুই নয়। মাইট্যা পালং বলে কোনোকিছু নেই। আসল ব্যাপারটা হলো, ধরো, আমি কয়েকটি বাসায় ঝাড়-ফুঁক করেছি, কয়েকবার হাত ধোয়ার ফলে আমার হাতে লাগানো আমের ছালের 'কষ'-এর কার্যকারিতাও শেষ। এ অবস্থায় কাউকে ঝাড়-ফুঁক করতে হলে চুনের পানি আর হলুদ হবে না, তখন হাত দুটো ঘষা-ঘষি করলে হাতের ময়লাই শুধু পানির সাথে মিশে যাবে এবং পানিটা মেটে বর্ণ ধারণ করবে। এটাকেই 'মাইট্যা পালং' বলে রোগীদের বুঝিয়ে থাকি।'...

'হলুইদ্যা পালং' বা 'মাইট্যা পালং হলে হলুদযুক্ত তরকারি খাওয়ার ব্যাপারে বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়ে থাকে। এতে নাকি শরীরের হলুদবর্ণ আরো বৃদ্ধি পায় এবং রোগের প্রকোপ বেড়ে যায় বলে লোকসমাজে বিশ্বাস প্রচলিত।

খ. সাপের বিষ নামানো

আজকাল বন-জঙ্গলের পরিমাণ কমে যাওয়ায় এবং ক্ষেতে-খামারে কীটনাশকের ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় সাপের উপদ্রবও অনেকটা কমে গেছে। কিছুদিন আগ পর্যন্ত রাতে গ্রামের রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় পথচারীরা জোরে জোরে পায়ের শব্দ করে হাঁটতো, কিছুক্ষণ পরপর হাতে তালি দিতো, যাতে করে রাস্তার ওপরে শুয়ে থাকা সাপ মানুষের উপস্থিতি টের পেয়ে নিরাপদ দূরত্বে চলে যায়।

সাপে কাটা রোগীকে সুস্থ করা অর্থাৎ সাপের বিষ নামানোর ক্ষেত্রে ওঝার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভোলা শহরের কেন্দ্রস্থলে সদর রোডে বাংলা স্কুলের মোড় পেরিয়ে যোগীর ঘোলের দিকে একটু এগোতেই রাস্তার ডান পাশে বসে জুতো সেলাই করতেন শ্রীচরণ মুচি। চোখে অনেক পুরু গ্লাসের চশমা। সাপের বিষ নামাতে অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। সাপে কাটা রোগীর সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথেই তিনি চলে যেতেন। দেহের যে স্থানে সাপে কেটেছে, তার একটু ওপরে রশি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে নিতেন। তারপর পায়ের বা হাতের কনিষ্ঠাঙ্গুলের অগ্রভাগ একটু সুতো দিয়ে শক্ত করে বেঁধে নিতেন। মনে মনে মন্ত্রোচ্চারণ করতেন এবং সুতা ধরে টানতে থাকতেন। কিছুক্ষণ পর ঐ কনিষ্ঠাঙুলের অগ্রভাগ নীলবর্ণ ধারণ করতো এবং শ্রীচরণ বাবু একটা সুঁই দিয়ে আঙুলের অগ্রভাবে খুবই সূক্ষ্ম একটা ফুটো করে দিতেন। সঙ্গে সঙ্গে দু'তিন ফোঁটা কালো রক্ত বেরুতো। এটাই সাপের বিষ!

www.pathagar.com

শ্রীচরণ বাবু কিছুদিন আগে প্রয়াত হয়েছেন।

ভোলা সদর উপজেলার ইলিশা বাসস্ট্যান্ডের পশ্চিম পাশে ফরাজিদের মসজিদের কাছে চৌধুরীর বাড়ি। চৌধুরী সাপে-কাটা রোগীর বিষ নামাতেন এক অভিনব পদ্ধতিতে। যিনি সাপে কাটা রোগীর সংবাদ নিয়ে যেতেন, 'তাকে জিজ্ঞেস করতে থাকতেন, কী নাম? ... কী নাম? ...কী নাম?...এরপর তিনি তার শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে সংবাদ বাহকের গালে বসিয়ে দিতেন বড়ো ধরনের এক চড়। এতেই সাপে কাটা রোগীর বিষ নেমে যেতো। এ সময় অনেকেই টাল সামলাতে না পেরে মাটিতে পড়ে যেতো। এজন্যই চৌধুরীর কাছে অত্যন্ত বাছ-বিচার করে, দেখে শুনে শক্ত-সামর্থ্য লোক পাঠানো হতো। এই চৌধুরী সাহেবও সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন। এছাড়াও সাপে-কাটা রোগীকে সুস্থ করে তোলার ক্ষেত্রে এ-এলাকায় খ্যাতিমান ছিলেন চন্দ্রমোহন, আশরাফ আলী কয়াল, আবদুল গনি বেপারি ও সেরাজুল হক পণ্ডিত (পোস্টমাস্টার)। চন্দ্রমোহনও সংবাদ বাহককে চড় মারতো। চড় মারার পর আর কোনো কথা না বলে ঘরের মধ্যে চলে যেত। যারা তার এই নিয়ম সম্পর্কে অবহিত থাকতোনা তারা প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে যেত। এখনও দু'একগ্রাম পরপরই অনেক ওঝার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। বলতে গেলে, কাউকে সাপে কাটলে এখনও আক্রান্ত ব্যক্তিকে দ্রুত হাসপাতালে না নিয়ে তার আত্মীয়-স্বজন বা পাড়া-প্রতিবেশী আগে বেরিয়ে পড়ে ওঝার সন্ধানে।

গ. রোগ-ব্যাধি নিরাময়ে ডোর দেওয়া

'বান্দা জ্বর' (নিয়মিতভাবে একই সময়ে জ্বর আসা ও ছাড়া), টাইফয়েড, বাত রোগসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে ব্যথা-বেদনা উপশমের জন্য 'ডোর' দেওয়া হয়। 'মন্ত্র' বা 'দোওয়া' পড়ে দেহের আক্রান্ত স্থানে কাচের টুকরা অথবা ব্লেড দিয়ে হালকা করে কেচে (আঁচরের মতো কেটে দেওয়া) দেওয়া হয়। এরপর যে-কোনো হাতের বা পায়ের কনিষ্ঠাঙুলি বা মধ্যমার শেষ মাথায় সুতা বেঁধে সুতার অপর প্রান্তে ধরে জোরে জোরে টানতে হয়। কিছু সময় পর আঙুলের মাথাটা ফুলে উঠলে ওখানে সুই দিয়ে ক্ষুদ্র একটি ফুটা করে দেওয়া হয়। এ সময় যে রক্তটা বের হয়ে যায়, সেটাই ব্যথা-বেদনার প্রধান উদ্রেককারী বলে লোকচিকিৎসকেরা মত দিয়ে থাকেন।

ঘ. শিঙ্গা দেওয়া

এ চিকিৎসা কেবল বেদে সম্প্রদায়ের মহিলারাই করে থাকেন। শিঙা দেওয়ার বেলায়ও ব্লেড বা কাঁচ ভাঙ্গা দিয়ে আগে আক্রান্ত স্থানে বা তার আশে-পাশে একটু সামান্য ক্ষত করে দিতে হয়। এরপর শিঙার এক প্রান্ত ক্ষতস্থানের ওপর চেপে ধরে অপর প্রান্ত মুখে দিয়ে চুষে চুষে বিষাক্ত (!) রক্ত বের করে ফেলে দেওয়া হয়।

এছাড়াও বাংলার গ্রামীণ সমাজের শিক্ষিত-অশিক্ষিত ভেদে অনেক মানুষই বিভিন্ন রোগে লোকচিকিৎসকদের শরণাপন্ন হয়ে থাকেন, যেমন, দাঁতে পোঁকা ধরা, বাত, প্লীহা, পক্ষাঘাত, বসন্ত, কলেরা, কিশোর-কিশোরীদের রাতে বিছানায় প্রস্রাব করা, দীর্ঘস্থায়ী আমাশয়, মহিলাদের বাধক বেদনা, ঋতুস্রাবে বিলম্ব, অনিয়মিত ঋতুস্রাব, অতিরিক্ত ঋতুস্রাব, বন্ধ্যাত্ব, অনিচ্ছাকৃত গর্ভধারণ ইত্যাদি বহু শারীরিক ব্যাধি। এ

www.pathagar.com

জাতীয় ব্যাধি ছাড়াও দৃশ্যমান ও যুক্তিগ্রাহ্য নয় এমন সব কারণে উদ্ভূত রোগ যেমন 'বাতাস লাগা', 'উপরির দোষ' ইত্যাদি ব্যাপারে অনেকেই লোকচিকিৎসকদের শরণাপন্ন হয়ে থাকেন। এসব ক্ষেত্রে চিকিৎসকরা কিছু কিছু গাছের লতা-পাতা, মূল, ফল, তেল, নিমপাতা, কালিজিরা, মধু, লেবুর রস, ইত্যাদি ব্যবস্থাপত্র দিয়ে থাকেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে পানি পড়া, তেল পড়া, তাবিজ-কবজ ইত্যাদি দেওয়া হয়ে থাকে।

দৌলতখান উপজেলা

অনেক জটিল ও কঠিন রোগে কিংবা সাধারণ রোগেও লোকচিকিৎসা কতদূর কার্যকরী সে-বিষয়ে যথেষ্ট যুক্তিতর্কের অবকাশ থাকলেও গ্রাম-বাংলার মানুষের একটি ব্যাপক অংশই এই চিকিৎসাব্যবস্থার ওপর আস্থা স্থাপন করে স্থানীয় লোকচিকিৎসকদের শরণাপন্ন হয়ে থাকেন। এসব চিকিৎসক সাধারণত স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য গাছ-গাছালি, লতা, পাতা, গাছের শিকড়, ফল, বীচি ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকেন। সর্বাগ্রে চিকিৎসার যে ব্যবস্থার ওপর মানুষের আস্থা শতভাগ, তা হচ্ছে ঝাড়-ফুঁক, তাবিজ-তুমার, তেলপড়া, পানি পড়া, কালিজিরা পড়া ইত্যাদি। আধুনিক বিজ্ঞান রোগ-ব্যাধি নিরাময়ে এসব দ্রব্যাদির কার্যকর ভূমিকা মেনে না নিলেও এখানকার ধর্মভীরু মানুষ এসব বিষয়ের ওপর শতভাগ আস্থা স্থাপন করেন। সর্বোপরি, এসব ব্যবস্থাদি রোগীর মানসিক শক্তিকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়, যা রোগ-প্রতিরোধ বা নিরাময়ে বহুলাংশে সাহায্য করে থাকে। তদুপরি গাছ, লতা, পাতা ইত্যাদি ব্যবহার করে জনসমাজ যুগ-যুগ ধরে উপকৃত হয়েছে বলেই এসব এখনও টিকে আছে। যেসব রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হলে লোকসমাজ লোকচিকিৎসকদের দ্বারস্থ হন তা নিম্নরূপ :

১. জন্ডিস, ২. সাপে কাটলে, ৩. সন্তান ধারণে বিলম্ব হলে, ৪. মৃত সন্তান প্রসব করলে, ৫. দাঁতে পোকায় ধরলে, ৬. বিছানায় প্রস্রাব করলে, ৭. শিশুরা ঘুমের মধ্যে চমকে উঠলে, ৮. কোনো কোনো রোগ-ব্যাধিকে 'বাতাস লাগা' বা 'উপরির দোষ' নামীয় দুটি অশুভ শক্তির প্রভাব হিসেবে বিশ্বাস করলে, ৯. প্যারালাইসিসে আক্রান্ত হলে, ১০. বুক ধড়ফড় করা, ১১. দীর্ঘকালব্যাপী অজীর্ণ বা আমাশয় ভোগা, ১২. মানসিক সমস্যা, ১৩. গলায় মাছের কাঁটা আটকে গেলে, ১৪. শরীরের কোথাও আঁচিল হলে, ১৫. মেয়াদি জ্বর অর্থাৎ নিয়মিতভাবে একই সময়ে জ্বর আসা ও ছেড়ে যাওয়া, ১৬. শরীরের কোথাও ভাঙলে বা মচকালে, ১৭. হাঁপানি, ১৮. কটিবাত ও গেঁটেবাত, ১৯. মেয়েদের ঋতুবদ্ধতা, ২০. লিভার ও প্লীহার প্রদাহ, ২১. অজীর্ণ, পেটফাঁপা ও পেটব্যথা, ২২. চর্মরোগ ও একজিমা, ২৩. শ্বেতপ্রদর, ২৪. অনিয়মিত ঋতুস্রাব, ২৫. যৌন দুর্বলতাসহ নানাবিধ যৌন সমস্যা, ২৬. হাম, ২৭. বসন্ত, ২৮. আঘাতজনিত কাটা-ছেঁড়া, ২৯. পোকা-মাকড়ের দংশন, ৩০. আমাশয় ইত্যাদি। এছাড়াও এমন বহু রোগ-ব্যাধি রয়েছে যা নিরাময়ের আশায় ভুক্তভোগী মানুষ লোকচিকিৎসকদের কাছে ছুটে যান।

লোকচিকিৎসকগণ রোগীদের রোগ-নিরাময়ে যেসব বনৌষধি ব্যবহার করে থাকেন, তন্মধ্যে বাসক পাতা, তুলসি পাতা, গন্ধবাঁদালি পাতা, আদামুনকুনি পাতা (থানকুনি), আমলকি, কালমেঘ, নিমের পাতা ও শিকড়, তেলাকুচা, গাঁদা ফুলগাছের

www.pathagar.com

পাতা, দূর্বা, ভেরেণ্ডা, লজ্জাবতী, স্বর্ণলতা, হরিতকি, বহেরা, ওলট কম্বল, মেহেদি, পাকিস্তানি লতা, লেবুপাতা, চিরতা, হলুদ, মৌরি মূল ও বীজ, যষ্টি মধু, আদা, গোলাপ ফুল, অর্জুনের ছাল, অড়হড় ডালগাছের পাতা, তেজপাতা, পুদিনা, তুলা বীজ, মেহেদি, লাউ বীচি, নিসিন্দা পাতা ইত্যাদি বিভিন্ন জাতের ঔষধি গাছ ও লতা-পাতা এবং বিভিন্ন পশু-পাখির শরীরের কোনো উপাদান, যেমন—শিয়ালের মাংস দিয়ে বানানো বড়ি ও তেল ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

এ দেশের অনেক মানুষই শরীরের বিভিন্ন স্থানে ব্যথা-বেদনা ইত্যাদি ব্যাধিতে ভুগে থাকেন, বিশেষকরে কোমরের বেদনায় অনেকেই ভোগেন। এক্ষেত্রে এসব রোগীদের অনেকেই বেদেনীদের অপ-চিকিৎসার শিকারে পরিণত হয়ে থাকেন। ব্যথা-বেদনা, বিশেষকরে কোমরের বেদনার জন্য তারা বেদেনীদের দ্বারা 'শিঙা' দিয়ে থাকেন।

বেদেনীদের আর একটি চিকিৎসা এ গ্রামাঞ্চলের মহিলারা তাদের সন্তানদের জন্য গ্রহণ করে থাকেন। শিশুদের অনেকেই বাবা-মায়ের অমনোযোগিতার কারণে দাঁতের ক্ষয়রোগে ভুগে থাকেন। এই ক্ষয়কে অনেকে দাঁতে পোকায় ধরেছে বলে ভুল ধারণা পোষণ করেন। আর বেদেনীরাও তাদের এই ভ্রান্ত ধারণার সুযোগ নিয়ে দাঁতের পোকা বের করার নামে ভাঁওতা দিয়ে থাকেন।

আমাদের লোকসমাজের কাছে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য মানুষ মসজিদের ইমাম, মুয়াজ্জিন, পীর, দরবেশ প্রমুখ। এরা দোওয়া পড়ে মুখে একটু ফুঁ দিলেই রোগ-বালাই ইত্যাদি মুহূর্তে নিরাময় লাভ করতে পারে বলে আমাদের লোকসমাজের অটুট বিশ্বাস রয়েছে। এজন্যই তারা বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি নিরাময়ের প্রত্যাশায় তাদের শরণাপন্ন হয়ে থাকেন।

তজুমুদ্দিন উপজেলা

আবহমানকাল থেকেই এ অঞ্চলে লোকচিকিৎসাব্যবস্থা প্রচলিত আছে। আর্থিক অসচ্ছলতা, উপযুক্ত চিকিৎসকের অভাব, রোগ এবং এর প্রতিষেধক ঔষধ সম্পর্কে মানুষের ভ্রান্ত ধারণা ইত্যাদি কারণে আমাদের লোকসমাজ লোকচিকিৎসা ব্যবস্থার শরণাপন্ন হয়ে থাকেন। সর্বোপরি, আমাদের জনসমাজ এতোটা ধর্মভীরু এবং ধর্মীয় গ্রন্থাদি ও আলেম-ওলামাদের প্রতি এতোটাই আস্থাবান যে, তারা এটা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে থাকেন যে, কোরআনের একটি আয়াত পড়ে ফুঁ দেওয়া পানি বা কালিজিরা বা তেল পড়া তার অনেক জটিল ও কঠিন ব্যাধির আরোগ্য লাভের নিয়ামক হতে পারে। তারা এ বিশ্বাস তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি হওয়ার পর থেকেই লালন করে আসছেন। এ কারণেই দেখা যায়, একজন মহিলা সন্তান প্রসবের পরই তিনি বা তার স্বামী বা ভাই একজন আলেম, মসজিদের ইমাম বা মুয়াজ্জিনকে নিয়ে প্রথমে সদ্যোজাত শিশুটির চোখে-মুখে-বুকে একটু ফুঁ দেওয়ার পদক্ষেপ নেন। একজন আলেম যখন একটু দোওয়া পড়ে শিশুটিকে ফুঁ দিয়ে দেন, তখন তাঁর পিতা-মাতা বা অভিভাবকদের মনে এই বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় যে, যে কোনো রকম অশুভ দৃষ্টি, অশুভ শক্তির প্রভাব এবং যে-কোনো রকম প্রাণহানিকর অসুখ-বিসুখ থেকে তার সন্তান এখন অনেকটা নিরাপদ। সনাতন ধর্মাবলম্বীরাও তাদের এরূপ বিশ্বাসভাজনদের দ্বারস্থ হন।

www.pathagar.com

এতো গেল লোকচিকিৎসাব্যবস্থা গ্রহণে এ অঞ্চলের লোকসমাজের ওপর ধর্মীয় প্রভাবের কথা। এরপর রয়েছে আধুনিক চিকিৎসাব্যবস্থার উন্নতি সম্পর্কে তাদের পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাব, বংশানুক্রমিকভাবে বিশ্বাস-উদ্ভূত কিছু রোগ ও তার প্রতিকারে লোকজ ব্যবস্থার ওপর অগাধ অন্ধবিশ্বাস, আর্থিক অসচ্ছলতা প্রভৃতি।

পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, নিম্নলিখিত রোগ-ব্যাধি এবং অশুভ শক্তির আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা এবং আক্রান্ত হয়ে পড়লে তা থেকে নিরাময় লাভ কিংবা পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য এ অঞ্চলের অধিকাংশ জনগোষ্ঠী লোকচিকিৎসা ব্যবস্থার দ্বারস্থ হন।

১. সাপে কাটলে বিষ নামানো, ২. হলুইদ্যা পালং বা জন্ডিস, ৩. দাঁতের ক্ষয়রোগ বা পোকায় ধরা, ৪. শিশু-কিশোরদের বিছানায় প্রস্রাব করা, ৫. ঘুমের মধ্যে শিশুরা কেঁদে উঠলে বা ছ্যাপড়া (চমকে ওঠা) খেলে, ৬. দীর্ঘকালস্থায়ী আমাশয় বা অজীর্ণ রোগ, ৭. মানসিক সমস্যা, ৮. মেয়াদী জ্বর, ৯. হাত-পা ভাঙা বা মচকানো, ১০. সন্তান না হওয়া বা বন্ধ্যাত্ব, ১১. মৃত সন্তান প্রসব করা, ১২. বিভিন্ন ধরনের স্ত্রীরোগ, যেমন, দেরীতে ঋতুস্রাব শুরু হওয়া, অনিয়মিত ঋতুস্রাব, স্বল্প ঋতুস্রাব, অধিক ঋতুস্রাব এবং ঋতুকালীন পেটে বেদনা, শ্বেত প্রদর, ইত্যাদি, ১৩. বিভিন্ন রকমের যৌন সমস্যা, ১৪. যৌন সমস্যা, ১৫. কোমর ব্যথা, সন্ধি বাতসহ বিভিন্ন স্থানের ব্যথা, ১৬. বিভিন্ন ধরনের বাতব্যাধি, ১৭. প্যারালাইসিস, ১৮. কাশি ও হাঁপানি, ও ১৯. বাতাস লাগা, বা 'উপরির দোষ' নামে অস্তিত্বহীন এক শক্তির 'কু-দৃষ্টির' ফল হিসেবে চিহ্নিত করে কোনো রোগ-ব্যাধি ইত্যাদি।

চিকিৎসা প্রদানের ক্ষেত্রে এ অঞ্চলের কবিরাজ বা লোকচিকিৎসকগণ সাপের বিষ নামানোর জন্য মন্ত্রাদি পড়ে ঝাড়া, জন্ডিসের নিরাময়ের জন্য চুনমেশানো পানিতে হাত রেখে ঝাড়া ও মালা পড়া দেওয়া ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এছাড়া অন্যান্য রোগের চিকিৎসায় লোকচিকিৎসকগণ স্থানীয়ভাবে কিংবা কাছাকাছি পাওয়া যায় এমন সব বনৌষধি ব্যবহার করে থাকেন। এসব বনৌষধির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, নিমের পাতা ও শিকড়, বাসকপাতা ও তুলসি পাতা, তেলাকুচা, দূর্বা, ভেরেন্ডা, ওলট কম্বল, আমলকি, হরিতকি, বহেড়া, মেহেদি, গাঁদাফুল গাছের পাতা, পাকিস্তানি লতা, গন্ধবাঁদালি পাতা, অড়হর ডাল গাছের পাতা, লেবু ও লেবু পাতা, আদামুনকুনি (থানকুনি) পাতা, গৈয়ম (পেয়ারা) গাছের পাতা, ধনিয়া, গোলাপ ফুল ইত্যাদি। বাজার থেকে কিনে নিতে হয় এমন উপকরণ যেমন, এলাচ, লবঙ্গ, দারচিনি, সালাজিত, যত্রিক, জাফরান, কর্পূর, ইত্যাদিও তারা তাদের চিকিৎসায় ব্যবহার করে থাকেন।

তজুমুদ্দিনের অনেক এলাকা নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়ার ফলে এখানকার লোকসংখ্যাও ক্রমাগত হ্রাস পেতে থাকে। স্থানীয় লোকচিকিৎসাব্যবস্থার উপরও এর প্রভাব পড়তে থাকে। সাম্প্রতিককালে গ্রামাঞ্চলে অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসক নামে হাতুড়ে চিকিৎসকগণই (মূলত ওষুধবিক্রেতা) লোকচিকিৎসকদের স্থানটি দখল করে নিচ্ছেন।

বোরহানউদ্দিন উপজেলা

স্থলপথে ভোলা জেলার সাথে বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের কোনো যোগাযোগ না থাকায় দ্রুততম সময়ের মধ্যে চিকিৎসাপ্রাপ্তি একসময় খুবই দুর্লভ ছিল। বোধকরি, এ

www.pathagar.com

কারণেই এই জেলার সর্বত্রই আবহমানকাল থেকেই লোকচিকিৎসকদের যথেষ্ট প্রাধান্য ছিল। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে এখন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক না হলেও অন্তত পাশ করা চিকিৎসক একটু কষ্ট করলেই পাওয়া যায়। তারপরও গ্রাম ও শহরাঞ্চলেও লোকচিকিৎসাব্যবস্থা এবং লোকচিকিৎসকদের যথেষ্ট জনপ্রিয়তা আছে। জন্ডিসের কথাই ধরা যাক। কাছাকাছি হাসপাতাল কিংবা ডাক্তার থাকলেও এখনও অনেক মানুষ হলুইদ্যা পালং বা জন্ডিসের নিরাময়ের জন্য চুনের পানিতে হাত ভিজিয়ে রেখে কিংবা মাথায় মালা দিয়ে চিকিৎসা নিয়ে থাকেন। লোকচিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ডাব খেতে খেতে বাড়ির সব নারিকেল গাছ নারিকেল-শূন্য করে ফেলেন, মৌসুম সহায়ক হলে কলসের পর কলস আখের রস উদরস্থ করেন। শুধু জন্ডিস নয়, কুকুরে কামড়ালে কিংবা সাপে কামড়ালে এখনও অনেক মানুষই ওঝা কিংবা লোকচিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়ে থাকেন।

এছাড়াও বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি, বাত, হাড় ভাঙা বা মচকানো, পুরনো আমাশয় বা অজীর্ণতা, কোমর ব্যথাসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে ব্যথা, সর্দি-কাশি থেকে বিভিন্ন জটিল ও কঠিন রোগ, বৃদ্ধদের বয়সজনিত কাশি, ইত্যাদি বহুবিধ রোগ-ব্যাধির নিরাময়ের জন্য সাধারণ মানুষ লোকচিকিৎসকদের শরণাপন্ন হয়ে থাকেন। এতে প্রাথমিকভাবে দুটো লাভ—এক, স্বল্প ব্যয় ও দুই, স্বল্প সময়ে চিকিৎসা লাভ।

লোকচিকিৎসকরা স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য বিভিন্ন গাছ-গাছড়ার শিকড়, লতা-পাতা, ফুল, ফল ইত্যাদি ব্যবহার করে রোগীকে সুস্থ করে তুলতে চেষ্টা করেন। তারা যেসব ঔষধি উদ্ভিদ বা ফল-মূল ব্যবহার করে থাকেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, নিমের পাতা, ছাল ও শিকড়, বাসক পাতা, তুলসি পাতা ও বীজ, গন্ধবাঁদালি পাতা, আদামুনকুনি পাতা (থানকুনি), ঘৃতকুমারী, কালমেঘ, আকন্দ, লজ্জাবতী, গাঁদা ফুল গাছের পাতা, শিয়ালকাঁটা, ধুতুরা ইত্যাদি।

লোকচিকিৎসার ক্ষেত্রে বেদেদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। তারা গ্রামে গ্রামে ঘুরে সাপ খেলা দেখায় আর অনক্ষর, সহজ-সরল মানুষকে দাঁতের পোকা ফেলে কিংবা শিঙা দিয়ে বোকা বানায়। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে দাঁতে কোনো পোকার অস্তিত্ব নেই। এটি দাঁতের একরকম ক্ষয় রোগ। এরপরও বেদে-বেদেনীরা কীভাবে বাচ্চাদের দাঁতে তুলা দিয়ে কিছুক্ষণ পর সেই তুলা বের করে এনে তুলার মধ্য থেকে পোকা বের করে দেখায়, সেটা অবাক করে। অনেকে বলে থাকেন, এটা ওদের যাদুমন্ত্রের ফল। গ্রামাঞ্চলের অনেক মানুষ তো কোমরে প্রচণ্ড ব্যথা নিয়েও বেদে-বেদেনীদের অপেক্ষায় দিনের পর দিন নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকেন। তাদের পাওয়া গেলে 'শিঙা' দিয়ে তবে আরোগ্য লাভ করেন বলে জানা যায়।

বেদে-বেদেনীদের বেশির-ভাগ শিকার গ্রামাঞ্চলের অনক্ষর সহজ-সরল মহিলা। বেদেনীরা মহিলাদের অনেকগুলি সাধারণ দুর্বলতার কথা অবহিত আছে, যেমন, সন্তান না হওয়া, সময়মতো ঋতুস্রাব না হওয়া বা অতিরিক্ত ঋতুস্রাব হওয়া, বৎসরান্তে প্রসবজনিত কারণে শারীরিক দুর্বলতা, ঋতুস্রাবের সময় তলপেটে প্রচণ্ড বেদনা ইত্যাদি বিভিন্ন মেয়েলি রোগের বিষয়ে তারা অনর্গল বক্তৃতা দিয়ে মহিলাদের কাবু করে ফেলে এবং তাদের দেওয়া 'বড়ি' গ্রহণ করতে বাধ্য করে ফেলে।

www.pathagar.com

সাপে কামড়ালেও সাধারণ মানুষ দ্রুত হাসপাতালের পরিবর্তে ওঝার কাছে যায়। ওঝারা সাধারণত ঝাড়-ফুঁক করে বিষ নামিয়ে থাকে। ঝাড়-ফুঁককে লোকচিকিৎসার অন্তর্ভুক্ত করা যায় কিনা জানি না, তবে প্রাচীনকাল থেকেই সাপে কামড়ালে মানুষ তাদের শরণাপন্ন হয়ে থাকেন এবং আরোগ্যও লাভ করেন।

লালমোহন উপজেলা

সুশিক্ষিত ও প্রশিক্ষিত চিকিৎসকের সাক্ষাৎ লাভ এবং তাদের তত্ত্বাবধানে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পাওয়ার কিছুটা সুযোগ থাকলেও গ্রামাঞ্চলের অনেক মানুষই নানা কারণে লোকচিকিৎসকদের শরণাপন্ন হয়ে থাকেন। এর প্রধান দুটি কারণ রয়েছে। এক, সবসময় নামকরা ও অভিজ্ঞ চিকিৎসক হাতের কাছে না পাওয়া এবং দুই, একজন চিকিৎসকের নির্ধারিত ফি ও উচ্চমূল্যের ঔষধ ক্রয়ের অক্ষমতা। পক্ষান্তরে, একজন লোকচিকিৎসকের শরণাপন্ন হলে কোনোরকম ফি ছাড়াই শুধু স্বল্পমূল্যের ঔষধ কিংবা ঔষধি গাছের লতা-পাতা শেকড়ের রস সেবন করলে অনেক ক্ষেত্রেই আরোগ্য লাভ সম্ভব বলে তারা বিশ্বাস করেন। এছাড়া একজন চিকিৎসকের দ্বারস্থ হলে তিনি কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়া সচরাচর প্রেসক্রিপশন করেন না এবং এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য একজন রোগীকে জেলা শহর ভোলায়, এমনকি বিভাগীয় শহর বরিশালেও যেতে হয়। সেখানে যাওয়া-আসার খরচ, প্রয়োজনে হোটেলে অবস্থান, ইত্যাদি ব্যয় মেটানো অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয় না। সর্বোপরি, এতে প্রচুর সময়ের প্রয়োজন। এ কারণেই কাছাকাছি একজন লোকচিকিৎসক—না হোন তিনি নাম করা ডাক্তার, না থাকুক সার্টিফিকেট, তার প্রদত্ত প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী ওষুধ খেয়ে দু-চারজন রোগী ভালো হয়ে গেলেই আশপাশের সবাই তার কাছে ভিড় জমাতে শুরু করে।

যাহোক, লোকচিকিৎসকরা অনেক কম খরচে রোগী বা রোগিণীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করে থাকেন বলেই গ্রামাঞ্চলের মানুষের কাছে তাদের কদর অনেক বেশি। সাপে কামড়ালে বিষ নষ্ট করা বা বিষ নামানোর বিষয়টির কথাই ধরা যাক। প্রত্যন্ত চরাঞ্চলের একজন মানুষকে সাপে কামড়ালে তাকে হাসপাতাল পর্যন্ত নিয়ে আসার যে বিড়ম্বনা ও দুর্ভোগ, তা পোহাতে অবশেষে হাসপাতাল পর্যন্ত পৌঁছতে পারলেও ততক্ষণ রোগীর দেহে প্রাণ থাকবে—এমন নিশ্চয়তা নেই। এমতাবস্থায় বাধ্য হয়েই একজন সাপে কাটা রোগীকে নিকটস্থ ওঝার শরণাপন্ন হতে হয়। সাপের বিষ নামানোর জন্য তারা যে ঝাড়ফুঁক করে থাকেন, তার বিনিময়ে তারা কোনো আর্থিক সুবিধাও গ্রহণ করেন না।

কামলা বা জন্ডিসে আক্রান্ত একজন রোগী বা রোগিণীর বেলায় একজন পাসকরা ডাক্তারের সাক্ষাৎ পাওয়া গেলেও প্রকৃতপক্ষেই জন্ডিস হয়েছে কি-না তা নির্ধারণের জন্য তাকে অবশ্যই কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হয়। তাতে ব্যয়ও কম নয়। এক্ষেত্রে একজন লোকচিকিৎসক হয়তো তার অভিজ্ঞতার নিরিখে তার চোখের বর্ণ, জিহ্বার রং দেখে ও প্রস্রাবের রং জেনে নিয়েই তাকে প্রাথমিক কিছু উপশমকারী ঔষধ বা বনৌষধি দিয়ে থাকবেন। এক্ষেত্রে তিনি রোগী বা রোগিণীকে অড়হর ডাল গাছের পাতার রস একটা নির্দিষ্ট পরিমাণে প্রতিদিন সেবন, অড়হর ডাল রান্না করে খাওয়া, সহজপাচ্য

www.pathagar.com

খাবার-দাবার গ্রহণ, তৈলাক্ত, চর্বিযুক্ত খাবার ও ভাজা-পোড়া খাবার বর্জন এবং দীর্ঘ বিশ্রামের পরামর্শ দিয়ে থাকবেন। প্রকৃতপক্ষে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, রোগিণী এসব পথ্য নিয়মিত গ্রহণ এবং নিয়ম মেনে চললে অতি দ্রুতই আরোগ্য লাভের পথে এগিয়ে যান। জন্ডিস, যা এ-অঞ্চলে হলুইদ্যা পালং বা কামলা নামে পরিচিত, তার নিরাময়ের জন্য চুনের পানিতে হাত ভিজিয়ে ঝাড়া, মালা পড়া ইত্যাদিরও প্রচলন রয়েছে। এমনিভাবে কুকুরে কামড়ালে বা পাঁচড়াসহ বিভিন্ন চর্মরোগের প্রতিকারেও লোকচিকিৎসকরা ধন্বন্তরীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। হাড়-ভাঙা বা মচকানোর ক্ষেত্রেও দেখা যায়, একজন লোকচিকিৎসক একটা মালিশ দেওয়ার পর তিনদিনেই রোগী আরোগ্য লাভের পথে চলে যায়। কখনো কখনো ঝুঁকিপূর্ণ, এমনকি রোগিণীর মৃত্যু ঘটার সম্ভাবনা থাকলেও এখনও অনেক মহিলার সন্তান প্রসবে গ্রাম্য দাইয়েরাই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে থাকেন।

এছাড়াও শিশুদের ডায়রিয়া, আমাশয়, কাশি, জ্বর ইত্যাদি রোগ, মহিলাদের সন্তান না হওয়া, মৃত সন্তান প্রসব করা, অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণ, শ্বেতপ্রদর, অনিয়মিত ঋতুস্রাব, অতিরিক্ত ঋতুস্রাব, কিশোরীদের সঠিক সময়ে ঋতু শুরু না হওয়া ইত্যাদি স্ত্রী-রোগ, পুরনো আমাশয় বা অজীর্ণতা, কোমর ব্যথা, ঘাড় ব্যথা, সন্ধিবাতসহ বিভিন্ন বাতব্যধি, প্যারালাইসিস ইত্যাদি বহু রোগ-ব্যাধি নিরাময়ের জন্য লোকসমাজ লোকচিকিৎসকদের শরণাপন্ন হয়ে থাকেন।

লোকচিকিৎসকগণ সাধারণত স্থানীয়ভাবে বা সহজলভ্য এমন ঔষধি গাছ-গাছড়া, শিকড়, লতা-পাতা, ফুল এবং কাছাকাছি বাজারে পাওয়া যায় এমন সব ঔষধি উপকরণ দিয়ে চিকিৎসা সম্পন্ন করে থাকেন। এসব ঔষধি গাছের মধ্যে এমন অনেক গাছ থাকে, যা হাত বাড়ালেই কিংবা একটু খুঁজলেই পাওয়া যায়, যেমন—বাসকপাতা, তুলসিপাতা, নিমপাতা ও নিমগাছের শিকড়, ভেরেন্ডা, জবা ফুল, গন্ধবাঁদালি পাতা, আদামুনকুনি বা থানকুনি পাতা, চিরতা, আমলকি, বহেড়া, হরিতকি, ঘৃতকুমারী, কালমেঘ, আকন্দ, গাঁদা ফুলগাছের পাতা, ধুতুরা ইত্যাদি।

এ এলাকার মতো, মনে হয় সারাদেশেই বেদে-বেদেনীর কিছু রোগ-ব্যাধির চিকিৎসায় ভূমিকা রয়েছে। তাদের কতোটা চিকিৎসা কতোটা অপচিকিৎসা আর কতোটা প্রতারণা, সেটা তর্কের বিষয়। গ্রাম কিংবা শহরাঞ্চলের সরলমনা গৃহিণীরা অনেক সময়ই এদের পাতা ফাঁদে পা দেন। বিশেষকরে একজন স্নেহময়ী মা যখন চোখের সামনে তার শিশুসন্তানকে দাঁতের ব্যথায় চিৎকার করতে দেখেন, তখন বেদে-বেদেনী তাকে ফাঁকি দিয়ে কতো টাকা কিংবা কয় সের চাউল নিয়ে কেটে পড়ল, সেটা হিসাব করার সময় পান না। সন্তানের আরোগ্য লাভ অর্থাৎ দাঁত ব্যথার উপশম দিয়েই কথা। মা কিংবা অনেকের সামনেই তারা দাঁতের গর্তের ভেতরে তুলা ঢুকিয়ে কিছুক্ষণ রেখে দিয়ে দাঁতের পোকাসহ তুলাটা বের করে নিয়ে আসেন। চোখের সামনে দেখা যায়, ক্ষুদ্র সাদা পোকা নড়াচড়া করছে কিংবা মরে পড়ে আছে। কোমরের বিষ-ব্যথা সারানোর জন্য বেদেনীরা শিঙা দিয়ে থাকে। এই শিঙা দেওয়ার পদ্ধতি সর্বত্রই একই রকম। দেখা যায়, শিঙা দেওয়ার পর অনেকে কোমর ব্যথা থেকে আরোগ্য লাভও করেছেন। দাঁতের পোকা বের করা এবং শিঙা দেওয়া ছাড়াও বেদেনীরা নানারকম

www.pathagar.com

স্ত্রীরোগের চিকিৎসা করে গ্রামীণ মহিলাদের আঁচলে বাঁধা টাকা হাতড়িয়ে নিয়ে থাকেন। এসব রোগের মধ্যে রয়েছে মহিলাদের ঋতুস্রাবজনিত তলপেটে প্রচণ্ড বেদনা, উপযুক্ত বয়সে ঋতুস্রাবে বিলম্ব কিংবা অধিক ঋতুস্রাব ইত্যাদি।

চরফ্যাশন উপজেলা

ক. জন্ডিসের চিকিৎসা

হলুইদ্যা পালং বা জন্ডিস হলে কলা পড়া খেতে দেওয়া হয়। এছাড়া মাথা কেচে কেচে (ধারালো কোনো কিছু দিয়ে হালকা করে ক্ষত করে) সেখানে পান্তা ভাতের পানি, সিঁদুর ও কাপুর (কর্পূর) পড়া লাগানো হয়। 'বাড়ি' গাছের ডাল-পালা ছোট করে কেটে মালা বানিয়ে মাথায় পরানো হয়। তারপর সেই মালা ধীরে ধীরে বড় হতে হতে সারা শরীর বেয়ে শরীরের নিম্নাংশ দিয়ে মাটিতে পড়ে যায়। এতে ধারণা করা হয় যে, মালাটি জন্ডিসের সব 'বিষ' চুষে নিয়ে মাটিতে পড়ে গেছে।

জন্ডিস রোগ নিরাময়ের জন্যে চুন-মেশানো পানিতে হাত রেখে ঝাড়া দেওয়া আর একটি প্রচলিত চিকিৎসা।

খ. সাপে কাটা রোগীর বিষ নামানো

সাপের উপদ্রব আগের মতো এখন আর অতোটা প্রবল নয়। তবুও চরাঞ্চলে এবং বন্যা হলে সর্প দংশনে মানুষ আক্রান্ত হয় এবং মারাও যায়। এক্ষেত্রে হাসপাতালে কিংবা চিকিৎসকের শরণাপন্ন না হয়ে মানুষ আগে ছোটে ওঝার কাছে। চরাঞ্চলে বা দুর্গম এলাকায় তো আর হাসপাতাল বা ডাক্তার নেই। সেখানকার মানুষকে বাধ্য হয়েই ওঝার কাছে ছুটতে হয়। মন্ত্র কিংবা দোয়া পড়ে ঝাড়া হয়। যে স্থানে সাপে দংশন করেছে, তার একটু ওপরে প্রথমে রশি দিয়ে শক্ত করে বাঁধা হয়। তারপর হাত বা পায়ের কনিষ্ঠাঙুলের শেষ মাথায় আর একটি শক্ত সুতো বেঁধে টানা হয়। ধীরে ধীরে বাঁধ দেওয়া স্থানের বাইরের দিকে আঙুলের অগ্রভাগ নীল বর্ণ ধারণ করে। তারপর ওঝা একটা সুইয়ের মাথা দিয়ে নীলবর্ণ ধারণ করা স্থানটিতে একটু ফুটা করে দেন। নীচে রাখা একটি কচু পাতায় ওই রক্ত গড়িয়ে পড়ে। এই রক্তের সাথেই সাপের বিষ থাকে বলে বিশ্বাস।

গ. শিঙ্গা দেওয়া

বিভিন্ন বাতব্যাধি, বিশেষকরে কোমরের ব্যথা সারানোর জন্য 'শিঙ্গা' দেওয়া হয়ে থাকে। কোমরের কোনো একটি স্থানে ব্লেড বা ভাঙা গ্লাসের টুকরা দিয়ে হালকা করে কেচে কেচে (সূক্ষ্মভাবে কেটে দেওয়া) সেখানটায় শিঙার (গরু বা মোষের শিং) একমাথা চেপে ধরে অন্য মাথা মুখের মধ্যে নিয়ে চুষতে হয়। এতে যে রক্ত বেরিয়ে আসে, সেটাই বিষাক্ত রক্ত, অর্থাৎ কোমর ব্যথার কারণ বলে অভিমত দেওয়া হয়। এই চিকিৎসা মূলত বেদে সম্প্রদায়ের মহিলারাই করে থাকেন।

ঘ. দাঁতের পোকা বের করা

এটিও বেদে মহিলারাই করে থাকেন। আক্রান্ত দাঁতের গর্তের মধ্যে তুলা দিয়ে কিছুক্ষণ রেখে দেওয়া হয়। তারপর তুলা রেব করে নিয়ে এসে ক্ষুদ্র জ্যান্ত পোকা দেখানো হয়।

www.pathagar.com

কিন্তু চিকিৎসাবিজ্ঞানে দাঁতে এ ধরনের কোনো পোকার অস্তিত্ব নেই। এটি দাঁতের এক প্রকারের ক্ষয়রোগ বা 'ক্যারিজ' বলা হয়ে থাকে।

ঙ. দাঁত ব্যথা

দাঁতের ক্ষয়জনিত ব্যথায় লোকচিকিৎসকগণ ভেরেন্ডা গাছের রসের সাথে লবণ মিশিয়ে আক্রান্ত স্থানে প্রয়োগের পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

এসব ব্যাধি ছাড়াও এমন অনেক জটিল ও কঠিন ব্যাধি আছে যার চিকিৎসার জন্য গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র ও আধুনিক চিকিৎসা-পদ্ধতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ নর-নারী অধিকাংশ সময়ই লোকচিকিৎসকদের হাতে প্রতারিত হয়ে থাকেন। তবে যেসব লোকচিকিৎসক গাছ-পালার পাতা, শিকড়, ফুল ইত্যাদি ব্যবহারপূর্বক চিকিৎসা করে থাকেন, সে-ক্ষেত্রে তাদের সফলতা লক্ষণীয়। এসব ঔষধি ফল, লতা-পাতা ও শেকড়ের মধ্যে রয়েছে গন্ধবাদালি, আদামুনকুনি (থানকুনি), নিমপাতা, আকন্দ, আমলকি, ভাঁট, লজ্জাবতী, তেলাকুচা, গাঁদা, ভেরেন্ডা, স্বর্ণলতা, কালমেঘ, হরিতকি, বহেরা, তুলসি, বাসক, দূর্বা, হেলেঞ্চা, কচু ইত্যাদি।

চ. কুকুরে কামড়ালে

ধুতুরা বিষাক্ত গাছ হিসেবেই পরিচিত। এর ফল, লতা-পাতা মানুষকে অচেতন করার কাজে অন্যায় ও বেআইনিভাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তবে বাংলাদেশের কবিরাজরা কুকুরে কামড়ানোর চিকিৎসায় এর ফল-মূল, লতা-পাতা ব্যবহার করে থাকেন।

এছাড়া বন্ধ্যাত্ব বা সন্তান না হওয়া, প্যারালাইসিস, অনেকদিন ধরে অজীর্ণ বা আমাশয় রোগে ভোগা, মেয়াদী জ্বর (একটা নির্দিষ্ট সময়ে জ্বর আসা ও ছেড়ে যাওয়া), মানসিক ব্যাধি, গা জ্বালা-পোড়া করা, কলেরা ও বসন্তের হাত থেকে রক্ষা ইত্যাদি থেকে শুরু করে বাচ্চাদের নানা রোগে অনেক মানুষ লোকচিকিৎসক কিংবা ঝাঁড়-ফুঁকের পানির জন্য 'হুজুরদের' শরণাপন্ন হয়ে থাকেন।

মনপুরা উপজেলা

ভোলা দ্বীপাঞ্চলের প্রায় সমসাময়িককালেই মনপুরা দ্বীপের উৎপত্তি। ভোলা জেলা সদর কিংবা বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের সাথে স্থলপথে এই দ্বীপাঞ্চলের কোনো সংযোগ নেই। উন্নততর যোগাযোগ ব্যবস্থার এই যুগেও জেলা সদর ভোলার সাথে যাতায়াতের একমাত্র বাহন সী-ট্রাক বা ট্রলার, যাতে সময় লাগে প্রায় ২ ঘণ্টা। আর এর আরো আগে যখন সী-ট্রাক বা ট্রলার এখানে চলাচল শুরু করেনি তখন তো শুধু নৌকাই ছিল এই উত্তাল মেঘনা নদী পাড়ি দেওয়ার একমাত্র অবলম্বন। উন্নত যোগাযোগব্যবস্থার অভাবে এখনও এখানে কোনো সরকারি চিকিৎসক, এমনকি সরকারি কর্মকর্তারাও বেশিদিন অবস্থান করতে আগ্রহী হয় না। ভৌগোলিক অবস্থান এবং বহির্বিশ্বের সাথে সড়কপথে দ্বীপের বিচ্ছিন্নতার কারণেই উৎপত্তিকাল থেকেই লোকচিকিৎসা ব্যবস্থা এ-অঞ্চলের মানুষের জীবনে একটি মজবুত আসন করে নিতে সমর্থ হয়।

www.pathagar.com

এ এলাকার অনেক মানুষ, বিশেষকরে দুর্গম চরাঞ্চলের মানুষ তো এখনও বিভিন্ন রোগ-ব্যাধিতে লোকচিকিৎসকদের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া অন্য কোনো উপায় খুঁজে পায় না। তদুপরি, সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষের আর্থিক সামর্থ্যের বিষয়টিও তাদের চিকিৎসা গ্রহণের পদ্ধতির সাথে খুবই নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। একজন পাসকরা ডাক্তার পাওয়া গেলেও তার ফি, ঔষধের উচ্চমূল্য ইত্যাদি বিষয়গুলো জনগণকে অতি স্বল্প খরচে প্রাপ্ত লোকচিকিৎসা গ্রহণের প্রতিই অধিক আগ্রহী করে তোলে।

লোকচিকিৎসা ব্যবস্থায় ঝাড়-ফুঁক-তাবিজ-তুমার আবহমানকাল থেকেই প্রচলিত। গ্রামীণ জনগণের কাছে এর গ্রহণযোগ্যতা ও বিশ্বাসযোগ্যতায় বিন্দুমাত্র ঘাটতি নেই। বিশেষত ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের সামনে যখন শ্বেতশ্মশ্রুমণ্ডিত, আলখিল্লা পরিহিত, সর্বোপরি আরবি ভাষায় শিক্ষিত মসজিদের একজন ইমাম বা মোয়াজ্জিন, এমনকি মাদ্রাসার একজন ছাত্র পবিত্র কোরআনের আয়াত বিশুদ্ধ উচ্চারণসহকারে পাঠ করে পানিতে, চিনিতে, গুড়ে, কালিজিরায় বা তেলে ফুঁ দিয়ে তা রোগ-ব্যাধিগ্রস্ত মানুষকে খেতে, পান করতে কিংবা আক্রান্ত স্থানে মালিশ করার পরামর্শ দেন, তখন আর রোগমুক্তিতে তার বিন্দুমাত্র সন্দেহ অবশিষ্ট থাকে না। এছাড়া একজন রোগাক্রান্ত ব্যক্তির দেহে যখন এ-ধরনের একজন আলেম কিংবা তার পীর একটু ফুঁ দিয়ে দেন, তখন ঐ মানুষটির দেহে-মনে যে কী রকম প্রশান্তি আসে, তা কেবল সেই অনুভব করতে পারে। একইভাবে একজন বিপদগ্রস্ত কিংবা রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে যখন কোরআনের আয়াত লিখে দিয়ে তা লোহার কিংবা রূপার বা তামার খোলে পুরে হাতে বা গলায় বা কোমরে বেঁধে ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়, এমনকি ঐ লোহা বা রূপার বা তামার তাবিজটি ধুয়ে সাতদিন খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয় এবং সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি যখন তা করে থাকেন, তখন তার মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হয় যে, 'আমি ভালো হয়ে যাচ্ছি, বা অবশ্যই ভালো হয়ে যাবো।' বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে এই তাবিজ ব্যবহার কিংবা ফুঁ দেওয়া পানি খাওয়ার কোনোরকম কার্যকারিতা হয়তো নেই, কিন্তু একজন রোগগ্রস্ত ব্যক্তি পরম নির্ভরতার সাথেই এসব চিকিৎসা গ্রহণ করে থাকেন এবং দ্বিগুণ, চতুর্গুণ মানসিক শক্তি ও স্বস্তি লাভ করেন, যা তার রোগ মুক্তিতে একটি বিরাট ভূমিকা পালন করে।

এ প্রসঙ্গে স্থানীয়ভাবে পরিচিত কামলা বা জন্ডিস রোগের নিরাময়ে চুনমিশ্রিত পানিতে হাত রেখে ঝাড়ার পদ্ধতির কথা উলেখ করা যেতে পারে। এটি সম্ভবত বাংলাদেশের প্রতিটি অঞ্চলেই প্রচলিত। জন্ডিস রোগীদের অনেকেরই হয়তো জানা নেই যে, কি পদ্ধতিতে বা উপায়ে চুনমিশ্রিত পানির রঙটি হলুদ বর্ণ ধারণ করে। একি ঝাড়-ফুঁকের কেরামতি, না অন্য কোনো কারণ আছে। তবে একজন ওঝা বা খোনকার তার হাতে আমগাছের ছাল ঘষে নিক আর না-ই নিক, তিনি যে তার ঝাড়-ফুঁকে কোরানের আয়াত কিংবা মন্ত্র পড়ে নিয়েছেন তা তো সত্যি। আর এটা যে-কোনো ধর্মাবলম্বী মানুষকে যে গৃহীত ব্যবস্থাটির প্রতি বিশ্বাসী করে তুলবে, তাতে সাধারণত সন্দেহ পোষণ করা যায় না।

জন্ডিসের নিরাময়ে 'মালা' পরার ব্যাপারেও একই কথা প্রযোজ্য। 'বাড়ি' গাছ নামক এক প্রকার গাছের ছোট ডাল-পালা সুতা দিয়ে গেঁথে এই মালাটি তৈরি করে

www.pathagar.com

জন্ডিস আক্রান্ত রোগীর মাথায় ভোরবেলায় সূর্য উঠার সময় পরিয়ে দেওয়া হয়। সারাদিনে মালাটি বড় হতে হতে (ঢিলা হতে হতে) বিকাল নাগাদ সারা শরীর গড়িয়ে মাটিতে পড়ে যায়। লোকচিকিৎসক বলে থাকেন, সারা শরীর থেকে জন্ডিসের সমস্ত 'বিষ' চুষে নিয়ে মালাটি পড়ে গেছে।

মন্ত্রের সাহায্যে সাপে কাটা রোগীর বিষ নামিয়ে থাকেন ওঝারা। কোনো মানুষকে সাপে কাটার সংবাদ পেলে ওই ওঝাকে বিন্দুমাত্র বিলম্ব না করে সঙ্গে সঙ্গে রোগীর কাছে যেতে হয়। এটি ওই ওঝার প্রতি তার গুরুর নির্দেশ বলেই জানা যায়। নিয়মটি সব ওঝার ক্ষেত্রেই পালনীয়। ঘটনাস্থলে পৌঁছে ওঝা প্রথমে সাপে দংশনের স্থানটি দেখেন এবং একটা শক্ত রশি দিয়ে দংশনের স্থানের একটু ওপরে একটা বাঁধ দেন। এরপর তিনি হাত ও পায়ের কনিষ্ঠাঙুলিতে, কেউ কেউ তর্জনীর মাথায় আর একটি সুতা বেঁধে দিয়ে ধীরে ধীরে টানতে থাকেন ও মনে মনে মন্ত্রোচ্চারণ করতে থাকেন। এক পর্যায়ে সুতা দিয়ে বাঁধা ঐ আঙুলটি যখন ফুলে ওঠে ও কালচে বর্ণ ধারণ করে, তখন একটি সুইয়ের সাহায্যে আস্তে করে একটি ফুটা করে দেওয়া হয়। নীচে রাখা কলাপাতা বা কচুপাতায় যে কালচে বা নীলচে রক্তবিন্দু গড়িয়ে পড়ে, তাই সাপের বিষ বলে ওঝাদের অভিমত।

লোকচিকিৎসায় আরেক ধরনের পদ্ধতি রয়েছে, যাতে কোনো ঝাড়-ফুঁক বা তাবিজ বা পানি পড়া, কালিজিরা পড়া, তেল পড়া দেওয়া হয় না। এক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় স্থানীয়ভাবে পাওয়া যায় এমন গাছ-গাছালির শিকড়, পাতা, ফুল, ফল, কষ ইত্যাদি। জন্ডিসের প্রসঙ্গ ধরা যাক। এই ব্যাধিতে আক্রান্ত হলে লোকচিকিৎসকগণ অড়হর ডাল গাছের পাতার রস প্রতিদিন সকালে খালি পেটে এককাপ পরিমাণ খেতে পরামর্শ দিয়ে থাকেন। এছাড়া তৈলাক্ত ও ভাজা খাদ্যদ্রব্য বর্জনসহ নিয়মিত দু'বেলা বা তিনবেলা ভাতের সাথে প্রচুর পরিমাণে অড়হর ডাল খেলেও জন্ডিস দ্রুত আরোগ্য হয় বলে লোকচিকিৎসকদের অভিমত।

কুকুর কামড়ানো রোগীদের ক্ষেত্রে ওঝারা ধুতুরা গাছ ব্যবহার করে থাকেন। দাঁতের ব্যথা উপশমের জন্য পেয়ারা পাতা গরম পানিতে সিদ্ধ করে ঐ পানি দিয়ে ভালো করে কুলি করলে কিংবা ভেরেণ্ডা গাছের 'কষ' একটু লবণের সাথে মিশিয়ে দাঁতের ক্ষয়ে যাওয়া স্থানে বা মাড়ি ফোলার স্থানে লাগাতে পরামর্শ দেওয়া হয়। কোথাও কেটে ছিঁড়ে গেলে পাকিস্তানি লতা কিংবা দূর্বা ঘাস বেটে আক্রান্ত স্থানে লাগানো বহু পুরনো লোকচিকিৎসা।

এছাড়াও আরো যে-সব বনৌষধি ব্যবহার করা হয়, তন্মধ্যে রয়েছে নিমপাতা, বাসকপাতা, তুলসি পাতা, থানকুনি পাতা, গন্ধবাঁদালি পাতা, আমলকি, বহেড়া, হরিতকি, কালমেঘ, চিরতা, তেলকুচা, গাঁদা ফুলের পাতা, দূর্বা, লজ্জাবতী, ওলটকম্বল, মেহেদি পাতা, লেবু পাতা, ইত্যাদি। অনেক রোগ, বিশেষকরে বিভিন্ন বাত-ব্যাধির নিরাময়ের ক্ষেত্রে শিয়ালের মাংসের বড়ি বানিয়ে শুকিয়ে খেতে দেওয়া হয়।

এ দেশের যার শ্রমজীবী মানুষ, বিশেষকরে যাদের মাথায় কিংবা হাতে অনেক ওজন বহন করতে হয়, তারা প্রচণ্ড ঘাড়ের ব্যথা ও কোমরের ব্যথায় ভুগে থাকেন। তারা খুব কমই অভিজ্ঞ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়ে থাকেন। এ ব্যাপারে তারা বেদে-

www.pathagar.com

বেদেনীদের চিকিৎসা গ্রহণ করতে আগ্রহী হয়ে থাকেন। বলাবাহুল্য এদেশের লোকচিকিৎসা ব্যবস্থায় বেদে-বেদেনীদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তাদের কতোটুকু চিকিৎসা, আর কতোটুকু অপ-চিকিৎসা, সেটা তর্কের বিষয়। তবে তারা কোমরের ব্যথার জন্য 'শিঙা' নিয়ে থাকেন। বেদেনীরা ভাঙা কাঁচের টুকরা (ইদানিং অনেকে বেড ব্যবহার করতে শুরু করেছেন) দিয়ে কেচ কেচে (চামড়ার ওপরে হালকা করে আঁচড় দিয়ে) শিঙ্গাটি চেপে ধরে অপর প্রান্তে মুখ দিয়ে চুষে চুষে রক্ত বের করে দেয়। বেদেনীদের বক্তব্য, কোমরে যে বিষাক্ত রক্তের প্রবাহ ছিল, সেটা বের কর দেওয়া হয়েছে। এখন রোগী রোগমুক্ত।

গ্রামাঞ্চলের সরলমনা মহিলারা প্রায়শই বেদেনীদের চালাকি কিংবা প্রতারণার শিকার হয়ে থাকেন। তারা প্রধানত কী কী রোগে ভুগতে পারেন, এমন একটা ধারণা বেদেনীদের আছে। তাই তারা তাদের চেহারা কিংবা হাতটা একটু ধরেই বলে দেয়, আপনার এই এই স্ত্রীরোগ রয়েছে। এজন্য চিকিৎসা প্রয়োজন। এসব চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় বড়িও তারা সঙ্গেই রাখে।

বাংলাদেশের অনেক শিশুই দাঁতের ক্ষয়রোগে (প্রচলিত ভাষায় পোকা ধরা) ভুগে থাকে। তারা বেদেনীদের উত্তম শিকার। তুলার ছোট ছোট গোলা পাকিয়ে দাঁতের গর্তের মধ্যে দিয়ে কিছুটা সময় রেখে দিয়ে কথিত দাঁতের পোকা বের করে আনা হয়।

সচরাচর যেসব রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে সাধারণ মানুষ লোকচিকিৎসকদের শরণাপন্ন হয়ে থাকেন, তার মধ্যে উপর্যুক্ত বিষয় ছাড়াও রয়েছে শিশু-কিশোরদের নিয়মিত বিছানায় প্রস্রাব করা, দীর্ঘকালস্থায়ী (ক্রিনিক) আমাশয় বা অজীর্ণতা, হাত-পা ভাঙা বা মচকানো, মানসিক ব্যাধি, সন্তান না হওয়া বা মৃত সন্তান হওয়া, মহিলাদের বিভিন্ন ধরনের রোগ যেমন, বিলম্বে ঋতুস্রাব শুরু হওয়া, অনিয়মিত ঋতুস্রাব, স্রাবকালীন তলপেটে বেদনা, শ্বেত প্রদর, খোস-পাঁচড়াসহ বিভিন্ন ধরনের চর্মরোগ, কৃমি, কাশি, হাঁপানি ইত্যাদি।

তথ্যসূত্র

১. আবদুর রহমান, পিতা : প্রয়াত এ কে এম ইউসুফ, মাতা : প্রয়াত জোলেখা খাতুন, বয়স : ৬৫ বছর, পেশা : ব্যবসা, ঠিকানা : গ্রাম : চাঁচড়া বাপ্তা, ডাকঘর : বাপ্তা পাইলট, উপজেলা : ভোলা সদর

২. মোঃ নজরুল ইসলাম, পিতা : প্রয়াত দেলওয়ার হোসেন, মাতা : প্রয়াত উম্মে কুলসুম, শিক্ষা : বি.এ., বয়স : ৪৪ বছর, পেশা : ব্যবসা, ঠিকানা : সদর রোড, ভোলা, ডাকঘর ও উপজেলা : ভোলা

৩. মোহাম্মদ আবদুল্লাহ, পিতা : মোহাম্মদ ইছহাক, মাতা : প্রয়াত সুফিয়া বেগম, শিক্ষা : ফাজিল, বয়স : ৪০ বছর, পেশা : ব্যবসা, ৭ নং ওয়ার্ড, দৌলতখান পৌরসভা, ঠিকানা : ডাকঘর : দৌলতখান, উপজেলা : দৌলতখান

৪. কার্তিক দেবনাথ, পিতা : ননীগোপাল দেবনাথ, মাতা : শান্তি দেবনাথ, শিক্ষা : ডি.ইউ.এম.এস, বয়স : ৬১ বছর, ঠিকানা : গ্রাম : হাসাননগর, ডাকঘর : মৃজাকালু, উপজেলা : বোরহানউদ্দিন

www.pathagar.com

৫. মোঃ অজিউল্লাহ মিয়া, পিতা : প্রয়াত আবদুর রহমান মিয়া, মাতা : প্রয়াত তহুরা খাতুন, বয়স : ৭১ বছর, পেশা : ব্যবসা, ঠিকানা : গ্রাম : ধলিগৌরনগর, ডাকঘর : সিরাজিয়া মাদ্রাসা, উপজেলা : লালমোহন
৬. সালেহা খাতুন (পারুল), স্বামী : মোঃ অজিউল্লাহ মিয়া, শিক্ষা : বি. এ., বয়স : ৫৭ বছর, পেশা : গৃহিণী, ঠিকানা : গ্রাম : ধলিগৌরনগর, ডাকঘর : সিরাজিয়া মাদ্রাসা, উপজেলা : লালমোহন
৭. কাজী মোহাম্মদ রাশেদ, পিতা : প্রয়াত মোহাম্মদ আলী, মাতা : জাকিয়া বেগম, বয়স : ৪০ বছর, পেশা : ব্যবসা, ঠিকানা : দক্ষিণ ফ্যাশন, ডাকঘর ও উপজেলা : চরফ্যাশন
৮. মোঃ আলমগীর হোসেন, পিতা : মোহাম্মদ নূর হাফেজ মিয়া, মাতা : হাসিনা বেগম, শিক্ষা : বিএ (অনার্স) এম.এ, পেশা : শিক্ষকতা, বয়স : ৩৩ বছর, ঠিকানা : গ্রাম : চর ফৈজুদ্দিন, ডাকঘর : হাজীরহাট, উপজেলা : মনপুরা

www.pathagar.com

প্রবাদ-প্রবচন

ভোলা সদর উপজেলা

১. হুইতো[১] পায় না ওগলাকাডা[২]
কিনতো চায় পাডি[৩]
সোনা দিয়া বান্দাইতো[৪] চায়
ব্যারন[৫] গাছের লাডি[৬]।
: সামর্থ্যের অতিরিক্ত ব্যয় করার প্রবণতা।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. শুইতে, ২. হোগলার টুকরা, ৩. পাটি, ৪. বাঁধতে, ৫. ভেরেন্ডা গাছ, ও ৬. লাঠি।

২. আজাইর‍্যা[১] খায় আর মসইদো[২] আজান দ্যায়।
: নিষ্কর্মা।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. বিনা শ্রমে, ও ২. মসজিদে।

৩. চুন খাইয়া মোক[১] পোড়া যায়, দই খাইতে ছ্যাপড়া[২] খায়।
: পূর্ব বিপদের অভিজ্ঞতা স্মরণ।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. মুখ, ও ২. চমকে ওঠে।

৪. নির্বইল্যার[১] কুশল্যা[২] দরি[৩], আয় রে বাই পোন্দে[৪] আডি[৫]।
: সক্ষম ব্যক্তিকে অক্ষমে পরিণত করার কু-পরামর্শ।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. বলহীনের, ২. পরামর্শ, ৩. ধরি, ৪. পাছা দিয়ে, ও ৫. হাঁটি।

৫. সরকারে খায় মসইদো আজান দ্যায়।
: নিষ্কর্মা।

৬. বাড়ির গরু দরজার ঘাস খায় না।
: নিজ বাড়িতে বা দেশে অনাদর।

৭. দাদার বউ হাদা[১] খায়, পাদতে পাদতে[২] বোলা[৩] যায়।
: মহিলাদের সাদা পাতা (তামাকজাত দ্রব্য) খাওয়ার কুফল সম্পর্কে।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. সাদা পাতা (তামাক পাতা), ২. বায়ু ত্যাগ করতে করতে, ও ৩. ভোলা (ভোলা শহরে অর্থে)।

৮. নদীত তুফান দেইকখা তরে[১] আছাড় খায়।
: দূরবর্তী বিপদের সম্ভাবনায় ভীত।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. তীরে।

৯. পাইতে পাইতে লাই[১] বাপেরে বোলায়[২] বাই[৩]।
: অতিমাত্রায় লোভীর কাণ্ডজ্ঞান হারানো।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. অতিরিক্ত প্রশ্রয়, ২. ডাকে, ও ৩. ভাই।

www.pathagar.com

১০. আন্দি-গুন্দি[১] বাই আমার কোনো দোষ নাই।
: চোখ বন্ধ করে অপরের ক্ষতি সাধন করে নিজেকে নির্দোষ বানানোর প্রয়াস।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. চোখে না দেখা।

১১. রান্দি-বারি[১] যেই নারী ব্যাডার[২] আগে খায়।
বরা[৩] কলসের পানিও তার তরাশে হুগায়[৪]।
: সংসারের পুরুষদের আগে মহিলাদের আহার করার কুফলজনিত কুসংস্কার।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. রান্নাবান্না করে, ২. স্বামী অর্থে, ও ৩. শুকায়।

১২. যেয়ার[১] গরের হেয়া[২]।
: যেমন বাপ তেমন ব্যাটা।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. যেরূপ, ও ২. ঐরূপ।

১৩. অল্প বয়সের দাড়ি, নদীর পাড়ের বাড়ি আর বনে চরইন্যা[১] গাই—এই তিনে বিশ্বাস নাই।
: এই তিনটিরই স্থায়িত্বকাল নিয়ে সন্দেহ পোষণ করা।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. চরানো।

১৪. হুদাই আমার আমার করি, আমি কার কে আমার, কার লাইগ্যা করি।
: পৃথিবীতে কেউ বা কিছুই নিজের নয়।

১৫. আগে গ্যালে বাগে[১] খায়, শেষে গ্যালে দুদ-বাত[২] খায়।
: কোনো কিছু দ্রুত করে ফেলা উচিত নয়, ভেবে-চিন্তে ধীরে ধীরে কাজ করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. বাঘ, ও ২. দুধ-ভাত।

১৬. ব্যাক[১] মাছে গু খায় নাম পড়ে পাঙ্গাসের।
: অপরাধ করে অনেকে কিন্তু দায় পড়ে দু'একজনের।

১৭. বইতো দিলে হইতো চায়।
: কাউকে সামান্য আস্কারা দিলে অধিকতর সুবিধার প্রত্যাশা করে।

১৮. সুদ খাইয়া জমায়, মদ খাইয়া আরায়[১]।
: অসৎ পথে উপার্জিত অর্থ অসৎ পথেই ব্যয় হয়।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. হারায়।

১৯. উনা বাতে দুনা বল, নিত্য ঊনা রসাতল।
: পরিমিত আহার গ্রহণ করা স্বাস্থ্যের জন্য হিতকর।

২০. ব্যাহাইয়ারে[১] মারে পিছা[২] ব্যাহাইয়া কয় হুদা মিছা[৩]।
: নির্লজ্জতা (অপমানিত হয়েও তা বিনা বাক্যে হজম করা)।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. বেহায়া, ২. ঝাড়ু, ও ৩. এমন কিছু না।

২১. হকুনের[১] দোয়ায় গরু মরে না।
: লোভী ব্যক্তির প্রার্থনা কবুল হয় না।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. শকুনের।

www.pathagar.com

২২. উদের[১] বদদোয়ায় মাছের ওল[২] খৈয়া[৩] পড়ে না।
: নিজের স্বার্থে অপরের ক্ষতি কামনা করলে তা সফল হয় না।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. জলচর মৎস্যভুক প্রাণি, ২. অণ্ডকোষ, ও ৩. খসে।

২৩. সময়ে লাগে মিডা[১] অসময়ে লাগে তিতা।
: ভাল কথা সবসময় ভাল লাগে না।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. মিষ্টি।

২৪. হারা[১] রাস্তায় দৌড়াদৌড়ি খেয়া গাটে[২] গড়াগড়ি।
: অযথা হয়রানি।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. সমস্ত, ও ২. ঘাটে।

২৫. আগের তন[১] পিছে বালা[২] যদি বোলায়[৩] মায়।
: মঙ্গলামঙ্গল বোঝানোর ক্ষেত্রে।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. থেকে, ২. ভালো, ও ৩. ডাকে।

২৬. নাই দ্যাশে ভেরেন্ডাও আবার বিরিক্ষ[১]।
: সময়ে অবমূল্যায়িত জিনিসেরও কদর হয়।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. বৃক্ষ।

২৭. হক কতা ডক[১] লাগে না।
: সত্য সবসময় অপ্রিয়।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. সুন্দর, ভালো।

দৌলতখান উপজেলা

১. কুত্তার নজর গুঁয়ের মিল।
: নিচ স্বভাবের মানুষের দৃষ্টিও নীচের দিকে।

২. গুমে[১] চায় না ওগলা-পাডি[২], আগা[৩] চায় না বাত্তি।
: অত্যধিক প্রয়োজনের সময় বাছ-বিচার করা যায় না।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. ঘুম, ২. হোগলা-পাটি (বিছানা), ও ৩. মলত্যাগ।

৩. ছিক্কার মাছ বিড়াইলের লাইগগা হারাম।
: নাগালের বাইরের বস্তুকে ক্ষতিকর বলে প্রচার করে আত্মতৃপ্তি লাভ।

৪. উদে মাছ ধরে, চিলে বাগ[১] করে।
: একের সংগৃহীত আহার অন্যে খায়।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. ভাগ।

৫. নিজে রান্দি নিজে বাড়ি, নিজের জামাই খায়
পাড়া-পড়শি মাগিগুলার চোউক টাডাইয়া যায়।
: একজনের সুখ অন্যের সহ্য না হওয়া।

৬. যার গরে চুরি করি হে কয় চোর, যার লাইগ্যা চুরি করি হেও কয় চোর।
: উপকারীকে অপবাদ দেওয়া।

www.pathagar.com

৭. গরের ইন্দুরে বান কাটলে ট্যার পাওয়া যায় না।
: আপন লোক ক্ষতি করলে আগে বোঝা যায় না।

৮. খেউয়াইন্যা[১] কুত্তায় কামড়ায় না।
: যে বেশি চোটপাট করে সে ক্ষতি করে না।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. ঘেউ ঘেউ করা।

৯. তুমি যেই পুগুইরের[১] মাছ, আমি হেই পুগুইরের উদ[২]।
: অধিকতর শক্তিমান।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. পুকুর, ও ২. জলচর মৎস্যভুক প্রাণী।

১০. আগে তিতা পরে মিডা।
: পূর্ব-আলোচনায় মীমাংসা করা।

১১. ইন্দুরের দারে কোরানও যা, পুরাণও তা।
: ক্ষতিকর ব্যক্তির কাছে কোনোকিছুর ভেদাভেদ নাই।

১২. উচিত কতার বাত নাই।
: সত্যবাদীর অবমূল্যায়ন।

১৩. আমার অইছে পেডে গা[১], আমারে কয় রসুন খা।
: ক্ষতিকর পরামর্শ।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. পেটে ঘা।

১৪. দুই মুইক্যা[১] হাপ[২]
: একজনের কথা যে আরেকজনের কাছে বলে। সবদিক থেকে ক্ষতিকর।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. দুমুখো, ও ২, সাপ।

১৫. ছাগল পালে পাগলে, আস[১] পালে অন্দে[২]।
হাজের[৩] কালে গরে না আইলে দুয়ারে বইয়া কান্দে।
: নিবুর্দ্ধিতা।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. হাঁস, ২. অন্ধ, ও ৩. সাঁঝের বেলা।

১৬. ছাল নাই কুত্তার বাগা[১] নাম
: অতি মূল্যায়ন।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. বাঘা।

১৭. বাঙা[১] পাও খাদে পড়ে।
: ক্ষতির পুনরাবৃত্তি।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. ভাঙা।

১৮. গরু চোরার মোহে আসি[১], মূলা চোরার ফাঁসি।
: অন্যায় শাস্তি।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. মুখে হাসি।

১৯. খায় মোচ আলায়, নাম অয় দাড়ি আলার।
: একজনের দায় আরেকজনের কাঁধে চাপানো।

www.pathagar.com

২০. নগদ বেচলে পাতে বাত[১] বাকি বেচলে মাতায় আত[২]।
: বুদ্ধির সঠিক প্রয়োগ।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. ভাত, ও ২. হাত।

২১. যদি থাহে বন্ধুর মন গাঙ পার অইতে কতক্ষণ।
: বন্ধুত্বের গভীরতা।

২২. গাই-বাছুরের মিল থাকলে মাডে গিয়াও দুধ দ্যায়।
: পারস্পরিক সম্পর্কের ফলাফল।

২৩. চোরে করে চুরি সাউদের গলায় পড়ে দড়ি।
: বিচারে পক্ষপাতিত্ব।

২৪. মহুরি কলম চিনে নাপতায় চিনে লোম।
মেস্তরিয়ে[১] কাঠ চিনে আইলসায় চিনে গুম[২]।
: যার যে বিষয়ে জ্ঞান।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. সুতার, ও ২. ঘুম।

২৫. আদার খাইয়া মাছ আটকায় না হেইডা ক্যামন বড়শি
ইশারায় কতা বোজে না হেইডা ক্যামন পড়শি।
: আন্তরিকতার অভাব।

২৬. পুত্রায় আইলে দর্ দর্[১], জামাই আইলে জবাই কর।
: সম্পর্ক বুঝে আচরণের পার্থক্য।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. ধরধর।

২৭. হৎ মা[১] হিরা্যা[২] চায়, সাগর হুগাইয়া[৩] যায়।
: অবিশ্বাস্য ঘটনা।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. মৎ মা, ২. ফিরে, ও ৩. শুকিয়ে।

২৮. অ্যাক চোরে বিয়া করে আরেক চোরের হালি[১]
: যে যেমন খোঁজে সে তেমনই পায়।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. শ্যালিকা।

২৯. করইন্যার[১] দোষ অয় না, দ্যাহইন্যার[২] দোষ।
: প্রকৃত অপরাধীকে রেখে আরেকজনের কাঁধে দোষ চাপানো।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. যে করে, ও ২. যে দেখে।

৩০. কুত্তার ল্যাজ বারো বচ্ছর চুঙ্গার মইদ্যে বইর‍্যা[১] রাখলেও সোজা অয় না।
: স্বভাব অপরিবর্তনশীল।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. ভরে।

তজুমুদ্দিন উপজেলা

১. নিজের কতা পরেরে কই, সাদ[১] কইর‍্যা পতে বই।
: নিজের সর্বনাশ নিজে ডেকে আনা।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. সাধ।

www.pathagar.com

২. কে কান্দে কী লইয়া, যুইগ্যায়[১] কান্দে যুইগ্যার গোয়ার[২] লাইগ্যা।
: বড় ধরনের আলোচনার মধ্যে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয় উত্থাপন।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. যোগী, ও ২. পাছার।

৩. আইছে পাদ[১] গ্যাছে পাদ, পাদ লইয়া ক্যান বাদাবাদ।
: মন্দ বা তুচ্ছ বিষয় নিয়ে আলোচনা না করার পরামর্শ।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. পায়ুপথ দিয়ে নিঃসৃত বায়ু।

৪. কিনতে পাগল বেচতে ছাগল।
: ভাবনা-চিন্তা না করে সিদ্ধান্তগ্রহণের ফল।

৫. পাইত্যালেরে[১] বাঙ্গা বেড়া[২] দ্যাহান।
: ক্ষতি করার সহজ পথের সন্ধান দান।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. পাতিশিয়াল, ও ২. ভাঙা বেড়া।

৬. বাপ কইতে যতক্ষণ শালা কইতেও ততক্ষণ।
: যার কোনো বুক-পিঠ নেই।

৭. ব্যাহাইয়ারে[১] মারে পিছা[২] ব্যাহাইয়া কয়-হুদা-মিছা[৩]।
: অপমানিত হলেও যার গায়ে লাগে না।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. বেহায়া, ২. ঝাড়ু, ও ৩. গায়ে না মাখানো অর্থে।

৮. ডুব দিয়া পানি খায়, মাইনষের দারে[১] উয়াস[২] দ্যাহায়।
: গোপনে গোপনে দোষ করে তা ঢেকে রাখার প্রচেষ্টা।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. কাছে, ও ২. উপাস।

৯. বাত নাই বাতার চায়।
: অক্ষমের চাহিদা।

১০. হেইদিন আর নাইরে নাতি, খাবলা খাবলা[১] বাত বিলাইতি[২]।
: গতদিনের প্রাচুর্য স্মরণ করে সংযমী হওয়ার পরামর্শ।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. মুঠো মুঠো, ও ২. বিলানো।

১১. কুত্তার ল্যাজ চৌদ্দ বচ্ছর চুঙ্গার[১] মইদ্যে বইর‍্যা রাখলেও সোজা অয় না।
: বদ স্বভাব কোনোদিন পাল্টায় না।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. সরু নল, ও ২. ভরে।

১২. ডুব দিয়া আগলেও[১] মাতায় ওডে[২]।
: মন্দ জিনিস লুকানো যায় না, প্রকাশিত হবেই।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. মলত্যাগ করা, ও ২. উঠে।

১৩. খাইতোও চায় বালা, হুইতো[১]ও চায় মইদ্যে।
: সবদিক থেকে সুবিধাজনক অবস্থানে থাকার প্রচেষ্টা।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. শুইতে।

১৪. ব্যাডা মাইনষে রাগ অইলে অয় বাশশা, মাইয়া মাইনষে রাগ অইলে অয় বেশ্যা।
: কাজ এক, কিন্তু দু-জনের ক্ষেত্রে দু-ধরনের ফল।

www.pathagar.com

১৫. আতো[১] দই মুখো[২] দুই, তবু কয় কই কই।
: অনেক পেয়েও অতৃপ্ত।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. হাতে, ও ২. মুখে।

১৬. গাই আর বাছুরে মিল থাকলে জঙ্গলে যাইয়াও দুধ দ্যায়।
: পরস্পরের প্রতি নিষ্ঠাবান।

১৭. মানী মরে মানের লাইগ্যা, কানী মরে চোউকের লাইগ্যা।
: যার যা প্রয়োজন।

১৮. জামাই-মাইয়ার দ্যাহা নাই শুক্কুরবারে বিয়া।
: পরিকল্পনার আগেই সিদ্ধান্তগ্রহণ।

১৯. নিজের বুদ্দিতে মরণও বালা, পরের বুদ্দিতে বাশশাও বালা না।
: জিদ বজায় রাখা, একরোখা।

২০. পাও দিয়া আলডাইলে[১] কামড়ায় না এমন হাপ[২] নাই।
: অন্যকে বিরক্ত করতে গেলেই নিজের ক্ষতি হয়।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. বিরক্ত করা, ও ২. সাপ।

২১. অ্যাক মা'র অ্যাক পুত, মইর‍্যা গ্যালে টুক্কুরুত[১]।
: শেষ ভরসা।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. সব শেষ অর্থে।

২২. নদীত তুফান দেইক্‌কা তরে[১] আছাড় খায়।
: দূরবর্তী কোনো বিপদের আলামত উপলব্ধি করে ভয় পাওয়া।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. তীরে।

২৩. বারি'র[১] গা[২] হুগায়[৩], কতার গা হুগায় না।
: কথা'র আঘাতে সৃষ্ট ক্ষত দীর্ঘস্থায়ী হয়।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. আঘাত, ২. ঘা, ও ৩. শুকায়।

২৪. হারা[১] পতে[২] দৌড়াদৌড়ি খেয়া গাটে[৩] গড়াগড়ি।
: নিষ্ফল পরিশ্রম।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. সারা, ২. পথে, ও ৩. খেয়াঘাটে।

২৫. অল্প ব'সের দাড়ির আর নদীর পাড়ের বাড়ির বিশ্বাস নাই।
: ক্ষণস্থায়ী।

২৬. লাউগ[১] পায়না যেয়ানো[২], খাউজ্যাইয়া[৩] মরে হেয়ানো[৪]।
: ধরা ছোঁয়ার বাইরের বিষয়ের প্রতি ঝোঁক।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. নাগাল, ২. যেখানে, ৩. চুলকায়, ও ৪. সেখানে।

www.pathagar.com

২৭. আবাইগ্যারে[১] পাইছে বুতে[২] গর[৩] থুইয়া[৪] বাইরে হুইতে[৫]।

: স্বেচ্ছায় দুঃখ-কষ্টকে বরণ করে নেওয়া।

আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. অভাগা, ২. ভূতে, ৩. ঘর, ৪. রেখে, ও ৫. শুইতে।

২৮. হাপের[১] ল্যাজ দিয়া কান খাউজ্যানো[২]।

: নিজের বিপদ নিজে ডেকে আনা।

আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. সাপ, ও ২. চুলকানো।

২৯. আমিও রাঁড়ি অইলাম, দ্যাশেও নতুন নতুন শাড়ি আইলো।

: যথাসময়ে না পাওয়ার দুঃখ।

৩০. হক কতা ডক[১] লাগে না।

: সত্য কথা সবারই অপ্রিয়।

আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. ভালো।

বোরহানউদ্দিন উপজেলা

১. পাও[১] পারা দিয়া ঝগড়া করা।

: গায়ে পড়ে ঝগড়া বাঁধানো।

আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. পায়ে।

২. পূব-পশ্চিম না মানা।

: রীতি-নীতি না মানা।

৩. চুন খাইয়া মোক পুইড়্যা যায়, দই খাইতে ছেপড়া[১] খাই।

: পূর্ব অভিজ্ঞতার তিক্ত স্মৃতি।

আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১ চমকে উঠে।

৪. চুন বেশি খাইলে মোক[১] পুইড়্যা যায়, আবার কম খাইলে মোক জ্বলে।

: কোনো কিছুর অপরিমিত ব্যবহার।

আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. মুখ।

৫. খলই বা চালনি দিয়া দুধ দোয়ানো।

: অপাত্রে ধারণ।

৬. যেয়ার[১] গরের হেয়া[২], বাইততার[৩] গরে চিয়া[৪]।

: ছোট অপরাধীর ঘরে বড় অপরাধীর জন্ম।

আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. যার, ২. সেরূপ, ৩. ছোট আকারের ইঁদুর, ও ৪. চিকা।

৭. নিরমুয়া[১] কুত্তা গু খাওনের যম।

: বাইরে সাধু সাধু ভাব দেখানো, কিন্তু ভিতরে মন্দ কাজে পারদর্শী।

আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১.।

www.pathagar.com

৮. আন্দা লেকতে পোন্দে[১] ফাড়ে[২]।
: অশিক্ষিতের দৌড়।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. পাছা, ও ২. ফাটে।

৯. কলা গাছে খন্তা হান্দাই[১]।
: তুচ্ছ বিষয়কে অধিক গুরুত্ব দেওয়া।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১ প্রবেশ করানো।

১০. নিজে পায় না জাগা[১] মাইগ্যা আনে বাগা[২]।
: অতিরিক্ত খায়েশ।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. স্থান, ও ২ বখরা।

১১. গলা দিয়া নাইম্যা গ্যালে আর মনে রাহে না[১]।
: অকৃতজ্ঞ।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. রাখে না।

১২. চোউকে কাজল লাগাইতে যাইয়া চোউক কানা করা।
: লাভের পরিবর্তে ক্ষতি।

১৩. মায় কয়না পুত, খালায় কয় বইনপুত।
: অতিরিক্ত আদর।

১৪. পুতে করে বাবুয়ানা, মায় পিন্দে চাবির তেনা[১]।
: আসল অবস্থার চাইতে বেশি দেখানো।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. অল্পদামী কাপড়ের টুকরা।

১৫. শোঙা শুঙি[১] না কইর‌্যা কুত্তায় গুয়ের দারেও যায় না।
: সাবধানতা অবলম্বন করা।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. শুঁকে দেখা।

১৬. পিড়া পাইত্যা বইলাম ভাই, বাড়া বাতে পড়লো ছাই।
: আশাভঙ্গের মনোবেদনা।

১৭. বড় মাইনষে কতা কয় টেয়া আর কড়ি,
ছোড মাইনষে কতা কয় হুইচ[১] আর দড়ি।
: স্তরভেদে আলাপ-আলোচনার প্রকৃতি।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. সুচ।

১৮. কুত্তায় কামড়ায় আড্ডুর[১] নীচে।
: দৃষ্টির সীমাবদ্ধতা বোঝানো।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. হাঁটু।

১৯. বানাইতো পারে না একখান
বাইঙ্গা করে খানখান।
: অকর্মণ্য ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়।

www.pathagar.com

২০. মন চায় রাজা অইতে, খোদায় দেয় না মাইগ্যা[১] খাইতে।
: সৃষ্টিকর্তার প্রতি অন্যায় অনুযোগ।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. ভিক্ষা করে।

২১. বাইরে লেপা পোছা[১] দুধের লাহান[২] সাদা।
মনের মইদ্যে লক্ষ হাজার শয়তানের বাসা।
: যার বাইরে একরূপ, ভিতরে আরেক রূপ।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. ধোপ-দুরস্ত, ও ২. মতো।

২২. অ্যাক গাছের ছাল আরেক গাছে লাগে না।
: অসম সম্পর্ক।

২৩. পোলার লগে[১] দ্যাহা নাই, ওস্তার[২] লগে দোস্তি।
: প্রাপ্তির আগেই ব্যয়ের পরিকল্পনা।

২৪. অবাগারে[১] পাইছে ভূতে, গর[২] থুইয়া[৩] বাইরে হুইতে[৪]।
: দুর্ভাগা নিজের দুর্ভাগ্য নিজেই ডেকে আনে।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. অভাগা, ২. ঘর, ৩. রেখে, ও ৪. শুইতে।

২৫. দিন যায় কতা থাকে, সময় যায় ফাঁকে ফাঁকে।
: সময় বয়ে যায় কিন্তু স্মৃতি বেঁচে থাকে।

২৬. চউকে চউকে যতক্ষণ পরান কান্দে ততক্ষণ।
: ক্ষণস্থায়ী সম্পর্কের ক্ষেত্রে।

২৭. ধন, জন, জোয়ানি—কচু পাতার পানি।
: পৃথিবী ও সংসারের নশ্বরতা বোঝাতে।

২৮. বাত[১] খায় বাতারের[২], গুণ গায় নাগরের।
: অকৃতজ্ঞতা।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. ভাত, ও ২. স্বামীর।

২৯. আশা কইর্যা বইয়া আছি।
দান-চাউল[১] মিশাইয়া বাছি।
: সুদূরের প্রত্যাশায় কাল কাটানো।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১ ধান-চাউল।

লালমোহন উপজেলা

১. আল্লাহ্‌র পোন্দে[১] খুডা[২] গারে[৩]।
: অবাস্তব কাজে লিপ্ত হওয়া।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. পাছায়, ২. কাঠের ক্ষুদ্র খুঁটি, ও ৩. পুঁতে রাখে।

www.pathagar.com

২. আমনা হাউরি[১] সেলাম পায় না চাচী হাউরিয়ে পাও[২] বাড়ায়।
: অবাঞ্ছিত প্রত্যাশা।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. শাশুড়ি, ও ২. পা।

৩. আতে[১] থাইকলে লোয়া[১] শয়তানে মারে গোয়া[২]।
: অলস মাথায় দুষ্ট বুদ্ধির উদ্রেক।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. হাতে, ২. লোহা, ও ৩. পাছা।

৪. ছোড লোকের[১] কান্দো[২] চরনের তন[৩] বড় লোকের জোতা বওন[৪] বালা।
: অমানুষের নেতৃত্ব করার চেয়ে ভালো মানুষের চাকর হওয়াও উত্তম।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. অমানুষের, ২. কাঁধে, ৩. চড়ার চেয়ে, ও ৪. বওয়া।

৫. হৈরে[১] বৈরাগীরে নিন্দা করে—তুই মাগি খাস।
: নিজের দোষ না দেখে অপরকে দোষী সাব্যস্ত করা।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. ফকিরে।

৬. নাপিত দেইকলে নউককনি[১] বাড়ে।
: অপ্রয়োজনেও প্রয়োজনীয়তা অনুভব।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. নখ কাটার ইচ্ছা।

৭. হানক হাপের[১] লেজ দি খাউজজায়[২]।
: নিশ্চিত বিপদ ডেকে আনা।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. বিষধর সাপ (গোখরো), ও ২. চুলকায়।

৮. আমিও বিধবা অইলাম সিন্দুরও[১] হস্তা[২] অইল।
: প্রয়োজনকালে না পাওয়ার দুঃখ।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. সিঁদুর, ও ২. সস্তা।

৯. চোরের পোলা, হাপের ছাও[১] আগুনের ফুলকা—তিন জাতেরে বিশ্বাস করণ নাই।
: ক্ষতিকর কোনো ক্ষুদ্র বস্তুকেই বিশ্বাস করতে নেই।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. সাপের বাচ্চা।

১০. আমনা[১] দন[২] পরেরে দি, কান্দে বুইড়্যায় গালে হাত দি।
: নিজের সম্পদ অপরকে দিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়া।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. নিজের, ও ২. ধন।

১১. মায় থাহে বটতলায়, পুতে থাহে সাত তালায়।
: অহংকার করা।

১২. রাডের[১] কালে কি-না খায় কাইজ্যার[২] সময় কি-না কয়।
: বিশেষ বিশেষ সময়ে ভালো-মন্দ বিচার না করা।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. দুর্ভিক্ষে, ও ২. ঝগড়ায়।

www.pathagar.com

১৩. নিত্য আবাইত্যারে[১] কে দ্যায় বাত[২] নিত্য মরারে কে দ্যায় কাঠ।
: চির-অভাবীকে কেউ দেখতে পারে না।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. নিরন্ন ও ২. ভাত।

১৪. বাউজে[১] কয় কিতা, কোন্ডায়[২] রইছে বাতের হাইল্যা[৩] কোন্ডায় রইছে বিয়া।
: আগাম চিন্তা-ভাবনা।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. ভাবী, ২. কোথায়, ও ৩. পাতিল।

১৫. হতিনের[১] পুত অউক, পড়শির বালা[২] অউক।
: অকল্পনীয় কামনা।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১.সতীনের, ও ২. ভালো।

১৬. যদি থাহে নসিবে, পোন্দে ঘষি আসিবে।
: ভাগ্যে থাকলে ফেরানো যাবে না।

১৭. চোরে খোঁজে আন্দাইর[১] রাইত।
: যার জন্য যা প্রয়োজন।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. অন্ধকার।

১৮. মোহের[১] ছ্যাপ[২] আর কতা পড়ি গ্যালে হিরি[৩] আইয়ে না।
: দুটোকেই আর ফেরানো যায় না।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. মুখের, ২. থুথু, ও ৩. ফিরে।

১৯. চুন খাই[১] মুক[২] পুইরছে[৩] দুই খাইতে ডরাই।
: পূর্বের তিক্ত অভিজ্ঞতার জন্য সতর্কতা অবলম্বন।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. খেয়ে, ২. মুখ, ও ৩. পুড়েছে।

২০. আশা করি বই[১] রইছি[২], দানে চাইলে[৩] মিশাই[৪] বাছি।
: প্রতীক্ষার প্রহর দীর্ঘায়িত করা।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. বসে, ২. আছি, ৩. ধানে-চাউলে, ও ৪. মিশিয়ে।

২১. শিন্নি দেহি আউগ্যায়[১], কুত্তা দেহি পাইছ্যায়[২]
: দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভোগা।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. এগোয়, ও ২. পিছিয়ে যায়।

২২. মায় হিন্দে ছাবির ত্যানা[১] পুতে করে বাবুয়ানা
: দম্ভ প্রদর্শন।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. ছেঁড়া কাপড়।

চরফ্যাশন উপজেলা

১. বিনা বাতাসে গাঙের পানি লড়ে না[১]।
: কারণ ছাড়া কার্য হয় না।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. নড়ে না।

www.pathagar.com

২. বাপ বালা[১] অইলে পোলা বালা
মা বালা অইলে জি[২]
গাই বালা অইলে বাছুর বালা
দুধ বালা অইলে গি[৩]।
: বীজ ভালো হলে ফসলও ভালো হয়।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. ভালো, ২. ঝি, ও ৩. ঘি।

৩. আমনা হাউরি[১] সেলাম পায় না, নানী হাউড়ি[২] পিড়া[৩] খোঁজে।
: অবাঞ্ছিত প্রত্যাশা।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. আপন শাশুড়ি, ২. নানী শাশুড়ি, ও ৩. পিঁড়ি।

৪. ব্যাহাইয়ারে[১] মারে পিছা, ব্যাহাইয়া কয় হুদা মিছা[২]।
: মান-অপমান বোধ নাই যার।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. বেহায়া, ও ২. ও কিছু না (অর্থে)।

৫. মানলে তালগাছ না মানলে বাল[১] গাছ।
: ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য গুণাগুণ বিচার।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. লজ্জাস্থানের লোম অর্থে।

৬. নিজের পুটকিতে[১] ছয় মন গু, অন্যেরে কয় বালা কইর‌্যা দো[২]।
: নিজের দোষ না দেখে অন্যের দোষ স্খালনের পরামর্শ।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. মলদ্বারে, ও ২. ধুয়ে ফেলো।

৭. যতদিন থাহে[১] বিছনার মুত[২], ততদিন থাহে মায়ের পুত।
: প্রয়োজন শেষ হলে সম্পর্কেরও সমাপ্তি ঘটে।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. থাকে, ও ২. প্রস্রাব।

৮. বারো বচ্ছর চুঙ্গার মইদ্যে বইর‌্যা[১] রাখলেও কুত্তার ল্যাজ সোজা অয় না।
: স্বভাবের অপরিবর্তনশীলতা।
: **আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ :** ১. ভরে।

৯. চোরে খোঁজে বাঙা বেড়া।
: সুযোগসন্ধানী ব্যক্তি।

১০. হুইচ[১] অইয়া ডোকে[২] হাল[৩] অইয়া বাইরায়[৪]।
: বড় ধরনের অনিষ্টকারী।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. সুই, ২. ঢোকে, ৩. ফাল, ও ৪. বের হয়।

১১. গাঙ্গে ডেউ[১] দেইককা তরে[২] আছাড় খায়।
: অকারণে আতঙ্কিত হওয়া।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. ঢেউ, ও ২. তীরে।

১২. মানুষ আডে[১] দুই পায় বিপদ আডে চাইর[২] পায়।
: উপর্যুপরি দ্রুততর বেগে বিপদ আসা।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. হাঁটে, ও ২. চার।

www.pathagar.com

১৩. ফরজ থুইয়া[১] নফল লইয়া দৌড়াদৌড়ি।
: অবশ্য করণীয় কাজ রেখে কম গুরুত্বপূর্ণ কাজের প্রতি অধিক গুরুত্ব প্রদর্শন।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. রেখে।

১৪. লাউগ[১] পায় না যেয়ান[২], খাউজ্যাইয়া[৩] মরে হেয়ান[৪]।
: যে বিষয়ে জ্ঞান নেই, সে বিষয়ে আলোচনা করা।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. নাগাল, ২. যেখানে, ৩. চুলকায়, ও ৪. সেখানে।

১৫. লতার উরপে[১] লতা গ্যাছে, টাইন্যা[২] আনতে ছিইড়্যা[৩] গ্যাছে।
: অতি দূর সম্পর্কের আত্মীয়তা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে জটিলতা।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. উপরে, ২. টেনে, ও ৩. ছিঁড়ে।

১৬. যেয়ার[১] নাম চাউল বাজা[২], হেয়ার[৩] নাম মুড়ি।
: সম্পর্ক নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. যার, ২. ভাজা, ও ৩. তার।

১৭. হৈল[১] নাচে, বোয়াল নাচে
লগে লগে[২] খইলা-পুডিও[৩] নাচে।
: বেয়াদবি করা অর্থে।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. শোল মাছ, ২. সাথে সাথে, ও ৩. খলসে-পুঁটি মাছ।

১৮. শোনানে[১] রাজরানী, শোনানে বিছানো মুতুনি[২]।
: বিশাল ব্যবধান বোঝানো অর্থে প্রয়োগ।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. কোথায়, ও ২. যে বিছানায় প্রস্রাব করে।

১৯. বড় নদী বড় মানুষ, দারে দারে[১] না থাওনই[২] বালা[৩]।
: নিজের চেয়ে বেশি ক্ষমতাবান ব্যক্তি থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকার পরামর্শ।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. কাছে কাছে, ২. না থাকা, ও ৩. ভালো।

২০. বড় আইয়েনা[১] গিনে[২], ছোড আইয়েনা ডরে।
: উচ্চ-নিচ সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে জটিলতা।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. আসে না, ও ২ ঘৃণায়।

২১. পচ্চিম মিল[১] আছাড়ও খায় না।
: পাপ-পুণ্য বা ন্যায়নীতি বোধ না থাকা।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. পশ্চিম দিক।

২২. দিনে মুন্সি রাইতে চোর।
: ভণ্ড ধার্মিকের ক্ষেত্রে।

২৩. পীরের দাড়ি লইয়া ঠাট্টা।
: চরম বেয়াদবি।

www.pathagar.com

২৪. মাইনষের চাওন[১] হুরায় না[২], আল্লাহ্‌র দ্যাওনও[৩] হুরায়না।
: মানুষের চাহিদা ও আল্লাহ তাআলার ভাণ্ডার—কোনোটারই শেষ নেই।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. চাওয়া, ২. ফুরায় না, ও ৩. দেওয়া।

২৫. গাছের শত্রু লতা-পাতা, মাইনষের শত্রু কতা।
: ভারসাম্যহীন কথা-বার্তা বলার জন্য মানুষ নিজেই নিজের বিপদ ডেকে আনে।

২৬. আড্ডি[১] থাকলে মাংস হয়।
: মূল কাঠামো ঠিক রাখা।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. হাড্ডি।

২৭. র'-রে[১] আমার পাশে, বাত[২] দিমু তোরে আগন[৩] মাসে।
: দূরের লোভ দেখিয়ে কাজ আদায় করে নেওয়া।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. থাকরে, ২. ভাত, ও ৩. অগ্রহায়ণ।

মনপুরা উপজেলা

১. তাঁতীর গরে[১] অইছিলাম[২] মাইনষে কইতো যুইগ্যা
এইকুল ওইকুল দুইকুল গেল গিরস্তিতে লাইগ্যা।
অঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. ঘরে, ২. জন্মেছিলাম, ও ৩. যোগী, লেগে।

২. আড়াই দিনের বৈরাগী বাতেরে কয় অন্ন।
: আচার-আচরণে কৃত্রিমতা।

৩. যদি থাহে নসিবে, আমনে আমনে[১] আসিবে।
: নিয়তির লিখনের ওপর নির্ভরতা।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. নিজে নিজে।

৪. আমনা হরি[১] সেলাম পায় না, খালা হরি[২] পাও[৩] বাড়ায়।
: অধিক প্রত্যাশা
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. আপন শাশুড়ি, ২. খালা শাশুড়ি, ও ৩. পা।

৫. হৈল[১] নাচে বোয়াল নাচে,
লগে লগে[২] খইলসা-পুড়িও নাচে।
: আচার-আচরণে বেয়াদবী প্রকাশ পাওয়া (অসংযত আচরণ)।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. শোল, ও ২. সাথে সাথে।

৬. খাইতোও চায় বালা, হুইতোও[১] চায় মইদ্যে[২]
: সুযোগসন্ধানী।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. শুইতে, ও ২. মাঝখানে।

৭. নিজে অইছে[১] এক বুড়ি, আরেক বুড়িরে কয় নানী হাউরি[২]
: নিজেকে অধিকতর কম বয়স্ক প্রমাণের চেষ্টা।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. হলো, ও ২. শাশুড়ি।

www.pathagar.com

৮. পিডা[১] বানায় জামাইর লাইগ্যা
জামাইর বাই[২] আইয়া খায় মাইগ্যা[৩]।
: একজনের ভাগ্যে আরেকজনের প্রাপ্তি।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. পিঠা, ২. ভাই, ও ৩. চেয়ে।

৯. ব্যাকে[১] ত অ্যাক রাস্তা দিয়াই যায়,
কেও হাইড্যা[২] যায়, কেও উস্টা[৩] খায়।
: ভাগ্যের লিখন ছাড়া আর কি।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. সবাই, ২. হেঁটে, ও ৩. হোঁচট।

১০. গাও[১] গ্যালেও গাওয়ের দাগ থাহে।
: কলঙ্কের চিহ্ন মোছা যায় না।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. ঘা।

১১. পীরের দাড়ি লইয়া ঠাট্টা।
: অধিকতর শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তির সাথে বেয়াদবি করা।

১২. কে কান্দে কি লইয়া, যুইগ্যায়[১] কান্দে যুইগ্যার গোয়াডারে[২] লইয়া।
: গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার মধ্যে তুচ্ছ বিষয়ের অবতারণা।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১ যোগী, ও ২. পাছা।

১৩. আমিও রাঁড়ি[১] অইলাম, দ্যাশেও নতুন নতুন চুড়ি গজাইলো[২]।
: সময়মতো কিছু না পাওয়ার জন্য মনোবেদনা প্রকাশ।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. বিধবা, ও ২. আবির্ভূত হওয়া।

১৪. দাও[১]-এর কাম কি আর কোদাল দিয়া অয়।
: যার কাজ তারই সাজে।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. দা।

১৫. গাই থাকলে দুদ দোয়াইবার অভাব অয় না।
: মূলধনই প্রকৃত শক্তি।

১৬. চুরির অভ্যাস কি আর সহজে যায়
খালি বিডায়[১] হিং[২] দেয়।
: খারাপ স্বভাব কখনো বদলায় না।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. ভিটা, ও ২. সিঁধ কাটা।

১৭. কুত্তার ল্যাজ গি[১] দিয়া মাখলেও সোজা অয় না।
: স্বভাবের অপরিবর্তনশীলতা বোঝাতে।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. ঘি।

১৮. চুন বেশি খাইলে মোক পুইড়্যা যায়,
আবার কম খাইলে মোক জ্বলে।
: কোনো কিছুর অপরিমিত ব্যবহার সম্পর্কে সতর্কতা।

www.pathagar.com

১৯. পাইতে পাইতে লাই বাপেরে বোলায় ভাই
: অতিমাত্রায় সুবিধা প্রাপ্তির ফলে কাণ্ড জ্ঞান হারানো।

২০. নির্বইল্যার[১] কুশল্যা[২] দরি[৩], আয়য়ে বাই[৪] পোন্দে[৫] আডি[৬]।
: সক্ষম ব্যক্তিকে অক্ষম ব্যক্তির কু-পরামর্শ।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. শক্তিহীন, ২. পরামর্শ, ৩. ধরি, ৪. ভাই, ৫. পাছার সাহায্যে, ও ৬. হাঁটি।

২১. উদের[১] বদদোয়ায় মাছের ওল[২] খৈয়া[৩] পড়ে না।
: ক্ষতিকর ব্যক্তির অভিশাপ সফল হয় না।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. জলে বিচরণকারী মৎস্যভুক প্রাণী, ২. অণ্ডকোষ, ও ৩. খসে পড়া।

২২. দুমুইক্যা[১] হাপ[২]।
: সবদিক থেকে ক্ষতিকর।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. দু'মুখো, ও ২. সাপ।

২৩. পাগল মৌলবী অইলেও চোখ লালি ছাড়ে না।
: স্বভাবের অপরিবর্তনশীলতা।

২৪. কিরপিনের[১] দন বখিলে খায়।
: কৃপণের ধন আরেক কৃপণের হাতেই চলে যায়।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. কৃপণ।

২৫. গরিব দ্যাকলে বুতেও[১] ছ্যাপ[২] হালায়।
: দারিদ্র্য সবার কাছেই ঘৃণ্য।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. ভূতে, ও ২. থুথু।

২৬. বইয়া বইয়া খাইলে নদীর বালুতেও কুলায় না।
: অকর্মণ্যতার পরিণাম শুভ হয় না।

২৭. মশার কামড় না সয় পাও[১],
ছোড লোকের কতা না সয় গা[২]।
: দুটোরই সমান ধার।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. পায়ে, ও ২. গায়ে।

২৮. মাল যায় যার, ঈমান যায় তার।
: একই কারণে দ্বিগুণ ক্ষতি।

২৯. যেয়ার[১] গরে করি চুরি হেয়ায়[২] কয় চোর,
যার লাইগ্যা করি চুরি হেয়ায়-ও কয় চোর।
: উভয় সংকটে পড়া।
আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. যার, ও ২. সে

www.pathagar.com

তথ্যসূত্র

১. হোসেন আহমদ, পিতা : প্রয়াত রফিকুল হক, মাতা : প্রয়াত সিদ্দিকা খাতুন, বয়স : ৬১ বছর, পেশা : চাকরি, ঠিকানা : গ্রাম : বাপ্তা, ডাকঘর ও উপজেলা : ভোলা

২. নজরুল ইসলাম, পিতা : প্রয়াত দেলওয়ার হোসেন, মাতা : প্রয়াত উম্মে কুলসুম, শিক্ষা: বি.এ., বয়স : ৪৫ বছর, পেশা : চাকরি, ঠিকানা : সদর রোড, ভোলা, ডাকঘর ও উপজেলা : ভোলা

৩. মোহাম্মদ আবদুল্লাহ, পিতা : মোহাম্মদ ইছহাক, মাতা : প্রয়াত সুফিয়া বেগম, শিক্ষা : ফাজিল, বয়স : ৪০ বছর, পেশা : ব্যবসা, ঠিকানা : গ্রাম : ৭নং ওয়ার্ড, দৌলতখান পৌরসভা, ডাকঘর : দৌলতখান, উপজেলা : দৌলতখান

৪. এমএ তাহের, পিতা : প্রয়াত আলহাজ্ব গোলাম রহমান, মাতা : প্রয়াত সাহেরা খাতুন, শিক্ষা : বি.এ, বয়স : ৮০ বছর, পেশা : সাংবাদিকতা, ঠিকানা : গ্রাম : দক্ষিণ সৈয়দপুর ডাকঘর : সাহেব হাজীপুর মাদ্রাসা, উপজেলা : দৌলতখান

৫. মোঃ আবদুর রশিদ, পিতা : মোঃ ইউসুফ আলী, মাতা : মাসুমা খাতুন, বয়স : ৩৮ বছর, শিক্ষা : বি.এ., পেশা : চাকরি, ঠিকানা : গ্রাম : ডিমাডুবি, ডাকঘর : দেবীপুর মাদ্রাসা, উপজেলা : তজুমুদ্দিন

৬. মোঃ নূরুল আলম, পিতা : প্রয়াত আবদুল খালেক, মাতা : রিজিয়া বেগম, শিক্ষা : বি.এ, বয়স : ৬১ বছর, পেশা : ব্যবসা, ঠিকানা : গ্রাম : কুড়ালিয়া, ডাকঘর : কাশিগঞ্জ, উপজেলা : বোরহানউদ্দিন

৭. মোঃ অজিউল্লাহ্ মিয়া, পিতা : প্রয়াত আবদুর রহমান মিয়া, মাতা : প্রয়াত তহুরা খাতুন, বয়স : ৭০ বছর, পেশা : ব্যবসা, ঠিকানা : গ্রাম : ধলিগৌরনগর, ডাকঘর : সিরাজিয়া মাদ্রাসা, উপজেলা : লালমোহন

৮. তোফায়েল আহমদ, পিতা : প্রয়াত আলী হোসেন, মাতা : লুৎফুন্নেসা বেগম, শিক্ষা : বি.এ., বয়স : ৬৭ বছর, পেশা : ব্যবসা, ঠিকানা : গ্রাম : ধলিগৌরনগর, ডাকঘর : সিরাজিয়া মাদ্রাসা, উপজেলা : লালমোহন

৯. আয়েশা, স্বামী : প্রয়াত আখতার হোসেন, শিক্ষা : তৃতীয় শ্রেণি, বয়স : ৭১ বছর, পেশা : গৃহিণী, ঠিকানা : গ্রাম : চরফৈজুদ্দিন, ডাকঘর : হাজীরহাট, উপজেলা : মনপুরা

১০. কাজী মোহাম্মদ রাশেদ, পিতা : প্রয়াত মোহাম্মদ আলী, মাতা : জাকিয়া বেগম, বয়স : ৪০ বছর, পেশা : ব্যবসা, ঠিকানা : দক্ষিণ ফ্যাশন, ডাকঘর ও উপজেলা : চরফ্যাশন

www.pathagar.com

লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার

ভোলা সদর উপজেলা

ক. ঝাড়-ফুঁক

উপজেলার মোটামুটি প্রায় গ্রামেই দু-চারজন ওঝা, গুণিন বা ঝাড়-ফুঁক করে থাকেন কিংবা তাবিজ দিয়ে থাকেন এমন মানুষের সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে। যেখানে মানুষ এখনও এমন কিছু বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করে থাকেন, যার কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই, সেখানে তাবিজ-কবজ দাতাদের কদর থাকবে এটাই স্বাভাবিক। গ্রাম কিংবা শহরের অশিক্ষিত, অর্ধ-শিক্ষিত এমনকি শিক্ষিত পরিবারেও এমনও দেখা যায় যে, কেউ যদি একটু দীর্ঘদিন ধরে জ্বরে ভোগেন কিংবা মাথা ঘোরা বা কিছু খেতে না পারেন অর্থাৎ আহারে অরুচি—এমন কোনো রোগে আক্রান্ত হন, তাহলে এখনও প্রথমেই যে মন্তব্য শোনা যায় তার পরিবার-পরিজনের কাছ থেকে, হা হলো—দ্যাখো, কেউ 'নষ্ট' করেছে কি-না। এই 'নষ্ট' হলো কোনো অদৃশ্য বা দৃশ্যমান শত্রু দ্বারা তাবিজের মাধ্যমে বা অন্য কোনো উপায়ে কারো ক্ষতিসাধন করা বা মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা করা। এমনও শোনা যায়, একসময় নাকি গ্রামে এমন ওঝাও ছিল, যে কাউকে বান মেরে দাঁড়ানো অবস্থা থেকে মাটিতে ফেলে দিতে পারতো, কুমারী মেয়েদের বিয়ে বন্ধ করে রাখতে পারতো, গর্ভবতী মায়ের মৃত সন্তান প্রসব করাতে পারতো, ইত্যাদি ইত্যাদি। এখনও কারো দৃশ্যমান কোনো রোগ-ভোগ ছাড়াই হঠাৎ মৃত্যুর সংবাদ পেলে অন্যজনকে কিংবা তার পরিবারের লোকজনকেও বলতে দেখা যায়—বাণ মেরেছে, বড় শক্ত বাণ। অসুস্থ হলে, কুমারী মেয়েদের বিয়েতে বিলম্ব ঘটলে, মৃত সন্তান প্রসব করলে, মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটলে, কারো আচার-আচরণে বা কথা-বার্তায় মানসিক ভারসাম্যহীনতার প্রকাশ ঘটলে, এমনি বহু ক্ষেত্রেই সন্দেহ করা হয়—'নষ্ট' করেছে, অর্থাৎ যাদুটোনার আশ্রয় নিয়ে ক্ষতি করা হয়েছে।

বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি, এমনকি সামান্য মাথা ব্যথা, আধ-কপালি মাথা ব্যথা থেকে শুরু করে বাত, পক্ষাঘাত , হৃদরোগ, বুক ধড়ফড় করা, কলেরা, বসন্ত ইত্যাদি যে-কোনো কঠিন ও জটিল ব্যাধি থেকে মুক্তি, শিশুদের ঘুম থেকে চমকে চমকে ওঠা, রাতে চিৎকার করে ঘুম থেকে জেগে ওঠা, কিশোর-কিশোরীদের রাতে বিছানায় প্রস্রাব করা, নিঃসন্তানের সন্তান লাভ, মৃত সন্তান প্রসব থেকে মুক্তি, অবাধ্য সন্তানকে পিতামাতার অনুগত করা, দাম্পত্য জীবনের নানাবিধ অশান্তি, ঝগড়া-বিবাদ দূর করে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা, স্বামীকে বশীভূত করা, কাঙ্ক্ষিত মানুষকে নিজের মতো করে পাওয়া বা নিজের বশে আনা, জাদুটোনা-বাণটোনা কাটানো, দেও-দানব, ভূত-পেত্নী, মন্দ জ্বীনের (?) 'আসর' থেকে মুক্তি, অশুভ ও অপশক্তির হাত থেকে নিরাপদ থাকার জন্য 'শরীর' ও বাড়ি 'বন্ধ করা', শস্যক্ষেত বা উৎকৃষ্ট ও প্রচুর পরিমাণে ফলদায়ক বৃক্ষকে বদলোকের 'কু-দৃষ্টি' বা 'বদ নজর' থেকে রক্ষা করা, অধ্যয়নরত

www.pathagar.com

ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনা কিংবা পরীক্ষায় ভালো ফললাভ, বিয়ে কিংবা সন্তান হওয়ার ব্যাপারে মনুষ্য সৃষ্ট বা 'বাতাস লাগা'র (জ্বীন-পরীর আসর) কারণে বিলম্ব বা বাধা সৃষ্টি হয়ে থাকলে তা বিনষ্ট করা, মামলা-মোকদ্দমায় শত্রুকে পরাজিত করা ও নিজের জয়লাভ ইত্যাদি অনেক আর্থিক, পারিবারিক ও ব্যক্তিগত বাধা-বিঘ্ন দূর ও তার সমস্যা সমাধানে আমাদের একটি বিরাট জনগোষ্ঠী শরণাপন্ন হয় পীর, দরবেশ, মসজিদের ইমাম, ওঝা 'খোনকার' ও গুণিনের। এমনকি, প্রতিযোগিতামূলক খেলা, বিশেষকরে ফুটবল খেলায় জয়লাভের জন্যও এদের দ্বারস্থ হতে দেখা যায়। জীবনের দৈনন্দিন জটিল ও কঠিন অনেক সমস্যা সমাধানেই নির্ভর করতে দেখা যায় অলৌকিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির ওপর। এক এক ধরনের সমস্যার সমাধানে দেওয়া হয়ে থাকে একেক রকম তদবির। পানি পড়া, তেল পড়া, কালিজিরা পড়া, চিনি বা গুড় পড়া, ডাব পড়া, সুতা পড়া, ইত্যাদি সমস্যাভেদে একেক জিনিস একেকভাবে ব্যবহার করতে উপদেশ দেওয়া হয়ে থাকে। কালো সুতা বা কাইতন হাতের কব্জিতে, গলায় কিংবা কোমরে বাঁধতে হয়, মিষ্টান্ন আকাঙ্ক্ষিত মানুষকে খাওয়াতে হয়। তাবিজ সমস্যাভেদে গলায়, হাতে কিংবা কোমরে, বালিশের ভেতরে কিংবা ঘরের কোণায় গর্ত করে পুঁতে রাখতে হয়। তেলপড়া গায়ে, হাতে-পায়ে ও মাথায় মাখার জন্য দেওয়া হয়।

এ অঞ্চলের কোনো কোনো গ্রামে, এমনকি শহরের কোথাও কোথাও দেখা যায়, মহিলারা যখন পিঠা-পায়েস তৈরি করে, চিড়া-মুড়ি ভাজে, তখন সেখানে অন্য কোনো বাড়ির বা নিজ বাড়িরই বিশেষ লক্ষণযুক্ত কোনো নারীর আগমন ঘটলে পিঠা-পায়েস বা রান্নার উপকরণাদি তার চোখের আড়াল করে রাখা হয়, এমনকি যখন তেলের পিঠা তেলের ভিতর ছেড়ে দেওয়ার পর বুদবুদ ওঠে, তা-ও তাকে দেখতে দেওয়া হয় না। এতে নাকি আগন্তুক মহিলার 'নজর' লেগে পিঠা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, চিড়ামুড়ি ভালোভাবে ফুটতে নাও পারে। কোনো কোনো নারীর নাকি এ-রকম বদগুণ রয়েছে যে, তার দৃষ্টিতেই পিঠা-লাটা নষ্ট হয়ে যায়। এমন সময়ে প্রতিরোধক হিসেবে কিছু করার না থাকলেও তাৎক্ষণিকভাবে, দূর থেকে হলেও পিঠার উপকরণসমূহের ওপর হালকা ও মৃদু থুথু ছিটিয়ে দেওয়ার ভান করা হয়।

এসব ঝাড়-ফুঁক (এ এলাকায় 'তদবির' বলা হয়) অনেকে বিনা খরচ করে থাকেন, কোনো টাকা-পয়সাই নেন না। আবার অনেকে খুশি হয়ে হাদিয়া হিসেবে যেটা দেওয়া হয়, সেটাই গ্রহণ করে থাকেন। আবার কোনো কোনো জটিল সমস্যার সমাধানে প্রয়োজন হয় তিন জোড়া বা পাঁচ জোড়া কালো মুরগি বা কবুতর, কুচকুচে কালো ছাগলোর রক্ত, সোয়া কেজি চিনি (আগে সোয়া সের ছিল) বা গুড়, সোয়া সাতগজ কালো কাপড়, তাবিজ লেখার জন্য জাফরান ও মেশ্‌ক, কালিজিরা ইত্যাদি। আগে কালো গরুর প্রয়োজন হতো। ইদানীং গবাদিপশুর দাম অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় চাহিদার তালিকা থেকে গরু বাদ দেওয়া হয়েছে। কোনো কাঙ্ক্ষিত নারীকে আপন করে পাওয়ার জন্য যে তদবির করতে হয়, গুণিনদের ভাষায় তা খুবই কঠিন ও জটিল এবং ব্যয়সাধ্য। এক্ষেত্রে অমাবস্যা রাতে শ্মশানের কয়লা বা হাড়, কবরস্থান থেকে কাফনের কাপড়ের টুকরা সংগ্রহ করা একটি আবশ্যিক শর্ত। কেউ এটা ইচ্ছা করলে নিজেও সংগ্রহ করে নিতে পারে অথবা গুণিনের ওপরও দায়িত্ব দেওয়া যায়। এক্ষেত্রে মোটা অংকের অর্থ দিতে হয়।

www.pathagar.com

যে বিষয়টি লক্ষণীয় সেটা হচ্ছে এই যে, যে কোনো ভালো কাজে, অর্থাৎ 'মন্দ' কাজের ক্রিয়া নষ্ট করে দেওয়া, সমস্যা সমাধানে ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়া ইত্যাদি ব্যাপারে অনেক তদবিরকারীর সাক্ষাৎ মেলে, কিন্তু যদি বলা যায় যে, একটা বাণ মারতে হবে কিংবা বাণ মেরে একজনকে দাঁড়ানো অবস্থা থেকে শুইয়ে দিতে হবে—এমন গুণিনের সাক্ষাৎ কিন্তু পাওয়া যায় না অথবা থেকে থাকলেও তারা সহজে ও প্রকাশ্যে হয়তো ধরা দিতে চান না।

আরেকটি বিষয় লক্ষ করার মতো, সেটি হচ্ছে এই যে, এক্ষেত্রে ধর্মাদর্শ বিবেচিত হয় না অর্থাৎ গুণিন বা 'খোনকার' যে ধর্মের হোন না কেন, তার দেওয়া তাবিজ-কবজ বা অন্য কোনো পদ্ধতি যে-কোনো ধর্মের অনুসারীই ব্যবহার করতে পারে এবং তা করা হয়ও।

ঝাড়-ফুঁকের ক্ষেত্রে অনেক সময় ব্যবহারের জন্য কোনো কিছু না দিয়ে শুধু সমাধানের পথ বাতলে দেওয়া হয়, ফুঁ দিয়ে দেওয়া হয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে ব্যাধিগ্রস্ত বা সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির ব্যবহারের জন্য বা খাওয়ার জন্য কিছু পড়ে দেওয়া হয়। কখনো কখনো বা দুটোই করা হয়ে থাকে।

বশীকরণের জন্য একটি মন্ত্রোচ্চারণের কথা জানা যায়। এটি এরূপ, 'সূর্য বন্দি, চন্দ্র বন্দি, আকাশ বন্দি পাতাল বন্দি, অনাদি-আদি বন্দি, রাধা-কৃষ্ণের চাইর (চার) চোখ বন্দি, কামরূপ কামাখ্যার বরে, অমুকের (এখানে যাকে বশীকরণ করার চেষ্টা করা হয়, তার নাম উচ্চারণ করতে হবে) পাঁচ পরান যেন আমার লাইগ্যা মরে।'

খ. বাণ মারা

গ্রামবাংলায় এটি এক নিষ্ঠুর প্রতিহিংসামূলক ব্যবস্থা। বাণ মারার নাম শুনলে এখনও অনেক শিক্ষিত মানুষও আতঙ্কিত হন। শত্রু বা প্রতিপক্ষকে সমূলে বিনাশ করা অর্থাৎ তাকে একেবারে প্রাণে মেরে ফেলার জন্য বাণ মারা হয়। বাণ মেরে শত্রুকে নিধন করার অনেক সুবিধা। প্রথমত এতে অস্ত্রের প্রয়োজন হয় না। ধারালো বা অন্য কোনো মারণাস্ত্র বহনও করতে হয় না। একটা বাণ মারলেই দাঁড়ানো অবস্থা থেকে একটা সুস্থ, সবল মানুষের নাক-মুখ দিয়ে রক্ত উঠবে এবং মাটিতে ধপাস্ করে পড়ে যাবে, সে প্রাণত্যাগ করবে। এই হত্যাকাণ্ডের কোনো হদিস পাওয়া যায় না। কাজেই এ-কাণ্ড কে ঘটালো, তা সনাক্ত করারও কোনো উপায় থাকে না, মামলা-মোকদ্দমাও করা যায় না। এক্ষেত্রে শুধু এটুকু সন্দেহ পোষণ করা হয় যে, অমুকের সাথে অমুকের জমি-জমা নিয়ে বিরোধ ছিল, এলাকায় প্রভাব বিস্তার নিয়ে শত্রুতা ছিল—অতএব তার দ্বারাই এ-কাজটি সম্পন্ন হয়েছে। একসময়ে এমন অনেক গুণিনও নাকি ছিল যে, তাদের নাম শুনলে অনেক গ্রামের লোক আঁতকে উঠতো। এক এক গুণিনের বাণ মারার পদ্ধতি নাকি একেক রকম ছিল। কেউ কলাগাছে, কেউ নারিকেল গাছে, কেউ লাউয়ে খেঁজুর কাটা ঢুকিয়ে বাণ মারতো। কেউ মাটিতে কাঁটা বিঁধিয়ে আবার কেউবা পানিতে কাটাকুটি করে, আবার কেউ কবুতর কিংবা মুরগির পাখায়, লেজে বা পায়ে কাঁটা বিঁধিয়ে বাণ মারতো বলে শোনা যায়। বাণ মারার জন্য মন্ত্রই নাকি মোক্ষম অস্ত্র। আবার কেউ কেউ বলেন, পবিত্র কোরানের কোনো কোনো আয়াত উল্টা দিক থেকে পড়েও নাকি বাণ মারা যায়। এটাকে 'কুফরি কালাম' বলা হয় বলে অনেকের ধারণা।

www.pathagar.com

গ. 'উপরির দোষ' বা 'বাতাস লাগা'

এর প্রভাবে দেহে বিভিন্ন রোগের উদ্ভব হতে পারে। মাথা ধরা, মাথা ব্যথা, মাথা ঘুরানো, পেট খারাপ, বদহজম, জ্বর, খোসপাঁচড়া, নাক দিয়ে রক্ত পড়া, কোমরের বাত (সায়েটিকা) শরীরের জ্বালাপোড়া, বিষণ্নতা, শিশুদের খিঁচুনি রোগ, অনিদ্রা, বাত ব্যথা, মহিলাদের বিভিন্ন ধরনের রোগ, ঋতুস্রাবে অনিয়ম, মস্তিষ্ক-বিকৃতি, ভয়-ভীতি ইত্যাদি যে 'উপরির দোষ' বা 'বাতাস লাগা' জনিত রোগ তাতে কোনো সন্দেহ পোষণ করা হয় না। আর পক্ষাঘাত হলে তো তা নিশ্চিত 'বাতাস লেগেছে' বলে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। এই 'উপরি' কিংবা 'বাতাস' যে প্রকৃতপক্ষে কী, তার সঠিক ও স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় না। তবে এটা যে অশুভ ও অদৃশ্য মহাশক্তিধর কোনো কিছু তা নিশ্চিত করেই বলা হয়ে থাকে।

এই 'উপরির দোষ' বা 'বাতাস লাগা'র প্রভাবে সৃষ্ট রোগ-ব্যাধিসমূহের জন্য সাধারণত পানি পড়া, তাবিজ, ঘর বন্ধ করা, রোগী বা রোগিণীকে ঝাড়-ফুঁক দেওয়া ইত্যাদি ব্যবস্থাপত্র দেওয়া হয়ে থাকে।

ঘ. জ্বীন ও ভূত-পেত্নী তাড়ানো

জ্বীন-পরী, ভূত-পেত্নী মানুষের ওপর 'আসর' বা 'ভর' করে। আর সাধারণত দেখা যায়, তারা 'আসর' বা 'ভর' করে থাকে তরুণী, যুবতী ও কিশোরীদের ওপর। মাঝ-বয়সী মহিলা ও পুরুষের ওপরও 'ভর' করতে দেখা যায়। 'জ্বীন' বা 'ভূত-পেত্নী' মানুষের দেহ থেকে 'ছাড়ানো' ছাড়া কোনো উপায় থাকে না, এটাই ওঝার চিকিৎসা। মেয়েদের ক্ষেত্রে 'বন্ধ ঘরে', কখনও কখনও বাড়ির উঠানে প্রকাশ্যে এই জ্বীন বা ভূত ছাড়ানোর প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়ে থাকে।

রোগী বা রোগিণীকে উঠানে বা ঘরের বারান্দার কোণে খুঁটির সাথে বেঁধে 'ঠুণ্ডা কাইছা' (বাড়ির পেছনের ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার করার ঝাড়ু) কিংবা তেঁতুল বা তুলা বা পাকোড় গাছের ডাল বা ছেঁড়া জুতো দিয়ে জ্বীন-ভূত আক্রান্ত ব্যক্তির দেহে উপর্যুপরি আঘাত করা হয়। কারণ এসব গাছের মগডালেই এদের আস্তানা। অনেক সময় রোগীর চারপাশ আগুন জ্বেলে ধোঁয়াচ্ছন্ন করে রাখা হয়। আগুনকে ভূতের ভীষণ ভয়। জ্বীন-পরী তাড়ানোর সময় যেসব মন্ত্র বা দোয়া পড়া হয়, তাতে নবী-পয়গম্বর বা দেব-দেবীদের নাম উচ্চারণ করে তাদের দোহাই দেওয়া হয় এজন্য যে, তাদের (নবী-পয়গম্বর) ভয়ে ভীত হয়ে তারা যেন রোগী বা রোগিণীকে ছেড়ে দ্রুত স্থানত্যাগ করে।

ঙ. জ্বীন আনা বা জ্বীন চালান দেওয়া

এমন কেউ কেউ আছেন যারা জ্বীন আনতে পারেন বলে শোনা যায়। বিভিন্ন ফকিরের জ্বীন আনার পদ্ধতি ভিন্ন রকম। তবে এক্ষেত্রে সবাই একটি অন্ধকার ঘর ব্যবহার করে থাকেন। বাড়ির অন্যান্য ঘরেও বাতি জ্বালানোর ওপর নিষেধাজ্ঞা থাকে। কারণ, জ্বীনরা নাকি আলো পছন্দ করেন না। যিনি জ্বীন আনেন, অন্ধকার ঘরের এক কোণে তিনি একটি জায়নামাজে আসন গ্রহণ করে দোয়া পড়তে থাকেন। রোগী বা রোগিণীর সামনে কিছুটা দূরত্বে একটি শূন্য চেয়ার রেখে দেওয়া হয়, যেখানে জ্বীন এসে বসবেন।

www.pathagar.com

অন্ধকারে আচ্ছাদিত ঘর। জ্বীন এসে বসলেন। রোগীকে সালাম দিলেন এবং অত্যন্ত ভারিক্কি গলায় তার সমস্যা, অসুখ ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে চাইলেন। এসব ক্ষেত্রে কখনও কখনও রোগীকে দু'টি-তিনটির বেশি সমস্যা বা অসুখের ব্যাপারে বলতে বারণ করা হয়।

রোগীর সমস্যার কথা শুনে 'আগত জ্বীন' ব্যবস্থাপত্র দিয়ে থাকেন। এসব ব্যবস্থাপত্রের মধ্যে থাকে পানি পড়া, কালিজিরা পড়া, তাবিজ-কবজ, মাজার বা মসজিদে দান, গরু-খাসি 'লুটাইয়া' দেওয়া (জবেহ্ করে মাংস বিলি) ইত্যাদির পরামর্শ। কোনো কোনো জ্বীন কখনো আবার অ্যালোপ্যাথিক ওষুধেরও ব্যবস্থাপত্র দিয়ে থাকেন।

বলে রাখা ভালো, জ্বীন চলে যাবার পর ঘরের সব আলো জ্বালিয়ে দেওয়া হয় এবং জায়নামাজ থেকে উঠে এসে 'জ্বীন আনয়নকারী 'খোনকার' কাগজে এসব লিখে দেন। যাবার সময় জ্বীনকে অনেক সময়ই বলতে শোনা যায় যে, তাকে কিছুক্ষণের মধ্যেই আজমীর কিংবা হযরত শাহজালাল (র.) অথবা বড় পীর সাহেবের মাজারে যেতে হবে, সেখানে মিলাদ-মাহফিল আছে অথবা জ্বীনদের এক বিশাল সভায় উপস্থিত থাকতে হবে।... জ্বীন আনার আরো অনেক রকম পদ্ধতির প্রচলন রয়েছে।

যাহোক, এ-অঞ্চলে বিশেষ প্রয়োজনে, যেমন, দীর্ঘদিন ধরে রোগে ভুগতে থাকলে, দেহে ব্যতিক্রমী কোনো উপসর্গ দেখা দিলে, দীর্ঘদিন ধরে কারো আর্থিক অবস্থার উন্নতি না হলে, মানসিক রোগে আক্রান্ত হলে সবরকম গুণ থাকা সত্ত্বেও কোনো মেয়ের বিয়েতে বিলম্ব ঘটলে, ইত্যাদি অনেক অজানা ও অজ্ঞাত বিষয়ের সন্ধান ও সমাধান লাভের উদ্দেশ্যে 'জ্বীন আনা' একটি অতি প্রচলিত ও পুরনো বিষয়। এর প্রচলন বহু পূর্ব থেকে এবং অদ্যাবধি আছে। জানা যায়, ভোলা শহরের উত্তরে পশ্চিম বাপ্তার প্রয়াত মৌলভী আজিজুর রহমানের সাথে মসজিদে ও বাড়িতে যে দুটি বিড়ালছানা ছিল, তারা জ্বীন। মৌলভী আজিজুর রহমান ছিলেন জৌনপুরী পীর মওলানা আবদুর রব (র.)-এর অন্যতম একজন খলিফা। এই জ্বীন দুটো নাকি মৌলভী আজিজুর রহমান ও জৌনপুরী পীরের মধ্যে চিঠিপত্র আনা-নেওয়ার কাজে নিয়োজিত ছিল।

জ্বীন আনতে গিয়ে কথিত 'জ্বীনের বাচ্চাসহ' (মানুষরূপী বুড়ো জ্বীন ও তার ছেলে) হাতে-নাতে ধরা পড়ে জনতার হাতে বেদমভাবে প্রহৃত হওয়ার ঘটনার কথাও মাঝে মধ্যে শোনা যায়।

চ. ঘর-বাড়ি 'বন্ধ' করা

ভূত-প্রেত, দৈত্য-দানব, 'উপরি', বদ জ্বীন এবং শত্রুর যাদুটোনা নষ্ট করা বা শত্রু কর্তৃক কোনো অশুভ শক্তিকে 'চালান' দিয়ে বাড়ি-ঘরে বসবাসকারী সদসদের ক্ষতিসাধন, চোরের আক্রমণ ইত্যাদি যাবতীয় বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ঘর-বাড়ি 'বন্ধ' করা হয়। এখানে একজন পীর বা ফকির বা 'ওঝা' বা 'খোনকার' এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দোওয়া-দরুদ বা মন্ত্র পড়ে ঘর বা বাড়ির তিন কোণের চারকোণের প্রত্যেক কোণায় গিয়ে তিনবার আজান দিয়ে তিনবার করে হাত তালি দেন এবং অবশিষ্ট কোণে একটি তাবিজ বা মন্ত্রপূত লোহা পুঁতে রাখেন। এতে উপর্যুক্ত বিপদ থেকে বাড়ি বা ঘর মুক্ত থাকে।

www.pathagar.com

আগে অনেক সময় গ্রামে কলেরা, বসন্ত ইত্যাদি মহামারি আকারে দেখা দিলে এসব রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ওঝা বা ফকির দিয়ে গ্রাম বা মহল্লা 'বন্ধ' করা হতো।

ছ. আয়না পড়া

সাধারণত কোনো বস্তু বা দ্রব্য হারিয়ে গেলে কিংবা কোনো ব্যক্তি নিখোঁজ হয়ে গেলে তার সন্ধান জানার জন্য আয়না পড়া দেওয়া হয়ে থাকে। দোয়া পড়া আয়না যিনি ধরবেন তিনি আয়নার মধ্যে দেখতে পাবেন হারিয়ে যাওয়া দ্রব্য বা ব্যক্তির গতিবিধি বা অবস্থান। অবশ্য এক্ষেত্রে একটি শর্ত থাকে এই যে, আয়না যিনি ধরবেন তাকে অবশ্যই তুলা রাশির জাতক বা জাতিকা হতে হবে।

জ. জুতা চালান

সন্দেহযুক্ত ব্যক্তিকে সনাক্ত করা কিংবা কোনো তথ্য উদ্ধারের জন্য এই প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয়। প্রথমে একটি চটি জুতার ভেতরে 'গজাল' (বড় তারকাটা) মারা হয়। পরে দু'ব্যক্তি দুই আঙুলের ওপর গজালটাকে হাল্কা করে ধরে রাখে। এরপর অনেক কাঁঠাল পাতায় সন্দেহযুক্ত ব্যক্তিদের নাম বা কোনো তথ্য আলাদা আলাদা করে লিখে জুতার দুপাশে রেখে দেওয়া হয়। জুতাটি ঘুরতে থাকলে বুঝতে হবে যে, লিখিত নামগুলির মধ্যেই সন্দেহভাজন ব্যক্তি বা তথ্য রয়েছে। এভাবে পাতার পরিমাণ কমিয়ে ফেলতে ফেলতে শেষ পর্যায়ে যে পাতার ক্ষেত্রে জুতাটি ঘুরতে থাকবে, সেটাকে সঠিক তথ্য বলে মেনে নেওয়া হয়।

ঝ. বাটি চালান

এটিও হারানো দ্রব্য ফেরত আওয়া বা চোর সনাক্ত করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। 'বাটি চালান' দেখেন নি—এমন মানুষ এদেশে সম্ভবত খুব কমই আছে। এক্ষেত্রেও ওঝা বা গুণিন বা কোনো আলেম ব্যক্তি একটি বাটি পড়া দিয়ে থাকেন এবং বাটির মধ্যে একটি তাবিজ দিয়ে থাকেন। এরপর একজন তুলা রাশির জাতক বা জাতিকা বাটিটির ভেতরে ডান হাতের পাঁচ আঙুলে চাপ দিয়ে ধরবেন। হারানো দ্রব্য বা 'চোর' যেদিকে থাকবে অথবা কেউ যদি কাউকে 'নষ্ট' করার জন্য বাড়ির কোথাও তাবিজ পুঁতে রেখে থাকে, তাহলে ব্যক্তিসহ ঐ বাটিটি দ্রুতবেগে বা ধীর গতিতে চলতে চলতে ঐ স্থানে গিয়ে থেমে যাবে এবং ঘুরপাক খেতে থাকবে। চোর সনাক্ত করার জন্য এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়ে থাকলে বাটিটি তার গায়ে গিয়ে উঠবে। কোনো ক্ষতিকারক তাবিজ তুমার বের করার জন্য এর প্রয়োগ হয়ে থাকলে বাটিটি যে স্থানে ঘুরপাক খাচ্ছে, সে স্থানের মাটি খুঁড়ে ক্ষতিকারক দ্রব্য বা তাবিজের সন্ধান করা হয়।

ঞ. চাউল পড়া

এটিও হারানো দ্রব্য ফিরে পাওয়ার বা চোর সনাক্ত করার একটি পদ্ধতি। এটি অবশ্য পূর্ব-নির্ধারিত কয়েকজন ব্যক্তির ওপরই প্রয়োগ করা হয়। বাটি চালান কিংবা আয়না পড়ার মাধ্যমে অদৃশ্য স্থানে লুকানো জিনিসের বা ব্যক্তির সন্ধান করা হয় কিংবা অজানা চোর ধরার কাজে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু 'চাউল পড়া' সন্দেহভাজন নির্দিষ্ট কয়েকজন

www.pathagar.com

ব্যক্তিকেই শুধু খেতে দেওয়া হয়। বলা হয়, যে 'চোর' অথবা যার কাছে হারানো দ্রব্য পাওয়া যাবে, তার নাক-মুখ দিয়ে রক্ত উঠে মারা যাবে। এটা যে আগেই ভয় পাইয়ে দিয়ে হারানো জিনিসটি বের করে আনার কৌশল তা বলাই বাহুল্য।

ট. কোরান শরীফ চালান দেওয়া

এটিও কোনো সন্দেহভাজন অপরাধী, গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বা স্থান ইত্যাদি সনাক্তকরণের জন্য বাটি চালান, চাল পড়া, আয়না পড়ার মতোই একটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও বিশ্বাসযোগ্য পদ্ধতি। কোরান চালান দেওয়ার ব্যাপারে সহজে কোনো ব্যক্তি রাজি হতে চান না। অনেক সময় আত্মীয়, বন্ধু বা প্রভাবশালী ব্যক্তিদের অনুরোধে এসব বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা কোরান চালান দেওয়ার মতো এই অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজটি করে থাকেন। তবে এক্ষেত্রেও তুলা রাশির জাতক বা জাতিকার প্রয়োজন হয়।

এ পদ্ধতিতে তুলা রাশির একজন জাতক বা জাতিকা একটি পবিত্র স্থানে অজু করে রেহেল-এ করে কোরান হাতে নিয়ে বসবেন। যিনি চালান দেওয়ার মূল কাজটি করবেন, তিনি প্রয়োজনীয় দোয়া-দরুদ পড়ে নেবেন। এরপর দু'জন মানুষ পরস্পপর মুখোমুখি বসে এক আঙুলের ওপর একটি পিতলের বদনার 'কান্দা' ধরে থাকবে। তারপর খোনকার সন্দেহভাজন ব্যক্তি বা স্থানের নাম বা গুরুত্বর্পূ বিষয়গুলো কাঁঠাল পাতায় পৃথক পৃথকভাবে লিখে নেন। কাঁঠাল পাতাগুলো এক এক করে কোরানের ওপর রাখা হবে। এর মধ্যে যার বা যে স্থানের নাম বা যে তথ্য সংবলিত কাগজটি কোরানের ওপর রাখলে কোরান বদনাসহ ঘুরতে থাকবে, তখন বুঝতে হবে সেটিই প্রকৃত তথ্য।

ঠ. সদ্যোজাত শিশুর নিরাপত্তা

সন্তান জন্ম গ্রহণের পরপরই তার সিথানের কাছে লোহার যে-কোনো যন্ত্রপাতি, অন্য কিছু হাতের কাছে পাওয়া না গেলে সরতা (সুপারি কাটার যন্ত্র) রেখে দেওয়া হয়। এর প্রধান কারণ হলো এই যে, কোনো লৌহ জাতীয় পদার্থকে ভূত-প্রেত ইত্যাদি অশুভ শক্তি ভয় পায়। লৌহজাতীয় পদার্থ নবজাতকের কাছে রেখে দিলে কোনো অশুভ শক্তি তার ধারে কাছে ভিড়তে পারে না বা কোনো ক্ষতিসাধন করতে পারে না, সে নিরাপদ থাকে।

সদ্যোজাত শিশু যে ঘরে থাকে সে-ঘরে অথবা তার সাথের ঘরে একটি কাঠের গুঁড়িতে আগুন দিয়ে রাখা হয়। গুঁড়িটি দাউ দাউ করে জ্বলে না, ওটা থেকে ধোঁয়া বেরুতে থাকে। শিশুর কাছে আসতে যে-কোনো মানুষকে এ জ্বলন্ত গাছের গুঁড়িটির তাপ নিয়ে আসতে হবে। এতে আগত ব্যক্তির সাথে যদি ভূত-প্রেত বা কোনো অশুভ শক্তি থেকেও থাকে—তাহলে আগুনের তাপের স্পর্শে তারা স্থান ত্যাগ করে চলে যায়। যেসব গৃহে এ-ধরনের গাছের গুঁড়িতে আগুন দিয়ে রাখা সম্ভব হয় না, সেক্ষেত্রে শিশুর মুখ দেখার জন্য আগত ব্যক্তিকে 'রসি গরে' (রান্নাঘরে) গিয়ে চুলার আগুনের তাপ নিয়ে আসতে হবে।

ভোলার গ্রামাঞ্চলে তো বটেই এমনকি শহরাঞ্চলেও এ ব্যবস্থা দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত ছিল। বর্তমানে এটা অনেকটা কমে গেছে।

www.pathagar.com

ড. অশুভ শক্তিকে এড়িয়ে চলা

অনেকে বিশ্বাস করেন, সদ্যোজাত শিশু, নারী, এমনকি বয়স্ক পুরুষদেরও কয়েকটি স্থান ভর দুপুর, সন্ধ্যায় আজান দেওয়ার সময় কিংবা রাত এড়িয়ে যাতায়াত করা কিংবা বাধ্য হয়ে ঐসব স্থানগুলো দিয়ে যেতে হলেও অত্যন্ত সাবধানতার সাথে যাতায়াত করা উচিত। এসব স্থান হলো, কোনো 'ছাড়া বাড়ি' (পরিত্যক্ত বাড়ি), রাস্তার তেমাথা, তুলা গাছতলা, তেঁতুল গাছতলা, বটগাছ তলা, কবরস্থান, শ্মশান, সদ্যনির্মিত কোনো ব্রীজ ইত্যাদি। এর কারণ হলো এই যে, এসব স্থান দিয়ে ভূত-প্রেত, জ্বীন-পরী ইত্যাদি অশুভ শক্তি অবাধে যাতায়াত করে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে এসব শক্তিকে 'বাও-বাতাস' কিংবা 'উপরির দোষ' হিসেবেও আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে।

শিক্ষিত-অশিক্ষিত ভেদে অনেক মানুষই খুব সহজেই বিশ্বাস করে থাকেন যে, এসব শক্তির কোনোরকম স্পর্শ, এমনকি 'বাতাস' লাগলেও যে-কোনো মানুষ প্যারালাইসিস, কলেরা, বসন্ত, মস্তিষ্কের রোগ (উন্মাদ)সহ বিভিন্ন মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত হতে পারে।

ঢ. 'ছ্যাপড়া খাওয়া' বা ভয় পাওয়া

কোনো শিশু, এমনকি বয়স্ক কেউও প্রচণ্ডভাবে ভয় পেলে তাকে পাতিলের তলায় লবণ ঘষে তিনবার খাইয়ে দেওয়া হয় অথবা বুকে তিনবার হাল্‌কা করে থুথু ছিটিয়ে দেওয়া হয়। এতে আক্রান্ত ব্যক্তি দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে।

ণ. নিঃসন্তানের সন্তান লাভ

অনেকের বিশ্বাস, সন্তানবতী মায়ের সন্তানের পরনের কাপড়ের কোণার চার বা ছয় আঙুল কাপড়, মাথার চুল কিংবা হাত-পায়ের কেটে ফেলা নখের সাহায্যে তুকতাক করা গেলে একজন নিঃসন্তান মহিলা সন্তানবতী হতে পারে। এত পূর্বোক্ত শিশুর সমূহ ক্ষতি হবার সম্ভাবনা থাকে, এমনকি তার মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

ত. মহিলাদের চুল যত্রতত্র ফেলা

মহিলাদের চুল আঁচড়ানোর পর চিরুনিতে যেসব চুল উঠে আসে তা যত্র-তত্র ফেলা উচিত নয়। কারণ, লোক সমাজের বিশ্বাস, ঐ চুল দিয়ে যে-কোনো ধরনের অনিষ্ট সাধন করা যায়। অবিবাহিত মেয়েদের বিয়ে বন্ধ করা, বিবাহিত নারীর গর্ভস্থ সন্তান নষ্ট করে দেওয়া, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো কিংবা অমিল সৃষ্টি করা, এমনকি বশীকরণের কাজেও এই চুল ব্যবহার করা যেতে পারে।

এজন্য মেয়েরা চুল আঁচড়ানোর পর চিরুনি থেকে চুলগুলো ছাড়িয়ে নিয়ে গোল্লা করে ঘরের কোনো একটি গোপন নির্দিষ্ট স্থানে রেখে দেয়। পরে সুযোগ মতো বাড়ির পেছনে গর্ত করে মাটিতে পুঁতে রাখে।

থ. 'নজর লাগা', 'মুখ লাগা' বা 'কু-নজর'

শহর কিংবা গ্রাম, শিক্ষিত কিংবা অশিক্ষিত যে-ক্ষেত্রেই হোক, এই 'নজর লাগা' বা 'মুখ লাগা'র বিষয়টিকে বেশ গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। যদি কারো সুন্দর, পুষ্ট শিশু থাকে, সেক্ষেত্রে তাকে অন্যের কু-দৃষ্টি থেকে রক্ষা করার জন্য তার

www.pathagar.com

কপালে কালো টিপ দেওয়া হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে কোনো 'নিন্দা' নয়, যদি 'প্রশংসাবাচক' শব্দ উচ্চারণ করা হয়, যেমন শিশুটিকে দেখে কেউ বললো, 'ইস্ কী সুন্দর, কী স্বাস্থ্য!' তাহলেই শিশুটির যেন মহা সর্বনাশ হয়ে গেল। বিশ্বাস করা হয়, সে খুব দ্রুত শুকিয়ে যাবে, কালো কিংবা অসুন্দর হয়ে যাবে কিংবা সে রোগে ভুগবে ইত্যাদি।

আবার কারো গাছের উত্তম ফল-ফলাদি বা ক্ষেতের ভালো ফসল দেখে কেউ যদি মন্তব্য করে—এতো ফল ধরেছে, বা এতো ফসল, তাহলে ঐ ক্ষেতের বা গাছের ফল নষ্ট হয়ে যাবে কিংবা গাছ মরে যাবে। এসব ক্ষেত্রে একটি মাটির পাতিলের রং কালো করে তার ওপর চুনের সাদা সাদা ফোঁটা দিয়ে বিশেষ বৃক্ষটির গায়ে কিংবা ক্ষেতের আলে টানিয়ে দেওয়া হয়। লক্ষ্য বদনজর থেকে ফসল রক্ষা।

নজর লাগা বা মুখ লাগার কারণে কারো সন্তানের মারাত্মক অসুখ-বিসুখ বা ক্ষেতের শস্যহানি বা অনুরূপ কোনো ক্ষতির সম্মুখীন হলে ঝাঁড়-ফুক, পানি পড়া তাবিজ ও মাদুলি ধারণই একমাত্র প্রতিষেধক বলে লোকসমাজের বিশ্বাস।

লোকবিশ্বাস

১. আঁতুর গরের সামনে বা বাড়ির দরজাত গরুর মাতার খুলি জুলাইয়া[১] রাখলে ভূত-পেরেত-এর আতের তন রক্কা পাওয়া যায়।
২. আটকুইড়্যা পুরুষ ও বাজা মাইয়া মানুষ দ্যাকলে যাত্রা শুভ অয় না।
৩. বাড়ির দরজাত ছিঁড়া জোতা ও ঠুণ্ডা কাইছা[২] জুলাইয়া রাখলে বদ মাইনসের কু-নজর ও জ্বীন-ভূত-পেরেতের আসরের তন নিরাপদ থাওন যায়।
৪. রাইতের কালে গর্ববতী মাতারির আগুন ছাড়া বাইরে যাইতে অয় না। এয়াতে গর্বের পোলাইনের ক্ষতি অয়।
৫. সূর্য গ্রহণ ও চন্দ্র গ্রহণের সময় কোনো গর্ববতী মাইয়া মাইনসের কোনোকিছু কাডাকুডি[৩] করতো অয় না। করলে ঠোঁট কাডা পোলাইন অয়।
৬. পোলাইন অওনের লাইগ্যা পীরের মাজারে শিন্নি দিলে মনের আশা পুন্ন অয়।
৭. গর্ববতী মাতারিগো গজার মাছ ও পুডি মাছ খাইতো অয় না। এয়াতে প্যাডের পোলাইন বাইট্যা ও দুর্বল অয়।
৮. খাওনের সুম আচি[৪] দিলে গরে অতিত[৫] আইয়ে।
৯. কোনোআনে যাওনের সুম পিছের তন বোলাইলে অমঙ্গল অয়। আবার মায় বোলাইলে বালা।
১০. আতের তন কাকই (চিরুনি) পইড়্যা গ্যালে গরে অতিত আইয়ে।
১১. কোনোআনে যাওনের সুম উস্টা[৬] খাইলে পতে বিপদ অয়। এট্টু বইয়া গ্যালে বালা।
১২. গরের তন বাইর অওনের সুম কেও আচি দিলে বালা না।
১৩. কাউয়ায় টাইন্যা টাইন্যা ডাক দিলে খারাপ খবর পাওনের সম্বাবনা।
১৪. কাউয়ায় রাইতকা ডাক দিলে অশুভ।
১৫. জন্মবারে বিয়া করন খারাপ।

www.pathagar.com

১৬. রাইতকা হাপ[৭] দ্যাকলে 'হাপ' কইর‍্যা চিক্কইর দিতো অয় না। 'দড়ি দড়ি' কইতো অয়।
১৭. যেসব মাতারিগো পোলাইন বাঁচে না, হ্যাগো পোলাইনের আজে-বাজে নাম রাকলে পোলাইন মরে না। যেমন—ফালানি, পচা।
১৮. গেডিত[৮] বা মাতায় বিষ অইলে বালিশ রইদে হুগাইতো অয়।
১৯. কোনো ভালা কামে যাওনের সুম আণ্ডা খাইলে বালা অয় না।
২০. রাইতকা নউক[৯] কাটতো অয়না। এয়াতে[১০] অসুক-বিসুক অয়।
২১. প্যাডে পোলাইন আইলে যমইজ্যা[১১] ক্যালা খাইতো অয় না। হেয়াতে মাইয়্যা অয়, যমইজ্যা পোলাইন অয়।
২২. প্যাডে পোলাইন আইলে হৈল, বোয়াল ও গজাড় মাছ খাওন যায় না। এয়াতে 'মাতা গুরানি'[১২] বা 'বায়ুচড়া ব্যারাম অয়।
২৩. টিকটিকি মারলে এক বারি[১৩] দিয়া মারতো অয়, এয়াতে সোয়াব অয়।
২৫. কোনো মাইয়া মাইনসের মাসিকের রক্ত পুরুষ মাইনসের গায় লাগলে হেই জাগা অবশ অইয়া যায়।
২৬. জামাই'র আগে বউয়ের বাত খাইতো অয় না। এয়াতে জামাইর আয়ু কইম্যা যায়।
২৭. রাস্তার তেমাতা, বাঙা বাড়ি, চিতাখোলা ও কবরস্থানে জ্বীন ও ভূত-পেত্নিরা আওয়া-যাওয়া করে।
২৮. জামাইর গায় পাও লাগলে তিনবার তারে সেলাম করতো অয়, নইলে জামাই মইর‍্যা যায়।
২৯. হাপের খাওনের সুম কোনো হাপ মারলে হেয়ার পোলাইন অয় না।
৩০. গর্ববতী মাতারি গো রাইতকারকালে ফল ছিড়তো অয় না। ছিড়লে গর্বের পোলাইনের ক্ষেতি অয়।
৩১. যেয়াগো[১৪] পত্তি বছর পোলাইন অয়, হেয়াগো[১৫] লাইগ্যাই অন্য মাইনসের পোলাইন অয় না।
৩২. বেরন[১৬] গাছের কষের লগে লবণ মিয়াইয়া দাঁতো দিলে দাঁত ব্যতা বালা অয়।
৩৩. পোলাইন অওনের পর গর্বের ফুল মাডির[১৭] যত বিতরে পুইত্যা রাহন যায়, পরের বার পোলাইন তত দেরি কইর‍্যা অয়।
৩৪. গর্ববতী অবস্থায় আরেকজনের পোলাইন অইতে দ্যাকলে নিজের অওনের সুম কষ্ট অয়।
৩৫. গর্ববতী অবস্থায় শাড়ির কোচ্ছার[১৮] তন কিছু খাইতো অয় না। খাইলে পোলাইনের কষ্ট অয়।
৩৬. বাইশ আঙুইল্যা পোলাইনের বাইগ্য[১৯] বালা অয়।

আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. ঝুলিয়ে, ২. বাড়ির পেছনের ময়লা স্থান ঝাঁড়ু দেওয়ার জন্য যে পুরনো ঝাঁটা ব্যবহার করা হয়, ৩. কাটাকুটি, ৪. হাঁচি, ৫. অতিথি, ৬. হোঁচট, ৭. সাপ, ৮. ঘাড়ে, ৯. নখ, ১০. এতে, ১১. যমজ, ১২. মাথা ঘূর্ণন, ১৩. আঘাত, ১৪. যাদের, ১৫. তাদের, ১৬. ভেরেণ্ডা, ১৭. মাটির, ১৮. কোচর, ও ১৯. ভাগ্য।

www.pathagar.com

দৌলতখান উপজেলা

বিচিত্র সমস্যায় পরিপূর্ণ মানুষের জীবন। বিশেষকরে বাংলার গ্রামাঞ্চলের অর্ধ-শিক্ষিত ও অনক্ষর মানুষের জীবনে রয়েছে অন্তহীন সমস্যা। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতার ওপর পরিপূর্ণ আস্থা ও সাধারণ শিক্ষা-দীক্ষার অভাব, পুরুষানুক্রমে বিশ্বাস করে আসা কুসংস্কারের সর্বব্যাপী প্রভাব ইত্যাদি বহু কারণেই তাদের সমস্যাগুলো বিস্তার লাভ করে যাবেই অহরহ। অশিক্ষিত ও অর্ধ-শিক্ষিত মানুষ তো বটেই, শিক্ষিত ও সভ্যতার আলোকপ্রাপ্ত অনেক মানুষও এমন বিষয়ের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করতে দেখা যায়, যার সাথে বিজ্ঞানের কার্য-কারণ সম্পর্কের কোনো যোগাযোগ নেই। বাংলা একাডেমী গৃহীত 'লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ' কর্মসূচির আওতায় পরিচালিত ফিল্ডওয়ার্কে এমন কিছু তথ্যই আবার নতুন করে বেরিয়ে এসেছে। তন্মধ্যে কয়েকটি বিষয় এখানে আলোচনা করা যেতে পারে।

ক. আয়না পড়া, চাউল পড়া, বাটি চালান ও বাঁশ চালান

চুরি-ডাকাতি এ অঞ্চলে একটি নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। এটি আগেও ছিল, এখনও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। ভোলা জেলার পত্তনের পরপর এদেশে পর্তুগিজ ও আরাকানি জলদস্যুরা সম্ভবত এই দূরারোগ্য ব্যাধির বীজ বপন করে গেছে। ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত এই চুরি-ডাকাতি থেকে নিজেদের নিরাপদ রাখতে কিংবা চোর-ডাকাতকে সনাক্ত করতে অতীতের মতো এখনও এ অঞ্চলের মানুষ প্রায়শ নানাবিধ অদৃশ্য ও অলৌকিক শক্তির ওপর নির্ভর করে। ডাকাতকে সম্ভব না হলেও চোর কিংবা কোনো হারানো দ্রব্য কিংবা কোনো হারিয়ে যাওয়া দলিল বা মানুষের সন্ধান পেতে তারা দৃষ্টি রাখছে 'আয়না পড়া'র ওপর, 'চাউল পড়া' খেতে দিচ্ছে সন্দেহের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত বাছাই করা কতিপয় ব্যক্তিকে। চোর ধরা কিংবা চুরি যাওয়া মালামাল ফেরত পেতে কিংবা ব্যক্তিবিশেষের অনিষ্ট সাধনের জন্য বাড়ির কোনো গোপন স্থানে পুঁতে রাখা অনিষ্টকর তাবিজ খুঁজে বের করার জন্য তারা নির্ভর করছে 'বাটি চালানে'র ওপর। ইদানীং এই 'বাটি চালান' দেওয়ার প্রক্রিয়াটির গুরুত্ব অনেকটা হ্রাস পেয়েছে। বলা যায়, এটি এখন একটি বিলুপ্তপ্রায় প্রক্রিয়া। তবে, অপরাধী কিংবা সন্দেভাজন ব্যক্তিকে চিহ্নিত করার জন্য রয়েছে 'বাঁশ চালান' প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় একটি বাঁশকে দোওয়া বা মন্ত্রপূত করে দুই ফালি করে তার মাঝখানে সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে দাঁড় করিয়ে রেখে বাঁশের দুই প্রান্তে দু'জন মানুষ বাঁশখণ্ড দুটি হাতে ধরে রাখে। কোনো ব্যক্তি যদি অপরাধ না করে থাকে তাহলে বাঁশ তাকে কিছুই করবে না। কিন্তু প্রকৃত অপরাধী ঐ বাঁশখণ্ডটির মাঝখানে দাঁড়ালে বাঁশ তাকে দুপাশ থেকে পেটাতে থাকবে।

খ. নষ্ট করা

এরপর আসা যাক 'নষ্ট করা'র বিষয়ে। এই বিষয়টি এমন যে, এটি না ধরা-ছোঁয়া যায়, না দেখা যায়, না কোনো মেডিক্যাল পরীক্ষায় প্রমাণ করা যায়। কেউ দীর্ঘদিন ধরে রোগে ভুগছে, চিকিৎসকের শরণাপন্ন না হয়েই বলা হয়, তাকে 'নষ্ট' করা হয়েছে। কোনো মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না—বলা হচ্ছে, ওই অমুকের মেয়ের তো বিয়ের বয়স পার হওয়া সত্ত্বেও বিয়ে হচ্ছে না, এজন্য আমাদের মেয়ের বিয়ে বন্ধ করে রেখেছে। এখন

www.pathagar.com

তার বিয়ে হয়ে যাবে। অমুকের সন্তান হচ্ছে না, বা মৃত সন্তান হচ্ছে? এখানেও ওই একই অভিযোগ। অমুকের তো সন্তান হয়ে বাঁচে না, এজন্য আমাদের ওপর তাবিজ করেছে, যাতে আমাদেরটা মরে যায় আর আমাদেরটা মারতে পারলে ওদের তো সুস্থ সন্তান হবেই। কী সব অদ্ভুত যুক্তি!

এভাবে পারিবারিক অশান্তি, স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া-বিবাদ বা মনোমালিন্য দীর্ঘস্থায়ী হলে কিংবা কারো সন্তান সঙ্গদোষে বেয়াড়া হয়ে গেলেও ধরে নেওয়া হয় যে, অমুকের চোখে এই জামাই-বউয়ের মধ্যকার এতো সুন্দর সম্পর্কটা সয়নি বলে এই অকর্মটা করেছে, তাবিজ করে ওদের দুজনের মধ্যে অশান্তির সৃষ্টি করে দিয়েছে। তাবিজ না করা হয়ে থাকলে কি এতো গভীর ও সুন্দর সম্পর্কের এই হাল হয়। যেখানে একজন আরেকজনকে রেখে আলুর ভর্তাটি পর্যন্ত খেতো না, এখন অবস্থা এমন করে ছেড়েছে যে, একজন আরেকজনকে রেখে নির্বিবাদে পোলাও-বিরিয়ানি খেয়ে ফেলে! একজন আরেকজনকে দেখে না যেন বিষ দেখে।

গ. বাণমারা

বাড়ির পাশে বা দরজায় লাগানো কলা গাছে বাচ্চারা খেলতে খেলতে হয়তো খেঁজুর কাঁটা বা অন্য কোনো কাঁটা কয়েকটা বিঁধে রেখেছে। কারো হয়তো নজর পড়লো ঐ বাড়িরই ওপর। আর যায় কোথায়? গুণে গুণে দেখা গেল ২টি, ৩টি বা ৪টি কাঁটা। নির্ঘাত এমন বাণ মেরেছে কাউকে মারার জন্য, যে হয়তো আর ৪/৫দিন বা ৪/৫ মাস বেঁচে থাকতে পারে। তারপর তার নির্ঘাত মৃত্যু। দৈবাৎ এ-বাড়িতে যদি কারো অসুস্থতা থেকে থাকে কিংবা বেশ কিছুদিন ধরে রোগে ভুগছেন—এমন কেউ থেকে থাকে, তাহলে বলা হয়, নিশ্চয়ই ঐ মানুষটিকে মেরে ফেলার জন্য কেউ না কেউ এ-কাজটি করেছে, বাণ মেরেছে।

ঘ. উপরির দোষ বা বাতাস লাগা

ছোটো শিশু বা বড় কারুর অসুখ করেছে, পেট খারাপ হয়েছে—নির্ঘাত 'বাতাস' লেগেছে। কোনো মেয়ের মাসিক স্রাবে বিলম্ব ঘটছে কিংবা অতিরিক্ত স্রাব হচ্ছে—পাড়ার মহিলাদের মধ্যে বলাবলি হয়, নিশ্চয়ই 'বাতাস লেগেছে' বা 'উপরির দোষ'। এই 'উপুরির দোষ' বা 'বাতাস লাগা'র কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে কি-না আমাদের জানা নেই। এমনকি যারা এই শব্দ দুটি ব্যবহার করছেন, তারাও বলতে পারছেন না। সদ্যোজাত বা খুব ছোট শিশু ঘুমের মধ্যে বারবার চমকে উঠছে—সন্দেহ হয়, এটাও 'বাতাস লাগা' থেকেই হয়েছে বা অশুভ কিছু 'ভর' করেছে।

ঙ. নজর লাগা

কারো খুবই স্বাস্থ্যবান, গোলগাল ও আকর্ষণীয় একটি ছেলে বা মেয়েকে দেখে কিংবা একটি গাছে উৎকৃষ্ট শশা, বা আতাফল বা অন্য কোনো ফলের প্রাচুর্যে গাছের ডালপালা নুইয়ে এসেছে—এমন দৃশ্য দেখে নিন্দাসূচক নয়, প্রশংসাসূচক উক্তি করার লোকের অভাব হয় না। ছেলেটির গাল দুটো কী ফোলা ফোলা রে বাবা! এতো ভারি যে ওপরে তুলতে গেলে হাত ধরে আসে।

www.pathagar.com

এ জাতীয় কোনো ঘটনা ঘটলে ওই শিশুটির গালে বা কপালে পরিয়ে দেওয়া হয় কুচকুচে কালো টিপ। হয়তো শিশুর বুকে সামান্য থুথুর ছিটা দেওয়া হয়। ফল গাছটির সাথে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় ছেঁড়া জুতা বা 'ঠুণ্ডা কাইছা' (যে ঝাড়ু শুধু বাড়ির পেছনের ময়লা পরিষ্কার করার জন্য ব্যবহার করা হয়। এই ঝাড়ুর ঘরের ভেতরে ঢোকার প্রবেশাধিকার নেই)। কারণ শিশুটি ওপর কিংবা ফলটির ওপর আরেকজনের কু-দৃষ্টি পড়েছে কিংবা নজর লেগেছে।

চ. জ্বীন-ভূত তাড়ানো

কোনো পুরুষ কিংবা মহিলার মানসিক রোগ দেখা দিয়েছে। মানসিক রোগের চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার আগেই বলে দেওয়া হচ্ছে, নিশ্চয়ই ভূতে কিংবা জ্বীনে ধরেছে। ওই মহিলাকে আবার ভূত-পেত্নীতে ধরবে না? ভরদুপুরে কি সন্ধ্যাবেলায় খোলা চুলে তাকে রাস্তার তেমাথা দিয়ে, জমাদার বাড়ির ঐ তুলাগাছ বা তাল গাছটার নীচে দিয়ে যেতে দেখা যায়। ভূতে ধরবে না! এরপর ডাকা হয় ওঝা বা গুণিন বা খোনকার। ভূত ছাড়াতে হবে। যদি একটু কম বয়সের বা বদমাশ বা ফটকা গুণিন বা খোনকার হয় তাহলে তো ভূত ছাড়ানোর জন্য তাকে রুদ্ধদ্বার কক্ষে নিতে হয়, যে ঘরে কোনো ফুটা থাকবে না, আলো ঢুকতে পারবে না। আর নয়তো ওঝার ক্যারিশমা প্রদর্শনের জন্য বাড়ির উঠানে শত শত মানুষের সামনে প্রকাশ্যে ভূত তাড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়। 'ভুত-আক্রান্ত' রোগী বা রোগিণীর ওপর চলে কাউফলা গাছ, তেঁতুল গাছ বা 'ঠুভা কাইছার' উপর্যুপরি আঘাত, রক্তাক্ত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে রোগিণীর দেহ।

এতোটা পরিশ্রম কি ওঝা এমনি এমনি করে থাকেন? মোটেই না। জোড়া মুরগি, সোয়া সাতগজ সাদা ও কালো কাপড়, নগদ ৭০১ টাকা ইত্যাদি ছাড়া তো ভূত সহজে ছেড়ে যেতে চায় না। অনেক ভূত-পেত্নী অনেক লোভী হয়। তারা তো কালো গরু, কালো ছাগল কিংবা জোড়া কালো মুরগির রক্ত ছাড়া বাড়ির ত্রিসীমানা ছাড়ে না।

ছ. জ্বীনের সাথে বৈঠক

ডাক্তার-কবিরাজের ওষুধ অনেক খাওয়ানো হয়েছে। রোগ ভালো হচ্ছে না। কী করা প্রয়োজন? নিশ্চয়ই জ্বীন বলে দিতে পারবে। তার কী হয়েছে বা কী করলে ভালো হয়ে যাবে। সন্ধান করার জন্য বেরিয়ে পড়ে আক্রান্ত ব্যক্তির আত্মীয়স্বজন। আর শেষে সন্ধান মেলে তার। 'বৈঠক' দেওয়া হয়, জ্বীন আনা হয়। জ্বীন দিয়ে যান পানি পড়া, কালিজিরা পড়া ও তাবিজসহ অন্যান্য ব্যবস্থাপত্র। আর হয়তো দিয়ে যান নির্দিষ্ট কোনো মাজারে ছাগল বা গরু 'লুটাইয়া' দেওয়ার (গরু বা ছাগল জবাই করে তার মাংস বিলিয়ে দেওয়া) পরামর্শ।

জ. বাড়ি-ঘর বন্ধ করা

বাড়ির লোকজন প্রায় রাতেই দুঃস্বপ্ন দেখে কিংবা বিভিন্ন ধরনের অদ্ভুত আওয়াজ শুনতে পায়, ঘরের টিনের চাল ধরে কোনো অদৃশ্য শক্তি জোরে জোরে নাড়া দেয়, এমন অবস্থায় কী করণীয়? এসব তো অ্যালোপ্যাথ, আয়ুর্বেদ কিংবা হোমিওপ্যাথ চিকিৎসকের কাজ নয়। ওঝা ডাকতে হবে, খোনকার ডাকতে হবে। বাড়ি 'বন্ধ' করতে হবে যাতে

www.pathagar.com

'খারাপ কিছু' বাড়ির ত্রিসীমানায় আর প্রবেশ করতে না পারে। খোনকার বা গুণিন আসেন, সঙ্গে আনেন দু'জন সহযোগী, দোয়া বা মন্ত্র পড়েন। সদর্পে হেঁটে যান ঘরের তিন কোণে বা বাড়ির তিন প্রান্তে। এক এক কোণে দোয়া বা মন্ত্র পড়ে জোরে জোরে আজান দেন আর তিনটি করে হাততালি দেন। যে কোণা খালি থাকে সে কোণে এসে মন্ত্রপূত বা দোওয়া পড়ে ফুঁ দেওয়া তিনটি লোহার 'গজাল' (বড় ধরনের পেরেক) বা তাবিজ পুঁতে রাখেন। ব্যস, বাড়ি বা ঘর 'বন্ধ' হয়ে গেল। অশুভ শক্তির উৎপাত থেকে মুক্ত হলো ঘর-বাড়ির বাসিন্দারা।

ঝ. বশীকরণ

যুগ যুগ ধরে মানুষ মানুষকে ভালবেসে এসেছে, সম্ভবত পৃথিবী ধ্বংস হওয়া অবধি তা অব্যাহত থাকবে। নারী পুরুষকে আর পুরুষকে নারী। এ ভালাবাসা কোথাও কোথাও নীতি-নিয়মের সীমানার মধ্যেই বন্দি থাকছে, আবার কোথাও এ সবের তোয়াক্কা না করে ছুটে চলেছে দূর্বার গতিতে। ভালবাসার এই দূর্বার গতির কাছে পরাজয় মেনে নেয় নারী-পুরুষের বাহ্যিক পারিবারিক কিংবা সামাজিক সম্পর্ক, ধনী কিংবা দরিদ্রের ব্যবধান। পুরুষ ভুলে যায় তাদের উভয়ের মধ্যে বিরাজমান সম্পর্ক কিংবা সামাজিক ব্যবধানের কথা। ভালবাসার মানুষটির সাথে তার যে সম্পর্ক, ভাবী কিংবা একটু সামান্য দূরের ভাগনি বা মামী বা ছোট ভাইয়ের বউ—ভালবাসার আবেগের দৌড়ের কাছে এসব সম্পর্ক হার মানে, পরাজয় বরণ করে, হার মানে আর্থিক ও সামাজিক ব্যবধান। কিন্তু কাঙ্ক্ষিত মানুষটিকে তো সোজা পথে পাবার উপায় নেই। কী করবে সে? পাগল প্রেমিক ছুটে যায় গুণিনের কাছে, খোনকারের কাছে। প্রথমে তিনি বলে দেন—না, এটা অনৈতিক কাজ, আমার দ্বারা হবে না। তাছাড়া এতে ঝুঁকিও অনেক। অমাবস্যা রাতে সংগ্রহ করতে হয় শ্মশানের কয়লা, গোরস্তান থেকে কাফনের কাপড়। কার অতো বড় বুকের পাটা! বাধ্য হয়ে গুণিনকে দায়িত্ব দেওয়া হয়, বিনিময়ে দিতে হয় মোটা অঙ্কের টাকা। শুধু এক্ষেত্রে নয়, আজকাল অনেক ওঝা-বদ্যি-খোনকার আধুনিক ভাষায় 'প্যাকেজ' প্রোগ্রাম চালু করেছেন। সব কিছু করা হবে, সব আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদির ব্যবস্থা করা হবে, বিনিময়ে সাকুল্যে এই পরিমাণ টাকা।

ফলাফল কী হয়? কে জানে, কবে, কোথায় কোনো শিকেটি কার ভাগ্যে ছিঁড়ে পড়েছে।

লোকবিশ্বাস

১. আডা-চলার পতে[১] অ্যাকটা শালিক দেকলে দুঃখ বা বিপদ অওনের সম্বাবনা থাহে। জোড় শালিক দ্যাহন বালা।
২. যার নাক গামে[২] হের বউ সোন্দর অয়।
৩. গরের 'পিড়ার' মইদ্যে দাও, বডি দার[৩] দিতো অয় না। এয়াতে[৪] হেই মানুষ দেনদার অয়।
৪. বাত[৫] বা অন্য কিছু খাওনের সুম 'নাক-তাউল্যাত'[৬] উটলে মনে করতো অইবো যে, এইসুম কেও হের নাম লইছে।
৫. আতের তন[৭] চিরুনি পইড়্যা গ্যালে বা ছোড পোলাইনে গর[৮] জাড়ু[৯] দিলে বাড়িত অতিত[১০] আইয়ে।

৬. চোউকে এন্না ওটলে ছোড পোলাইনের নুনুর মাতা ছোয়াইলে বালা অইয়া যায়।
৭. গর বা উডানের[১১] অর্দেক জাড়ু দিয়া রাখলে আদ-কপালি মাতা বিষ[১২] অয়।
৮. কপালে আত[১৩] দিয়া রাকলে দুক্ক বাড়ে।
৯. কাচা চাউল খাইলে মোহে[১৪] আচিল অয়।
১০. ব্যারন গাছের কষের লগে নুন লাগাইয়া দাতো[১৫] দিলে দাত ব্যতা সাইর‍্যা যায়।
১১. শবেবরাতের রাইতে, বচ্ছরের পরথম দিনে দোকানে বাকি দিলে হারা বচ্ছরই বাকি দেওন লাগে।
১২. বাত খাইয়া লগে লগে গোসল করলে প্যাডে[১৬] কুত্তার ছাও অয়।
১৩. ডেহির[১৭] উরপে বইয়া কিছু খাইতো অয় না। খাইলে মাজা ব্যারাম অয়।
১৪. বাঙ্গা[১৮] আয়না দিয়া মুক দ্যাকতো অয় না। এয়াতে ক্ষতি হয়।
১৫. বাঙ্গা গেলাসে পানি খাইতো অয় না। কপালে দুক্ক অয়।
১৬. দুরপের[১৯] কালে তেতই[২০] গাছ ও তুলা গাছের নীচে গেলে বুতে[২১] দরে।
১৭. জন্মবার, জন্মমাসে বিয়া অইলে বউ-জামাইয়ের অশান্তি অয়।
১৮. শইল্যে[২২] প্রজাপতি বইলে তরাতরি বিয়া অইয়া যায় (অবিবাহিতদের ক্ষেত্রে)।
১৯. মাছের পানি শইল্যে পড়লে শরীল নাপাক অইয়া যায়।
২০. যে আবিয়াইত্যা মাইয়া দানের তুষ[২৩] পাড়ায়, হের বিয়া অয় না।
২১. হারা জীবন[২৪] বিয়া না কইর‍্যা থাকলে লাইলী-মজনুর বিয়া খাওন যায়।
২২. রাইতদুরপে কুত্তায় কানলে, কাউয়ায় ডাকলে অমঙ্গল।
২৩. মাগরিবের আজানের সুম মাইয়ালোকের চুল খোলা রাকতো অয় না। এইসুম বদজ্বীন ও বুতেরা দৌড়াদৌড়ি করে।
২৪. বিয়ার দিন গাও অলুদ মাইক্যা বাইরে গেলে জ্বীন-বুতে আসর করে।
২৫. বুকের কড়া বড় অইয়া গ্যালে আতের বুইড়্যা আঙুলে বাই মোহের[২৫] ছ্যাপ[২৬] লইয়া লাগাইয়া দিলে বুকের কড়া ঠিক অইয়া যায়।
২৬. ডুবাইন্যা নারিনের পানির মইদ্যে গোসল করলে গামছি[২৭] সাইর‍্যা যায়।
২৭. অড়হড় ডাইলের পাতার রস খাওয়াইলে জণ্ডিস বালা অইয়া যায়।
২৮. কেওর খাওন লইয়া কোনো কতা কইতো অয় না। এয়াতে হের অসুক অয়।
২৯. মাতাত চালুইন লইলে মাতাত গোডা[২৮] অয়।
৩০. মাইয়া মাইনষে মাতাত টুপি দিলে টাক পড়ে।
৩১. গরের দুয়ারে বইয়া থাকলে গরের মাইনষের অমঙ্গল অয়।
৩২. মায়ের দুধ খাউজ্যাইলে[২৯] ছোড পোলাইনের অসুক অয়।
৩৩. শবেবরাতের রাইতে 'চই' পিডা না খাইলে পরকালে কেচ্ছা (কেঁচো) খাইতো অইবো।

আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. হাঁটা-চলার পথে, ২. ঘামে, ৩. ধার বা শান দেওয়া, ৪. এতে, ৫. ভাত, ৬. নাক্-তালু, ৭. হাত থেকে, ৮. ঘর, ৯. ঝাড়ু, ১০. অতিথি, ১১. উঠানের, ১২. মাথা ব্যথা, ১৩. হাত, ১৪. মুখে, ১৫. দাঁতে, ১৬. পেটে, ১৭. ঢেঁকি, ১৮. ভাঙা, ১৯. দুপুরে, ২০. তেঁতুল, ২১. ভূতে, ২২. শরীরে, ২৩. ধানের তুষ, ২৪. সারা জীবন, ২৫: বাসিমুখে, ২৬. থুথু, ২৭. ঘামাচি, ২৮. গোটা, ও ২৯. চুলকালে।

www.pathagar.com

তজুমুদ্দিন উপজেলা

ক. ঝাড়-ফুঁক

কোনো রোগ-ব্যাধি বা অসুখ-বিসুখ নিরাময় বা অসুখ-বিসুখের আক্রমণ যাতে না হয় সেজন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে বা অন্য কোনো উদ্দেশ্য সাধনের উপায় হিসেবে ঝাড়-ফুঁককে অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করাকে কেউ কেউ বিশ্বাস করেন, আবার কেউ কেউ করেন না। তবে মুসলিম সম্প্রদায়ে একটি শিশুর জন্মগ্রহণের আগে থেকেই ঝাড়-ফুঁক একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে। গ্রামাঞ্চলে, এমনকি শহর এলাকায়ও ধনী-গরিব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সব শ্রেণির মানুষের পরিবারেই লক্ষ্য করা যায় যে, একজন গর্ভবতী রমণীর সন্তান প্রসবের সময় যখন ঘনিয়ে আসে, তখন, কিংবা প্রসবকালে ডাক্তার-কবিরাজ বা দাইদের উপস্থিতি সত্ত্বেও নির্বিঘ্ন ও নিরাপদ প্রসবের জন্য নিকটবর্তী মসজিদের ইমাম, হাফেজ কিংবা কোনো খ্যাতনামা আলেম বা পীর সাহেবের কাছ থেকে পড়া পানি খাইয়ে দেওয়া হয় কিংবা একটা কাইতন পড়া এনে প্রসূতির কোমরে হাল্কা করে বেঁধে দেওয়া হয়। আধুনিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে হয়তো বা এর কোনো কার্যকারিতাই খুঁজে পাওয়া যাবে না কিন্তু বাংলার লোকসমাজের অন্তর্গত অনেক মানুষই এটা বিশ্বাস করে থাকেন এবং তা মনে-প্রাণেই।

প্রসবের পরও মা তার সদ্যপ্রসূত সন্তানকে নিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন না। কেন জানি তার দুর্ভাবনা হয়, কোনো অশরীরী আত্মার অশুভ দৃষ্টি কিংবা কোনো মানুষের 'নজর' লেগে তার সন্তানের যদি বা কোনো ক্ষতি হয়। এসব অশুভ দৃষ্টি বা 'নজর' থেকে সন্তানের পেট খারাপ থেকে শুরু করে গায়ের রং ময়লা হয়ে যাওয়া, এমনকি মানসিক কিংবা শারীরিক বৈকল্যেরও উদ্ভব হতে পারে বলে অনেকের বিশ্বাস। এমন মানসিক অবস্থায় অনেকেই অনুভব করে থাকেন যে, মসজিদের ইমাম বা হাফেজ যদি একটু কষ্ট স্বীকার করে বাড়িতে এসে বাচ্চাটিকে একটু দোওয়া পড়ে ফুঁ দিয়ে দোওয়া করে যান, তাহলে হয়তো সে নিরাপদে থাকবে। অনেকে আবার ঐ শিশু সন্তানের কপালে কালো টিপ পরিয়ে কোলে নিয়ে ইমাম বা কোনো আলেমের নিকট সশরীরে উপস্থিত হয়ে এ কাজটি সম্পন্ন করে থাকেন।

বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সাথে আলাপকালে জানা যায় যে, এছাড়া আরো অনেক কারণেই মানুষ ঝাড়-ফুঁক বা তাবিজের আশ্রয় নিতে পারে। কয়েকটি কারণ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

খ. শত্রুর দ্বারা 'নষ্ট করা' থেকে মুক্তিলাভ

এ অঞ্চলের লোকসমাজে 'নষ্ট করা' একটি বহুল প্রচলিত ধারণা। কোনো মানুষের ক্ষতি করার জন্য এ-ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়ে থাকে বলে অনেকের অভিমত। এই প্রক্রিয়ায় কোনো মানুষকে শারীরিকভাবে আঘাত না করে অতি গোপনে তাবিজ, ক্ষতিকর মন্ত্রাদির সাহায্যে কিংবা 'কুফরি কালাম' পড়া কোনো দ্রব্য খাইয়ে দেওয়ার মাধ্যমে তার কর্মক্ষমতা বা যশ, সুনাম খর্ব করা হয়ে থাকে। এই 'নষ্ট করা' প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কাউকে মানসিকভাবে অবসন্ন করে কর্মহীন করা থেকে শুরু করে শারীরিকভাবে অসুস্থ করা, গর্ভবতী নারীর সন্তান নষ্ট করা, পরীক্ষায় অকৃতকার্য করা, কুমারী মেয়েদের বিয়ে

www.pathagar.com

বন্ধ করে রাখা ইত্যাদি অনৈতিক কর্মকাণ্ড নাকি করা যেতে পারে। এটাই নষ্ট করা। আর এই 'নষ্ট প্রক্রিয়ার' প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যই অনেকে ঝাড়-ফুঁক ও তাবিজ ইত্যাদির শরণাপন্ন হয়ে থাকেন। একজন ভালো ছাত্র যখন অনেক কৃতকার্যতার পরে হঠাৎ করে কোনো কারণে পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়, একজন মানুষ যদি দীর্ঘদিন ধরে আমাশয়ে কিংবা বদহজম রোগে ভুগতে থাকে, একজন নারী যখন মৃত সন্তান প্রসব করে অথবা গর্ভধারণ করতে একেবারেই সমর্থ হয় না কিংবা একটি মেয়ের যদি বিয়ের গড় বয়স অতিক্রম করার পরেও পাত্রস্থ করা সম্ভবপর না হয়, তখন এমন ধারণা পোষণ করা হয় যে, 'ক'-এর ছেলে পড়ালেখায় ভালো নয় বলে 'খ'-এর ছেলেকে 'নষ্ট করার' মাধ্যমে পরীক্ষায় ফেল করিয়ে দিয়েছে বা অমুককে 'নষ্ট' করার জন্য গোপনে কিছু খাইয়ে দিয়েছে বলে তার আমাশয় বা বদহজম সারছে না বা 'খ' নামীয় মহিলার সন্তান বাঁচে না বলে সে 'গ'এর গর্ভস্থ সন্তানকে 'নষ্ট' করেছে কিংবা 'খ'-এর মেয়েদের বিয়ে হচ্ছে না বলেই সে 'ঙ'-এর মেয়েদের বিয়ে 'বন্ধ' করে রেখেছে।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, যারা এই অনৈতিক কাজগুলো করছে, তাদের লাভ কী? এই প্রশ্নেরও উত্তর পাওয়া গেছে ফিল্ডওয়ার্কের মাধ্যমে। অনেকে জানিয়েছেন, অপরের ক্ষতি করার মাধ্যমেই নাকি নিজের ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়া যায়। যেমন, যেসব মহিলার সন্তান হয় না, অথবা গর্ভধারণ করলেও মৃত সন্তান প্রসব করে, তারা যদি কোনো সুস্থ গর্ভবতী মহিলাকে তুকতাক করে তার গর্ভস্থ সন্তানকে নষ্ট করে দিতে পারে, তাহলে পূর্ববর্তী মহিলা নাকি সুস্থ সন্তান প্রসব করতে সমর্থ হবে। এক্ষেত্রে প্রথমোক্ত মহিলার যে কারণেই গর্ভপাত ঘটুক না কেন, সেক্ষেত্রে এরূপ সন্দেহ পোষণ করা হয় যে, কোনো মহিলা হয়তো তার সন্তান বাঁচানোর জন্যই এই অপকর্ম কোনো খোনকারকে দিয়ে করিয়েছে। এরূপ ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত মহিলা কোনো আলেম, মসজিদের ইমাম কিংবা কোনো খোনকারের শরণাপন্ন হয়ে ঝাড়-ফুঁক বা তাবিজ গ্রহণ করে থাকেন। এমনিভাবে সামান্য মাথা ব্যথা, আধ-কপালী মাথা ব্যথা থেকে শুরু করে পক্ষাঘাত, বাচ্চাদের রাতে ঘুমের মধ্যে ছ্যাপড়া খেয়ে ওঠা, কুমারী মেয়েদের সময়মতো বিয়ে না হওয়া, দাম্পত্য জীবনে সৃষ্ট অশান্তি দূর করে শান্তি স্থাপন করা, ভূত-পেত্নী বা বদজ্বীনের 'আসর' থেকে মুক্তিলাভ, মামলা-মোকদ্দমায় জয়লাভ ইত্যাদি শত শত জীবন সম্পৃক্ত সমস্যার সমাধানের জন্য আমাদের অনেকেই ঝাড়-ফুঁক ও তাবিজের শরণাপন্ন হয়ে থাকেন।

গ. নজর লাগা বা কু-দৃষ্টি

এটি একটি অদ্ভুত বিষয়। এখানে কাউকে কোনো তাবিজ করতে হয় না, হাতে স্পর্শ করার প্রয়োজন হয় না, কেবল চোখের দৃষ্টিতে বা মন্তব্যেই সোনাও ছাই হয়ে যেতে পারে। ধরা যাক, একজন গৃহিণীর পিঠা তৈরির হাত খুব ভালো অর্থাৎ তিনি অত্যন্ত সুস্বাদু পিঠা তৈরিতে পারদর্শী অথবা একজন মহিলার রোপণ করা গাছে অনেক সুস্বাদু ফল ধরে—এরূপ দৃশ্য যদি কোনো বিশেষ লক্ষণযুক্ত মহিলার দৃষ্টিতে পড়ে কিংবা যদি তিনি কোনো প্রশংসাসূচক মন্তব্য করে বলেন, ইস, পিঠাগুলো খুব ভালো ফুলেছে বা গাছটায় এতো ফল ধরেছে যে, ডাল-পালা একবারে নুইয়া পড়েছে। ব্যস হয়ে গেল। কোনো খারাপ মন্তব্য নয় বরং প্রশংসাবাচক মন্তব্যেই ওই পিঠা বা গাছের বারোটা

www.pathagar.com

বাজার আর বাকি থাকে না। অর্থাৎ পিঠা নষ্ট হয়ে যায় আর গাছটিতে ফল ধরলেও পুষ্ট না হতেই কালো কালো হয়ে ঝরে পড়ে। এরকম নাকি অনেক এলাকায়ই অহরহ হতে দেখা যায়। এজন্য নিতে হয় প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা। এমতাবস্থায় গাছের ডালে 'ঠুণ্ডা কাইছা' বা ছেঁড়া জুতো ঝুলিয়ে শত্রুর দৃষ্টি থেকে রক্ষা পাওয়া গেলেও পিঠার পাতিলটা একটু আড়ালে-আবডালে রাখা কিংবা 'হুজুরকে' দিয়ে একটু পানি পড়িয়ে এনে তা গুঁড়ির সাথে মিশিয়ে দেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। আর এতেই অবশ্য উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয়।

ঘ. বশীকরণ

সাধারণ অর্থে বশীকরণ বলতে অনেকে শুধু কোনো কাঙ্ক্ষিত মেয়েকে নিজের করে পাওয়ার জন্য গৃহীত প্রচেষ্টাকেই বুঝিয়ে থাকেন। তবে এটি আরো বিস্তৃত অর্থ বহন করে। কোনো স্ত্রী তার স্বামীকে বশীভূত করে রাখতে চান, মামলায় জড়িত কোনো ফরিয়াদি বা বিবাদী বিচারককে বশীভূত করে মামলার রায়টি তার স্বপক্ষে আনার প্রত্যাশা করেন।

এক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রীকে বা স্ত্রী স্বামীকে তুকতাক করা নানা দ্রব্য খাইয়ে কিংবা বালিশের ভেতরে তাবিজ রেখে দিয়ে উদ্দেশ্য সাধনে তৎপর হতে পারলেও এসব তুক-তাকের প্রভাব বিচারালয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশে সমর্থ হয়েছে বলে কোনোকালে শোনা যায়নি।

ঙ. বাণমারা

একসময়ে এ দেশে বাণ মারার ফলে কারো কারো প্রাণহানি ঘটার সংবাদ লোকমুখে প্রচারিত হলেও চিকিৎসা গ্রহণের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে আজকাল আর এরূপ প্রাণহানি ঘটার সংবাদ পাওয়া যায় না। একসময়ে অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল যে, কারো কোনো প্রকার রোগে না ভুগে মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া গেলেই ধারণা করা হতো যে, বাণ মারার ফলেই অমুকের মৃত্যু হয়েছে। নাহলে এমন প্রাণবন্ত মানুষটি এমন 'খাড়াৎ' (অর্থাৎ সুস্থ ও দাঁড়ানো অবস্থায়) মারা যেতে পারে না।

চ. 'উপরির দোষ' ও 'বাতাস লাগা'

যে-কোনো বয়সের মানুষ বিশেষকরে শিশু ও মহিলারা কিছু কিছু রোগ-ব্যাধি, যেমন, মাথা ঘুরানো, শরীর জ্বালা-পোড়া করা, বাত, অনিয়মিত ও ব্যথাযুক্ত ঋতুস্রাব এবং পেট খারাপ, শুকিয়ে যাওয়া, ঘুমের মধ্যে চমকে ওঠা ইত্যাদিতে আক্রান্ত হলে কোনো অশুভ ও অশরীরী শক্তির প্রভাবেই এসব রোগ হয়েছে বলে রোগীর মা-বোনেরা ব্যাখ্যা করেন। এই 'অশুভ ও অশরীরী' শক্তিকেই তারা 'উপরি' কিংবা 'বাতাস' নামে অভিহিত করে থাকেন।

ছ. বাটি চালান

এক সময়ে চোর ধরা বা হারানো দ্রব্য পুনরুদ্ধার করা কিংবা বাড়ির গোপন স্থানে পুঁতে রাখা তাবিজ বের করে আনার জন্য এই বাটি চালানের খুব প্রচলন ছিল। আজকাল হারানো দ্রব্য পুনরুদ্ধার ও অসৎ উদ্দেশ্যে পুঁতে রাখা তাবিজ বের করার জন্য কোথাও

www.pathagar.com

কোথাও বাটি চালানের প্রচলন মাঝে মধ্যে লক্ষ্য করা গেলেও চোর ধরার ক্ষেত্রে এটি আর প্রয়োগ করা হয় না। বাটি চালান দেওয়ার সময় একজন তুলারাশির মানুষের প্রয়োজন হয় যিনি তাবিজসহ বাটিটি চেপে ধরে রাখবেন এবং বাটির সঙ্গে সঙ্গে দৌড়াতে সক্ষম হবেন।

জ. চাউল পড়া

এটিও একটি বিলুপ্তপ্রায় প্রক্রিয়া। এই পদ্ধতি প্রধানত চোর ধরার কাজে প্রয়োগ করা হয়। কারো কোনো ছোট-খাটো জিনিস বা অল্প পরিমাণ টাকা-পয়সা হারানো গেলে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। তবে এই চাউল পড়া নিতান্তই হাতে গোনা কয়েকজন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে খাওয়ানো হয়ে থাকে। বলা হয়ে থাকে, যে জিনিসটি অপহরণ করেছে, চাউল খেলে তার রক্তবমি হবে এবং গলায় চাউল আটকে সে মারাও যেতে পারে।

ঝ. 'নখে' দেখা বা 'আয়না পড়া' বা 'পান পড়া'

এ পদ্ধতি কোনো চোর, অপহরণকারী, হারিয়ে যাওয়া দ্রব্য বা মানুষকে স্বচক্ষে দেখার জন্য প্রয়োগ করা হয়। এই পদ্ধতিতে কোনো তুলারাশির জাতকের হাতের বৃদ্ধাঙুলির নখে এবং একটি গোটা পানে মন্ত্রপূত সরিষার তেল মাখিয়ে জাতককে কড়া রোদের মধ্যে বসানো হয়। তেল মাখানো নখ এবং পানের মধ্যে নাকি চোর বা অপহরণকারী কিংবা হারানো ব্যক্তি বা দ্রব্যের গতিবিধি ও অবস্থান লক্ষ্য করা যায় এবং তদ্‌নুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভবপর হয়।

ঞ. বাড়ি-ঘর 'বন্ধ' করা

এটি কোনো বিশিষ্ট আলেম, মসজিদের ইমাম বা 'খোনকারের' মাধ্যমে করা হয়ে থাকে। বাড়িতে চোরের উপদ্রব কিংবা কোনো অশরীরী শক্তির পদচারণা অনুমান করা গেলে বাড়ির সম্পদ ও সদস্যদের নিরাপদ রাখার জন্য বাড়ি-ঘর 'বন্ধ' করা হয়ে থাকে। একজন আলেম বা খোনকার একাই পর্যায়ক্রমে বাড়ির তিন কোণায় গিয়ে একবার করে আজান ও তিনটি করে হাততালি দিয়ে এবং অবশিষ্ট কোণে একটি দোওয়া পড়ে ফুঁ দেওয়া লোহার গজাল মাটিতে পুঁতে দিয়ে বাড়ি বন্ধ করে দেন। এক্ষেত্রে কখনও কখনও তিনজন আলেম একই সঙ্গে তিন কোণায় অবস্থান গ্রহণ করে একবার করে আজান দিয়ে তিনটি করে হাততালি দিয়ে থাকেন। বাড়িতে 'আঁতুড় ঘর' বন্ধ করার প্রয়োজন দেখা দিলেও একই পদ্ধতিতে তা করা হয়ে থাকে।

ট. কোরান শরীফ চালান দেওয়া

কোনো অজ্ঞাত বিষয় জ্ঞাত হওয়ার জন্য একজন আলেমকে দিয়ে কোরান 'চালান' দেওয়া হয়। যে বিষয়গুলো বা যাদের নাম জানতে চাওয়া হবে, সে সে বিষয় এবং নামগুলো প্রথমে কাঁঠাল গাছের পাতায় লিখতে হবে। তারপর কোরান রাখার 'রেহেল'-এ একখানা কোরান রেখে দু'জন মানুষ অজু করে আঙুলের ওপর উঁচু করে রেহেলখানা ধরবে। এরপর কাঁঠাল পাতাগুলো এক এক করে কোরানের ওপর রাখা হবে। যে যে পাতা রাখার পর কোরান আঙুলের ওপরই ঘুরতে থাকবে, সে সে বিষয় বা নামগুলো সঠিক বলে মনে করতে হবে।

www.pathagar.com

ঠ. ভূত-পেত্নী ছাড়ানো

তুলাগাছ, তেঁতুলগাছ, পাকুড় গাছতলা দিয়ে গেলে কিংবা কোনো শ্মশান বা করবস্থানের পাশ দিয়ে রাতের বেলা বা ভরদুপুর বেলা যাতায়াত করলে ভূত-প্রেতে ধরতে পারে বলে অনেকে বিশ্বাস করেন। এছাড়া ভরদুপুর কিংবা ঠিক সন্ধ্যেবেলা মাগরিবের আজান দেওয়ার সময় ভূত-পেত্নীদের যাতায়াত খুব বেগবান হয় বলে এ সময়ও বালিকা, তরুণী বা মহিলারা তাদের দ্বারা আক্রান্ত হতে পারেন। এরূপ ঘটনা ঘটলে অর্থাৎ ভূত-পেত্নীর 'আসর' বা 'ভর' হলে সে-ই ভূত তাড়ানোর ব্যবস্থা করে থাকেন ওঝা বা খোনকার।

ভূত তাড়ানোর আগে রোগিণীকে বাড়ির উঠানের একপাশে কোনো কিছুর সঙ্গে শক্ত করে বাঁধা হয়। তারপর কাউফলার বা তেঁতুলের ডাল দিয়ে লাঠি বানিয়ে তা দিয়ে রোগিণীকে আঘাত করা হয় অর্থাৎ রোগিণীর ওপর 'ভর' বা 'আসর' করা ভূত-পেত্নীকে প্রহার করা হয় এবং বিভিন্ন রকম মন্ত্রাদি পড়া হয়। এসময়ে বিভিন্ন পয়গম্বর, বিশেষকরে হযরত সোলায়মান (আ.)-এর দোহাই দিয়ে রোগিণীকে অবিলম্বে ছেড়ে দিয়ে ঐ এলাকা বা গ্রাম ত্যাগ করার নির্দেশ দেওয়া হতে থাকে। ভূত স্থান ত্যাগ করার আগে খোনকারের কাছ থেকে কিছু প্রতিশ্রুতিও সে আদায় করে নেয়, যেমন, বিশেষ কোনো মাজারে গরু বা ছাগল লুটাইয়া দেওয়া, একজোড়া শাড়ি ইত্যাদি। এগুলো রোগিণীর তরফ থেকে খোনকারের কাছে দিয়ে দিতে হয়।

ড. বন্ধ্য দম্পতির সন্তান লাভ

এক্ষেত্রে খোনকাররা বিভিন্ন রকম 'তদবির' দিয়ে থাকেন। 'ডিম পড়া' খাওয়া এ-বিষয়ে একটি উত্তম দাওয়া বলে অনেকে বিশ্বাস করেন। এছাড়া কোমরে বাঁধার জন্য তাবিজ বা কাইতন পড়াও দেওয়া হয়ে থাকে।

ঢ. জ্বীনের সাথে 'বৈঠক দেওয়া'

বিভিন্ন রোগ-ব্যাধির নিরাময় এবং সমস্যা ও সংকট থেকে মুক্তিলাভের ব্যাপারে পরামর্শ চাওয়ার জন্য জ্বীনের সাথে 'বৈঠক' দেওয়া হয়ে থাকে। এমন কেউ কেউ আছেন যারা বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করে জ্বীন উপস্থিত করে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে তার সহায়তা চেয়ে থাকেন।

লোকবিশ্বাস

১. চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্য গ্রহণের সুম কিছু খাইতো[১] অয় না[২]। খাইলে অমঙ্গল অয়।

২. চান্দের মইদ্যে যেই ছবিডা দ্যাহা যায় হেইডা[৩] অইল ইস্রাফিল (আ.)-এর ছবি। তিনি শিঙ্গা আতে[৪] লইয়া বইয়া রইছেন। যহন আল্লাহ্য় হুকুম করবো, তহনই তিনি শিঙ্গায় হুঁ[৫] দিবেন আর তহনই কেয়ামত অইবো।

৩. কেও[৬] কতা কওনের সুম[৭] টিকটিকি টিকটিক কইর‍্যা ওটলে ওই মাইনষের কতাডা যে এক্কেরেই হাছা কতা[৮], হেয়ার লাইগ্যাই[৯] টিকটিকি কয় 'ঠিক ঠিক'।

৪. রাইতকারকালে[১০] বাইরের তন[১১] কেও অ্যাকবার বোলাইলে[১২] লগে লগে[১৩] জোয়াব[১৪] দিতো অয় না। তিনবার বোলাইলে জোয়াব দিতো অয়। কারণ, ভূতেরা একবারই বোলায়।

www.pathagar.com

৫. রাইতকা কোনো স্বপ্নের কতা কইতো অয় না। এয়াতে স্বপ্নের বালা[১৫] গুণ নষ্ট অইয়া যায়।
৬. যেই মাইয়া মাইনষে ব্যাকসুম[১৬] চুল আইলা-জাইলা[১৭] কইর‍্যা রাহে, হেগো[১৮] সংসারেও হেইরম আইলা-জাইলা লাইগ্যা থাহে।
৭. ব্যাডা মাইনষের মুরকার[১৯] কইলজা খাইতো অয় না। খাইলে বুদ্ধি কইম্যা যায়।
৮. যারা পাতিল কাচাইয়া[২০] খায়, হ্যাগো মাইয়া অয়।
৯. জোকে কামরাইলে হেই জাগাত মুইত্যা[২১] দিলে জোক ছাইড়্যা যায়।
১০. গলাত মাছের কাডা[২২] আটকাইলে বিলাইর[২৩] আত-পাও[২৪] দরলে কাডা নাইম্যা যায়।
১১. আন্ডা খাওনের সুম আন্ডার খোসার এট্টুও প্যাডে[২৫] গেলে হের শ্বেতী ব্যারাম অয়।
১২. বাত[২৬] খাইয়া লঙ্গি[২৭] দিয়া মোক মোছলে সংসারে অলক্ষ্মী গর বান্দে।
১৩. মাডির[২৮] গর[২৯] আদা লেইপ্যা[৩০] থোওন নাই। থুইলে সংসারের ক্ষতি অয়।
১৪. বালিশের উরপে[৩১] বইলে পোন্দের[৩২] মইদ্যে ফোড়া অয়।
১৫. কাচা চাউল খাইলে শইল্যে[৩৩] আচিল অয়।
১৬. মাতারিরা[৩৪] টুপি মাতাত দিলে মাতাত টাক পড়ে।
১৭. রাইতকারকালে আয়নাত মুক দ্যাকতো অয় না। দ্যাকলে রোগ অয়।
১৮. রাইতকারকালে কুত্তায় কানলে বিপদ আইয়ে।
১৯. যেই পোলাগো নাক গামে[৩৫] হেয়ারা[৩৬] সোন্দর বউ পায়।
২০. জামাই হউরবাড়িত[৩৭] গ্যালে মাইয়ার মা পানির আড়ির[৩৮] মইদ্যে আত[৩৯] বিজাইয়া রাকলে জামাই বউর বাইদ্য[৪০] থাহে।
২১. ঠোঁটে তিল থাকলে হে বড় কামুক অয়।
২২. উরপের পাডির[৪১] সামনের দাত দুইডার মইদ্যে ফাক থাকলে হে খুব কামুক অয়।
২৩. যেই মাইয়্যায় গরের দুয়ারে পাও ছ্যাতরাইয়া[৪২] বয় হের বিয়া দূর দ্যাশে অয়।
২৪. যেই পুরুষে কোনোদিন দাড়িতে ক্ষুর লাগাইবো না, হে লায়লী-মজনুর বিয়া খাইবো।
২৫. বিয়ার দিন চুল কাটতো অয় না। কাটলে জামাইর কপালে দুক্ক থাহে।
২৬. আতেরতন[৪৩] চিরুনি পইড়্যা গ্যালে বাড়িত অতিত[৪৪] আইয়ে।
২৭. আজান দ্যাওনের সুম মাতাত[৪৫] কাপড় না দিলে বুত পেরেত[৪৬] মাতার চুলের মইদ্যে আটকাইয়া যায়।
২৮. ছোড পোলাইনের মাতার দারে ছোরতা[৪৭] থুইয়া দিলে বুত-পেরেত আইতো পারে না।
২৯. ছোড পোলাইনে ডরাইয়া ছ্যাপড়া[৪৮] খাইয়া ওটলে বুকে ছ্যাপ দিয়া এট্টু নুন পাইল্যার[৪৯] তলায় গইস্যা[৫০] খাওয়াইয়া দিলে আর ডর থাহে না।
৩০. গরের[৫১] মিল পাছা দিয়া গরের দুয়ারে বইলে গরের অমঙ্গল অয়।
৩১. গরের মইদ্যে খাড়াইয়া হইরেরে[৫২] বিক্কা[৫৩] দিতো অয় না। দুয়ারের বাইরে আইয়া বিক্কা দিতো অয়।

www.pathagar.com

৩২. এক গরে অনেক পোলা থাকলে হেগো একলগে বাইর অইতে অয় না। বাইর অইলে মোক লাগে[৫৪]।

আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. খেতে, ২. উচিত নয়, ৩. সেটা, ৪. হাতে, ৫. ফুঁ, ৬. কেউ, ৭. সময়, ৮. সত্য কথা, ৯. সেজন্য, ১০. রাত্রিকালে, ১১. বাইরে থেকে, ১২. ডাকলে, ১৩. সাথে সাথে, ১৪. উত্তর, ১৫. ভালো, ১৬. সব সময়, ১৭. এলোমেলো, ১৮. তাদের, ১৯. মোরগের, ২০. মুছে, ২১. প্রসাব করে, ২২. কাঁটা, ২৩. বিড়ালের, ২৪. হাত-পা, ২৫. পেটে, ২৬. ভাত, ২৭. লুঙ্গি, ২৮. মাটির, ২৯. ঘর, ৩০. লেপা, ৩১. ওপরে, ৩২. পাছায়, ৩৩. শরীরে, ৩৪. মহিলারা, ৩৫. ঘামে, ৩৬. তারা, ৩৭. শ্বশুরবাড়ি, ৩৮. হাঁড়ির, ৩৯. হাত, ৪০. বাধ্য, ৪১. ওপরের পাটির, ৪২. ছড়িয়ে দিয়ে, ৪৩. হাত থেকে, ৪৪. অতিথি, ৪৫. মাথায়, ৪৬. ভূত-প্রেত, ৪৭. সুপারি কাটার যন্ত্র (সরতা), ৪৮. চমকে ওঠা, ৪৯. পাতিলের, ৫০. ঘষে, ৫১. ঘরের, ৫২. ফকিরের বা ভিক্ষুকের, ৫৩. ভিক্ষা, ও ৫৪. নজর লাগা বা কু-দৃষ্টি।

বোরহানউদ্দিন উপজেলা

ক. ঝাড়-ফুঁক

ঝাড়-ফুঁকের প্রচলন এ অঞ্চলে কবে থেকে শুরু হয়েছে তা কেউ নির্দিষ্ট করে বলতে পারেন না। তবে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে শিক্ষাপ্রাপ্ত চিকিৎসকদের এখানে পদার্পণের অনেক আগেই এর সূচনা, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এমন একটি সময় ছিল, একজন চিকিৎসকের দেখা পেতে দশ-বিশ-ত্রিশ মাইল দূরে যেতে হতো রোগ-ব্যাধিগ্রস্ত অসহায় মানুষকে। তাৎক্ষণিকভাবে কাছে যাকে পাওয়া যেতো, আর তিনি যদি হতেন আরবি শিক্ষায় শিক্ষিত, মুসলমানদের বিশেষ পোশাক পরিহিত, কিংবা সনাতন ধর্মাবলম্বীদের ক্ষেত্রে সংস্কৃতে অভিজ্ঞ, কিংবা মন্ত্র-তন্ত্রে পারদর্শী, তাহলে তার কাছেই নিজের কিংবা স্ত্রীর, কিংবা সন্তানের রোগ-ব্যাধির উপশমের জন্য শরণাপন্ন হতে হতো। এই একুশ শতকে, আজ চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রগতির যুগে চিকিৎসাব্যবস্থা মোটামুটিভাবে এ অঞ্চলে একেবারে হাতের মুঠোয় না হলেও নাগালের একেবারেই বাইরে নয়। এরূপ অবস্থায়ও এতদ্এলাকার, বোধকরি, বাংলাদেশের অনেক এলাকারই শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-গরিব, সর্বস্তরের মানুষই একজন পীর, ফকির কিংবা আলেমের শরণাপন্ন হয়ে থাকেন দৈহিক ও মানসিক নানাবিধ রোগের কারণে। সবাই যে তাদের বিশ্বাস করেন, তাদের একটু দোওয়া পড়া পানি সবাই যে পান করেন কিংবা পরিবারের অন্য সদস্যদের পান করতে দেন, তা নয়। তবে দেখা গেছে, অশিক্ষিত বা সাধারণ শিক্ষিত বা উচ্চশিক্ষিত কিংবা ধনী বা গরিব, যে পর্যায়েরই হোক না কেন, বেশিরভাগ মানুষই এতে বিশ্বাস স্থাপন করে থাকেন।

প্রথমেই বলে নেওয়া ভালো, এ এলাকার মুসলমানরা যেমন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুল এবং কোরআন-হাদিসে বিনাশর্তে বিনা বাক্য ব্যয়ে বিশ্বাস করে থাকেন, তেমনি সনাতন ধর্মবিশ্বাসীরাও তাদের দেব-দেবীর প্রতি একান্ত অনুগত এবং মঙ্গল-অমঙ্গল সাধনে তাদের ক্ষমতা সম্পর্কেও পুরোপুরি আস্থাশীল। এ কারণেই একজন মুসলমান কিংবা একজন সনাতন ধর্মাবলম্বী মানুষ যখন কোনো জটিল ও কঠিন ব্যাধি বা সমস্যায়

www.pathagar.com

জড়িয়ে পড়ে, তখন তিনি এ থেকে পরিত্রাণের আশায় মসজিদ বা মন্দিরে, পীর-ফকির-দরবেশ বা ওঝা-গুণিন-বৈদ্যের কাছে যান।

এখন দেখা যাক, কী কী বিষয়ে বা কোন কোন রোগ-ব্যাধির আক্রমণ থেকে মুক্তির জন্য এতদ্‌অঞ্চলের লোকজন ঝাড়-ফুঁক-মন্ত্রতন্ত্র কিংবা এ-জাতীয় শক্তির দ্বারস্থ হয়ে থাকেন।

ক. শারীরিক রোগ-ব্যাধি : হলুইদ্যা পালং বা জন্ডিস, দাঁতের পোকা বা দাঁতের ক্ষয়রোগ, পক্ষাঘাত, বাতব্যাধি, দীর্ঘস্থায়ী আমাশয় বা অজীর্ণ রোগ, মেয়াদী জ্বর (প্রতিদিন একই সময়ে জ্বর আসা এবং ছেড়ে যাওয়া), গা জ্বালা-পোড়া, মানসিক রোগ, কলেরা ও বসন্ত, গলায় বিঁধে যাওয়া কাঁটা ছাড়ানো, মাথা ব্যথা (আধ-কপালি), বন্ধ্যাত্ব, মৃত সন্তান প্রসব, সদ্যোজাত শিশুর নানাবিধ সংকট, বাচ্চাদের বিছানায় প্রসাব করা, বিভিন্ন রকম স্ত্রী-রোগ ইত্যাদি।

খ. রোগের লক্ষণ দৃশ্যমান কিন্তু কারণ দৃশ্যমান নয় এমন ব্যাধি : নষ্ট করা, জাদুটোনা বা বাণটোনা, নজর লাগা, ভূত-পেত্নী ও জ্বীনের 'আসর' বা 'ভর', বাতাস লাগা, উপরির দোষ, সদ্যোজাত শিশুর নিরাপত্তাবিধান ইত্যাদি।

গ. বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য : অশুভ শক্তির হাত থেকে নিরাপদ থাকার জন্য বাড়ি-ঘর 'বন্ধ' করা, বশীকরণ বা কোনো মানুষকে নিজের অধিকারে আনা, স্বামীকে বশীভূত রাখা, স্বামীর কোনো গোপন কথা জানা, স্বামী-স্ত্রীর অশান্তি ও ঝগড়া-বিবাদ দূর করে সু-সম্পর্ক স্থাপন, শত্রু দমন করা, অবাধ্য সন্তানকে পিতা-মাতার অনুগত করা, চাকুরি লাভ, আর্থিক সচ্ছলতা লাভ, বয়স হওয়া সত্ত্বেও বিয়ে হচ্ছে না এমন মেয়েদের দ্রুত বিয়ে-শাদীর ব্যবস্থা করা, জ্বীন আনার মাধ্যমে ভালো-মন্দ অবগত হওয়া ও নানাবিধ সমস্যা দূর করা, চোরের উপদ্রব থেকে রক্ষা পাওয়া, মামলা-মোকদ্দমায় জয়লাভ করা ইত্যাদি। এছাড়াও মানুষের দৈনন্দিন জীবনে উদ্ভূত নানাবিধ সমস্যা ও তার প্রতিকারের জন্য ঝাড়-ফুঁক ও অন্যান্য 'তদবিরের' আশ্রয় নেওয়া হয়।

পীর-ফকির-দরবেশ-ইমাম-মুয়াজ্জিন-আলেম-খোনকার এবং গুণিন, ওঝা, বৈদ্যদের কাছে উপর্যুক্ত বা এর বাইরেও যেসব সমস্যা নিয়ে মানুষ ছুটে যায়, সে-সবের সমাধানকল্পে তারা মোটামুটিভাবে এসব পদক্ষেপ নিয়ে থাকেন : পানি পড়া, কালিজিরা পড়া, তেল পড়া, কাইতন পড়ে গিঁট দেয়ে দেওয়া, কোরানের আয়াত লিখিত প্লেট বা বাসন পড়া (পানি দিয়ে ধুয়ে খেতে হয়), সুতা পড়া, দোওয়া পড়ে ঝাড়া, গাছ-গাছালির শিকড় এবং তাবিজ-তুমার ইত্যাদি।

মোটামুটিভাবে এই হচ্ছে এ এলাকার ঝাড়ফুঁকের একটি সাধারণ চিত্র। এককে রকম সমস্যা বা রোগের জন্য একই তাবিজের ভিন্ন ভিন্নভাবে ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়। একটি তাবিজের কথাই ধরা যাক। একটি তাবিজ সমস্যার প্রকৃতি অনুযায়ী গলায়, বাহুতে, কোমরে, বালিশে, ঘরের কোণে, গাছে, যাতায়াতের পথে মাটিতে পুঁতে রাখা, ধুয়ে নিয়মিত পানি খাওয়া, স্পর্শ করানো ইত্যাদি নানাভাবে ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়। এভাবে পানি পড়া বা অন্যান্য জিনিসেরও বহু ব্যবহার দেখা যায়।

www.pathagar.com

ঝাড়-ফুঁক-এর ক্ষেত্রে সম্মানী বা পারিশ্রমিকের বিষয়টিও বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে পেশাদার খোনকার বা ওঝা, গুণিনরা একটু বেশিই মূল্য নিয়ে থাকেন। এমনিতে অনেক পীর-দরবেশ-আলেম আছেন যাদের কোনো 'হাদিয়া' দিতে হয় না। অনেক সময় যিনি উপকারের প্রত্যাশায় যান, বা উপকৃত হয়ে থাকেন, তিনি খুশি হয়ে যা 'হাদিয়া' বা সম্মানী প্রদান করেন, তাই সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করে থাকেন। পেশাদার 'খোনকার' বা গুণিন-ওঝা ব্যতীত অন্যরা অনৈতিক কোনো 'তদবির' করেন না, যেমন, বশীকরণ।

খ. জ্বীন আনা

এমন অনেক শোনা যায় যে, 'অমুকে জ্বীন আনতে পারেন। ওই জ্বীন অনেক সমস্যার সমাধান দিতে পারে।' এমনি ব্যবস্থা এখানেও আছে। তবে জ্বীন আনার পদ্ধতিটি এখানে অন্যরকম। এখানে দিনের বেলায়ও জ্বীন আনা যায় তবে একমাত্র যিনি জ্বীন আনেন তিনি ছাড়া জ্বীনের সাথে আর কারো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগাযোগ বা কথাবার্তা হয় না।

জ্বীন আনার পূর্বমুহূর্তে কয়েকজন মিলে গান করতে থাকে। মাঝখানে তাদের দলের তুলারাশির একজন জাতককে পিঁড়ির ওপর বসিয়ে তার হাতে সিঁদুর মাখানো একটি পান দেওয়া হয়। দলের বাকি লোক সবাই গান করতে থাকে। এ সময় পানের মধ্য দিয়ে জ্বীনের উপস্থিতি লক্ষ্য করেন ঐ তুলারাশির জাতক, যিনি পান হাতে নিয়ে বসে আছেন। তারপর যত কিছু জিজ্ঞাসা, অর্থাৎ যেসব সমস্যার সমাধানের জন্য জ্বীনকে আনা হয়েছে সেসব বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হয়। জ্বীন পানের মধ্য থেকে সেসব প্রশ্নের উত্তর দেন এবং কেবল যিনি পান হাতে নিয়ে বসে আছেন, অর্থাৎ যিনি জ্বীন আনছেন, তিনিই সব শুনতে পান। আশপাশের অন্য কেউ শুনতে পান না। জ্বীন চলে গেলে যাদের জন্য জ্বীন আনা হয়েছে, তাদের সবিস্তারে সব বলা হয়।

ভূত বা জ্বীনে 'আসর' বা 'ভর' করা রোগী বা রোগিণীকে উঠানের মাঝখানে বসিয়ে পরিবেশটাকে ধোঁয়াচ্ছন্ন করে কাউফলার লাঠি, তেঁতুলের লাঠি, পিছা বা ঠুণ্ডা কাইছা বা ছেঁড়া জুতা দিয়ে প্রহার করা হয়। বিভিন্ন নবী পয়গম্বরদের দোহাই দিয়ে রোগিণীকে ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে নির্দেশ দেওয়া হয়।

কোনো হারানো দ্রব্য ফেরত পাওয়া, নিরুদ্দেশ ব্যক্তির সন্ধান লাভ, চোর ধরা ইত্যাদি সনাক্ত করার জন্য আয়না পড়া, চাউল পড়া ইত্যাদির প্রচলন রয়েছে। তবে এ ব্যাপারে বাটি চালানের পদ্ধতিটির এখন কোনো অস্তিত্ব নেই বললেই চলে।

'উপরির দোষ' বা 'বাতাস লাগা'র কারণে অনেক রোগ-ব্যাধির আক্রমণ হয় বলে লোকসমাজের বিশ্বাস। এজন্য পানি পড়াসহ তাবিজ ইত্যাদি দেওয়া হয়ে থাকে।

অশরীরী অশুভ শক্তির হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য ঘর-বাড়ি 'বন্ধ' করা, কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অবগত হওয়ার জন্য কোরান চালান দেওয়া, সদ্যোজাত শিশুকে ভূত-প্রেতের মতো অশুভ শক্তির হাত থেকে নিরাপদ রাখার জন্য তার মাথার কাছে কোনো লৌহদ্রব্য রাখা, ঘরের দরজায় বড়ই কাঁটা বা বেত কাঁটা ঝুলিয়ে রাখা, খুব উন্নতমানের ফলদায়ক গাছকে 'কুনজর' বা 'বদনজর' থেকে নিরাপদ রাখার জন্য

www.pathagar.com

ঐ গাছের সাথে ছেঁড়া জুতা বা পিছা ঝুলিয়ে দেওয়া, নাদুস-নুদুস স্বাস্থ্যবান বাচ্চাদের কপালে কালো টিপ দেওয়া ইত্যাদি মেনে চলা হয়।

লোকবিশ্বাস

১. বাড়ির দরজাত ছিঁড়া জোতা আর ঠুণ্ডা কাইছা জুলাইয়া[১] থুইলে বাড়িত বুত-পেরেত ডোকতো[২] পারে না।
২. কোনো ফলগাছের লগে[৩] ছিঁড়া জোতা আর ঠুণ্ডা কাইছা[৪] জুলাইয়া থুইলে হেই গাছের ফলে 'নজর' (কু-নজর) লাগে না।
৩. গাও[৫] প্রজাপতি বইলে বিয়ার সময় গনাইয়া[৬] আইয়ে।
৪. গুমের মইদ্যে ছোড পোলাইনে আসলে[৭] মনে করতো অইবো যে, হেইসুম[৮] ফেরেশতারা হের লগে আসা-আসি[৯] করে।
৫. কোনো আবিয়াইত্যা মাইয়া প্রজাপতি মারলে হের বিয়া অয় না।
৬. কোনো আবিয়াইত্যা মাইয়া পাও[১০] লম্বা কইর‍্যা ছড়াইয়া দিয়া বইলে হের দূরে বিয়া অয়।
৭. কচু তরকারি খাওনের সুম গলা দরলে বাও আতের কেইন্যা আঙুল চাইপ্যা দরলে গলা দরনি[১১] সাইর‍্যা যায়।
৮. পোলাইনে আত[১২] দিয়া লজ্জার জায়গা খাউজ্যাইলে[১৩] হের বড় অসুক অয়।
৯. রাইতকারকালে[১৪] কুত্তায় কানলে কোনো খারাপ খবর হোনা যাওনের সম্বাবনা থাহে।
১০. মোহে[১৫] বরণ অইলে বাত খাওনের পর আইডা[১৬] আত দিয়া মোক[১৭] মুইছ্যা দিলে বরণ সাইর‍্যা যায়।
১১. রাইতকারকালে গরে বা উডানে বাঁশি বাজাইতো অয় না। বাজাইলে গরে হাফ[১৮] আইয়ে।
১২. আতেরতন[১৯] কাকই[২০] পইড়্যা গ্যালে বাড়িত অতিত[২১] আইয়ে।
১৩. ছোড পোলাইনে গর[২২] জারা[২৩] দিতে শুরু করলে বাড়িত অতিত আইয়ে।
১৪. জামাইর পাও'র নীচেরতন মাডি লইয়া হিন্দুরের লগে মিয়াইয়া[২৪] ফোঁডা দিলে জামাই মরণ পইরযন্ত বউর বাইদ্য থাহে।
১৫. যমইক্যা[২৫] ক্যালা খাইলে জমইক্যা পোলাইন অয়।
১৬. গেদা-গেদির মোহে দুধ দ্যাওনের সুম দুধে এট্টু থুখু ছিডাইয়া লইলে গেদা-গেদির কোনো ক্ষতি হয় না।
১৭. রাইতকারকালে কাউয়ায় কানলে কোনো খারাপ খবর পাওনের সম্বাবনা থাহে।
১৮. ছ্যাপ হালানের সুম যদি ঐ ছ্যাপ এট্টুও নিজের শইল্যে পড়ে, তাইলে হের অসুক অইবো।
১৯. রাইতকারকালে গাছের লতা, পাতা, ফুল ছিঁড়লে নিজের ক্ষতি হয়।
২০. হু[২৬] দিয়া চেরাগ বাততি নিবাইতো অয় না।
২১. আন্ডা খাইয়া পরীক্ষা দিতো যাইতো অয় না। ফল খারাপ অয়।
২২. কোনোহানে যাওনের সুম পিছের তন বোলাইলে বিপদ অয়।
২৩. কোনো হানে যাওনের সুম উস্টা[২৭] খাইলে পথে বিপদ অয়।

www.pathagar.com

২৪. বাতের[২৮] পাতিলের তন কাঁচা চাউল খাইলে মোহে আঁচিল অয়।
২৫. ছোড পোলাইনের মাতার দারে লোয়া থুইলে বুত-পেরেত[২৯] আইতো পারে না।
২৬. রাইতকারকালে কোনো স্বপ্নের কতা কইতো অয়না। কইলে খারাপ ফল অয়।

আঞ্চলিক শব্দের সামর্থক শব্দ : ১. ঝুলিয়ে, ২. ডাকতে, ৩. সঙ্গে, ৪. বাড়ির আশপাশের ময়লা পরিষ্কার করার জন্য ব্যবহৃত ঝাড়ু, ৫. শরীরে, ৬. ঘনিয়ে, ৭. হাসলে, ৮. সে সময়ে, ৯. হাসাহাসি, ১০. পা, ১১. গলা চুলকানো, ১২. হাত, ১৩. চুলকালে, ১৪. রাত্রিবেলা, ১৫. মুখে, ১৬. এঁটো, ১৭. মুখ, ১৮. সাপ, ১৯. হাত থেকে, ২০. চিরুনি, ২১. অতিথি, ২২. ঘর, ২৩. ঝাড়ু, ২৪. মিশিয়ে, ২৫. যমজ, ২৬. ফুঁ, ২৭. হোঁচট, ২৮. ভাতের, ও ২৯. ভূত-প্রেত।

লালমোহন উপজেলা

খুব কম মানুষই আছেন যারা ঝাড়-ফুঁক বা তাবিজে বিশ্বাস করেন না। যারা বিশ্বাস করেন না, তারা আবার এই বিষয়টাকে একেবারে উড়িয়েও দেন না, কিংবা অবহেলাও করেন না। যাদের এসবে বিশ্বাস নেই বা কম বিশ্বাস তারাও অনিচ্ছাসত্ত্বেও এসব ঝাড়ফুঁক কিংবা তাবিজের দ্বারস্থ হয়ে থাকেন বা কেউ দিয়ে থাকলেও তা ফেলে দেওয়ার সাহস করেন না। তাদের দুশ্চিন্তা এই, যদি এর মধ্যে সত্যিই কিছু থেকে থাকে, তাহলে তো বিপদ হবে। কোরআনের আয়াত পড়া পানি বা আয়াত লেখা তাবিজ মাঠে-ঘাটে ফেলে দেবে—মানুষের পায়ের তলায় পিষ্ট হবে, এমন দুঃসাহস কারো নেই। যারা আরবি ও উর্দুর মধ্যেকার প্রভেদ বুঝতে পারেন না, তারাও রাস্তা-ঘাটে কোনো উর্দু লেখা কাগজ বা বইয়ের ছেঁড়া পাতাকেও কোরআনের অংশ বলে বিশ্বাস করে পুকুরের বা খালের পানিতে ফেলে দেন। যারা পানি পড়াতে বা কালিজিরা পড়াতে বিশ্বাস করেন না, তারা কখনো দ্রব্য দুটিকে পা দিয়ে মাড়াবার মতো সাহস কিংবা স্পর্ধা করেন না। কারো প্রিয় সন্তান যদি অসুস্থ হয়, মারাত্মক কোনো রোগে আক্রান্ত হয় যা থেকে বেঁচে যাবার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ হয়, তিনি জীবনে কোনোদিন পশ্চিমদিকে ফিরে আছাড় না খেলেও সযত্নে ঐ পানিটুকু তার প্রিয় সন্তানের মুখে তুলে দেবেন। বিশ্বাস এই যে, যদি এর মধ্যে কোনো মাহাত্ম্য বা গুণ থেকে থাকে। কোনো মানুষ যদি প্রচণ্ড বাতরোগে ভুগতে থাকেন, ঘাড়ের ব্যথা, মাথা ব্যথা, হাটু ব্যথা সইতে না পেরে অহরহ কোঁকাতে থাকেন, তখন যদি কেউ তাকে চরম দুর্গন্ধযুক্ত শিয়ালের মাংসের বড়ি এনেও খেতে দেন, তিনি তা নির্দ্বিধায় গিলে ফেলবেন কিংবা শিয়ালের তেল শরীরের আক্রান্ত স্থানে উপর্যুপরি মালিশ করতে থাকবেন।

পর্যবেক্ষণ ও ফিল্ডওয়ার্কে দেখা গেছে, এক শ্রেণির মানুষ, বলা যায় অধিকাংশ মানুষই, তা তিনি হিন্দু হোন আর মুসলমান হোন, ধনী হোন বা গরিব হোন এবং এমনকি শিক্ষিত হোন আর অশিক্ষিত হোন—ঝাড়-ফুঁক, পানি পড়া, তাবিজ, মাদুলি ইত্যাদিতে বিশ্বাস করেন এবং বিশ্বাস করে প্রয়োজনের সময় তা ব্যবহারও করে থাকেন।

এখন দেখা যেতে পারে কী কী বিষয়গুলোতে বা কী কী সমস্যায় পড়লে বা সমস্যায় পড়ার সম্ভাবনা থাকলে মানুষ এই ঝাড়-ফুঁক, তাবিজ-তুমারের শরণাপন্ন হয়ে থাকেন :

www.pathagar.com

১. শত্রু দ্বারা 'নষ্ট করা' এবং বাণটোনা বা জাদুটোনা কাটানো;
২. মেয়েদের বিয়েতে বিলম্ব হলে কিংবা কেউ 'নষ্ট করে' বিয়ে বন্ধ করে রেখেছে বলে সন্দেহ হলে;
৩. বন্ধ্যাত্ব কাটানো বা নিঃসন্তানদের সন্তান লাভ;
৪. মৃত সন্তান প্রসব থেকে মুক্তি;
৫. কোনো 'বদনজর' বা 'কুনজর' বা 'দৃষ্টি'জনিত কুফল থেকে নিরাময়;
৬. 'উপরির দোষ' বা 'বাতাস লাগা'জনিত অসুখ থেকে নিরাময়;
৭. জ্বীন-ভূত-প্রেত 'আসর' করলে তা ছাড়ানো;
৮. শিশু-কিশোরদের বিছানায় প্রস্রাব বন্ধ করা;
৯. স্বামীকে নিজের অনুগত রাখা বা বাধ্য করা;
১০. বেপরোয়া বা অবাধ্য সন্তানকে বাধ্যগত করা;
১১. দাম্পত্য কলহ দূর করা;
১২. কোনো কাঙ্ক্ষিত মানুষকে নিজের করে পাওয়া বা বশীকরণ;
১৩. জ্বীন আনার মাধ্যমে তার কাছ থেকে ভালো-মন্দ ও গোপন বিষয়াদি অবগত হওয়া ও তার প্রতিকার;
১৪. সন্দেহযুক্ত ব্যক্তিকে সনাক্ত করা;
১৫. হারানো দ্রব্য ফিরে পাওয়া;
১৬. হারিয়ে যাওয়া মানুষের সন্ধান লাভ;
১৭. শিশু-সন্তানদের অশুভ শক্তির হাত থেকে নিরাপদ রাখা;
১৮. পড়াশোনায় অমনোযোগী ছাত্র-ছাত্রীদের মনোযোগ ফিরিয়ে আনা;
১৯. স্বামীর গোপন কথা জানা;
২০. যাবতীয় স্ত্রীরোগ;
২১. মামলা-মোকদ্দমায় জয়লাভ;
২২. চাকরি প্রাপ্তি;
২৩. হারানো চাকরি ফিরে পাওয়া;
২৪. ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতি;
২৫. সুপাত্রে কন্যা দান;
২৬. মানসিক রোগ;
২৭. বাড়ি-ঘর বন্ধ করা;
২৮. অনিষ্ট সাধনের উদ্দেশ্যে শত্রু কর্তৃক পুঁতে রাখা তাবিজ উদ্ধারের জন্য বাটি চালান, ইত্যাদি।

এছাড়া পেট ব্যথা, মাথা ব্যথা থেকে শুরু করে যাবতীয় কঠিন ও জটিল রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্তিলাভের উপায় হিসেবে মানুষ ঝাড়-ফুঁক ও তাবিজ-তুমারের শরণাপন্ন হয়ে থাকেন।

এসব সমস্যা ও সংকট এবং বিপদ থেকে মুক্তিলাভের জন্য এ অঞ্চলের খোনকার, আলেম, ওঝা, গুণিন প্রমুখ যেসব 'তদবির' বা ব্যবস্থা দিয়ে থাকেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, পানি পড়া, কালিজিরা পড়া, সরিষার তেল পড়া, কালো সুতা পড়া,

www.pathagar.com

চিনি পড়া, মিষ্টি পড়া, ডাব পড়া, আয়না পড়া, চাউল পড়া, কোরআন চালান দেওয়া, জ্বীন চালান দেওয়া, বিভিন্ন ধরনের তাবিজ-তুমার ইত্যাদি।

লোকবিশ্বাস

১. আতের তেন[১] কাঁকই[২] পড়ি গ্যালে বাড়িত অতিত[৩] আইয়ে।
২. ঠুণ্ডা কাইছা[৪] শইল্যের লগে লাগলে অসুক হয়।
৩. রবিবারে নতুন কাইছা বান্দন বালা না।
৪. পোলাইনে আচুক্কা[৫] ছ্যাপড়া[৬] খাইলে বুয়ে ছ্যাপ[৭] দিতো অয়। নইলে বুক দড়ফড়ানি অসুক অয়।
৫. ছোড পোলাইনের পোন্দের তলা দি চাইতো অয়না, চাইলে অসুক অয়।
৬. চোউকে এন্না (অঞ্জনি) উটলে ছোড পোলাইনের নুনু ছোয়াইলে বালা অই যায়।
৭. পোয়াতি মাইয়া মাইনষের উরপে জ্বীন ও ভূত-পেত্নী 'আসর' করলে পোলাইন নষ্ট অয়।
৮. শাওন মাসে কোনো মাইয়ার বিয়া অইলে হেই মাইয়ার মরা পোলাইন অয়।
৯. গাছের গোড়ায় আগলে মোতলে[৮] হেইসব জাগাত হোড়া[৯] অয়।
১০. মোসলমানি করনের পর পান্তা বাত খাইলে নুনু পাকি[১০] যায়।
১১. বচ্ছরের পইলা দিন গরুর শিঙ্গে ত্যাল দিলে হেই গরুর অসুক অয় না।
১২. মুত চাইপ্যা রাইকলে বহুমূত্র রোগ অয়।
১৩. কপালে আত দি থাইকতো অয়না। হেইলে দুক্ক অয়।
১৪. চেরাগ বা বাততি ফু দি নিবাইতো অয় না। নিবাইলে অসুক অয়।
১৫. গরুর গলার মইদ্যে জোতার[১১] তলা বান্দি রাইকলে মোক লাগে না।
১৬. কেওর মিরগি ব্যারাম অইয়া ফিট অইয়া গ্যালে হ্যারে চামড়ার জোতা হোঙাই[১২] দিলে বালা অই যায়।
১৭. কমলার ছাল খাইলে গলা পরিষ্কার অয়।
১৮. কেওর শইল্যে একজিমা ব্যারাম অইলে পচা আমপাতা, ব্যাতের[১৩] আগা ও আদা মিশাই বাটি খাওয়াইলে বালা অয়।
১৯. ডাইন চোউক লাফাইলে অসুক বা বিপদ অয়।
২০. পরা অবস্তায় কাপড় সিলাইতো অয় না। সিলাইলে অসুক অয়।
২১. মাইয়া মাইনষের কাপড়ের আচল দি মুক মুইচলে মুহে গোডা অয়।
২২. বিষ্টির পানিত ভিইজলে ঘামচি সারি যায়।
২৩. পোয়াতিরে মিরকা মাছ খাওয়ান ঠিক না। খাওয়াইলে মাথা গুরানি রোগ অয়।
২৪. মাইয়া মাইনষের হায়াজের সুম গরুর আড্ডি পারা দিলে হায়াজ বন্দ অয় না।
২৫. জোকে দরলে হেয়ানো[১৪] মুতি দিলে জোকে ছাড়ি দেয়।
২৬. মোহে বরন অইলে মোহের ছ্যাপ লাগাইলে বরণ সারি যায়।
২৭. বিছানায় মোতোইন্যা[১৫] পোলাইনেরে শনি-মোঙ্গলবারে বাঁশের নতুন চারার উরপে বয়াই[১৬] গোসল করাইলে আর মোতে না।
২৮. নেশা কইর‍্যা মাতাল অইলে তেতুইয়ের সরবত খাওয়াই দিলে নেশা ছুডি যায়।

www.pathagar.com

২৯. গলাত কাটা আটকাইলে বিলাইর পায়ে দরলে কাডা নামি যায়।
৩০. গাই দোয়াইয়া লগে লগে হেই দুধ খাওয়াইলে আমাশা বালা অই যায়।
৩১. উডানের অর্দেক জাইর‍্যা[17] থুই দেওন ঠিক নয়। হেইলে আদ-কপালি মাতা বেদনা অয়।
৩২. আগতে বইয়া নাক খোচাইলে নাকে ঘা অয়।
৩৩. প্যাডে পোলাইন লই গাছেরতন ফল ছিঁড়ি খাইলে মরা পোলাইন অয়।
৩৪. যাগো পোলাইন অই মরি যায়, হেরা যদি ছয় মাইস্যা পোলাইনের গেডির[18] চুল ও মা'র কাপড়ের আচলের টুকরা তাবিজের মইদ্যে ভরি মাজাত বান্দে, তাইলে পোলাইন বাঁচে।
৩৫. দুলা পড়া দি শত্রুরে গুম পাড়াই রাওন যায়।
৩৬. দুলা পড়া বাড়ির চাইরপাশে ছিডাই দিলে বাড়ির মাইনষে গুমাই যায়। এই সুম চোরেগো চুরি কইরতে সুবিদা হয়।
৩৭. জ্যৈষ্ঠ মাসে পয়লা পোলা বা মাইয়া বিয়া দেওন ঠিক না।
৩৮. গর্বইত্যা মাইয়ালোকের জামাইয়ের কিছু কাডন-কোডন ঠিক না। কইরলে পোলাইন ল্যাংড়া অয়।

আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. হাত থেকে, ২. চিরুনি, ৩. অতিথি, ৪. ঝাড়ু, ৫. হঠাৎ, ৬. চমকে ওঠা, ৭. থুথু, ৮. মল-মূত্র ত্যাগ করলে, ৯. ফোঁড়া, ১০. পেঁকে যায়, ১১. জুতার, ১২. শোঁকানো, ১৩. বেত, ১৪. সেখানে, ১৫. যে প্রস্রাব করে, ১৬. বসিয়ে, ১৭. ঝাড়ু দিয়ে, ও ১৮. ঘাড়ের।

চরফ্যাশন উপজেলা

এমন একটি সময় ছিল যখন গ্রামাঞ্চলে তো দূরের কথা, তদানীন্তন থানা শহরেও অভিজ্ঞ ডাক্তারের দেখা পাওয়া কঠিন ছিল। মহকুমা শহরে পদস্থ অফিসাররা তাদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যাসহ বাস করতেন বলে হাতেগোনা দু-একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক ছিলেন। অনভিজ্ঞ, অশিক্ষিত, ডাক্তার নামধারী কিছু মানুষ, কবিরাজ ও ওঝা আর পীর-দরবেশ, মসজিদের ইমাম, মুয়াজ্জিন ও পেশাদার কিছু 'খোনকার'ই (যারা ঝাঁড়-ফুক, তাবিজ-তুমার দিয়ে থাকেন) ছিল মানুষের বিভিন্ন ধরনের রোগ-ব্যাধি, 'ভূত-পেত্নী-জ্বীনের আসর', অসাধু খোনকার বা গুণিনের দ্বারা মানুষকে 'নষ্ট করা' (তাবিজ-তুমারের দ্বারা কারো ক্ষতি সাধন) ইত্যাদি থেকে মুক্তি ও উপশম লাভের একমাত্র আশ্রয়স্থল। এখনও যেসব বিপদ, ব্যাধি ও সংকটে পড়লে মানুষ এসব খোনকার, ওঝা ও গুণিনদের কাছে যেতে বাধ্য হয় তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা এখানে দেওয়া হলো :

১. সাপে কাটা, ২. হলুইদ্যা পালং বা জন্ডিস, ৩. বন্ধ্যাত্ব বা সন্তান না হওয়া, ৪. মৃত সন্তান প্রসব করা, ৫. সদ্যোজাত শিশুর নিরাপত্তা, ৬. দাঁতের পোকা, ৭. শিং মাছে কাটা দেওয়া, ৮. জাদুটোনা বা বানটোনা কাটানো, ৯. কিশোর-কিশোরীদের বিছানায় প্রস্রাব করা, ১০. ঘুমের মধ্যে শিশুদের ছ্যাপড়া (চমকে ওঠা) খাওয়া, ১১. নজর লাগা, ১২. অশুভ শক্তির হাত থেকে নিরাপদ থাকার জন্য বাড়ি বা ঘর 'বন্ধ' করা, ১৩. ভূত-পেত্নী ও জ্বীনের 'আসর' ছাড়ানো, ১৪. 'বাতাস লাগা', ১৫. উপড়ির দোষ কাটানো,

www.pathagar.com

১৬. বশীকরণ (কাঙ্ক্ষিত মানুষকে নিজের বশে আনা), ১৭. স্বামীকে বশীভূত রাখা, ১৮. স্বামীর দৈনন্দিন গোপন কথা জানা, ১৯. দাম্পত্য জীবনের অশান্তি ও মনোমালিন্য দূর করা, ২০. স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সু-সম্পর্ক স্থাপন করা, ২১. অবাধ্য সন্তানকে পিতা-মাতার অনুগত করা, ২২. অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষায় ভালো ফললাভ, ২৩. কুমারী মেয়েদের বিয়ে বন্ধ করা কাটানো, ২৪. মামলা-মোকদ্দমায় জয়লাভ, ২৫. চোর সনাক্ত করা, ২৬. হারিয়ে যাওয়া কোনো দ্রব্য বা মানুষ খুঁজে বের করা, ২৭. আর্থিক স্বচ্ছলতা লাভ, ২৮. চাকরি প্রাপ্তি, ২৯. মেয়েদের বিয়ে ত্বরান্বিত করা, ৩০. জ্বীন আনার মাধ্যমে ভালো-মন্দ অবগত হওয়া, ৩১. পক্ষাঘাত, ৩২. বুক ধড়ফড় করা, ৩৩. দীর্ঘদিন ধরে আমাশয় বা অজীর্ণ রোগে ভোগা, ৩৪. বিশেষ সময়ে জ্বর আসা বা মেয়াদী জ্বর, ৩৫. গা জ্বালা-পোড়া করা, ৩৬. মানসিক বা উন্মাদ রোগ, ৩৭. খেলাধুলায় জয়লাভ, ৩৮. ভবিষ্যতের কোনো বিষয় সম্পর্কে পূর্বাহ্নে অবগত হওয়ার জন্য এস্তেখারা করা, ৩৯. হারানো চাকরি ফিরে পাওয়া, ৪০. শত্রুতা সৃষ্টি করা, ৪১. ঝগড়া-বিবাদ দূর করা, ৪২. কলেরা ও বসন্ত থেকে রক্ষা পাওয়া, ৪৩. মানুষ ও জন্তুর অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়া, ৪৪. বৃষ্টি হওয়ার জন্য, ৪৫. বদলোকের কু-নজর থেকে ফসল রক্ষা, ৪৬. গলায় বিঁধে যাওয়া কাঁটা নামানো, ৪৭. জেল থেকে বাঁচা, ৪৮. বিচারক সদয় হওয়া, ৪৯.শত্রু দমন, ৫০. চোরের উপদ্রব থেকে রক্ষা পাওয়া ইত্যাদি। এছাড়া ছোট-খাটো অসুখ-বিসুখ, জ্বর, পেটখারাপ, মাথা ব্যথা ইত্যাদির জন্যও অনেকে পীর-ফকির, দরবেশ, গুণিন, ওঝা, খোনকার, প্রমুখের দ্বারস্থ হন।

উপর্যুক্ত সমস্যাসমূহ থেকে মুক্তি লাভের জন্য যেসব 'তদবির' দেওয়া হয়, তা নিম্নরূপঃ

১. দোওয়া পড়ে ফুঁ দেওয়া বা ঝাড়া, ২. তাবিজ-তুমার ব্যবহার, ৩. পানিপড়া, ৪. তেল পড়া, ৫. কালিজিরা পড়া, ৬. কাইতন পড়া, ৭. প্লেট বা বাসন পড়া, ৮. দোওয়া লিখিত প্লেট বা বাসন, ৭দিন, ১৪ দিন, ২১ দিন বা ৪১ দিন ভোরে ধুয়ে পানি খাওয়া, ৯. মন্ত্র পড়ে বিষ নামানো, ১০. পয়সা ফুটো করে কোমরে তাগার সঙ্গে বেঁধে দেওয়া, ১১. চিনি বা গুড় পড়া, ১২. সুতা পড়া, ১৩. বাড়ি বা শরীর 'বন্ধ' করা, ১৪. শিকড় ধারণ ও ১৫. স্পর্শ ইত্যাদি।

উপর্যুক্ত ব্যবস্থাপত্র ভিন্ন ভিন্ন সমস্যা বা রোগ-ব্যাধির জন্য ভিন্ন ভিন্নভাবে ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়। যেমন, পানি পড়া সমস্যা ভেদে খেতে হয়, মাথায় দিতে হয় কিংবা গোসলের পানিতে মিশিয়ে সেই পানি দিয়ে গোসল করতে হয় কিংবা প্রয়োজনীয় স্থানে লাগাতে হয়; তেল পড়া কখনো গায়ে মালিশ করতে হয়, কখনো নাকে দিতে হয়, কখনো বা কানে দিতে হয়। লিখিত আয়াত বা কাগজে অঙ্কিত কোনো নকশা কখনো রূপার, কখনো বা তামার বা লোহার খোলের মধ্যে ঢুকিয়ে মোম দিয়ে মুখ বন্ধ করে বাম হাতে বা ডান হাতে, গলায় কিংবা কোমরে কালো কাইতন দিয়ে ধারণ করতে হয়।

নানা সমস্যার জন্য বিভিন্ন রকম আয়াত, মন্ত্র বা সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। এসব আয়াত, মন্ত্র বা সাংকেতিক চিহ্ন মেশ্‌ক ও জাফরান দিয়ে খুব পাতলা ও

www.pathagar.com

মসৃণ কাগজে লেখা হয়। তারপর লোহা, তামা বা রূপার খোলে ভরে ব্যবহার করতে হয়। যেমন, বশীকরণের জন্য দেওয়া তাবিজ কাঙ্ক্ষিত মানুষের চলাচলের রাস্তায় অমাবস্যা রাতের গাঢ় অন্ধকারে পুঁতে রাখতে দেওয়া হয় কিংবা তার বালিশের তুলার মধ্যে ঢুকিয়ে রাখতে বলা হয়। আবার কারো ক্ষতি করার উদ্দেশ্যেও ঐ বালিশের ভেতরেই তাবিজ রেখে দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। বাড়ি বা ঘর 'বন্ধ' করার ক্ষেত্রে তাবিজ ঘরের কোণে বা বাড়ির কোণে পুঁতে রাখতে হয়।

'বশীকরণের' প্রয়োজনে আবার পড়ে দেওয়া (দোয়া পড়ে ফুঁ দেওয়া) চিনি, গুড় বা অন্য কোনো মিষ্টি দ্রব্য খাওয়ানোর পরামর্শ দেওয়া হয় কিংবা এমন কিছু নকশা অঙ্কিত তাবিজ লিখে দেওয়া হয় যেগুলি ৭ দিন, ১৪ দিন, ২১ দিন কিংবা ৩৯ দিন কাঙ্ক্ষিত মানুষটির বাড়ির দিকে মুখ রেখে বসে সেগুলি মোমের আগুনে পোড়াতে হয় কিংবা পুড়িয়ে ছাইগুলো নিজের মুখে, বুকে মাখতে হয়। কাউকে বাণটোনা করার ক্ষেত্রে মন্ত্র বা দোওয়া পড়ে মাটিতে কাটাকুটি করা হয়, বিশেষ ব্যক্তির নাম নিয়ে কলা গাছে খেঁজুর কাঁটা বিঁধিয়ে দেওয়া হয়। মানসিক রোগী, যে ঘরে থাকতে চায় না, ঘর থেকে বেরিয়ে যায়, তাকে ঘরে আটকিয়ে রাখার জন্য দেওয়া হয় 'লেবু পড়া'—যেটি রোগীর বিছানায় মাথা বরাবর ওপরে ঝুলিয়ে রাখা হয়। আর একটি মজার বিষয় হচ্ছে, কারো স্বামীর কাজ-কর্ম, আচার-আচরণ ও গতিবিধিতে স্ত্রীর মনে সন্দেহের উদ্রেক হলে তার স্ত্রী তার সারাদিনের কাজকর্মের, চলাচলের একটা ফিরিস্তি জানার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেন। স্বামী কোথায় যায়, কোনো বাড়িতে যায়, কোনো মেয়েলোকের সাথে কথা-বার্তা কিংবা অন্য কোনোরকম সম্পর্ক হয় কি-না ইত্যাদি তাকে তাড়িয়ে বেড়ায়। কিন্তু এসব জানার উপায় কি? এক্ষেত্রে তারা প্রায়শই 'খোনকারের' শরণাপন্ন হয়ে থাকেন। খোনকার তাকে তাবিজ লিখে এই পরামর্শ দেন যে, স্বামী ঘুমিয়ে পড়লে এই তাবিজ তার বুকের ওপরে ধরতে হবে। তাহলে গড়গড় করে তিনি ঘুমের মধ্যেই সব বলতে থাকবেন। এরূপভাবে সমস্যার বিভিন্নতার ওপর নির্ভর করে প্রদত্ত তাবিজ বা অন্যান্য মন্ত্র বা দোওয়া পড়ে ফুঁ দিয়ে দেওয়া দ্রব্যের ব্যবহার।

ক. মরিচ ও সর্ষে পড়া

চোর ধরা বা হারানো দ্রব্য ফিরে পাওয়ার জন্য আয়না পড়া, চালপড়া ও সর্ষে পড়ার প্রচলন রয়েছে। এছাড়া প্রতিদিন সকালে দোওয়া পড়ে ফুঁ দেওয়া মরিচ চুলার আগুনে টালতে হয়। মরিচ যত উত্তপ্ত হতে থাকবে কিংবা পুড়তে থাকবে, চোর কিংবা অপরাধীর শরীরও একইভাবে জ্বলতে থাকবে, সে ছটফট করবে, এবং চুরি করা দ্রব্যাদি ফিরিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত সে স্বস্তি ও শান্তি তো পাবেই-না, উপরন্তু তার প্রাণহানিরও সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

খ. হ্যারিকেন পড়া

তাবিজ লিখে হ্যারিকেনের ওপর রেখে গরম করতে হয়। এটিও যত উত্তপ্ত হতে থাকবে, চুরি করা দ্রব্যাদি ফেরত দেওয়ার জন্য তার শরীরও জ্বলতে থাকবে এবং সে যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে চুরি করে নিয়ে যাওয়া দ্রব্যাদি ফেরত দিতে এগিয়ে আসবে।

www.pathagar.com

গ. জ্বীন আনা

ভোলার অন্যান্য এলাকার মতো এখানেও বিভিন্ন রকম সমস্যার সমাধান দেওয়ার উদ্দেশ্যে যারা জ্বীন 'হাসিল' করেছেন তাদের দিয়ে জ্বীন আনানো হয়। অমাবস্যার ঘুটঘুটে অন্ধকার রাতে জ্বীন আনতে হয়। ঘরে কোনোরকম আলো জ্বালানো যায় না। জ্বীন এসে প্রথমেই বাইরে থেকে ঘরের চালা ও বিভিন্ন বেড়া ধরে নাড়া দিয়ে তার উপস্থিতি জানান দেন। তারপর ধীরে ধীরে ঘরে প্রবেশ করেন এবং যিনি তাকে এনেছেন তার সঙ্গে কথা বলেন ও বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি ও সমস্যা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে সে-সম্পর্কে জবাব দেন ও সমাধান বাতলে দেন।

ঘ. কাটাছিঁড়ার পানি দিয়ে গোসল দেওয়া

কোনো ব্যক্তিকে তাবিজ-তুমার করে 'নষ্ট' করা হয়েছে অর্থাৎ তার শারীরিক ক্ষতির জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে এমন সন্দেহ করা হলে 'খোনকার' ডাকা হয় বা তার কাছে যাওয়া হয়। খোনকার মন্ত্র বা দোওয়া পড়ে একটি পাত্রে পানি নিয়ে কিংবা মাটিতে কাটাকুটি করে পানি পড়া দেন। সেই পানি দিয়ে আক্রান্ত ব্যক্তিকে গোসল করাতে হয়।

লোকবিশ্বাস

১. কেওর[১] খাওনের সুম যদি দূরেরতনে[২] কেও হের[৩] নাম লয় বা হের কতা মনে করে, তাইলে হের গলাত খাওন আটকাইয়া যায়।
২. কোনোআনে যাওনের সুম পিছেরতন[৪] বোলাইতে নাই। বোলাইলে হের অমঙ্গল অয়।
৩. দুরপের[৫] সুম গরের চালের উরপে[৬] বা আশপাশে কাউয়ায় করুণ গলায় কা-কা কইর‍্যা ডাকলে দূরেরতন খুব খারাপ খবর হোনা যাওনের ডর থাকে।
৪. ছোড পোলাইনে পিছা দিয়া গর[৭] জারু[৮] দিলে বাড়িত অতিত[৯] আইয়ে।
৫. আতেরতন কাকই[১০] পইড়্যা গেলে বাড়িত অতিত আইয়ে।
৬. বালিশের উরপে বইলে পোন্দে ফোঁড়া অয়।
৭. পোন্দে ফোঁড়া অইলে ট্যায়া পাওয়া যায়।
৮. বাড়ির পিছের পত দিয়া বাড়িততন[১১] বাইরাইতে[১২] অয় না।
৯. বাত[১৩] খাইয়া গোসল করলে প্যাডে কুত্তার ছাও অয়।
১০. পুরুষ মাইনষের মুরকার[১৪] কইলজা খাইতো অয় না। খাইলে সাহস কইম্যা যায়।
১১. যে মাইয়ালোক সালুইনের[১৫] পাতিল মুইছ্যা খায়, হের মাইয়া অয়।
১২. যে মাইনসের পায়ের বুইড়্যা আঙুলের তন পাশের আঙুলগুলি বড় অয়, হের আতো[১৬] ট্যায়া-পইসা থাহে না।
১৩. কুত্তায় যদি রসি ঘরের ব্যাড়া বাঙ্গে[১৭] হেইলে হের সংসারের ক্ষতি হয়।
১৪. যমইক্যা[১৮] ক্যালা খাইলে যমইক্যা পোলা বা মাইয়্যা অয়।
১৫. কোনো পোয়াতির আতে-পায়ে পানি নামলে গন্ধবাদালি পাতার রস খাওয়াইলে পানি নামা বন্দ অইয়া যায়।

www.pathagar.com

১৬. যারা দাড়ি-মোচে কোনোদিন ক্ষুর দিবো না, হেরা লায়লী-মজনুর বিয়া খাইতো পারবো।
১৭. জন্মবারে বিয়া করন বালা না।
১৮. আঁতুড় গরের দরজাত ব্যাল গাছ বা বড়ই গাছের কাডা বাইন্দা রাকলে ভূত-পেরেত ডোকতে পারে না।
১৯. গরের সামনে গরুর মাতার খুলি জুলাইয়া[১৯] থুইলে হেই গরের দারে-কাছে[২০] ভূত-পেরেত বা বদজ্বীন আইতো পারে না।
২০. স্বামীর আইডা[২১] খাইলে বৌর হায়াত বাড়ে।
২১. যার নাক গামে[২২] হে সুন্দরী বউ পায়।
২২. যে মাইয়্যার ঠোঁট কালা হেই মাইয়ার স্বামী বাঁচে না।
২৩. বিয়া কইর‍্যা বাড়িত আওনের সুম পতে জাইল্যা[২৩] দেকলে বউ লক্ষ্মী অয়।
২৪. কোন গরে চেরাগের উরপে পানি পড়লে হেই গরের আবিয়াত্যা মাইয়্যা থাকলে হের তড়াতড়ি বিয়া অইয়া যায়।
২৫. বিয়ার দিন কোনো কিছু কাডাকুডি করলে বিয়াত বাদা[২৪] পড়ে।
২৬. হিং মাছে[২৫] কাডা দিলে তেঁতুই'র আডি[২৬] বাইড্যা লাগাইয়া দিলে বালা অইয়া যায়।
২৭. নিমপাতা বাইড্যা হের রস খাওয়াইলে প্যাডের[২৭] কিরমি[২৮] মইর‍্যা যায়।
২৮. মা'র দুধ খাউজ্যাইলে[২৯] পোলাইনের অসুক অয়।
২৯. উডানের অর্দেকটা জাডু দিয়া থুইয়া দিতো অয় না। দিলে আদ-কপালি[৩০] মাতা বেদনা অয়।
৩০. যে মাইয়্যা মাইনষের জিরপা'র[৩১] আগা কালা, হের স্বামী বেশিদিন বাঁচে না।

আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. কারো, ২. দূর থেকে, ৩. তীর, ৪. পেছন থেকে, ৫. দুপুরে, ৬. ওপরে, ৭. ঘর, ৮. ঝাড়ু, ৯. অতিথি, ১০. চিরুনি, ১১. বাড়ি থেকে, ১২. বের হতে, ১৩. ভাত, ১৪. মোরগের, ১৫. তরকারির, ১৬. হাতে, ১৭. ভাঙে, ১৮. জমজ, ১৯. ঝুলিয়ে, ২০. আশেপাশে, ২১. এঁটো, ২২. ঘামে, ২৩. জেলে, ২৪. বাধা, ২৫. শিং মাছ, ২৬. বীচি, ২৭. পেটের, ২৮. কৃমি, ২৯. চুলকালে, ৩০. আধ-কপালি, ও ৩১. জিহ্বার।

মনপুরা উপজেলা

ক. ঝাড়-ফুঁক-তাবিজ-তুমার

হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের অনেক মানুষই জ্বীন-ভূত-প্রেতে বিশ্বাস করেন। এতে শিক্ষিত আর অশিক্ষিতের ভেদ নেই। গ্রাম বা শহরের সাধারণ মানুষ এদের খুব সমীহ করে চলে। এই অশরীরী আত্মাদের বসবাস সাধারণত শ্মশান, কবরস্থান, পুরনো বা ভাঙা মন্দির, ভাঙা ব্রীজ বা নতুন নির্মিত ব্রীজ, কোনো উঁচু বৃক্ষ যেমন, তুলা গাছ ও তাল গাছ; প্রচুর ডালপালাপূর্ণ বৃক্ষ যেমন, তেঁতুল গাছ, বটগাছ, পাকোড় গাছ; নিরিবিলি স্থান, বিশাল মাঠ, রাস্তার তেমাথা প্রভৃতি স্থানে। এদের যাতায়াতের একটা সময় আছে। অমাবস্যার রাত, নিশিরাত, ভরদুপুর, সন্ধ্যা প্রভৃতি সময় এরা নাকি প্রবল

www.pathagar.com

গতিতে ছুটাছুটি করতে থাকে। তখন এদের সামনে পড়লে আর রক্ষা নাই। মহিলারা এ সময়ে চুল খোলা রাখলে এরা চুলে জড়িয়ে পড়তে পারে। এসব সময়ে এবং অন্য সময়েও এরা বিনা কারণে সাধারণ মানুষের ওপর 'ভর' বা 'আসর' করে মজা পায়। তাদের আক্রমণের শিকার বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মহিলা ও শিশু। তবে পুরুষেরাও তাদের হাত থেকে রেহাই পান না।

এই অশরীরী ও অশুভ শক্তির হাত থেকে নিরাপদ থাকা এবং যদি আক্রমণ বা 'আসর' বা 'ভর' করেই ফেলে তাহলে তা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য এ অঞ্চলে এক শ্রেণির 'খোনকার', পীর, ফকির, দরবেশ, গুণিন, জ্ঞানী ও পরহেজগার আলেম, মসজিদের ইমাম বা মুয়াজ্জিনরা নানা পথ বাতলে দিয়ে থাকেন বা তারা নিজেরা এই প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়ে থাকেন। বিভিন্ন রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হলে যেমন আছেন অ্যালোপ্যাথ, হোমিওপ্যাথ, আয়ুর্বেদ ও ইউনানি চিকিৎসক, তেমনি এ বিষয়েও পারদর্শী এক শ্রেণির আলেম বা পরহেজগার মানুষ নানা 'তদবির' দিয়ে থাকেন। হিন্দু সম্প্রদায়ে আছেন বিভিন্ন ব্রাহ্মণ, ওঝা, গুণিন প্রমুখ। এদের ব্যবস্থাপত্রের মধ্যে খুব একটা পার্থক্য থাকে না। ঘুরে ফিরে একই ব্যবস্থা, তাবিজ-মাদুলি ধারণ, পানিপড়া, কাইতন পড়া, ঘর-বাড়ি বন্ধ করা, ঘরের কোণে তাবিজ পুঁতে রাখা ইত্যাদি।

শুধু অশুভ শক্তির অন্যায়ভাবে 'ভর' বা 'আসরের' শিকার হয়ে মানসিক বিকারগ্রস্ত রোগীতে পরিণত হওয়া থেকে নয়, নানাবিধ রোগ-ব্যাধির আক্রমণ, সাপে কাটা, শিং বা ট্যাংরা মাছে কাঁটা দেওয়া, নজর লাগা, বাণটোনা, যাদুটোনা, নষ্ট করা ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় থেকে নিরাপদ থাকা ও আক্রান্ত হলে তার প্রতিবিধানের জন্য এ অঞ্চলের মানুষ বিভিন্ন ধরনের খোনকার, পীর-ফকির-দরবেশের আশ্রয় নিয়ে থাকেন। বড় হয়েও বিছানায় প্রস্রাব করা, ছ্যাপড়া খাওয়া (চমকে ওঠা), বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েও মেয়েদের বিয়ে না হওয়া, সন্তান লাভে বিলম্ব বা সন্তান একেবারেই না হওয়া কিংবা মৃত সন্তান প্রসব করা, মেয়েদের বাধক বেদনা, স্তনে দুধ কম আসা, অনিয়মিত ঋতুস্রাব বা অতিরিক্ত ঋতুস্রাব, অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণ, মানসিক রোগ বা মস্তিষ্ক বিকৃতি, পক্ষাঘাত ছাড়াও এমন কোনো জটিল বা কঠিন রোগ নেই, যার জন্য পানি পড়া ও তাবিজ-তুমারের আশ্রয় নেওয়া হয় না।

এরপরে আছে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের নানাবিধ ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সমস্যার বিষয়। এখানে রয়েছে জীবনের অনেক জটিল ও কঠিন সমস্যা। স্বামী-স্ত্রীতে বনিবনা না হওয়া পারিবারিক জীবনের একটি প্রধান সমস্যা। এমনটি হলে অনেক মানুষের মনে এই বিশ্বাস দানা বেঁধে ওঠে যে, তৃতীয় কোনো পক্ষ স্বামী-স্ত্রীর মধুর সম্পর্কে ঈর্ষান্বিত হয়ে 'তাবিজ' করে তা নষ্ট করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত। অথবা গ্রামাঞ্চলে এমনও সন্দেহ পোষণ করা হয় যে, স্বামী বা স্ত্রীর দুইজনের যে-কোনো একজনকে অন্যায়ভাবে পাওয়ার জন্য কোনো পুরুষ অথবা মহিলা 'তাবিজ' করে এই সম্পর্কটাকে 'নষ্ট' করে দিয়েছে। এছাড়াও দাম্পত্য জীবনের নানাবিধ অশান্তি, শ্বশুর-শাশুড়ি-ননদ-দেবরদের না দেখতে পারার অভিযোগ বা অপবাদ, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর বা স্ত্রীর প্রতি স্বামীর বিশ্বস্ত না থাকা, সংসারে অমনোযোগী, পরকীয়া, স্বামীকে বশীভূত রাখা, কোনো যৌক্তিক কারণ ছাড়াই শুধু সন্দেহের বশীভূত হয়ে স্বামীর গোপন কথা জানার ইচ্ছা,

www.pathagar.com

কোনো নারীকে আপন করে পাওয়া, অবাধ্য সন্তানকে বাধ্যগত করা, পড়াশোনায় অমনোযোগী ছাত্র-ছাত্রীদের মনোযোগ ফেরানো, অসৎসঙ্গ থেকে ফিরিয়ে আনা, অশরীরী ও অশুভ শক্তির হাত থেকে বাড়ি ও বাড়ির সদস্যদের নিরাপদ রাখার জন্য বাড়ি-ঘর বন্ধ করা, কারো দ্বারা বিয়ে বন্ধ করে রাখা কাটানো, গাছ-গাছড়ার ফলফলাদিকে নজর-লাগা থেকে নিরাপদ রাখা, মামলায় জয়লাভ, পরীক্ষার ফলাফল জানা, কোনো কাজ শুরু করার আগে ভালো-মন্দ ফলাফল জেনে নেওয়ার জন্য এস্তেখারা করিয়ে নেওয়া ইত্যাদি জীবন, পরিবার ও সমাজ-সংসারের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত বহু বিষয়ে এ সমাজের শিক্ষিত-অশিক্ষিত উভয় শ্রেণির অনেক মানুষ বিভিন্ন পীর-ফকির, দরবেশ, খোনকার, মসজিদের ইমাম-মুয়াজ্জিন প্রমুখ আলেম ও কামেল মানুষের দ্বারস্থ হন।

এসব সমস্যার সমাধানে একেক জনের সমস্যা শুনে তারা একেক রকম ব্যবস্থাপত্র দিয়ে থাকেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ হচ্ছে, পানিপড়া, তাবিজ-তুমার ইত্যাদি। কোনো তাবিজ হাতে, গলায় বা কোমরে রূপা বা তামার খোলে পুরে বেঁধে রাখতে হয়। আবার কোনো তাবিজ ধুয়ে সাতদিন বা একুশ দিন পানি খাওয়াতে হয়। কোনো তাবিজ ঘরের ভেতরে বা বাইরে চার কোণায় পুঁতে রাখতে কিংবা বালিশের তুলার ভিতরে ঢুকিয়ে রাখতে হয়। কঠিন রোগ-ব্যাধি নিরাময়ের জন্য অন্যান্য তদবিরের সাথে প্লেট পড়া (চিনামাটির প্লেটে মেশক-জাফরান দিয়ে লেখা বিশেষ কোনো আয়াত বা আয়াতসমূহ) খেতে দেওয়া হয়। এটা কাউকে ৭ দিন, কাউকে ২১ দিন আবার কাউকে বা ৪০ দিন ধুয়ে সেই পানি পান করতে দেওয়া হয়। এমনি বহু সমাধান দেওয়া হয়। এছাড়া তেল পড়া, কাইতন পড়া, পানি পড়া, গুড় বা চিনি পড়া ইত্যাদি তো রয়েছেই। যারা উন্মাদ রোগে ভোগেন তাদের কাউকে দেওয়া হয় লেবু পড়া। এই লেবু মশারির ওপর রোগী বা রোগীর মাথার ওপর ঝুলিয়ে রাখতে হয়।

খ. নজর লাগা বা কু-নজর বা বদনজর

এদের সবকটিরই ফলাফল এক। এক্ষেত্রে ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে কারো বিরুদ্ধে কোনো বিশেষ কিছু করতে হয় না, তাবিজ করতে হয় না। শুধু দৃষ্টি পড়লেই হলো। এক বিশেষ ধরনের বা বিশেষ লক্ষণযুক্ত মানুষের কারো দৃষ্টি নাকি এমনই যে, তাতে সোনাও ছাই হয়ে যায়। এই দৃষ্টি প্রদানের সময় কোনো নিন্দাজ্ঞাপক কথা বলা হয় না বরং প্রশংসাসূচক বাক্য বললেই মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যেমন ধরা যাক, কেউ কারো সন্তানের সুন্দর স্বাস্থ্য দেখে খুব প্রশংসার সাথে বললেন, 'ছেলেটার যা স্বাস্থ্য', 'যা-ই বলুন আর না-ই বলুন, আপনার ক্ষেতের বেগুনগুলো যা হয়েছে না', অথবা কেউ কাউকে পিঠা ভাজতে দেখে বললো, 'আহা! পিঠাগুলি বেশ ফুলেছে' ইত্যাদি। এক্ষেত্রে প্রতিবিধান হিসেবে দেওয়া হয় পানি পড়া, কালিজিরা পড়া, পিঠার গুঁড়িতে ফুঁ দিয়ে আনা ইত্যাদি ব্যবস্থাপত্র। শস্যের ক্ষেত্রে 'পড়া' পানিটা গাছ-গাছড়া বা ফল-ফলাদির ওপর ছিটিয়ে দিতে হয়। অবশ্য গ্রামাঞ্চলের মহিলারা এ ধরনের মন্তব্য প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে মৃদু থুথু ছিটিয়ে তাৎক্ষণিক ক্ষতির প্রভাব থেকে মুক্ত থাকার প্রয়াস পান।

www.pathagar.com

গ. নষ্ট করা

গ্রামাঞ্চলে কি শহরাঞ্চলে এই 'নষ্ট করা' কথাটির অর্থই হচ্ছে কোনো কিছু খাইয়ে, তাবিজ করে বা অন্য কোনো অদৃশ্য উপায়ে কারো ক্ষতি করা, বিভিন্ন জটিল বা কঠিন রোগে ভোগানো, কোনো বিবাহযোগ্য মেয়ের বিয়ে বন্ধ করে রাখা, কারো গর্ভস্থ সন্তান নষ্ট করা, প্রতিহিংসা বা ঈর্ষাবশত কারো সন্তানকে পড়াশোনা কিংবা এ-জাতীয় কোনো কাজে অমনোযোগী করে তোলা, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অমিল বা অশান্তি সৃষ্টি করা ইত্যাদি।

ঘ. বাণটোনা

এর অর্থ হচ্ছে কারো সাথে কারো মারাত্মক শত্রুতা থাকলে তাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া। এখন সমস্যা হচ্ছে, এ ধরনের কাজ করতে গেলে লোকের (ঘাতকের) প্রয়োজন হয়, অস্ত্রের প্রয়োজন হয়, নানা রকম প্রস্তুতি ও সতর্কতা অবলম্বনেরও প্রয়োজন হয়। আর বাণটোনা করলে কী করতে হয়? কোনো প্রস্তুতির প্রয়োজন নেই, পরিকল্পনার কিংবা ওঁত পেতে থাকার প্রয়োজন নেই, বাড়িতে বা তার যাতায়াতের রাস্তায় আক্রমণ করারও প্রয়োজন নেই। একটি বাণ মারতে পারলেই শেষ; একেবারে দাঁড়ানো অবস্থা থেকে শত্রুটি মাটিতে পড়ে যাবে। মুখ দিয়ে রক্ত বা ফেনা বেরোবে, গড়াগড়ি দেওয়ার সময় পাবে না, এমনকি 'মা' বলে 'গো' বলারও সময় পাবে না। এইভাবে হত্যা করার অনেক সুবিধাও আছে। কেউ দেখলো না শুনলো না, কোনো সাক্ষী থাকলো না। হত্যার কোনো সূত্র বা কূল-কিনারা পাওয়া যাবে না। যারা এই 'বাণটোনার' কাজটি করে থাকেন বা এক সময় করতেন বলে শোনা যায়, তারা নাকি অনেক অর্থের বিনিময়েই এই কাজটি করতেন। বর্তমানকালে সন্ত্রাসী ভাড়া করে গুলি বা জবাই করে হত্যার বিষয়টিও একই রকম। এখানে ধরা পড়ার ভয় আছে, পুলিশ রিমান্ডের ভয় আছে, জেলের ভয় আছে, বাণটোনায় এর কোনোটাই নেই। এ সম্পর্কে অনেক সচেতন মানুষের মনে প্রশ্ন ওঠে—আগের দিনে থাকলেও এই প্রক্রিয়ার অস্তিত্ব কি এখন সত্যি আছে? থেকে থাকলে তো রাজনৈতিক কিংবা অন্য কোনো অঙ্গনের অনেক খ্যাতনামা মানুষেরই কোনো অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যেতো না।

ঙ. বশীকরণ

পছন্দের মানুষকে সোজা পথে হোক আর বাঁকা পথেই হোক, নিজের মতো করে পাওয়ার বা আপন করে পাওয়ার ইচ্ছা মানুষের অনেক পুরনো। স্বামী তার স্ত্রীকে কিংবা স্ত্রী তার স্বামীকেও আরো কাছে পাওয়ার ও নিজের মতো করে পরিচালিত করার ইচ্ছাও মানুষের নতুন নয়। যেখানে কথা বা আচার-আচরণ দিয়ে সম্ভব, সেখানে মানুষ তাই চেষ্টা করে। আর যেখানে আচার-আচরণে দেখানো তো দূরের কথা, কথা বলারও সুযোগ নেই, সেখানে মানুষের এই বশীকরণের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে কী?

এই ক্ষেত্রে যিনি অপর কাউকে বশ করার জন্য ইচ্ছা পোষণ করবেন, গুণিন বা ফকির বা দরবেশরা তার কাছ থেকে একটু মোটা অঙ্কের অর্থই দাবি করে থাকেন। নগদ অর্থ ছাড়াও থাকে তদবিরের আনুষঙ্গিক খরচের নামে প্রচুর টাকার দাবি। যেমন, এই কাজের প্রস্তুতির জন্য শ্মশান থেকে কয়লা ও কবরস্থান থেকে কাফনের কাপড়ের

www.pathagar.com

টুকরোর প্রয়োজন। যিনি বশীকরণের কাজটি করাবেন, তার পক্ষে তো এগুলি সংগ্রহ করা অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না। তদবিরকারীর তত্ত্বধানেই এগুলি তৃতীয় কোনো সাহসী লোককে দিয়ে সংগ্রহ করানোর কথা বলা হয় এবং সেই অজুহাতে বেশ অর্থ হাতিয়ে নেওয়া হয়।

বশীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় এসব উপকরণের সাথে আরো যোগ হতে পারে ওই বিশেষ নারী বা পুরুষের মা-বাবার নাম, মাথার চুল, হাত-পায়ের নখ, ব্যবহৃত কাপড়ের টুকরা ইত্যাদি। এসব দিয়ে তাবিজ বা মাদুলি বানিয়ে দেওয়া হয় এবং সেই মাদুলি ইপ্সিত ব্যক্তির ঘরের দরজায় বা যাতায়াতের পথে পুঁতে রাখতে হয়, তাও আবার অমাবস্যার রাতের ঘুঁটঘুঁটে অন্ধকারে। সম্ভব হলে কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিকে মিষ্টান্ন জাতীয় কিছু খাইয়ে দিতে হয়, যা আগেই দোওয়া পড়ে বা মন্ত্রপুত করে রাখা হয়। গুণিন বা খোনকার এটা ভালো করেই জানেন যে, কবরস্থান বা শ্মশানে গিয়ে এসব উপকরণ সংগ্রহের মানসিক শক্তি যদি কারো থাকে, তাহলে সে অন্তত অলৌকিক শক্তির ওপর নির্ভর করে এ পথে পা বাড়াবে না। কাজেই এসব উপকরণ সংগ্রহের দায়িত্ব তাদের নিজেদেরই নিয়ে নিতে হবে, যার বিনিময়ে মোটা অঙ্কের অর্থ দাবি করা যাবে। যাই হোক, বশীকরণের এসব উপকরণ হাতে ধরিয়ে দিয়ে তদবিরকারী ফকির বা গুণিন বা খোনকার বলেন, 'দেখবেন, আপনাকে ছাড়া বাড়িতে একটু ভর্তাও খাবে না সে, এমন মহব্বত পয়দা হয়ে যাবে। এসব করে কতো বিয়ের ব্যবস্থা করে দিলাম, কতো বিয়ের খাওয়া খেলাম। কতো খাসির মাথা আর মাছের মুড়ো যে এই 'প্যাটে' আছে, বুঝলেন?'

এসব ছাড়াও এ অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার জন্য রয়েছে বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণের বিষয়। যেমন চোর ধরা বা কাউকে 'নষ্ট' করার উদ্দেশ্যে মাটিতে পুঁতে রাখা তাবিজ বের করার জন্য রয়েছে বাটি চালান, আয়না পড়া ইত্যাদি।

চ. কোরান চালান দেওয়া

কোনো গোপন বা বিশেষ তথ্য জানার জন্য এটি উত্তম ও সর্বতোভাবে বিশ্বাসযোগ্য একটি ব্যবস্থা। যিনি কোরান চালান দেন তিনি অজু করে পবিত্র হয়ে জায়নামাজে রেহেল-এ করে একখানা কোরআন নিয়ে বসবেন। যাদের মাধ্যমে কোরান শরীফ দেওয়া হবে, অর্থাৎ যাদের এই প্রক্রিয়ার মাধ্যম হিসেবে নির্বাচন করা হবে, তারাও অজু করে পবিত্র হয়ে বসবেন। বলে রাখা প্রয়োজন, এখানে দু'জন মাধ্যমের প্রয়োজন হয়। এই দুই ব্যক্তির সামনে পানিভর্তি একটি পিতলের বদনা রাখা হবে। তারা পরস্পরে মুখোমুখি বসবেন এবং বদনাটির 'কান্দা' বা 'কান্দি' তাদের বুড়ো আঙুলের ওপর স্থাপন করবেন। এরপর বদনাটির ওপর রাখা হবে পবিত্র কোরান। তারপর যে যে বিষয় জানা বা সত্য-মিথ্যা যাচাই করা প্রয়োজন, সে সে বিষয়গুলো বা প্রয়োজনানুযায়ী সেসব ব্যক্তি বা স্থানের নাম কাঁঠালপাতায় লিখে একটি একটি করে কোরানের ওপর রাখতে হবে। সঠিক নাম বা তথ্য কোরানের ওপর রাখা হলে কোরান ডানদিকে ঘুরবে। আর যদি কোরান বামদিকে ঘোরে, তাহলে বুঝতে হবে কোরানের ওপর রাখা কাঁঠালপাতায় লেখা নাম বা স্থান বা তথ্যটি সঠিক নয়।

www.pathagar.com

ছ. লাঠি চালান

এটি কেবল কোনো সন্দেহভাজন ব্যক্তির কোনো কর্মকাণ্ড সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য প্রয়োগ করা হয়। কোনো বিশেষ ঘটনার জন্য দায়ী হতে পারে এমন কয়েকজন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে সামনে রেখে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। দোওয়া পড়ে লাঠিতে ফুঁ দিয়ে অথবা লাঠিটি মন্ত্রপূত করে সেটি একজন তুলারাশির জাতককে মাটিতে চেপে ধরতে হয়। জমায়েত হওয়া সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের মধ্যে যদি প্রকৃত অপরাধী থেকে থাকে, তাহলে ঐ ব্যক্তিসহ লাঠিটি ছুটে গিয়ে তার দেহে উপর্যুপরি আঘাত করতে থাকবে। এভাবে প্রকৃত অপরাধীকে সনাক্ত করার জন্য চেষ্টা করা হয়ে থাকে কখনো কখনো।

জ. জুতা চালান

প্রকৃত অপরাধীকে সনাক্ত ও অপমানিত করার জন্য এটি একটি পদ্ধতি। একটি চটি জুতাকে মন্ত্রপূত করে একজন তুলারাশির জাতককে দিয়ে চালান দেওয়া হয়। জাতককে টেনে নিয়ে যায় মন্ত্রপূত জুতা। অবশেষে প্রকৃত অপরাধীর সন্ধান পেলে তার গায়ে আঘাত করতে থাকে।

ঞ. জ্বীন টানা

অনেকে জ্বীন 'হাসিল' করতে পারেন—এমন কথা প্রায়ই শোনা যায়। এই 'হাসিল' করা জ্বীন তাদের কর্তৃত্বে থাকে। জ্বীন তাদের কথার অবাধ্য হয় না এবং জ্বীন হাসিল করা ব্যক্তির অনুরোধে বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে সে সাহায্য করে থাকে।

নানা রোগ-ব্যাধি নির্ণয় ও নিরাময়, পারিবারিক ও সামাজিক অশান্তি থেকে মুক্তি এবং অশুভ শক্তির হাত থেকে নিরাপদ থাকার লক্ষ্যে জ্বীনের দেওয়া সমাধানের পরামর্শ শোনা এবং তা গ্রহণের জন্য আমাদের এখানে 'জ্বীন' আনার প্রচলন রয়েছে। যতদূর জানা যায়, যারা জ্বীন আনেন, তারা নাকি বিভিন্ন 'সাধনার বলে' জ্বীনকে আনার ক্ষমতা লাভ করেন এবং তার সাথে 'বৈঠক' দিয়ে মানুষের নানাবিধ জ্ঞাত ও অজ্ঞাত সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেন।

জ্বীনের সাথে 'বৈঠক' দেওয়ার অনেক শর্ত রয়েছে। এর মধ্যে প্রধান বিষয় হলো, জ্বীন আনতে হলে গভীর ও অন্ধকার রাতে আনতে হবে, কারণ তারা (জ্বীনরা) রাত ছাড়া আসেন না। দ্বিতীয়ত, ঘরটাকে পুরোপুরি অন্ধকারাচ্ছন্ন রাখতে হবে। কেউ বাতি তো দূরের কথা, একটি দেওয়াশলাইয়ের কাঠিও জ্বালাতে পারবে না এবং তৃতীয়ত, জ্বীনকে বেশি প্রশ্ন করে তার বিরক্তি উৎপাদন করা যাবে না।

জ্বীনরা বিভিন্ন সমস্যার জন্য তাবিজ, পানি পড়া, রসগোল্লা পড়া, কালিজিরা পড়া ইত্যাদি দিয়ে থাকেন। তবে এগুলি জ্বীন নিজ হাতে দেন না, যিনি জ্বীন আনেন, তার মাধ্যমেই দেওয়া হয়ে থাকে।

চ. ভূত-প্রেত তাড়ানো

এ বিষয়টি সম্ভবত বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায় লক্ষ্য করা যাবে। তবে ভূত-প্রেত তাড়ানোর পদ্ধতি বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন রকম হতে পারে। একটি ক্ষেত্রে সম্ভবত সর্বত্রই

www.pathagar.com

এক রকম ব্যবস্থা, আর তা হলো যাকে ভূতে বা জ্বীনে ধরেছে, বা 'আসর' করেছে, তার ওপর শারীরিক নির্যাতন করার মাধ্যমে ভূত তাড়ানো। সাধারণত ধূপ-ধুনা জ্বালিয়ে একটা ধোঁয়াচ্ছন্ন পরিবেশ তৈরি করে 'ঠুণ্ডা কাইছা' (বাড়ির পেছনের নোংরা জায়গা ঝাড়ু দেওয়ার ঝাঁটা), তেঁতুলের ডালা, কাউফলার ডাটা দিয়ে এই নির্যাতন চালানো হয়। কখনো কখনো তার গলায় ছেঁড়া জুতার মালাও পরিয়ে দেওয়া হয়।

ছ. ঘর-বাড়ি বন্ধ করা

ঘর-বাড়িতে নানা ধরনের অশরীরী ও অশুভ শক্তির উপদ্রব হতে পারে—এমন ধারণায় বাড়ির সদস্যদের সবরকম বিপদ থেকে মুক্ত ও নিরাপদ রাখার জন্য ঘর-বাড়ি 'বন্ধ' করা হয়। এ সময়ে ঘর-বাড়ির তিনটি কোণে গুণিন বা খোনকার দোওয়া বা মন্ত্র পড়েন, তিনজন হাতে তিনটি করে তালি দেন এবং আজান দেন, একটি কোণে একটি তাবিজ কিংবা দোওয়া পড়া বা মন্ত্রপড়া লোহা মাটিতে পুঁতে রাখেন। এর ফলে বাড়ির সদস্যরা নানা রোগ-ব্যাধি, চোর, অশরীরী শক্তি ইত্যাদির উপদ্রব থেকে নিরাপদ থাকে।

লোকবিশ্বাস

১. খাই-দাই[১] পরের দুয়ারে কুলি হালান[২] অ-লক্ষ্মীর লক্ষণ।
২. উদাম রাহোইন্যা কোনো খাওন খাইতো অয় না। উদাম খাওনের উরপে[৩] শয়তানে মুতি[৪] দ্যায়।
৩. বিয়ার সুম গাও হলুদ দেওনের পরে একলা বাইরে গেলে জ্বীনে-বুতে দরে।
৪. গর্বইত্যা মাইয়ালোকে গজার মাছ খাইলে হ্যারে বুত-জ্বীনে 'আসর' করে।
৫. ব্যাডা মাইনষে মুরকার[৫] কইলজা খাইলে হের সাহস কইম্যা যায়।
৬. গরু যদি ছাগলের শইল্যে চাডা[৬] দেয়, হেইলে হেই বচ্ছর দ্যাশে খুব জগড়া-কাইজ্যা লাইগ্যা থাহে।
৭. রাস্তা-গাডে এ্যাকটা হালিক[৭] দেইকলে বিপদ আওনের লক্ষণ। জোড়া হালিক দ্যাহন বালা।
৮. রাইতদুরপে[৮] ভুতুম পইকের[৯] ডাক হোনলে[১০] খারাপ খবর আওনের লক্ষণ।
৯. কোরআনে বিষ লাইগলে গরুর চোনা দিলে বিষ নষ্ট অই যায়।
১০. বিলাই মাইরলে বিলাইয়ের ওজনের হমান চাউল আল্লাহর ওয়াস্তে দিয়া দিতো অয়।
১১. চাউল চিবাইলে মোহে আচিল অয়।
১২. গরের দুয়ারে বওন ঠিক না। বইলে গরে লক্ষ্মী ডোকে না।
১৩. বাত খাইতে বই বেশি কতা কইলে আদ-কপালি মাতা দরা রোগ অয়।
১৪. কোনো জাগা ফাডি[১১] গেলে ক্যালা গাছের ডাইগ্যা[১২] কাডি[১৩] রস দিলে বালা অই যায়।
১৫. আবিয়াত্যা পুরুষ মাইনষের নাকে ফোডা-ফোডা[১৪] গাম[১৫] অইলে হেয়ার বউ সোন্দর অয়।
১৬. ঠোটের উরপে তিল থাইকলে হে বিষণ কামুক অয়।

www.pathagar.com

১৭. ক্যাও যদি পাতে ভাত থুই[১৬] উডি যায়, তাইলে হেই ভাতে শয়তানে মুতি দ্যায়।
১৮. পাইল্লা[১৭] মোছা বাত বা তরকারি খাইলে হের মাইয়্যা অয়।
১৯. কুত্তায় রসিগরের[১৮] বেড়া বাঙ্গি[১৯] বিতরে ডুইকলে ঐ সংসারের বরকত কমি যায়।
২০. গন্দ-বাদালির পাতার ভর্তা খাইলে গর্বইত্যা মাইয়ালোকের আতে-পায়ের পানি নাইম্যা যায়।
২১. মাইয়ালোকের পোলাইন অওনের সুম ক্যাও কাপড়ে গিট দিলে পোলাইন অইতে খুব কষ্ট অয়।
২২. পুগুইরে গোসল করি ভিজা কাপড় পরি বাড়িত ডুইকলে ঐ বাড়িত কলেরা-বসন্ত অয়।
২৩. আতের মইদ্যে চুন লই মাতা খাউজ্যাইলে[২০] মাথাত উন[২১] অয়।
২৪. বিজা কাপড় রইদে হুগাইতে[২২] দি সুরুজ ডোবনের আগে ঘরে লই আইতো অয়। নইলে হেই কাপড়ের ভাঁজে ভাঁজে 'খারাপ' জিনিস ডোহে।
২৫. পাইত্যাইলের[২৩] মাংস খাইলে বাত-বেদনা সারি যায়।
২৬. গরের পিড়ার মইদ্যে দাও দার[২৪] দিলে বহুত দার-দেনা অয়।
২৭. কোনো জিনিস আড়াইয়া গ্যালে 'হাজী নূন-চাউল দিমু', 'হাজী নূন-চাউল দিমু' কইতে থাকলে আড়াইন্যা জিনিস পাওন যায়।
২৮. রাইতদুরপে কুত্তায় খেউয়্যাইলে বিপদ আইতো পারে।
২৯. কাউয়ায় করুণ স্বরে কানলে খারাপ খবর আওনের সম্বাবনা থাহে।
৩০. ব্যারণ গাছের কষের লগে লবণ মিয়াইয়া দাতো দিলে দাত ব্যতা বালা অইয়া যায়।
৩১. কোনো আনে যাওনের সুম উস্টা[২৫] খাইলে পতে বিপদ অইতো পারে।

আঞ্চলিক শব্দের সমার্থক শব্দ : ১. খাওয়া-দাওয়া সেরে, ২. ফেলা, ৩. ওপরে, ৪. প্রস্রাব করা, ৫. মোরগের, ৬. জিহ্বা দিয়ে লেহন করা, ৭. শালিক, ৮. গভীর রাতে, ৯. পাখির, ১০. শুনলে, ১১. ফেটে, ১২. ডাটা, ১৩. কেটে, ১৪. ফোঁটা ফোঁটা, ১৫. ঘাম, ১৬. রেখে, ১৭. পাতিল, ১৮. রান্নাঘর, ১৯. ভেঙে, ২০. চুলকালে, ২১. উকুন, ২২. শুকাতে, ২৩. পাতি শিয়ালের, ২৪. দা ধার দেওয়া, ও ২৫. হোঁচট।

তথ্যসূত্র

১. আবদুর রহমান, পিতা : প্রয়াত এ কে এম ইউসুফ, মাতা : প্রয়াত জোলেখা খাতুন, বয়স : ৬৮ বছর, পেশা : ব্যবসা, ঠিকানা : গ্রাম : বাপ্তা, ডাকঘর : বাপ্তা, উপজেলা : ভোলা সদর
২. মাহমুদা খাতুন, পিতা : প্রয়াত আবদুল লতিফ, মাতা : প্রয়াত জরিনা খাতুন, বয়স : ৭২ বছর, পেশা : গৃহিণী, ঠিকানা : গ্রাম ও ডাকঘর : বাপ্তা, উপজেলা : ভোলা সদর
৩. মোমেনা খাতুন, স্বামী : প্রয়াত আবদুল মালেক, বয়স : ৭৩ বছর, পেশা : গৃহিণী, ঠিকানা : গ্রাম : বাপ্তা, ডাকঘর : ভোলা, উপজেলা : ভোলা সদর, মোহাম্মদ মোতাসিম বিল্লাহ্‌, পিতা : প্রয়াত জাফর আলী, বয়স : ৬৩ বছর, শিক্ষা : বিএ, পেশা : ব্যবসা, ঠিকানা : ডাকঘর : চরনোয়াবাদ, উপজেলা : ভোলা

www.pathagar.com

৫. মোহাম্মদ আবদুল্লাহ, পিতা : মোহাম্মদ ইছহাক, মাতা : প্রয়াত সুফিয়া বেগম, শিক্ষা : ফাজিল, বয়স : ৪০ বছর, পেশা : ব্যবসা, ঠিকানা : গ্রাম : ৭নং ওয়ার্ড, দৌলতখান পৌরসভা, ডাকঘর : দৌলতখান, উপজেলা : দৌলতখান
৬. শফিকুল মাওলা ফারুক (শ.ম.ফারুক), পিতা : প্রয়াত সিকান্দার আহমদ, মাতা : ফিরোজা বেগম, শিক্ষা : বি.এ (অনার্স), এম.এ, বয়স : ৫১ বছর, পেশা : অধ্যাপনা, সাংবাদিকতা, ঠিকানা : গ্রাম : চরখলিফা, ডাকঘর : দিদারুল্লা, উপজেলা : দৌলতখান
৭. মোশারেফ হোসেন হাওলাদার, পিতা : প্রয়াত আবদুর রাজ্জাক হাওলাদার, মাতা : প্রয়াত সবুরা খাতুন, বয়স : ৬৭ বছর, পেশা : অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ঠিকানা : গ্রাম : পক্ষীয়া, ডাকঘর : বোরহানগঞ্জ, উপজেলা : বোরহানউদ্দিন
৮. শান্তি দেবনাথ, স্বামী : প্রয়াত ননীগোপাল দেবনাথ, বয়স : ৮২ বছর, পেশা : গৃহিণী, ঠিকানা : গ্রাম : হাসাননগর, ডাকঘর : মৃজাকালু, উপজেলা : বোরহানউদ্দিন
৯. তনুজা জাহান, স্বামী : নজরুল ইসলাম, শিক্ষা : এসএসসি, বয়স : ২৭ বছর, পেশা : গৃহিণী, ঠিকানা : গ্রাম : পক্ষীয়া, ডাকঘর : বোরহানগঘঞ্জ, উপজেলা : বোরহানউদ্দিন
১০. কার্তিক দেবনাথ, পিতা : ননীগোপাল দেবনাথ, মাতা : শান্তি দেবনাথ, শিক্ষা : ডি.ইউ.এমএস, বয়স : ৬১ বছর, পেশা : ব্যবসা, ঠিকানা : গ্রাম : হাসাননগর, ডাকঘর : মৃজাকালু, উপজেলা : বোরহানউদ্দিন
১১. মোঃ অজিউল্লাহ মিয়া, পিতা : প্রয়াত আবদুর রহমান মিয়া, মাতা : প্রয়াত তহুরা খাতুন, বয়স : ৭১ বছর, পেশা : ব্যবসা, ঠিকানা : গ্রাম : ধলিগৌরনগর, ডাকঘর : সিরাজিয়া মাদ্রাসা, পজেলা : লালমোহন
১২. সালেহা খাতুন (পারুল), স্বামী : মোঃ অজিউল্লাহ মিয়া, শিক্ষা : বি. এ., বয়স : ৫৭ বছর, পেশা : গৃহিণী, ঠিকানা : গ্রাম : ধলিগৌরনগর, ডাকঘর : সিরাজিয়া মাদ্রাসা, উপজেলা : লালমোহন
১৩. কাজী মোহাম্মদ রাশেদ, পিতা : প্রয়াত মোহাম্মদ আলী, মাতা : জাকিয়া বেগম, বয়স : ৪০ বছর, পেশা : ব্যবসা, ঠিকানা : গ্রাম : দক্ষিণ ফ্যাশন, ডাকঘর ও উপজেলা : চরফ্যাশন
১৪. মোঃ আলমগীর হোসেন, পিতা : মোহাম্মদ নূর হাফেজ মিয়া, মাতা : হাসিনা বেগম, শিক্ষা : বিএ (অনার্স) এম.এ, পেশা : শিক্ষকতা, বয়স : ৩৩ বছর, ঠিকানা : গ্রাম : চর ফৈজুদ্দিন, ডাকঘর : হাজীরহাট, উপজেলা : মনপুরা

www.pathagar.com

লোক প্রযুক্তি

ভোলা সদর উপজেলা

মাছ ধরার জাল ও অন্যান্য প্রযুক্তি

ছোট ও বড় বিভিন্ন আকারের মাছ ধরার জন্য এ অঞ্চলে নানা ধরনের জাল ব্যবহার করা হয়ে থাকে। পুকুরে, খালে, বিলে, দিঘিতে, নদীর কিনারে ও গভীর নদীর পানিতে ভিন্ন ধরনের জাল দিয়ে মাছ ধরা হয়ে থাকে। কয়েকটি জালের বিবরণ দেওয়া হলো :

১. 'জাই জাল' বা ঝাঁকি জাল : এ অঞ্চলে ব্যবহৃত জালগুলির মধ্যে এটি সর্বাধিক জনপ্রিয় ও বহুল ব্যবহৃত। এই জাল আবার দু'রকমের হয়ে থাকে : গুঁড়া জাল ও পাতলা জাল। গুঁড়া জালের খোপগুলো খুব ছোট ছোট ও চিকন সুতা দিয়ে বুনা হয়ে থাকে। এই জাল দৈর্ঘ্যে সাধারণত চার-পাঁচ হাত হয়ে থাকে। এটি বুনতে সময় বেশি লাগে। কারণ এর খোপগুলি খুব ছোট হয়ে থাকে। ছোট মাছ ধরার জন্য এই জাল ব্যবহার করা হয়।

পাতলা জালের খোপগুলো বড় বড় হয়ে থাকে। রুই, কাতলা জাতীয় বড় মাছ ধরার জন্য এই জাল ব্যবহার করা হয়। এই জাল ৫ থেকে ৭/৮ হাত লম্বা হয়ে থাকে। এটি বুনতে সময় কম লাগে। উভয় ধরনের জালের নীচে ছিদ্রযুক্ত লোহার গুটি ব্যবহার করতে হয়, যাতে মারার সঙ্গে সঙ্গে জালটি মাটি স্পর্শ করে মাছগুলো আটকে ফেলতে পারে।

জাল সবসময় ওপর থেকে বুনতে হয়। ওপরে ৩১ ঘর থেকে বুনা শুরু করে ক্রমশ 'জিউনি' দিয়ে (পরবর্তী ঘর থেকে একঘর করে বাড়িয়ে বুনে তার পরবর্তী ঘরে যাওয়ার নাম 'জিউনি') বুনতে হয়। এভাবে প্রত্যেক বার একঘর করে বেড়ে জালের শেষ প্রান্ত চওড়া হয়ে যায়।

এই জালের সাথে বেশ কয়েক হাত লম্বা মোটা রশি থাকে। এর এক প্রান্ত জালের কেন্দ্রস্থলে আটকানো থাকে, অন্য প্রান্ত শিকারির বাম হাতের কব্জি বা চার আঙ্গুলে বাঁধা থাকে। জাল মারার একটু পর শিকারি ধীরে ধীরে জালটি তীরের দিকে টানতে থাকে। এ সময় বিভিন্ন প্রকার মাছ বেরোতে গিয়ে জালের সাথে আটকা পড়ে যায় এবং জালের সাথে পাড়ের দিকে আসতে থাকে।

১. ধর্মজাল

এ জাল চারকোণা। চারটি 'বাঁশের টুকরো দিয়ে আড়াআড়িভাবে একটি কাঠামো তৈরি করে জালের চারটি কোণ এই কাঠামোর কোণে বেঁধে দেওয়া হয়। এরপর অন্য একটি বাঁশের সাহায্যে জালটিকে পানিতে ফেলা হয় এবং পানি থেকে টেনে তোলা হয়। সাধারণত খাল পাড়ে একটি মাচা তৈরি করে জালটি স্থায়ীভাবে বসানো হয়। জোয়ার-ভাটার স্রোতের সময় এই জাল ফেলা হয়। অন্যসময় এটি ওপরে বেঁধে রাখা হয়।

www.pathagar.com

২. লোতর জাল

এর ধরন অনেকটা ঝাঁকি জালের মতো। তবে এই জাল ঝাঁকি জালের মতো ওপর থেকে ছুঁড়ে দিয়ে মারা যায় না, কয়েকজনে মিলে টানতে হয়। টানতে টানতে পাড়ে গিয়ে মাছের ওপর ছেড়ে দিয়ে আটকানো রশি দিয়ে টানা লাগে। এই জালে প্রায় দেড় থেকে দুই মন ছিদ্রযুক্ত মাটির গুটি থাকে। গুটিগুলি আগুনে পুড়িয়ে নিয়ে জালের সাথে বেঁধে দিতে হয়। এটি বড় খালে মাছ ধরার জাল।

৩. ঠেলা জাল

জালটি ত্রিভুজাকৃতির। তিন-কোণাবিশিষ্ট একটি বাঁশের কাঠামো তৈরি করে জালের তিনটি কোণ তিন মাথায় আটকে দেওয়া হয়। তারপর ঠেলে এই জাল দিয়ে মাছ ধরতে হয়।

৪. পিছা জাল

এটিও ত্রিকোণাকৃতির জাল। এর দু'পাশে দুটি বড় বাঁশ থাকে, সামনে কাঠ বা বাঁশের পরিবর্তে মোটা রশি থাকে। বাঁশ দুটোর মাথা যাতে মাটিতে আটকে না যায় সেজন্য নারিকেলের আঁচার (মালার) অর্ধেকটা বাঁশের মাথায় আটকে দেওয়া হয়।

৫. খুঁচি জাল

এটি ত্রিকোণবিশিষ্ট জাল। এর দু'পাশে দুটি ছোট ছোট বাঁশের দণ্ড থাকে। সামনের অংশে মোটামুটি সাধারণ আকারের একটি কাঠ আটকানো থাকে। ছোট জঙ্গলের পানির মধ্যে 'খেও' দিয়ে মাছ ধরে আনার জন্য এই জাল ব্যবহার করা হয়।

৬. হোলি জাল বা বিন্নি জাল

জালটির ওপরের দিক প্রশস্ত ও নীচের দিক চিকন। জালের সামনের দিক ২৫.৩০ হাত চওড়া এবং জালটি প্রায় ৬০/৭০ হাত লম্বা হয়ে থাকে। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে এই জাল দিয়ে খালের মুখ আটকে দেওয়া হয়। তারপর পাকা বাঁশের কঞ্চি কেটে টোনা করে পলো বানিয়ে চেপে চেপে মাছ ধরা হয়।

৭. খোট জাল

এটি মূলত ইলিশ মাছ ধরার জাল। ছোট নৌকা থেকে এই জাল ফেলা হয়। জালের আওতায় মাছ এসে খোট দিলে জালটি টেনে তোলা হয়।

৮. মইজাল

জালটির এক প্রান্তে বাঁশ থাকে। অপর প্রান্তে দশ-পনেরোটি পকেট থাকে। যে পাশে বাঁশটি থাকে, সেদিকটায় ওজন বেঁধে দেওয়া হয়, যাতে বাঁশটি উঁচুতে উঠে না যায়। জাল টান দিলে জালের পকেটগুলো মাটির সাথে জড়িয়ে জড়িয়ে চলে আসে এবং সেগুলোর মধ্যে মাছ ঢুকে যায়।

৯. ছান্দি সাবার জাল বা ইলিশ জাল

এ জালগুলো চুঙার সাথে লাগানো থাকে। মাটির চাকতি বানিয়ে পুড়িয়ে জালের নীচের অংশে আটকানো হয়, যাতে জাল ভেসে না উঠে। দ্রুতগতিসম্পন্ন ইলিশ মাছ চলাচলের

www.pathagar.com

পথে এই জালে আটকা পড়ে। চাকতিগুলোর ওজন আধা-কেজি এক কেজি হয়ে থাকে। ২/৩ হাত পরপর এই চাকতিগুলো লাগানো হয়। জালের নীচের অংশের এক মাথা থেকে আরেক মাথা মোটা রশি দিয়ে আটকানো থাকে।

১০. বড় সাবার জাল (বেড় জাল)

এই জাল প্রায় দেড়-দুই কিলোমিটার লম্বা হয়। জাল বহন করার জন্য পাশাপাশি অনেক নৌকার প্রয়োজন হয়। নদীর পানির গভীরতা অনুযায়ী জালের বহর ঠিক করা হয়। জালগুলি খণ্ড খণ্ড ভাবে তৈরি করা হয়। একটার পর একটা নৌকায় জালগুলো বহন করা হয়। জোয়ারের সময় এক নৌকা থেকে জাল ছাড়া শুরু হয় এবং ঘটনাস্থলেই পরবর্তী জাল-খণ্ডটির সাথে রশি দিয়ে জোড়া দেওয়া হয়। তারপর বেড় দিতে দিতে যেখান থেকে জাল ফেলা শুরু হয় সেখানে এসে শেষ করা হয়। এভাবে প্রায় দেড়-দুই কিলোমিটারব্যাপী জাল ফেলা হয়। তারপর জাল টেনে মাছ তোলা হয়। আগে অনেক সময় এসব জালে এতো মাছ আটকাতো যে, মাছের ওজনে জাল ছিঁড়ে যাওয়ার উপক্রম হতো। তখন জালের জোড়া দেওয়া অংশ কেটে দেওয়া হতো।

১১. কইয়া জাল

অনেকটা ইলিশ মাছ ধরার জালের মতো। কিছু পরপর চোঙা বেঁধে দেওয়া হয়। একে ফাঁস জালও বলা হয়ে থাকে।

১২. আনতা

এটি বাঁশ কেটে চিকন করে বানানো হয়। এর ভেতরে মাছ ঢোকার জন্য ছোট-বড় বিভিন্ন মাপের দু-তিনটি মুখ থাকে। এই মুখ দিয়ে মাছ একবার ঢুকলে আর বের হতে পারে না। জোয়ার-ভাঁটার সময় পানির স্রোতের মুখে এটি বেঁধে রাখা হয়।

১৩. গরা

সুপারি গাছ বা বাঁশের শলাকা চিকন করে কেটে চিকন বেত দিয়ে বেঁধে খালের মধ্যে মাছ চলাচলের পথে পুঁতে রাখা হয়। এর নীচের দিকটা ফাঁকা রাখা হয়। ওখান দিয়ে মাছ একবার ঢুকলে আর বেরোতে পারে না।

১৪. কোচ

ছাতির শলাকার মতো সূচালো অগ্রভাগসম্পন্ন কয়েকটি লোহার শলাকা বাঁশের মাথায় আটকানো থাকে। এটা দিয়ে কোপ মেরে মাছ ধরা হয়।

১৫. ছাবি

চার-কোণবিশিষ্ট পুরনো বা ব্যবহৃত কাপড়ের টুকরাকে আড়াআড়িভাবে দুটি বাঁশের কঞ্চির সাথে বেঁধে এটি তৈরি করা হয়। ধানের কুঁড়া বা অন্য কোনো খাদ্য ছাবির ঠিক মাঝখানে রেখে খুব ধীরে ধীরে পানিতে ডোবানো হয়। এই খাবারের লোভে বিভিন্ন জাতের ছোট মাছ ছাবির মধ্যে এসে ভিড় জমায়। এসময় খুব সন্তর্পণে ছাবিটা ওপরের দিকে তুললে ছোট ছোট মাছ ধরা পড়ে। এই ছাবি নিয়ে লোকসমাজে একটি প্রবাদ প্রচলিত রয়েছে এ অঞ্চলে। দুস্থ গরিব ঘরের সন্তান তার সামর্থ্যের বাইরে বাবুয়ানা করলে বলা হয়, 'মায় পরে ছাবির ত্যানা, পুতে করে বাবুয়ানা।'

www.pathagar.com

১৬. খলুই
আগে এটি মাছের বাজার করার ব্যাগের পরিবর্তে মাছ কিনে আনার জন্য ব্যবহৃত হতো। তবে এই খলুই সাধারণত জাল দিয়ে মাছ ধরার পর সেগুলোকে তুলে রাখার কাজে ব্যবহার করা হয়। এটি বাঁশের চিকন পাতের তৈরি ও বেত দিয়ে বাঁধা হয়।

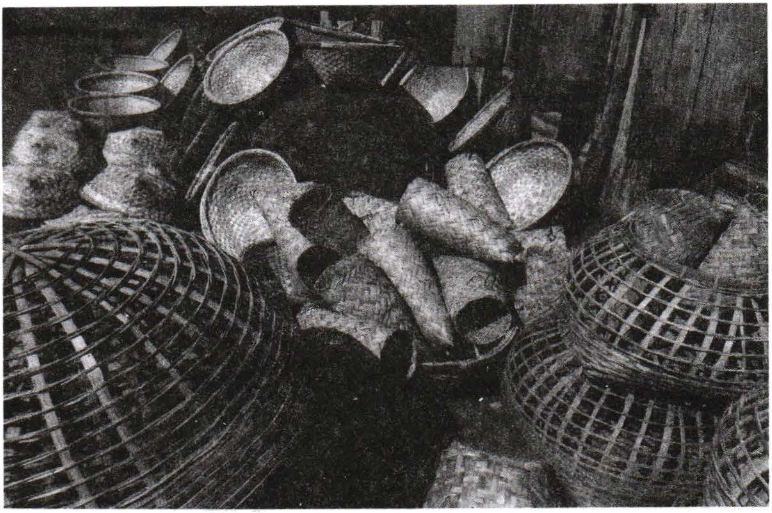

বাঁশ বেতের তৈরি বিভিন্ন দ্রব্য

১৭. টবগি
একটি ঝুনা নারিকেলের ‘আঁচা'র (মালা) অর্ধাংশের অগ্রভাগের সামান্য নীচে লোহার শলাকা আগুনে পুড়িয়ে দুটো ছিদ্র করা হয়। তারপর আড়াআড়িভাবে সুপারি গাছের মসৃণ একটি শলাকা ঢুকিয়ে দিয়ে এটি তৈরি করা হয়। এটি দৈর্ঘ্যে এক থেকে দেড় ফুট হতে পারে। চুলায় ফুটন্ত ডাল, চাউল ফিরনি বা অন্য কোনো তরল খাবার ওলট-পালট করে দিতে এটি ব্যবহার করা হয়।

১৮. তালাশি
এটি দেখতে ধাতব পদার্থের তৈরি খুন্তির মতো। সুপারি গাছের দেড় থেকে দুই ফুট লম্বা ও এক থেকে দুই ইঞ্চি প্রশস্ত একটি টুকরা দিয়ে এটা তৈরি করা হয়। তালাশির অগ্রভাগের তিন-চার ইঞ্চি জায়গা চ্যাপ্টা থাকে এবং নীচের দিকের বাকি অংশটা অপেক্ষাকৃত চিকন ও মসৃণ থাকে। তালাশি প্রধানত পাতিলের ভেতরের রান্নার উপকরণসমূহ নাড়ানাড়ি করার কাজে ব্যবহৃত হয়।

১৯. বারুনি
নারিকেলের আচার (মালার) অর্ধাংশ নিয়ে দুই প্রান্তে দুটি ছিদ্র করা হয়। এই ছিদ্র দিয়ে সুপারি গাছের একটি কোটা ও মসৃণ শলাকা লম্বালম্বিভাবে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। এই

www.pathagar.com

শলাকা দৈর্ঘ্যে দেড় থেকে দুই ফুট লম্বা হয়। বারুনি প্রধানত চুলার ভেতরের কয়লা বা ছাই বাইরে তুলে আনার কাজে ব্যবহার করা হয়। টবগি এবং তালাশির আকৃতি ও গঠন অনেকটা একই রকম। তবে টবগির আঁচা (মালাগুলো) খুব মসৃণ থাকে আর বারুনির গুলি অমসৃণ থাকে।

২০. দেউরকা

চেরাগ বা প্রদীপ রাখার জন্য এক ফুট দৈর্ঘ্যের একটি কাঠের টুকরা গোলাকার করে এটি তৈরি করা হয়। এর নীচের অংশ বা তলদেশ উপরের দিকের চেয়ে কিছুটা চ্যাপ্টা। আর চেরাগ রাখার মাথাটিও একটু চ্যাপ্টা রাখা হয় এবং এর বিভিন্ন স্থানে খাঁজ কেটে সামান্য নকশা করা হয়।

২১. কাইছা বা পিছা

ঘরের মেঝে, সিঁড়ি এবং ঘরের বাইরে উঠান ও ঘরের আশপাশ ঝাড়ু দেওয়ার জন্য নারিকেল পাতার শলা দিয়ে 'পিছা' বা ঝাড়ু তৈরি করা হয়। অনেক সময় খেজুরের পাতাও ব্যবহার করা হয়। এছাড়া 'ফুল ঝাড়ু' নামে এক প্রকার ঝাড়ু ঘর পরিষ্কার করার কাজে ব্যবহার করা হয়। তবে এটাকে 'পিছা' বলা হয় না। নারিকেলের পাতার শলা দিয়ে তৈরি ঝাড়ু অনেকদিন ব্যবহারের পর শলার মাথাগুলো ক্ষয় হয়ে অথবা ছিঁড়ে ছোটো হয়ে এলে তা দিয়ে বাড়ির আশপাশের ও ঘরের পেছনে জমে স্তূপ হয়ে থাকা ময়লা পরিষ্কার করার কাজে ব্যবহার করা হয়। তখন এটাকে বলা হয় 'ঠুণ্ডা কাইছা'। এই পিছা হচ্ছে সবচেয়ে নিকৃষ্টতম পিছা। কাউকে চরমভাবে অপমান কিংবা শাস্তি দিতে হলে বলা হয়, 'তোরে ঠুণ্ডা কাইছা দিয়ে পেটানো দরকার।' এই পিছা ঘরের সামনে গাছের সঙ্গে বা কোথাও ঝুলিয়ে রাখলে 'বদনজর', কুদৃষ্টি বা ভূত-প্রেতের অনুপ্রবেশ থেকে রক্ষা পাওয়া যায় বলে লোকবিশ্বাস প্রচলিত রয়েছে। আবার কোনো স্থানে যাত্রার সময় পিছার সাথে পা লাগলে তা অমঙ্গলজনক বলে বিশ্বাস।

২২. পিঁড়া বা পিঁড়ি

তিন টুকরা কাঠ দিয়ে পিঁড়া তৈরি করা হয়ে থাকে। দু পাশে দেড়-দুই ইঞ্চি উঁচু খাড়া করে রাখা দুটি কাঠের টুকরার ওপর ৬-৭ ইঞ্চি চওড়া একটি কাঠের ছাউনি পেরেক দিয়ে আটকিয়ে দিয়ে পিঁড়া তৈরি করা হয়। গ্রামীণ সমাজে বসার জন্য, বিশেষকরে রান্নাঘরে তরকারি কাটা, চুলায় জ্বাল দেওয়া ইত্যাদি কাজে এখনও পিঁড়ার বহুল প্রচলন রয়েছে। এছাড়া কাউকে বসতে দেওয়ার জন্যও পিঁড়া ব্যবহার করা হয়ে থাকে। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বর ও কনের গায়ে হলুদ ও বিয়েতে বিভিন্ন নকশা অঙ্কিত পিঁড়ার বিশেষ ব্যবহার হয়ে থাকে।

২৩. ছিক্কা বা শিঁকা

পাট বা নারিকেলের ছোবড়া থেকে তৈরি দড়ি দিয়ে ছিক্কা বা শিঁকা তৈরি করা হয়। এটি রান্নাঘরে রাখা খাবার-দাবার বিড়ালের হাত থেকে নিরাপদ রাখা এবং কিছু বাসনকোসন রাখার জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এই শিঁকার বুননরীতি অনেক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হতে দেখা যায়। পাট বা নারিকেলের দড়ি দিয়ে চুলের বিনুনির মতো পাকিয়ে সেগুলো নিখুঁতভাবে জোড়া দিয়ে শিঁকা তৈরিতে গ্রামের মহিলাদের জুড়ি নেই।

www.pathagar.com

২৪. চালুইন বা চালনি

বাঁশের পাতলা পাত দিয়ে বুনা হয়। একটু পরপর চার-কোণাকৃতির ছোট ঘর থাকে এবং পাশে বেত দিয়ে বাঁধা হয়। এটি গোলাকার হয়ে থাকে। সাধারণত বড়-ছোট মেশানো কোনো কিছু থেকে পরস্পর পৃথক করার জন্য চালুনি দিয়ে চালা হয়ে থাকে। অনেক সময় শাকপাতা থেকে বালু জাতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা পরিষ্কার করার কাজেও চালুনি ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

২৫. মাথাল

তালপাতা বা গোলপাতা দিয়ে তৈরি করা হয়। ওপরের অংশটি টুপির মতো করে তৈরি করা হয়, যা রোদ-বৃষ্টি থেকে মাথাকে রক্ষা করে। এটি সাধারণত মাঠে-ক্ষেতে কৃষকেরা ব্যবহার করে।

২৬. জোংলা বা জোংরা

এটিও তালপাতা বা গোলপাতা দিয়ে বানানো হয়ে থাকে, কখনো কখনো হোগলা পাতাও ব্যবহার করা হয়। এটি মাথার ওপর থেকে কোমর বা কোমরের নিচ পর্যন্ত লম্বা হয়। বৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষার জন্যই কৃষকেরা এটি মাঠে ব্যবহার করে থাকেন।

২৭. লাঙ্গল-যোয়াল

প্রাচীনকাল থেকে ব্যবহৃত কৃষিযন্ত্র। এই যন্ত্রটির একদিকে থাকে ভারী লোহার সূচালো ফলা, অন্যদিকে থাকে পুরু কাঠ, যা মুঠির মধ্যে ধরা যায়। এর মাঝামাঝি স্থান থেকে একটি কাঠের টুকরা গরু বা মহিষের কাঁধের ওপরে রাখা যোয়াল বা বাঁকানো কাঠটির সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়। আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতিতে ট্রাক্টর ও পাওয়ার টিলারের ব্যবহার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী এই কৃষিযন্ত্র বর্তমানে প্রায় বিলুপ্তির পথে।

২৮. ঠুলি

ফসল মাড়াইয়ের সময় অথবা বাড়ি থেকে মাঠে গরু নিয়ে যাবার সময় এটি গরুর মুখে আটকিয়ে দেওয়া হয় যাতে পথে কারো কোনো ফসল খেতে না পারে। বেত দিয়ে তৈরি এই ঠুলি দেখতে বাটির মতো।

২৯. ডুলি

এটি বাঁশের পাতলা পাত দিয়ে তৈরি করা হয়। এর ওপরের দিকটা সরু ও নীচের অংশ চওড়া। রসের জন্য খেঁজুর গাছ কাটতে যেসব উপকরণ প্রয়োজন সেগুলি এই ডুলির মধ্যে ভরে পিঠে নিয়ে গাছালি গাছে উঠে যায়। এটি দেখতে অনেকটা মাটির হাঁড়ির মতো।

৩০. গুলাল

একটি গাছের ডাল, যার মাঝখান থেকে দুটি শাখা একটু ওপরে উঠে দুদিকে চলে যায়, এমন একটি গাছের ডালকে গুলাল হিসেবে নির্বাচন করে গাছ থেকে কাটা হয়। এটি দেখতে অনেকটা ইংরেজি 'Y' এর মতো। উপরের দিকে যে দুটি শাখা দুদিকে চলে গেছে, তাদের মাথার অগ্রভাগে ৬-৭ ইঞ্চি লম্বা ও আধা ইঞ্চি থেকে ১ ইঞ্চি প্রশস্ত

www.pathagar.com

একটি রাবারের টুকরার দুইমাথা শক্ত সুতা দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়। রাবারটির মধ্যখানের স্থানটি একটু চওড়া থাকে। মাটির ছোটো ছোটো ও গোলগুলি বানিয়ে চুলার আগুনে পুড়িয়ে একটি একটি করে নিয়ে রাবারটির মাঝখানের চওড়া স্থানটিতে চেপে ধরে টেনে এনে নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুর দিকে ছোঁড়া হয়। এই গুলি নিশানা মাফিক ছুঁড়তে পারলে বিভিন্ন প্রজাতির পাখি আহত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। কিংবদন্তি আছে যে, দৌলতখানের জমিদার কালারায় কিশোর বয়সে যখন ইংরেজ লবণ এজেন্ট ডেমোক্লিয়াসের ফরমাস খাটতো, তখন তার পানসি নৌকা ডাকাতদের কবলে পড়লে কালারায় সুপারি ও জালের লৌহার গুটি দিয়ে রাতভর গুলাল ছুঁড়ে তার প্রাণ রক্ষা করেন। বিনিময়ে তিনি দৌলতখানের পাঁচ আনা অংশের জমিদারি লাভ করেন যা পরে আরো বিস্তৃত হয়।

৩১. হাতপাখা

তালগাছের পাতা কিংবা হোগলা পাতা দিয়ে এই পাখা তৈরি করা হয়। তালগাছের পাতার মাঝখান দিয়ে সমান দুটি ভাগ করে পাটার নীচে ৩/৪ দিন রেখে দেওয়া হয়। এতে পাতার মাঝখানের বিভিন্ন অংশের সূচালো ভাবটা আর থাকে না। তারপর পাটার নীচ থেকে বের করে এর চারপাশের অংশটা বেত বা বাঁশের পাতলা পাত দিয়ে মুড়িয়ে সুতা দিয়ে সেলাই করে দেওয়া হয়। একটি তালগাছের পাতায় দুটি পাখা তৈরি হয়ে যায়। সুপারি গাছের খোল দিয়েও হাতপাখা তৈরি করা হয়। এছাড়া মোটা কাপড় দিয়েও হাতপাখা তৈরি করে তার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সুতার কাজ করা হয়, যাকে নকশি পাখা বলা হয়। গ্রামের মহিলারা এই হাতপাখায় নানান ধরনের বাণী পেনসিল দিয়ে লিখে তার ওপর বিভিন্ন রং-এর সুতা দিয়ে সেলাই করে। তালের পাখায় লেখা থাকে, 'নামটি আমার তালের পাখা, শীতকালেতে দেই না দেখা, কাজ আমার বাতাস করা।' বাড়িতে নতুন জামাই, জামাইয়ের আত্মীয়-স্বজন কিংবা অন্য কোনো মেহমান এলে বাক্স থেকে হাতপাখাখানা বের করে দেওয়া হয়। ইদানীং গ্রামে গ্রামে বিদ্যুতের সরবরাহ বৃদ্ধি পাওয়ায় হাতপাখার ব্যবহার অনেকটা কমে গেছে।

৩২. কুলা ও ডালা

বাঁশের পাতলা পাত দিয়ে তৈরি কুলার তিন পাশে বাঁশ ও বেত দিয়ে বাঁধা থাকে। ধান-চাল-ডালসহ বিভিন্ন দ্রব্য ঝেড়ে পরিষ্কার করা এবং বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য রোদে শুকানোর কাজে কুলা ব্যবহার করা হয়। ডালাও একইভাবে তৈরি। তবে দুটির আকৃতি দু'ধরনের। ডালায়ও বিভিন্ন জিনিস রোদে শুকাতে দেওয়া হয়। সংসারের দৈনন্দিন কাজ ছাড়াও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক অনুষ্ঠান, যেমন, বধূবরণ ও গায়ে হলদু, বিয়ের অনুষ্ঠানে কন্যা বিদায়ের সময় ডালা-কুলার ব্যবহার অত্যাবশ্যক।

৩৩. বিড়া

মেঝেতে পানির কলসি, হাঁড়ি ইত্যাদি সঠিকভাবে রাখার জন্য খড় বা নাড়া পাকিয়ে পাকিয়ে মোটা রশির মতো তৈরি করা হয়। সেই রশি দিয়ে গোলাকৃতির বিড়া তৈরি করা হয়। এর ওপরে মাটির কলসি বা হাঁড়ি রাখলে কাত হয়ে পড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে না। এই 'বিড়া' আবার মাথায় বেশি ওজনের শক্ত কোনো কিছু বয়ে নিয়ে

www.pathagar.com

যাওয়ার জন্যও ব্যবহার করা হয়। এতে মাথায় শক্ত দ্রব্যাদির সরাসরি চাপ লাগে না।

দৌলতখান উপজেলা

[ভোলা সদর উপজেলার অনুরূপ]

তজুমুদ্দিন উপজেলা

[ভোলা সদর উপজেলার অনুরূপ। জেলার সর্বত্র একই রকম]

১. জাই জাল বা ঝাকি জাল
২. ধর্ম জাল
৩. ঠেলা জাল
৪. বিন্নি বা বিন্দি জাল
৫. লোতর জাল
৬. পিছা জাল
৭. ছান্দি সাবার জাল
৮. বড় সাবার জাল বা বেড় জাল
৯. হোলি জাল
১০. খোট জাল
১১. পলো
১২. আনতা
১৩. গরা
১৪. কোচ
১৫. পিঁড়ি
১৬. তালাশি
১৭. বারুনি
১৮. টগবি বা টবগি
১৯. শিঁকা
২০. ডালা
২১. কুলা
২২. চালুনি বা চালনি
২৩. হাত-পাখা
২৪. পিছা বা ঝাড়ু
২৫. ডোলা
২৬. খলুই
২৭. ছাবি
২৮. লাঙল
২৯. জোয়াল

www.pathagar.com

৩০. ঠুলি
৩১. গুলাল বাঁশ
৩২. মাথাল
৩৩. বিড়া
৩৪. পুরা

বোরহানউদ্দিন উপজেলা

[ভোলা সদর উপজেলা অনুরূপ। জেলার সর্বত্র একই রকম]

১. জাই জাল বা ঝাকি জাল
২. ধর্ম জাল
৩. ঠেলা জাল
৪. বিন্নি জাল বা বিন্দি জাল
৫. লোতর জাল
৬. পিছা জাল
৭. ছান্দি সাবার জাল
৮. বড় সাবার জাল বা বেড় জাল
৯. হোলি জাল
১০. খোট জাল
১১. পলো
১২. আনতা
১৩. গরা
১৪. কোচ
১৫. পিঁড়ি বা পিঁড়া
১৬. তালাশি
১৭. টবগি
১৮. বারুনি
১৯. শিঁকা
২০. ডোলা
২১. কুলা
২২. ডালা
২৩. চালুনি বা চালনি
২৪. হাতপাখা
২৫. পিছা বা ঝাড়ু
২৬. খলুই
২৭. ছাবি
২৮. লাঙল
২৯. জোয়াল

www.pathagar.com

৩০. ঠুলি
৩১. গুলাল বাঁশ
৩২. মাথাল
৩৩. বিড়া
৩৪. পুরা

লালমোহন উপজেলা

[ভোলা সদর উপজেলার অনুরূপ। জেলার সর্বত্র একই রকম]

১. জাই জাল বা ঝাকি জাল
২. ধর্ম জাল
৩. ঠেলা জাল
৪. বিন্নি জাল বা বিন্দি জাল
৫. লোতর জাল
৬. পিছা জাল
৭. ছান্দি সাবার জাল
৮. বড় সাবার জাল বা বেড় জাল
৯. হোলি জাল
১০. খোট জাল
১১. পলো
১২. আনতা
১৩. গরা
১৪. কোচ
১৫. খলুই
১৬. ছাবি
১৭. টবগি বা টগবি
১৮. বারুনি
১৯. শিঁকা
২০. ডোলা
২১. কুলা
২২. ডালা
২৩. চালুনি বা চালনি
২৪. হাতপাখা
২৫. পিছা বা ঝাড়ু
২৬. পিঁড়ি বা পিঁড়া
২৭. তালাশি
২৮. লাঙল
২৯. জোয়াল
৩০. ঠুলি

www.pathagar.com

৩১. গুলাল বাঁশ
৩২. মাথাল
৩৩. বিড়া
৩৪. পুরা

চরফ্যাশন উপজেলা
[ভোলা সদর উপজেলার অনুরূপ]
১. জাই জাল বা ঝাকি জাল
২. ধর্ম জাল
৩. ঠেলা জাল
৪. বিন্নি জাল বা বিন্দি জাল
৫. লোতর জাল
৬. পিছা জাল
৭. ছান্দি সাবার জাল
৮. বড় সাবার জাল বা বেড় জাল
৯. হোলি জাল
১০. খোট জাল
১১. পলো
১২. আনতা
১৩. গরা
১৪. কোচ
১৫. খলুই
১৬. ছাবি
১৭. টগবি বা টবগি
১৮. বারুনি
১৯. শিঁকা
২০. ডোলা
২১. কুলা
২২. ডালা
২৩. চালুনি বা চালনি
২৪. হাতপাখা
২৫. পিছা বা ঝাড়ু
২৬. পিঁড়ি বা পিঁড়া
২৭. তালাশি
২৮. লাঙল
২৯. জোয়াল
৩০. ঠুলি
৩১. গুলাল বাঁশ
৩২.মাথাল

www.pathagar.com

৩৩. বিড়া
৩৪. পুরা

মনপুরা উপজেলা
[ভোলা সদর উপজেলার অনুরূপ]
১. জাই জাল বা ঝাকি জাল
২. ধর্ম জাল
৩. ঠেলা জাল
৪. বিন্নি জাল বা বিন্দি জাল
৫. লোতর জাল
৬. পিছা জাল
৭. ছান্দি সাবার জাল
৮. বড় সাবার জাল বা বেড় জাল
৯. হোলি জাল
১০. খোট জাল
১১. পলো
১২. আনতা
১৩. গরা
১৪. কোচ
১৫. খলুই
১৬. ছাবি
১৭. টগবি বা টবগি
১৮. বারুনি
১৯. শিঁকা
২০. ডোলা
২১. কুলা
২২. ডালা
২৩. চালুনি বা চালনি
২৪. হাতপাখা
২৫. পিছা বা ঝাড়ু
২৬. পিঁড়ি বা পিঁড়া
২৭. তালাশি
২৮. লাঙল
২৯. জোয়াল
৩০. ঠুলি
৩১. গুলাল বাঁশ
৩২. মাথাল
৩৩. বিড়া
৩৪. পুরা

www.pathagar.com

তথ্যসূত্র

১. আবদুর রহমান, পিতা : প্রয়াত একেএম ইউসুফ মোহাম্মদ ইউসুফ, মাতা : প্রয়াত জোলেখা খাতুন, পেশা : ব্যবসা, বয়স : ৬৫ বছর, ঠিকানা : গ্রাম : চাঁচড়া বাপ্তা, ডাকঘর : বাপ্তা পাইলট, উপজেলা : সদর উপজেলা, ভোলা
২. হোসেন আহমদ, পিতা : প্রয়াত রফিকুল হক, মাতা : প্রয়াত সিদ্দিকা খাতুন, পেশা : চাকরি, ঠিকানা : গ্রাম : চাঁচড়া বাপ্তা, ডাকঘর : বাপ্তা পাইলট, উপজেলা : সদর উপজেলা, ভোলা
৩. হোসনে আরা মিনু, পিতা : প্রয়াত আবদুল মালেক, মাতা : মোমেনা খাতুন, বয়স : ৪৫ বছর, পেশা : গৃহিণী, ঠিকানা : গ্রাম : চাঁচড়া বাপ্তা, ডাকঘর : বাপ্তা পাইলট, উপজেলা : সদর উপজেলা, ভোলা
৪. এমএ তাহের, পিতা : প্রয়াত গোলাম রহমান, মাতা : প্রয়াত সাহেরা খাতুন, শিক্ষা : বিএ বয়স : ৮০ বছর, পেশা : সাংবাদিকতা ও লেখালেখি, ঠিকানা : গ্রাম : দক্ষিণ সৈয়দপুর ডাকঘর : সাবেক হাজীপুর মাদ্রাসা, উপজেলা : দৌলতখান।
৫. মোহাম্মদ আবদুল্লাহ, পতা : মোহাম্মদ ইছহাক, মাতা : প্রয়াত সুফিয়া বেগম, শিক্ষা : ফাজিল, বয়স : ৪০ বছর, পেশা : ব্যবসা, ঠিকানা : ৭ নং ওয়ার্ড, দৌলতখান পৌরসভা, ডাকঘর ও উপজেলা : দৌলতখান
৬. মোঃ সফিউদ্দিন মিয়া, পিতা : প্রয়াত এখলাছ উদ্দিন, মাতা : প্রয়াত জরিনা খাতুন, শিক্ষা : পঞ্চম শ্রেণি, বয়স : ৫৫ বছর, পেশা : কৃষিজীবী, ঠিকানা : গ্রাম : ডিমাড়ুবি, ডাকঘর : দেবীপুর মাদ্রাসা, উপজেলা : তজুমুদ্দিন
৭. কার্তিক দেবনাথ, পিতা : ননীগোপাল দেবনাথ, মাতা : শান্তি দেবনাথ, শিক্ষা : ডি.ইউ.এমএস, বয়স : ৬১ বছর, পেশা : ব্যবসা, ঠিকানা : গ্রাম : হাসাননগর, ডাকঘর : মৃজাকালু, উপজেলা : বোরহানউদ্দিন
৮. মোশারেফ হোসেন হাওলাদার, পিতা : প্রয়াত আবদুর রাজ্জাক হাওলাদার, মাতা : প্রয়াত সবুরা খাতুন, বয়স : ৬৭ বছর, পেশা : অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ঠিকানা : গ্রাম : পক্ষীয়া, ডাকঘর : বোরহানগঞ্জ, উপজেলা : বোরহানউদ্দিন
৯. নূরুল আলম, পিতা : প্রয়াত আবদল খালেক, মাতা : রিজিয়া বেগম, শিক্ষা : বি.এ, বয়স : ৬১ বছর, পেশা : ব্যবসা, ঠিকানা : গ্রাম : কুড়ালিয়া, ডাকঘর : কাশিগঞ্জ, উপজেলা : বোরহানউদ্দিন
১০. মোঃ অজিউল্লাহ মিয়া, পিতা : প্রয়াত আবদুর রহমান মিয়া, মাতা : প্রয়াত তহুরা খাতুন, বয়স : ৭১ বছর, পেশা : ব্যবসা, গ্রাম : ধলিগৌরনগর, ডাকঘর : সিরাজিয়া মাদ্রাসা, উপজেলা : লালমোহন
১১. সালেহা খাতুন (পারুল), স্বামী : মোঃ অজিউল্লাহ মিয়া, শিক্ষা : বি. এ., বয়স : ৫৭, পেশা : গৃহিণী, ঠিকানা : গ্রাম : ধলিগৌর নগর, ডাকঘর : সিরাজিয়া মাদ্রাসা, উপজেলা : লালমোহন
১২. মোঃ আফাজউল্লাহ, পিতা : প্রয়াত আবদুর রশিদ, মাতা : নূরজাহান বেগম, শিক্ষা : পঞ্চম শ্রেণি, বয়স : ৪৭ বছর, পেশা : মৎস্যজীবী, ঠিকানা : জিন্নাগড়, চরফ্যাশন
১৩. মোঃ আলমগীর হোসেন, পিতা : মোহাম্মদ নূর হাফেজ মিয়া, মাতা : হাসিনা বেগম, শিক্ষা : বিএ (অনার্স) এম.এ, পেশা : শিক্ষকতা, বয়স : ৩৩ বছর, ঠিকানা : গ্রাম : চর ফৈজুদ্দিন, ডাকঘর : হাজীরহাট, উপজেলা : মনপুরা
১৪. অধ্যাপক বিধানকৃষ্ণ দাস, পিতা : হরিহর দাস, মাতা : কল্পনা রানী, শিক্ষা : এমএসসি, পেশা : অধ্যাপনা, বয়স : ৪০ বছর, ঠিকানা : গ্রাম : সোনারচর, ডাকঘর : হাজীরহাট, উপজেলা : মনপুরা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বাংলা একাডেমি